

অনার্য দামোদর

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

**সিইচও
প্রকাশন**

সিইচও লিমিটেড
১২ বক্সিং চ্যাটার্জি ব্লক-১ কলকাতা ৭০০০৪০

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল, ১৯৫৮ ॥ বৈশাখ, ১৩৬৫

প্রকাশক

তপন দে

৩ সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন, কলকাতা, ৭০০ ০২২

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

পরিবেশক

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ

উদয় চক্রবর্তী

১৯৫৬ সালের ধর্মঘটী ঞমিকদের উদ্দেশে

ভূমিকা

কয়লা কুঠির কালো যশনিকার অন্তরালে বহু ইতিহাস, বহু মানুষ, বহু লোকাচার এবং কিংবদন্তী। সেই ঐতিহাসিক পটভূমিতে যে সব ক্রান্তিকাল ছিল সেই সম-সাময়িক কালের চরিত্র, ঘটনা সমাজ ও শিল্প নিয়ে পাঁচ-ছটি উপন্যাস রচনার মাস্টার প্ল্যান মোতাবেক মহাকালের ঘোড়া—১ম ও ২য় খণ্ড কয়লা কুঠির আদি পর্ব থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ট্রেড ডিপ্রেঞ্চারের পর্ব পর্যন্ত বিধৃত হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের গতি সঞ্চারণ ও স্বাধীনতা উত্তর পর্বে কয়লা অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাণপণ সংগ্রামের সত্যনিষ্ঠ বিবরণ দাখিল করেছি অনাৰ্থ দামোদর উপন্যাসে।

আমি কয়লা অঞ্চলের মাটির মানুষ। ১৯৫৭ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল কোল কোম্পানীতে মাইনিং অ্যাপ্রেনটিশ হয়ে খাদে ঢুকেছিলাম। তখন ১৯৫৬ সালের এক মাস ব্যাপী ধর্মঘটের স্মৃতি একেবারে তাজা। শ্রমিক, মালিক, নেতা ও দালালদিকে দেখার স্বেচছা পেলাম।

সেই থেকে বীজাকারে জ্ঞানাকারে যে বিষয়-ভাবনা, কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র ও বিবর্তনের ধারা আমার মগজে ক্রমাগত জাল বুনে যাচ্ছিল তাই এক এক করে ছাপার অক্ষরে পাঠকদের নামনে হাজির হচ্ছে।

উক্ত উপন্যাসগুলি সপ্তাহ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং মহাকালের ঘোড়া—১ম খণ্ড তাঁরা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন সেজন্য সপ্তাহের সম্পাদকমণ্ডলী ও কর্মীদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রী শিবব্রত গাঙ্গুলী বহু ক্লেশ স্বীকার করে মহাকালের ঘোড়া—২য় খণ্ড ও এই বইটি প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করেছেন সেজন্য তাঁকে ও তাঁর সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রফুল্ল কুমার সিংহ

অনার্য দামোদর

ভোঁ-ও-ও-ও

বয়লার হাউস থেকে একটানা বেজে যাচ্ছে হুইসল্। ছুটে যাচ্ছে যন্ত্র জগতের কুশীলবগণ। তাদের কাছে তুচ্ছ শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষার নৈসর্গিক বাধা বিপত্তি ; তুচ্ছ আহার নিদ্রা ও মৈথুনের দৈনন্দিনতা। পালি শেষ ও পালি গুরু এক একটি ভোঁ আশ্চর্যভাবে চারিয়ে আছে রক্তে, মজ্জায় ও হৃদয়ে।

ছুটেছে বাবু, ছুটেছে কারিগর, ছুটেছে কুলি মজুর, লোডার, টালোয়ান। মাঘ মাসের রাত বারোটায় কনকনে শীতের বাতাসে হাড় পাজর ঠন্ ঠন্ করে বাজছে। ঘরের মধ্যে পড়ে আছে বুকুর ওম ধরা বিছানা, যুবতী বোয়ের কোল, বাল-বাচ্চা বৃতক। সেদিকে তাকাবার অবসর নেই। কলের বাঁশি বেজে গেছে।

কিস্ত কেন ?

কি তাৎপর্য যন্ত্র জীবনের বিপুল বিস্তৃত যান্ত্রিক শব্দ মালার ? কারণ ভোঁ পডার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যাবে হাজিরা খাতা। যে আধ ঘণ্টার মধ্যে হাজির হবে তার নামে হাজিরা লেখা হবে। সে কাজ করবে। হস্তার শেষে শ্রমের দাম পাবে। তাই দিয়ে কিনবে চাল-গম-তেল-ছুন কাপড়-চোপড় কত কী ! চলবে জীবন। কত তার প্রয়োজন। অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, মাথার ওপর আচ্ছাদন চাই। চাই লজ্জার আবরণ, হৃদয়ের ভালবাসা। চলমান গাড়ি চলমান পৃথিবীর বৃকে চলে—কিস্ত তার জন্ত চাই জ্বালানি।

এমনিভাবেই জীবনের ব্যাখ্যা করে অনন্ত শর্মা। থার্ড ইয়ারের মাইনিং ট্রেনি। অঙ্ককার স্কেল পথে মুণ্ডা বাতির আলোতে লিখে রাখে কয়লা কুলিদের জীবনচর্যা।

স্কেলের চালু পথে দশ বারোজন কুলির সঙ্গে বসে আছে ও। ওরা সব খাদের লোডার। কাঠখোঁট্টা লাহাঙ্গা জোয়ান। নোংরা নোংরা মেঝের উপর লম্বান। অবসর সময়ে অনন্ত ওদের কানে মন্ত্র দেয়।

মানুষের অধিকার, শ্রমের মূল্য, শোষণের জাল, একতাবদ্ধ সংগ্রামের ক্ষমতা নিয়ে কথা বলে। ওরা ভালবাসে, ওর কথা শুনে উদ্বেগ হয়, উত্তেজিত হয়। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ভাক শোনে হৃদয়ের স্পন্দনে। প্রবহমান শোণিত ধারায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ওঠে।

ভারতবর্ষের আটশো কয়লা খনিতে পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিকের মধ্যে একটি অনন্ত শর্মা আর কতটুকু ? কিস্ত সে যদি স্কুলিঙ্গ হয় ? তাহলে পুঞ্জীভূত দাহ পদার্থে সৃষ্টি করতে পারে দাবানল।

সময় বড় বলবান। মহাকাল সৃষ্টি করে চরিত্র। কয়লা কুঠির অগ্নিগর্ভ সময়ে এমন কত অনন্ত শর্মা সঙ্কোপনে বেড়ে উঠেছে। কত আয়াসে তারা সংগ্রহ করছে জীবনের অভিজ্ঞতা। পোড় খাচ্ছে, সিদ্ধ হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে মানুষ। তৈরি করছে জমিন। যেখানে আবাদ হবে শোষণ মুক্ত সমাজের।

বুটিশ চলে গেছে। কিন্তু বুটিশ রাজের তৈরি শোষণের জালি তেমনি আছে। আট্টেপুঠে বন্দী হয়ে আছে কয়লা কুলির সমাজ। ওর মাথায় ঝোড়া চড়িয়ে দিয়ে ডি. ডি. সাহেব ভালই করেছেন। না হলে সে হাড়ে হাড়ে বুঝত না একটা লোডারকে একাকী ঘন ফুট কয়লা দুটি গাড়িতে বোঝাই করতে কত মেহনত করতে হয়, কত ঘাম ফেলতে হয়।

শুধু কি ঝোড়া বয়েই খালাস? তা নয়। আলোহীন, বাতাস মন্থর, মাথার উপর ছাদ পড় পড়। নীচে কোথাও এক হাঁটু জল তার মধ্যে থেকে কয়লা ছেকে তোলা, কোথাও তিনশো ফুট দূরে ট্রাম লাইন, কোথাও দেড়শো ফুট চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। কোথাও বা এত গরম যে কাজ করতে করতে পেটে ব্যথা ধরে যায়।

কোম্পানীর ট্রেনিং স্কীম মোতাবেক ছয় মাস লোডারের কাজ করতে হবে। প্রথম প্রথম ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। সে গরীবের ছেলে সবই সয়ে নিয়েছিল কিন্তু ওব বন্ধু কমলেন্দু অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন ডি. ডি. সাহেবের কাছে দরবার করতে দিয়েছিল স্মার। লোডারের কাজ তো আমাদের দ্বারা হচ্ছে না। বড় কঠিন কাজ।

উনি বলেছিলেন—ওহে কাজ করতে না পারছো তো বাড়ি চলে যাও। কোম্পানী তোমাদের জন্ম দানছত্র খোলেনি।

বড় আঘাত লেগেছিল অনন্তর অন্তরে। কোম্পানী দানছত্র খোলেনি ঠিকই কিন্তু ওরা তো ট্রেনি। মাসিক স্টাইপেণ্ড পায়। গাড়ি ভরলেও তো তার দাম পাবে না। ঠিক আছে—তোমাদের দয়া মাগতে যাব না।

বড়ই গোঁয়ার ছেলোটা, ডি. ডি. সাহেবের উপর রাগ নিজের উপরেই ঝাড়ে। একটা লোডার দলের সঙ্গে সমান তালে কাজ করছে।

ইনচার্জ বাবু এসে দাঁড়ালেন ওর কাছেই। ওর নাম ধনুক ধারী ঝা। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। গোঁপজোড়া সাদা। পরনে খাকি হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি। মাথায় হেলমেট। বাঁ হাতে ক্যাপল্যাম্পের হেডপীস। ডান হাতে তিনফুট লম্বা লাঠি। কোমরের বেণ্টে খুলছে খাদের গ্যাস চেক করার স্ক্রিম সেফটি ল্যাম্প। বুটিশ জমানার ছাপমারা মাইনিং ম্যান। তাকে ডাকলেন—অনন্তবাবু।

কাগজ কলম প্যান্টের হিপ পুকেটে রেখে অনন্ত উঠে দাঁড়াল। একটু হেসে বলল—নমস্তে ইনচার্জবাবু!

খাদের ভিতরে আলাদা আলাদা সেকশান। এক একটির দায়িত্বে একজন

ইনচার্জবাবু। তার অধীনে মাইনিংবাবু। এই দুজনের দাপটেই সারা সেক-
স্থানের কুলি মজুর কম্পমান।

পালি গুরুর পয়লা ডুলিতে মাইনিংবাবু খাদে নামেন। ইনচার্জবাবু আসেন
লোকজন, জিনিস পত্র বিলি ব্যবস্থা করে। তারপর সবকে তেড়ে নিয়ে আসেন
সেকস্থানে। কাজ শুরু হয়ে যায়। কোল কাটিং মেশিনের কাটানী, ড্রিল দিয়ে
হোল, বারুদ আওয়াজ, ট্রাম লাইনে খালি গাড়ি দেওয়া ইত্যাদি চলতে থাকে
পর্যায়ক্রমে।

সারা খাদ বারুদের ধোঁয়ায় ভরে যায়, অসহ্য গরম, তার মধ্যে লোডাররা
মাথায় ঝোড়া নিয়ে দুপ দুপ করে চলে।

পর পর কয়েক মাস একই পালিতে একই সেকস্থানে কাজ করার দরুন
ইনচার্জবাবুর সঙ্গে গুর ভাব জমে গেছে। তাই উনি বললেন, আপনি তো
বহুত পড়া লিখা জানা আদমী। আমার সঙ্গে যাবেন ?

—কেন ? কি হয়েছে ?

—সাতাশ নম্বর পছিয়াতে গ্যাস বেরিয়েছে। ডি. ডি. সাহেব উপর থেকে
খবর পাঠিয়েছে এক্স্‌প্লোজিভিভ পকশন করে রিপোর্ট পাঠাও।

—তাহলে তো ব্যাপারটি গুরুতর।

—হ্যাঁ ভাই। চলুন গ্যাস দেখে আসবেন।

গ্যাস দেখার অদম্য কৌতূহলে তৎক্ষণাত রাজী হয়ে গেল। দুজনে আগে
পিছে ঢালু পথ বেয়ে নীচে নামছে। ২৭ নম্বর পৌঁছে ডান দিকে ঝাঁক নিল।

অনন্ত জানতে চাইল সাতাশ নম্বরে গ্যাস বেরুনের পিছনে কোনো রহস্য
আছে কিনা। উনি বেশ ব্যাখ্যা করেই বুঝিয়ে দিলেন।

আগে তো খোলা চাঙনী ছিল। মানে এখন যেমন কয়লা কেটে নিয়ে ফাঁকা
জায়গা বালি দিয়ে ভরাট করা হয় তখন তা হয়নি।

ছাব্বিশ নম্বর থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত একটা প্যানেলে পিলার কাটিং হচ্ছিল।
এমনিতেই তো গ্যাসী খাদ। তারপরে হয়ে গেল স্পনটেনিয়াস হিটিং। আগুন
ধরে গেল। তখন ডি. ডি. সাহেব পুরো প্যানেলটা শীল করিয়ে দিলেন।
ছাব্বিশ নম্বর থেকে ত্রিশ নম্বর পর্যন্ত পাঁচটা স্‌ডস্কের মুখ তিনফুট পর পর ছুটো
ইন্টার দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করিয়েছিলেন। এখন যদি সাতাশ নম্বর থেকে গ্যাস
বেরোয় তাহলে তো বিপদ বটেই।

কথা বলতে বলতেই ওরা সাতাশ নম্বর লেভেলে পৌঁছে গেল। পর পর পাঁচটা
কয়লার কাঁথি পার হবার পর ইন্টার দেওয়াল চোখে পড়ল। কিন্তু তার আগে
থেকেই শী শী শব্দ শোনা যাচ্ছিল। উনি দাঁড়ালেন।

বললেন—ভাই! আর এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গ্যাস তো খুব
জোরেই বেরুচ্ছে। কাছে গেলে জান নিয়ে ফেরা দায় হবে।

বলতে বলতে উনি ঠাঁর হাতের ফ্লেম সেকটি ল্যাম্পটা তুলে ধরলেন। অল্প বাতিগুলি নিভিয়ে দেওয়া হলো। আর কি আশ্চর্য! বাতির ভিতর নীল আলোর একটা মন্দির তৈরি হয়ে গেল। ক্রমশ তা বেড়ে লম্বা হলো। নীল শিখার ধারে ধারে হলুদ আলোর ফুলঝুরি। তারপর হঠাৎই দমকা বাতাসের মতো গ্যাসটা এত জোরে এল যে বাতিটার ভিতর মুহূর্তের জল দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল এবং ঝট করে একটা শব্দ হয়েই নিভে গেল।

ঠনি চট করে দু'পা পিছিয়ে বাতিটা নীচে নামিয়ে বললেন—দেখা তো বাতিকা অন্দর বিস্ফোট হো গয়া।

—বাপরে! যত স্তন্দর তত মারাত্মক।

—চলিয়ে—বাহার চলিয়ে।

সেই পুরনো জায়গাটিতে এসে ইনচার্জবাবু বললেন—খোড়া লিখ দিজিয়ে ভাই। হামারা আংরেজী লিখা ঠিক নেহী হোতা।

অনন্ত খস্ খস্ করে লিখল—সিরিয়াস ব্লো অফ গ্যাসেস। কামিং আউট ফ্রম দ্যা স্টপিং উইথ এ সাউণ্ড লাইক হুইসল্। টেস্টেড বাই ফ্লেম সেকটি ল্যাম্প। এক্সপ্রোশান অকারড ইন ল্যাম্প। ওয়াণ্ট র্যাপিড অ্যাকশন।

উনি বললেন—ঠ্যা। বহুত ঠিক।

একটা লোক মারফৎ খবর পাঠিয়ে দিলেন ডি. ডি. সাহেবের কাছে। উনি চলে গেলেন রেজিঃয়ের কাজে।

অনন্ত পকেট থেকে কাগজ পেনসিল বের করে গ্যাস টেস্ট করার দৃশ্যটিকেই লিখতে শুরু করে দিল। ঘন অন্ধকার প্রেক্ষাপটে স্ততোর মতো নীল আলোর রেখা ক্রমশ হয়ে গেল একটা মন্দির তারই সৌন্দর্য বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া যা অনায়াসে ঘটে যেতে পারে যদি পেয়ে যায় দাহ্য পদার্থ এবং অক্সিজেন। তাতে খাদেই আছে। ঐ ফুলিঙ্গটি যদি বাইরে ঘটত তবেই বিস্ফোরণ।

খাদের কাছে ডি. ডি. সাহেবের ষষ্ঠ ইন্ড্রিয় ভীষণ সজাগ। রাত বারোটায় যখন অধোরে ঘুমুচ্ছিলেন তখন চাপরাশীর ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। সেকেও ইনচার্জবাবুর রিপোর্ট পড়েই জামা-প্যাণ্ট জুতো পরতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

বিউটিরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দারুণ স্তন্দর বৃকের উপর শায়াটাকে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করেছিল—এত রাত্রে কোথায় যাবে?

—খাদে গ্যাস হয়ে গেছে। আমাকে যেতেই হবে।

বিউটি মুখ বেকিয়ে বলেছিল—বাসায় আসো কি জল? খাদেই একটা খাটিয়া পেতে থাকতে পারো। হরদম খাদ—আর খাদ।

খুবই বিরক্ত হয়েছিল। একে তো ঘুমের জল সাধ্য সাধনা করতে হয় তবে

যদি ঘুম আসে। তারপর তা যদি মধ্যরাতে ভেঙে যায় তাহলে ভোররাত পর্যন্ত আর ঘুম আসবে না।

ডি. ডি. সাহেব বাতিঘরে বসেছিলেন উদ্‌গ্ৰীব প্রতিকায়। ওর মনে বিপদের আশঙ্কা। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এইরকম ধরনের ভাবনায় আক্রান্ত।

অনন্তর লেখা রিপোর্টটি পড়েই হুকুম দিলেন—আমার বাতি লাঠি টুপি বেড়ি কর। খাদে যাব।

উনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন—খাদ থেকে লোকজন উঠিয়ে দেবার জ্ঞ। ঐ লোকটিকেই সেই হুকুমটি লিখে ইনচার্জবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ডি. সি. সাহেবের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন—সাতাশ নম্বর স্টপিংয়ে ফাটল ধরার দরুন পুরনো চাঁদনীর বিষাক্ত গ্যাসের সঙ্গে ফায়ার ড্যাম্প গ্যাস বেরিয়ে আসছে। ব্যাপারটি গুরুতর। এটা চলতে দিলে পুরো খাদ বিষাক্ত গ্যাসে ভরে যাবে। সেজ্ঞ লোকজন উঠিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছি। তুমি অবিলম্বে ম্যানেজার, এজেন্ট, সি. এম. ই., মাইনস অফিস ও রেসকিউ স্টেশনে খবর দাও। সাতাশ নম্বর স্টপিং এক্সুগি সিল করতে রেসকিউ ব্রিগেড চাই। আর্জেন্ট কল দাও। আমি খাদে যাচ্ছি। বলা যায় না লোকজনও বিপদগ্রস্ত হতে পারে। ভেরী আর্জেন্ট।

বাতি বেঁধে পিট টপে এসে হাঁক দিলেন ঘণ্টাওলা। মারো তিন ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা মানে লোকজন ওঠানামার সঙ্গেত বিনিময়। গুলু লুনিয়া মানে গৈরীর বাপ ঘণ্টাওলা। সে কাজটা অতি দ্রুত সেরে ফেলল। ডি. ডি. সাহেবকে নিয়ে সর সর করে ডুলি নেমে গেল।

সেকশনে তখন লোক ওঠাবার জ্ঞ হুঁড়োহুড়ি পড়ে গেছে। অনন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইনচার্জ ও মাইনিংবাবু ঐ সেকশনের কোনায় কোনায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। লোকজনকে খুঁজে পেতে উপরে পাঠাবার জ্ঞ। রাত পালির ব্যাপার। দু'একজন ছুটকো বিরহী, ফাঁকিবাজ লেবার কোথাও পড়ে পড়ে ঘুমোতেও পারে।

ডি. ডি. সাহেব আসামাত্র সবাই তটস্থ। উনি বললেন—হুঁড়বুড় করিস না ধীরে হুঁস্বে উঠে যা।

অনন্তকে দেখতে পেয়ে বললেন—তোমারও নাইট শিফট নাকি ?

—হ্যা স্মার। আমিই তো রিপোর্টটা লিখলাম।

—তাই বুঝি ? হ্যা—তাইতো ! ধছকধারী এত বিজ্ঞে পাবে কোথায় ?

রিপোর্টটা পকেট থেকে বের করে একবার দেখে নিয়ে বললেন—চল তাহলে দেখে আসি। একসেট টিম্বারম্যান আর ব্রাটিশ ক্লথ নিতে হবে।

একটি খুঁটো মিস্ত্রী, দুটি কুলি, ডি. ডি. সাহেব এবং অনন্ত।

ডি. ডি. সাহেব সবার আগে আগে হাঁটছেন। সাতাশ নম্বরে পৌঁছে গন্ধ
ওঁকেই বললেন—এ-হে-হে! বাতাসটা ফাউল হয়ে গেছে।

—ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ।

টিম্বারম্যানদেরকে বললেন—তোরা এই খানেই একটা আড়া আড়ি ব্রাটিশ
ক্লথের স্টপিং তৈরি কর। তাতে যতটুকু আটক হয়।

ওরা কাজ শুরু করতে না করতেই ভিতরে একটা বড় পড় পড় শব্দ হলো।
উনি বললেন—পালা পালা—

নিজেও ছ'পা পিছিয়ে গেলেন। টিম্বারম্যানরা পড়ি কি মরি করে চড়াই
ভেঙে দৌড়তে শুরু করে দিল। ভিতর থেকে আবার একটা বড় রকমের শব্দ
ভেসে এল বেশ একটু সময় নিয়ে।

উনি বললেন—বোধহয় চাল ভেঙে পড়ল। চল—জলদি চল।

আগে ডি. ডি. সাহেব, পিছনে অনন্ত। অনেক আগে টিম্বারম্যানরা। চড়াই
ভেঙে উঠতে গিয়ে ডি. ডি. সাহেব আছাড় খেতে খেতে বেঁচে গেলেন। অনন্তর
বুকের ভিতরটা হাঁস ফাঁস করছে। কি রকম জ্বালা এবং অস্বস্তি। মথাটা ঘোর
হয়ে আছে। যেন কত না নেশা করেছে। ঠিক এমন অল্পভূতির সঙ্গে কখনো
পরিচিত ছিল না ও।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—অনন্ত! আমার পেটে গ্যাস ঢুক গেছে। তোমার
কিছু হয়নি তো?

—বড় কষ্ট হচ্ছে স্মার।

—চলো। এটা রিটার্ন জোন। বাতাস বেরুবার রাস্তা। তাই গ্যাস তাড়া
করে আসছে। কোনো রকমে বাতাস ঢুকবার রাস্তায় যেতে হবে। না হলে মৃত্যু।

এঁা। অনন্ত আঁতকে উঠল। পড়ি কি মরি করে চলছে। সামনে ডি.
ডি. সাহেব কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছেন। অনেক আগে টিম্বারম্যানদের বাতিগুলি
তিনটি চলমান আলোক বিন্দুর মতো ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

বহু কষ্টে চার পিলার উঠল। অনন্তর আর পা উঠছে না। বিষাক্ত গ্যাসের
ক্রিয়ায় ফুসফুসটা ফুলে উঠেছে। বাতাসের স্ফুধা মিটেছে না। কি করে মিটেবে?
একবার শ্বাস টানলে যতটা বাতাস ঢুকছে ততটা তো অকস্মিকেনেই। সহজ-
ভাবে শ্বাসক্রিয়া চলছে না! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পর পর ছ'বার ফ্যস্ট-এড কম্পিটিশনে ফাস্ট প্রাইজ পেয়ে এটা বুঝবার মতো
শিক্ষা ওর হয়েছে। কিন্তু শিখে ক্রি করবে?

ডি. ডি. সাহেব কয়লার পিলারে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভীষণভাবে
হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—অনন্ত! এটা তেইশ নম্বর লেভেল। ঘোলো নম্বরে
ফাটক আছে। গুনে গুনে যাও। বোলো নম্বরে পৌঁছলেই ডানদিকে ঘুরবে।

ফাটক খুলে ওপরে যেতে পারলেই জীবন। এপারে মৃত্যু। যা—ও—পড়ে যাচ্ছিলেন।

—স্মার !

অনন্ত গুকে ধরে ফেলল। অতবড় একটা লাশ ওর পক্ষে যোগান দিয়ে তুলে ধরা সহজ কথা নয়। তবু সে প্রাণপণে টাল সামনে নিল। ঠুর বা হাতটা নিজের কাঁধের উপরে নিয়ে বলল—আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন স্মার।

—তুমি ছেলেমানুষ। এই তো জীবনের শুরু। এখনও যেটুকু দম আছে তাতে করে ষোলো নম্বরে পৌঁছে যেতে পারবে। তুমি বাঁচো অনন্ত—আমার এখানেই শেষ।

অনন্তর কাঁধে ভর দিয়ে আরও এক পিলার উঠলেন। তারপর জিভটা বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো যেন ফুটে যাচ্ছে। সারামুখ বিকৃত। কি অসীম যন্ত্রণা হচ্ছে ভিতরে।

অনন্ত কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে। বুকটা ফেটে যাচ্ছে। তবু সে প্রাণপণে এগুবার চেষ্টা করছে। পা আগে উঠছে না।

দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রায় মিনিট দশেক খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকার পর মনে হলো এবার শ্বাস নিতে পারবে।

বলল আর একবার জোর লাগান স্মার।

ডি. ডি. সাহেবের মুখটা ঝেঁকে গেছে। টুপিটা পড়ে গেছে।

বাতির মাউথ পিসটা গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে।

বহু কষ্টে বললেন—আমি পারবো না। তুমি যাও। তোমার দিদিকে বলো—খাদের মাছুষটা খাদেই রয়ে গেল।

অনন্ত মাথা নীচু করে হাঁফাচ্ছিল। চোখ তুলে তাকাল।

অনেকক্ষণ দম নিয়ে উনি বললেন—আমার কোনো বংশ নেই যে পিও দেবে। তোমার দিদি একা হয়ে পড়বে। পাঁচটা শিয়াল কুকুর ছিঁড়ে খাবে। এই দুঃখ নিয়েই মরতে হচ্ছে।

বলতে বলতে এলিয়ে পড়লেন।

অনন্ত আর্তনাদ করে উঠল—স্মার !

—ওঃ ! আজ যদি নিজের রক্ত মাংসের একটা শিকড় থাকত—উঃ কত সেধেছিলাম—উঃ। ভগবান !

বলতে বলতে শুয়ে পড়লেন। অনন্তর আর সাধ্য নেই যে গুঁকে তুলে ধরে। বলল—হাতে পায়ে ভর দিয়ে চলুন স্মার। বুক চাপ কম লাগবে।

জীবনটা যে কি ধাতু দিয়ে তৈরি কে জানে ? সহজে খাঁচা ছাড়া হতে চায় না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যায়। অলৌকিক শক্তি ভর করে হাড় পাজরের গাঁটে গাঁটে।

হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘষটে ঘষটে চলতে লাগলেন। আরও ছুটো পিলার। এটা আঠারো নম্বর।

অনন্ত বলল—স্মার আঠারো নম্বর। আর দু'পিলার।

—তুমি যাও। কচি জীবনটা নষ্ট করো না। আঃ।

চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। একটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে উপুড় হয়ে মেঝের সঙ্গে মিশে গেলেন।

অনন্তরও ধাত ডুবছে। চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছে না। বহুকষ্টে বাতির ফোকাস দিল ডি. ডি. সাহেবের মুখে। ওঁর বুক হাত দিয়ে দেখল এখনো হৃদপিণ্ড চলছে।

তাহলে কি করবে। জীবন্ত মানুষটাকে ফেলে দিয়ে যাবে? কিন্তু সেই বা যাবে কী করে? তারও চোখের সামনেটা ঝিল মিল করছে। অনেকটা ধরতে পারছে না। কানেও শুনতে পাচ্ছে না। মুখটা যতদূর সম্ভব হাঁ করে শ্বাস নিতে চাইছে—তবু বাতাস ঢুকছে না।

না—না! সব না। জীবনটা বেবাক না হয়ে যাচ্ছে।

মা—মাগো মরার আগে তোমার মুখটা দেখতে পেলাম না মা! নেশাগ্রস্ত ভূতের মতো ডি. ডি. সাহেবকে ধরে ঘষটাতে ঘষটাতে খানিকটা এগিয়ে ধড়াস করে পড়ে গেল।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বুকফাটা ডাক দিলো...মা...

দুই

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

দূরগত ধ্বনি তরঙ্গ। সাগরের ওপার থেকে মা ডাকছেন মিষ্টি স্বরে। তার কপালে স্নেহ কোমল একটি হাত। অনেক রাত হয়েছে। মা জেগে আছেন শিয়রে। তাঁর চোখ ছুটি সিক্ত। মুখের রেখায় ব্যাকুল আর্তি। মা বৃষ্টি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন।

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

আবার সেই মিষ্টি স্বর। তবে কি সত্যিই মা এসেছেন? এই খাদের অন্ধকারে। এবড়ো খেবড়ো কালো পাথরে। কাঠ খুঁটো নোংরা আবর্জনার মধ্যে।

—মা—মাগো—

—অনন্ত!

এই ভয়ানক গ্যাসের মধ্যে তুমি কেন এলে মা ? এখানে এলে কেউ জীবনে বাঁচে না। আমাকে আশীর্বাদ কর মা। বড় আক্ষেপ ছিল মরার আগে তোমার মুখটা দেখতে পেলাম না।

—অনন্ত ! অনন্ত !

—এঁ্যা !

—সিটার। অনন্তর জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিন।

—কে ?

—চোখ মেলে তাকাও অনন্ত ! আমি তোমার দিদি—বিউটিদি।

—আপনি খাদে এলেন কি করে ?

—এটা খাদ নয়। হাসপাতাল।

—অনন্তর জ্ঞান ফিরেছে দিদি ?

স্ববীর ঢুকলো। পিছনে কমলেন্দু।

স্ববীর ওকে ধরে ঝাঁকি দিলো—কি রে ? তাকিয়ে দ্বাথ। আমরা সবাই আছি। আমি, কমলেন্দু, দীপক, স্মিতদা, ডাক্তারদা, ডাক্তার বৌদি, বিউটিদি।

—আমার মা কই ?

—তোর মাকে আনতে লোক গেছে। কাল সকালে আসবেন।

—আমি যে এক্ষুনি মাকে দেখলাম।

—ভুল দেখেছিস।

—সেকি ? তাহলে—

—তুই বিউটিদিকে দেখেছিস।

বাইরে ফিকে অন্ধকার। ভিতরে মূঢ় আলো। নাকে অক্সিজেনের নল লাগানো আছে। শ্বাস বইছে ধীরে ধীরে। আন্তে আন্তে অনন্তর জ্ঞান ফিরে এল পরিষ্কারভাবে।

জিজ্ঞাসা করল—ডি. ডি. সাহেব কোথায় ?

ঐতো পাশের বেডে।

—কেমন আছেন ?

—এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

অনন্ত কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ডাক্তার বৌদি বললেন—খুব বেঁচে গেলে ভাইটি। যা ভয় পেয়েছিলাম। যাক্। ফাঁড়া কেটে গেল। তোমার মা-বাবার পুণ্যের জোর আছে।

তখনো গুর দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়নি। বলল—দিদি !

—হ্যা ভাইটি !

—ডি. ডি. সাহেব ভালো হবেন ভে ?

ডাক্তারবাবু এলেন হাসপাতালের ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। উনিই বললেন—
নিশ্চয়।

পেসেন্ট দেখে ডাক্তারবাবু বললেন—ই্যা। বিপদ কেটে গেছে।

অক্সিজেনের নলটা খুলে দিলেন। বললেন—গরম চা কিংবা কফি দিন।
একটু পর ফলের রস দেবেন। ঘণ্টা খানেক পর দুধ দেবেন।

—এখন কটা বাজে ?

—রাত নটা।

—আমাদেরকে হাসপাতালে কে আনল ?

—আমরাই এনেছি। অবশ্য রেসকিউ টিম তোমাদেরকে খাদ থেকে তুলে
এনেছিল।

—রেসকিউ টিম ?

—ই্যা।

সে এক তুল্কালাম কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। খাদে গ্যাস। ডি. ডি. সাহেব
ওঠেননি। আবার খুঁটো মিস্ট্রী রিপোর্ট দিল—সাহেব ও অনন্তবাবু তাদের
পিছনে আসছিল। কি জানি গ্যাস লেগে গেল কি না ?

গ্যাসে ওরাও আক্রান্ত হয়েছিল। তবে উপরে উঠতে পেরেছিল এই যা।
ডি. ডি. সাহেব নিজের উদ্ধারের পথও নিজে করে গিয়েছিলেন ডি. সি. কে চিঠি
দিয়ে। উনি সেই মোতাবেক খবরটা দিতে বিলম্ব করেননি। দলে ম্যানেজার,
এজেন্ট, ডাক্তার, ইন্জিনিয়ার; গাড়ি, এম্বুলেন্স, রেসকিউ টিম এসে পড়েছিল
যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গেই।

হেঁ হেঁ ব্যাপার! রেসকিউ টিম অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে খাদে নেমে গিয়ে
অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকা ডি. ডি. ও অনন্তকে নোডকস অ্যাপারেটাস দিয়ে
অক্সিজেন দিয়েছিলেন। আরটিফিশিয়াল রেসপিরেশন দিতেই শ্বাসক্রিয়া
চালু হয়েছিল। স্ট্রেচারে তুলে দুজনকেই নিয়ে এসেছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এত কাজ হয়ে গিয়েছিল। আর দেরি হলে ওদের
বাঁচবার সম্ভাবনা ফুরিয়ে যেত। কারণ নাড়ী ও শ্বাসক্রিয়া ক্রমশ ক্ষীণ থেকে
ক্ষীণতর হয়ে আসছিল।

এতক্ষণে গোটা খাদ বিধ্বস্ত গ্যাসে ভরে গেছে। ডি. ডি. সাহেব যদি অত
দ্রুত লোক ওঠাবার সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে খাদটা ভরে যেত মৃতদেহের স্তূপে।

আবার অনন্ত যদি ঠেলেঠেলে ডি. ডি. সাহেবকে এতটা তুলে না আনতো
তাহলে ঊঁরও ইন্তেকাল হয়ে যেত। কারণ গ্যাসের প্রকোপটা নীচ থেকে উপরে
উঠে আসছিল। কাজেই নীচের দিকেই এর প্রাবল্য ছিল বেশী।

রেসকিউ টিমের ক্যাপটেন বাতাসের যে নমুনা সংগ্রহ করে এনেছিল তা থেকেই এসব তথ্য জানা গেছে।

ডি. ডি. সাহেবের জ্ঞান ফিরল রাত বারোটোর সময়। অর্থাৎ গ্যাসে আক্রান্ত হবার বাইশ ঘণ্টা পর।

বেশ কিছুক্ষণ ঘাবৎ ঘোলাটে অবস্থার মধ্যে কাটার পর যখন বিউটিকে চিনতে পারলেন তখন ঠুঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মুছে দিয়ে বিউটি বলল কেমন লাগছে ?

—অদ্ভুত ! আমি কি বেঁচে আছি ?

—হ্যাঁ !

—আশ্চর্য !

—বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—না।

—আমাকে দেখেও।

—মরবার সময়েও তো আমি তোমাকেই দেখছিলাম।

—কফিটা খাও।

ডাক্তারবাবু অক্সিজেনের নল খুলে দিয়ে কফি খেতে অনুরোধ করলে বিউটি চামচে করে কফি খাইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আবার চোখ মেললেন। বললেন—ঐ ছেলেরা—
অনন্ত। সে কোথায় আছে ?

অনন্ত বলল—আপনার পাশের বেডেই আছি স্মার।

—ভালো আছ তো ?

—হ্যাঁ স্মার।

—ঈশ্বর তোমাকে নিশ্চয় ভালো রাখবেন।

সেটা ছিল ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড। ওদের জ্ঞান ফিরে স্বাভাবিক হতেই ডাক্তার-বাবু তাদের বেড ট্রান্সফার করে দিলেন। এবার দুজনের দু'জায়গা। পদাধিকার বলে ডি. ডি. সাহেব অফিসার্স কেবিনের হক্‌দার। সেই রকমই ব্যবস্থা হয়েছে। আর অনন্তর জন্ম জেনারেল ওয়ার্ডের বেড।

স্ববীর, কমলেন্দুরা ডি. ডি. সাহেবের জ্ঞান ফেরার পর চলে গেছে। বিউটি একা দুটি পেশেন্টের দেখা শোনা করছে। সে ডাক্তারবাবুকে অনুরোধ করল ওদের দুজনকে কেবিনে দেওয়ার জন্ম।

তাতে আর অপত্তি কি ? অফিসার নিজে যদি রাজি থাকেন।

কাজেই ডি. ডি.-র জন্ম নির্দিষ্ট কেবিনে আর একটি বেড পেতে দেওয়া হল।

কেবিনটি বেশ বড়। দুদিকে দুটি বেড। তার সঙ্গে সমকোণে বসানো একটি সোফা। পেশেন্টরা বেডে। বিউটি সোফায়। আখশোয়া হয়ে চোখ বুজে

আছে। বাইরেটায় ঘূমের আবেশ কিন্তু ভিতরটা জেগে আছে। কত কথা মনে পড়ছে।

এই মানুষটাকে তো কোনোদিন মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারিনি। ভালও বাসিনি। অথচ ওর মুতপ্রায় শরীরটাকে যখন কম্বল ঢাকা দিয়ে খাদ থেকে তুলে নিয়ে এল তখন মনে হয়েছিল জীবনটা শূন্য হয়ে গেল। কামুক, মত্তপ, হিংস্র, বদমায়েশ যাইহোক তবু তো সেই তার মাথার উপর ছিল। আজ ছটা বছর একসঙ্গে ঘর করছে। প্রতিরাত্রে একসঙ্গে শুচ্ছে। সঙ্গম করছে। তবু কি একটা আকর্ষণ জন্মাবে না?

হয়তো জন্মেছে। না হলে এতটা ব্যাকুল হয়ে পড়ত না। গতকাল রাত্রি ছুটা থেকে আজকের ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকতো না। কি অসীম উদ্বেগে সময় কেটেছে। মিনিটকে মনে হয়েছে ঘণ্টা। ঘণ্টাকে দিন। ঘুম নেই, খাওয়া নেই, স্নান নেই। এক কাপড়ে হাসপাতালে পড়ে আছে। বিয়ে করা বোঁ এর চেয়ে কি বেশী করত?

বিউটি বাথরুম থেকে ফিরে এসে সোফাতেই বসল। ওর গা-টা ঘিন্ ঘিন্ করছিল। যে শরীর পারফিউমের মদির সুবাসে ভরে থাকে তা থেকে ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। হলেই বা শীতকাল। শরীরের সন্ধিস্থলগুলি পুনঃ পুনঃ ঘর্মাক্ত হয়েই ছিল। নাক সিঁটকে সোফাতে মাথাটা এলিয়ে ছিল। শাড়িটা একেবারে লাট খেয়ে গেছে। সিঁথিতে বাসি সিঁদুর। কপালের উপর চুল উড়ছে। এমন অবস্থায় সে কখনো থাকেনি। কিন্তু এসব কথা মনেই ছিল না।

গভীর আলস্যের মধ্যেই মনস্থির করে ফেলল সকালে স্ববীর আসবে বলে গেছে। ও এলেই একটা ট্যাক্সি ডাকিয়ে পেশেন্ট ছটিকে নিয়ে কলিয়ারী চলে যাবে। অনন্তকে দিন কয়েক নিজের কাছে রাখবে।

অকাতরে ঘুমুচ্ছে ওরা।

ভিন

বাইরে রোদ ঝলমল করছে। বিউটি বাংলাতে গেছে। কমলেন্দু এল জাহ্নবী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে। ফিস্ ফিস্ করে বলল—ওরা ঘুমুচ্ছে মাসিমা।

—আচ্ছা ঘুমোক।

উনি টুলটা নিয়ে অনন্তর মুখের কাছে বসলেন। অসীম মমতায় ওর মুখটিতে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের হাতের ছোঁয়াতে কি যেন ঘাছ আছে। ধীরে ধীরে জেগে উঠল অনন্ত। চোখ মেলে তাঁকালো। হেসে বলল—মা!

—কি হারান ছিল বাবা?

—খাদে গ্যাস লেগেছিল মা।

—ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। তোর বন্ধু যখন খবরটা দিল তখন আমি আর আম্মাতে ছিলাম না।

—জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম মা।

মাতা ও পুত্রের মধ্যে কত না মমতামেহুর, উদ্বেগ ব্যাকুল কথোপকথন। ডি. ডি. সাহেবের ঘুম ভেঙেছিল। অনন্তর মায়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি বললেন—বীর প্রসবিনী জননী আপনি। আপনাকে নমস্কার। কত সাহস ওর। নিজের জীবন তুচ্ছ করে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে তুলে এনেছে।

পুত্রের বীরত্বে কোন মায়ের না গর্ব হয়? তিনিও গর্ববোধ করলেন।

অনন্ত বলল—তোমাকে দেখলাম মা। এতেই আমি সেরে উঠব। তুমি কেন উপোস দিয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকবে? বাড়ি যাও। কমল পৌছে দেবে।

কমলেন্দু বলল—হ্যাঁ মাসিমা। চলুন।

ছেলেকে ছেড়ে যেতে গুঁর মন সরছে না। কিন্তু যেতে তো হবেই।

বললেন—অনন্ত! এত বিপজ্জনক কাজ নাই বা করলি বাবা। তোর জন্ম গ্রামের হাইস্কুল তো খোলাই আছে। ওখানেই মাস্টারি করবি।

অনন্ত বলল—আমি কি সারাজীবন মায়ের কোলেই বসে থাকব মা?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা! তিনি যে কাকে কি কাজে নিয়োজিত করবেন—মাতৃবের কি সাধ্য যে তার হৃদিশ পায়।

হাসপাতালের ভিড় বেলা একটা পর্যন্ত। তারপর ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে আসে। খাওয়া দাওয়ার পর রোগীরাও কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ ঝিমুচ্ছে। ডি. ডি. সাহেব জীবনে তো কখনো বিশ্রাম পান না। তাই হাসপাতালের অলস প্রহরগুলি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

অনন্তর চোখেও তন্দ্রার ঘোর। শরীর দুর্বল। ডুবে আছে ভাবনায়। রুম রুম শব্দ বাজল কানে। স্বপ্ন না বাস্তব কে জানে। অনন্ত চোখ বুজে আছে। কিন্তু তার পায়ের উপর মুহূ কোমল স্পর্শের অল্পভূতি পাচ্ছে। ঠুং ঠাং চুড়ির বাস্ত শুনছে। খুব ভালো লাগছে ওর। স্ব্থ স্ব্থ ভাব জাগছে মনে। সেই আমেজে চোখের পাতা মেলল।

হলুদ রাঙা শাড়ি পরা একটি কিশোরী তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। কপাল থেকে প্রায় তালু পর্যন্ত লম্বা সিঁথি বরাবর গোলা সিঁদুরের দাগ। সেই তার পায়ের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কাঁচের চুড়ি রিন্ ঠিন্ শব্দে বাজছে।

অক্ষুট কণ্ঠে বলল—গৈরী! তুই।

গৈরী চোখ তুলে তাকাল। গভীর কালো ছুটি টানা ভুরু টঙ্কার দিল। অনন্ত বলল, আয়,। এদিকে আয়।

গৈরী মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। অনন্ত বলল—কোথা থেকে এলি?

—স্থল থেকে ।

—এ সময়ে ?

হ্যাঁ । টিফিনে পালিয়ে এলাম ।

—কেন রে ?

—তোমাকে দেখতে ।

অনন্ত হাসল । কোনো উত্তর জোগাল না । গৈরীকেই ভালভাবে দেখল ।

ঢল ঢল লাভাশ্রময় মুখ । দুজনেই চূপ চাপ ।

দুঃম করে গৈরী বলে বলল—তুমি আমার কে হও অনন্ত দা ?

অনন্ত হকচকিয়ে গেল । একটু থেমে বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন রে ?

—কি জানি ?

—তোর বুদ্ধি আমার উপরে খুব টান পড়ে গেছে ?

হ্যাঁ তো ।

অকপট স্বীকারোক্তি । অনন্তর বৃকে ছন্দুভি বেজে উঠল ।

গৈরী বলল—যখন থেকে শুনেছি খাদে গ্যাস লেগে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছ তখন থেকেই তোমার জন্ম মনটা ছটফট করছিল ।

অনন্ত হাসল । গুর হাতের একটি চুড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ।

বলল—এখন শাস্ত হল ?

—হ্যাঁ । বড্ড ভয় পেয়েছিলাম ।

—আর ভয় নেই ।

—তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাও । আমি তোমার জন্ম পীর সাহেবের দরগায় সিন্দী চড়াবো ।

—ওরে বাব্বাঃ । মানত করে বসে আছিস ?

—তা করব না ? তুমি আমার মান রেখেছো তা কি ভুলবার বটে ?

ওর পায়ের উপর কঞ্চলটা ঢাকা দিয়ে মল ঝুমঝুম করে চলে গেল । অনন্তর মনে হলো একরাশ ফুলের সুবাস অথবা মধুর সঙ্গীতের মূর্ছনা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল । গৈরী আরো একটু থাকল না কেন ?

বিকলে সাহেব সুবোরা এলেন ডি. ডি. সাহেবকে দেখতে । বিউটি তখন বিউটিফুল হয়ে ফিরে এসেছে । সাহেবরা তারই স্তাবকতা করছেন । এ তার রূপের গরব ।

অথচ কত সহজে সে অনন্তর দিদি হয়ে গেছে । এই বিউটিকে সে আগে চিনতো না । এই ডি. ডি. সাহেবকেও নয় । বিপদকালেই বোধহয় মাছুষ মাছুষের আপন হয় ।

ডাঃ সেন বিউটির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বললেন—গ্যাস পয়জনের একটা

মারাত্মক প্রতিক্রিয়া আছে। পালমোনারী সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে সব চেক-আপ না হওয়া পর্যন্ত পেশেন্টদের ছাড়া হবে না।

অগত্যাই ওদেরকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হলো। শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অনন্ত। নিভ্রাহীন রাত্রে ভাবনায় ডুবে যায়। জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতার স্মৃতি কেউ ভোলে কেউ ভোলে না। অনন্ত তার ব্যতিক্রম নয়। সে মগ্ন হয় স্মৃতিলিপির পাতায়।

দামোদর অনার্য নদ। গৈরিক জলধারা অপার আনন্দে বয়ে যাচ্ছে কত না তরঙ্গ ভঙ্গে। দক্ষিণ পশ্চিম দিগন্তে পঞ্চকোট পাহাড়ের স্নানীল প্রেক্ষাপট। পরপারে মানভূমের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঝাঁকড়া মাথা তালবীথি, পাতাবরা পলাশ, মহুয়া।

মকর সংক্রান্তির দিন। মাথার উপর দীপ্ত সূর্য। সম্মুখে প্রসারিত ধূ-ধূ বালুকারাশির মধ্যে গৈরিক জল ধারায় ভেসে আসছে ফুল ও গাঁদা ফুলের মালা। সারা পৌষ মাস ধরে টুঙ্গ পরব হয়েছে তারই ভাসানের ফুল।

পৌষ পার্বণের শেষ লগ্ন। ঘাটে ঘাটে মকর স্নানের ভিড়। বালিকা ও কিশোরীদের টুঙ্গ ভাসানের গান, ফেরী ঘাটে নৌকা পারাপার, কূলে কূলে পৌষালী উৎসব, পিকনিকের জমাটি আনন্দ কোলাহল।

তারই মধ্যে পাথর চাতালে বসে ঢেউ গুণছে এক সরল কোমল তরুণ। গৌকে রেশ দিয়েছে। চোখ দুটি আয়ত। ঘন কৃষ্ণ জ্র এবং অতল গভীর চোখের তারায় রোমাঞ্চিক ভাবালুতা। নাকটা খাড়া। দাঁতগুলো অবিগ্নস্ত। মাথার উপর ঝাঁকড়া চুল। ঈষৎ কৌকড়ানো, অযত্নে লালিত। ছোট কপাল। মুখের মধ্যে কি যেন আকর্ষণ আছে।

উজ্জ্বল শ্রামল গায়ের রঙ। দোহারী শরীর। চওড়া পাঞ্জা। লম্বা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। বকের ছাতি ছত্রিশ ইঞ্চি। পরনে হাফপ্যান্ট। ছোট ছোট চেক দেওয়া কেলিকো ছিটের ফুল শার্ট প্যাণ্টের ভিতরে গুঁজে পরেছে সেজগ্ন দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছে ওকে। বসে আছে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। মনটাও সতেজ।

এই জাতকের নাম অনন্ত গোপাল শর্মা। পিতা ৬কৃষ্ণগোপাল শর্মা। সাকিন বনবিষ্ণুপুর। জিলা বর্ধমান।

গরিবের ছেলে। বাবা ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক। মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধাজীর আদর্শ। সংগ্রাম করেছেন অস্বাভাবিক অশুভতার বিরুদ্ধে। উত্তরাধিকার স্বত্রে পেয়েছিলেন সামান্য জমিজমা, পুকুর, ঝাঁপান। তাই দিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালাতেন। তিনি গত হবার পর তাঁর ঝাঁপান ঝাঁপানীদেবী বহুকষ্টে সেই সংসারের হাল ধরে রেখেছেন।

অনন্ত, নীতি, প্রশান্ত ও প্রীতি—চারটি ছেলেমেয়ে। প্রত্যেকেই আপন আপন ক্লাসে ফাস্ট হয়। অনন্ত বি.এস. সি.-তে ডিসটিংশান পেয়েছে। আরো পড়ার ইচ্ছে থাকলেও মাধ্যে কুলোয়নি।

তার পিসেমশাই বালিপাথর কলিয়ারীর মাইনিং সরদার তারই উত্তোগে দামোদর কোল কোম্পানীতে মাইনিং ট্রেনির জন্ম দরখাস্ত করেছিল। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেছে। আজ বেলা তিনটের সময় কোম্পানীর টেকনিক্যাল স্কুলে মৌখিক পরীক্ষা হবে।

সেজন্ম কোনো টেনশান ছিল না। ওসব আধুনিককালের ব্যাপার। ঠিক বেলা দুটোর সময় দামোদর থেকে উঠে ও ডিসেরগড়ের দিকে রওনা হলো। মেন গেট পেরিয়ে অনেকটা মোরাম রাস্তা। তার দু'পাশে সবুজ ঘাসের লন। রাস্তার ধারে কুড়ি ফুট অন্তর গোল করে ছাঁটা ঝাউ গাছের সারি। ডালিয়া, জিনিয়া, মেরী গোল্ড, ক্রিসানথিমাম এবং বিভিন্ন সিজন ফ্লাওয়ারের রঙে ও রূপে ভরপুর হয়ে উঠেছে বাগানটি।

মোজাইক করা গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনন্ত অপেক্ষা করতে লাগল তার জীবন ও জীবিকার কঠোর ভবিষ্যতের মুখে। বেশ একটা উদ্বেগ উত্তেজনার আশা ও নিরাশার দোলা। তারই মধ্যে সত্ত্ব পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দু'একটা হাল্কা কথায় মনের ভার কাটাবার প্রয়াস। কেউ কেউ নার্ভাস। অনন্ত বে-ফিকির।

প্রথমজন বেরিয়ে এল। জন কয়েক ছেকে ধরল ওকে।

—না—না। তেমন কিছু নয়। বলতে বলতে ও কেটে বেরিয়ে গেল।

বারোর পর তেরো। এইবার অনন্তর বুক টিপ্ টিপ্ করছে। কান দুটো গরম। চোখ দুটো ডাগর দেখাচ্ছে। টানা ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখ ভুরু এবং নাক এই তিনটি প্রত্যঙ্গে ওর মনের ভাব ফুটে ওঠে।

পরীক্ষকেরা হয়তো তা লক্ষ্য করেছিলেন। একজন বসতে বললেন। উনি মিঃ কর। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। মিঃ ভার্মা, পারসোন্টাল অফিসার এবং একজন গোরা সাহেব। ডেপুটি চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার। ওঁর কথা বোঝাই দায়। অবশ্য মিঃ কর দেশী ইংরেজিতে বলে দিচ্ছিলেন।

একে তো জন্মগত সাহেব ভীতি তারপর সবই ইংরেজি। একজন গ্রাম্য তরুণের পক্ষে সহজভাবে ইংরেজি ভাষায় উত্তর দেওয়া সোজা নয়। তবে সে বলেছিল।

ওর বায়োডাটার ফরম গোরা সাহেবের কাছে ছিল। নাম, পরিচয় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার পর উনি বললেন—তুমি ম্যাট্রিক ও ইন্টার মিডিয়েটে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। বি.এস. সি.-তেও ডিসটিংশান পেয়েছে। ত্রিলিয়াস্ট এক্যাডেমিক কারিয়ার। তাহলে তুমি আরো পড়লে না কেন ?

অনন্ত উত্তরটা শুরু করলো—আনফরচুনেটলী আই গ্যাম—বলে। তারপর অকালে পিতৃহীন হওয়া ও পরিবারের আর্থিক অনটনের কথা সরলভাবে বিবৃত করল। বলতে বলতে তার মুখে বেদনার ছাপ পড়ল। সাহেবটি সহানুভূতি দেখালেন ও প্রশ্ন করলেন—আমাদের কোম্পানী যদি তোমাকে মাইনিং ট্রেনিং-এর সুযোগ দেয় তবে ফাস্ট ক্লাস পাবে তো ?

অনন্ত আত্মবিশ্বাসের কণ্ঠে বলল—ইয়েস স্যার।

আরেকজন জিজ্ঞাসা করলেন—ক্যান ইউ ওয়ার্ক অ্যাজ ম্যানুয়েল লেবার ?

—ইয়েস স্যার।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ডান হাতের পাঞ্জাটা টেবিলের উপর চিৎ করে ফেলে দিল। শরীরটাতেও ঝাঁকুনি লাগল। সাহেবরা তা লক্ষ্য করলেন।

বললেন—ও কে। তুমি যাও।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

যেতে যেতে দেখল গোরা সাহেবটি ওর নামটাকে লাল কালির দাগে বেঁটন করলেন। তার দিনদশ পর শেরগড় হাসপাতালে মেডিকেল একজামিনেশনের ভাক পড়ল। শক্ত সমর্থ শরীর। ওতে সে ফেল করবে না।

চার

অনন্তর চাকরি হয়ে গেল। দিনে একটাকা স্টাইপেণ্ডে ফাস্ট ইয়ার মাইনিং ট্রেনি। চার বছরের কোর্স। প্রতি বছর ছ'আনা করে স্টাইপেণ্ড বাড়বে। চার বছর পর মারো ছুকা। সেকেও ক্লাস পাশ করতে পারলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ট্রেনি থেকে সাড়ে তিনশো টাকার ছোট সাহেব।

তার সঙ্গে বিবিধ অ্যালাউন্স। বাংলা, চাপরাশী, মেথর।

না পাশ করলেও বানে ভেসে যাবে না। কোম্পানী তাকে মাইনিং কোর্সের যেমন পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে তেমনি চাকরি দেবে। কাজেই সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ। সাধ্য ও সাধনা থাকলেই হলো।

সেই স্বপ্ন বৃকে নিয়ে স্ট্রামল ছায়াঘেরা প্রশান্ত পল্লী জীবন ছেড়ে কয়লা কুঠির কালো যবনিকার দিকে পা বাড়াল অনন্ত। এমন কত মানুষের বহুত শ্রোত কয়লা কুঠিতে আছড়ে পড়ছে ১৭৭৪ সাল থেকে। ইউরোপ থেকে শুরু করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জনমানুষ, কুলি কাবারী, সাহেব-গুবো অবলীলায় ছুটে এসেছে বাংলা বিহারের রাঢ় ভূমিতে ধরিত্রীর শিলাস্তর বিদীর্ণ করে আধুনিক সভ্যতার জীবনী শক্তি কয়লা আহরণ করতে ?

কত মানুষ কত ভাবেই না এসেছে। শিকড় গেড়েছে। ডালপালা বিস্তার করেছে। কেউ খিতু হয়েছে, কেউ হয়নি। কত আত্মদের জীবন যজ্ঞা। জীবন

ওজ্জীবিকার তাগিদে কত সংগ্রাম। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় কেউ হারিয়েছে রূপ, কেউ রূপো। কেউ কেউ হুঁহাত ভরে লুটে নিয়েছে রূপ, রূপো, হাসিনা দৌলৎ। সে এক রব। মধুচক্রকে বেটন করে মৌমাছির মতো।

সেটা কেক্সারি মাস। রোদটা চিন্ চিন্ করে গায়ে লাগছে। হান্সনিয়া মোড়ে অনন্ত বাস থেকে নামল শতরঞ্চি বাঁধা ছোট্ট বেড়ি ও গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্ট্রকেশ হাতে।

কপালে ঘাম। হুঁএক গোছা চুল পড়ছে চোখে। হাত দিয়ে তা সরিয়ে এদিক সেদিক তাকাল। পান গুমটিতে খবর নিল দামুলিয়া কলিয়ারীর অফিস কোন দিকে তা জানবার জন্ত।

অচেনা অজানা জায়গা। পিচ রোডটা নিয়ামতপুর থেকে চলে গেছে শের-গড়ের দিকে। ঐ পথে বাস চলে। একটা রেল পথ পিচ রাস্তাটা আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে কলিয়ারীর দিকে গেছে। ওটাই দামুলিয়া কলিয়ারীর সাইডিং লাইন। কয়লা বোঝাই মালগাড়ি চলাচল করে।

একটি মোরাম বিছানো পথ সেখান থেকে বেরিয়ে পুবে বাঁক নিয়ে কিছু দূর যাওয়ার পর হুঁভাগে ভাগ হয়েছে। যেটি ডাইনে বাঁক নিয়ে দক্ষিণে গেছে সেটিই দামুলিয়া কলিয়ারীর পথ।

অনন্ত হেঁটে যাচ্ছে। ডান হাতে ঝোলানো স্ট্রকেশ। বাঁ কাঁধে বেড়ি। একে একে পার হয়ে যাচ্ছে এজেন্ট সাহেবের বিরাট বাংলো, বাবু কোয়ার্টারের সারি। একটি ফুটবল মাঠ তারপর ফাঁকা। উঁচু কম্পাউণ্ড ঘেরা গোরখপুরী শ্রমিকদের ক্যাম্প, দোতলা হাসপাতাল কাম পিটহেড পথ, ছোট ছোট বাংলোর সারি, বাঁ দিকে ক্রেক বিল্ডিং, অগ্রদূত মেস, বাবু কোয়ার্টারের সারি, পাশে বাংলো।

কলিয়ারী অফিসের সামনে অনেকখানি খোলা জায়গা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখের তারা ঘুরোলেই চারটি চালক, হেডগীয়ার, ইঞ্জিন, চিমনি সব দেখা যায়।

বেশ বড়সড় অফিস। অনেক লোকজন। জানালায় জানালায় কয়লা কুলিরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেতন দেওয়া হচ্ছে।

একজন থাকি শার্ট প্যান্ট পরা লোককে জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার সাহেবের অফিস কোনটা ?

লোকটা গুকে সবচেয়ে শেষের ঘরটা দেখিয়ে দিল। অনন্ত ওর বেড়ি স্ট্রকেশটা বারান্দায় নামিয়ে রেখে সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াল। দারোয়ান গুকে আমল দিল না। অনন্ত দাঁড়িয়েই রইল। এতলোক ঐ অফিসে ঢুকছে বেরুচ্ছে কাউকেই সে আটকাচ্ছে না অথচ গুকেই আটকে দিল। আচ্ছা তো ?

একজন লম্বা চওড়া দারুণ শার্ট অফিসার অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে হাকপ্যাট, থাকি হাফ শার্ট। পায়ে খাদেশ জুতো। স্বকবকে পরিষ্কার

গায়ের রঙ। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো। ছোট ছোট চুল। পায়ের গোছে কালো কালো লোম গোল গোল পাক খেয়ে আছে।

অনন্ত ওকেই সেলাম দিয়ে জানালো—গুড মর্নিং স্মার।

—গুড মর্নিং। তুমি কে?

—মাইনিং ট্রেনি স্মার। নূতন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছি। তাই জয়েন করতে এসেছি। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

উনি মিঃ চৌধুরী। দামুলিয়ার ডেপুটি ম্যানেজার ফার্ট ক্লাস পাশ করেছেন বছর দুই আগে। ম্যানেজারের পরেই ওঁর স্থান। তিনিই দয়াপরবশ হয়ে ম্যানেজারের কাছে পৌঁছে দিলেন।

অনন্ত ওঁকে নমস্কার করল। উনি পেনসিলটা নাড়লেন।

গুধু নামটা ও কতদূর লেখাপড়া করেছে এইটুকু জিজ্ঞাসা করেই বললেন, ডি. সি. সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে চাকরি করতে হলে যে ছুটি মহাজন ব্যক্তির অঙ্ককম্পা অবশ্য প্রার্থনীয় তাঁদের একজন ডি. সি. সাহেব। অর্থাৎ দেবব্রত চক্রবর্তী। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার।

দ্বিতীয় জন হলেন ডি. ডি. সাহেব। পুরো নাম ধর্মদাস তালুকদার। ট্রেনিরা ঠাট্টা করে বলে ডি. ডি. টি। মাইনিং সরদারী সার্টিফিকেট সম্বল করে ব্রিটিশ কোম্পানির ছোট সাহেব। আঙুল ফুলে কনাগাছ আর কাকে বলে? একটি রাঁচের দৌলতে তার এত রমরমা।

প্রথম জনের অঙ্কজায় অনন্ত অগ্রদূত মেসে একটি সিট পেল অফিসের কেরানি অনিলবাবুর রুমে। ঘণ্টাখানেক পর আরো একজন এসে পড়ল। তার নাম কমলেন্দু বিশ্বাস। একটু মোটাসোটা স্বথী চেহারা। বাঁকুড়া ক্রিস্টিয়ান কলেজ থেকে ফার্ট ডিভিশনে আই. এস. সি. পাশ করেছে।

অনন্ত ডানপিটে। কমলেন্দু শান্ত সুবোধ। অনন্ত গরিবের ছেলে। কমলেন্দু-বড়লোকের ছেলে। কিন্তু মাত্র এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে দুজনের ভাব ভালবাসা জমে উঠেছে।

অনন্তের বিছানা ছিল মায়ের হাতে তৈরি একটি নকশি কাঁথা, একটি স্বজনী, সতরঞ্জি, চাদর, বালিশ। অমলেন্দুর ছিল তোষক, কয়ল, চাদর, বালিশ। অনিলবাবু বারোটার সময় মেসে এলেন। বড়ই অগ্রসর। একে কালো তাই ধমধমে। বললেন—দুটো বিছানা করলে আমাদের খাটটা কি মাথায় রাখব? এইটুকু তো ঘর। আপনারা একটা বিছানা করুন।

অগত্যাই। ওরা নতুন এসেছে। হাল হকিকত কি জানে?

দুটি বিছানা তুলে সবগুলি পর পর সাজিয়ে একটি বিছানা করল। পাশাপাশি দুটি বালিশ রেখে অনন্ত বলল—বাঃ! খালা-কুলশখ্যা হে!

কমলেন্দু বলল—ঈশ্বর করেন যেন এই বিছানার উপর আপনার ফুলশয্যা হয় ।

—ওঃ হো ! একটা বড় আ্যবসার্ড ড্রিম ।

অনিলবাবুর খাটটির মাথা শিতানে দেওয়ালে টাঙানো পুরানো ক্যালেন্ডারে গান্ধীজীর ছবি । নিচে লেখা—আমার জীবনই আমার বাণী ।

সেই মূল্যবান বাণী-মূর্তির পদতলে সটান লম্বমান অনিলবাবুর কালো ভুঁড়ির দিকে চোখ ঠেঁরে অনন্ত বলল—আহা কি পবিত্র !

অনিলবাবু ওর দিকে কট কট করে তাকিয়ে বললেন—বেশি ইয়াকি মারবেন না ।

মেসের বারান্দায় তখন জোর গুলজার । ট্রেনিরা এসে গেছে । প্রায় দশ বারোজন । তারা হল্লা জুড়ে দিয়েছে ।

‘টি’ শেপের বারান্দার সামনে ব্যাডমিন্টন কোর্ট । দুটি খুঁটি পুঁতে হাই পাওয়ার বাস লাগানোর সরঞ্জাম । নেটটা টাঙানোই আছে । সেখানে মোড়ার উপর বসে কেউ তেল মাখছে, কেউ খালি গায়ে কমরং করছে । সেইসঙ্গে চলছে গুলতানি । হাজারো কিসিমের কিসম্ভা কহানী । জিতে জড়তা নেই । অবলীলায় বলে যাচ্ছে আদিরসে চোবানো সংলাপ ।

একটি বাথরুম । দু-তিনজন এক একবারে ঢুকে পড়ছে । দরজাও খোলা । অথচ নগ্নস্নান । কেউ বা স্নান করে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে অনায়াসে বারান্দা দিয়ে পার হচ্ছে নগ্ন অবস্থাতেই ।

অলিখিত নিয়মে স্নানের সময়ে নারীদের প্রবেশ নিষেধ । যদি কেউ এসে পড়ে তবে সেই লজ্জায় পড়বে । ওদের কোনো বিকার নেই । সব সিদ্ধপুরুষ । কমলেন্দু ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল । অনন্ত অতটা নয় । বরং ভালোই লাগছিল । বেশ তো আদি জননীর কোলে আদিম সন্তান ।

বাঃ দৃশ্যটি উপভোগ্য !

একটি নগ্ন যুবক অনন্তর গাল টিপে বলল—এই থোকা । তোর নাম কি ?

—অনন্ত শর্মা ।

আরেকজন কমলেন্দুর গালে চুমু খেয়ে বলল—এ শালা রসের বিনোদিনী !

ওর মুখটা লাল হয়ে গেল রাগে ও লজ্জায় ।

ওদেরকে নিয়ে হাসি-মসকরা চলতেই লাগল । নানা অশ্লীল ভঙ্গীতে তাতিয়ে তুলল । কেউ কেউ দু-এক খান্নড় মারও বসাল ।

অনন্ত বলল—আপনারা আমাদের সিনিয়র । তাই দাদা । না হলে গায়ের জোর কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম । থোকা খুকু কিছু নয় দেখতে পাবেন খেলার মাঠে । আসবেন আমার সঙ্গে মৌকাবিলা করতে ।

—সাবাশ ! একটি ছোকরা হাততালি দিল । ওর নাম সুবীর সেন । কলকাতার ছেলে । আজই এসেছে এবং ওদের পাল্লায় পড়েছে । ওর দিকে

হাত বাড়িয়ে হাওশোক করল। একজন লম্বা ছিপছিপে কালো রঙের ছোকরা হাত বাড়িয়ে বলল—আমি স্টিফেন হেমব্রাম। ফোর্থ ইয়ার মেকানিক্যাল ট্রেনি। ফুটবল টিমের ক্যাপটেন। সুবীর ও অনন্ত দুজনই ওকে বাউ করে বলল—আশা করি খেলতে পাবো।

সেদিন সন্ধ্যায় ওদের পরিচয় হল স্মৃতিত চ্যাটার্জীর সঙ্গে। ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ করে চাকরি করছেন। মেসের সবারই লোক্যাল গার্ডেন।

তিনি স্নেহে ওর পিঠ চাপড়ে বললেন—সুড়ে যা অনন্ত। তোর মধ্যে স্পিরিট আছে।

—দাদা ওরা আমাদেরকে ভীষণ অপমান করেছে।

—কিছু মনে করিসনে। দিন কয়েক পর গলায় গলায় বন্ধুত্ব হবে। তখন আবার একজন আরেকজনকে ছেড়ে থাকতে পারবিনে।

পাঁচ

অগ্রদূত মেসের একটা পুরানো ঐতিহ্য আছে। এখান থেকে প্রতি বছর একটি দুটি ট্রেনি সেকেণ্ড ক্লাস পাশ করে ছোট সাহেব হয়। পাশ-করা ছাত্রদের উদাহরণ সামনে রেখে পড়াশোনা করে। তাদের নোট, খাতা, ড্রয়িং, স্কেচ, বইপত্র পায়। কারভিক থেকে প্রকাশিত ইউনিভার্সাল মাইনিং স্কুল বইটার তখনকার বাজারে একশো নব্বই টাকা দাম। দৈনিক এক টাকা হাজরি পাওয়া ছাত্রদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। যাদের বাড়ির অবস্থা ভালো তারা পারে। তাছাড়াও ডাঃ পেনম্যান, ডাঃ হুইটেকার, মিঃ ক্লার্ক, মিঃ ফ্যানেটকার প্রমুখের বই কিনতে হয়। সায়েন্স অ্যাণ্ড আর্টস অফ মাইনিং নামে পাক্ষিক পত্রিকা বের হতো সেটা তো নিতেই হয়। আমাদের দেশের ভূতত্ত্ব বিলেতের সঙ্গে মেলে না। আইন-কানুন বিলেতের ধাঁচে তৈরি হলেও বিলেতের মতো নয়। কাজেই সংগ্রহ একটা মন্ত ব্যাপার।

অগ্রদূত মেসের ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতার বাতাবরণ সেদিক দিয়ে খুবই অল্পকূল ছিল। পরের পর ছাত্ররা মাল মশলা পেয়ে যেত।

আর তাদের কেন্দ্র চরিত্র ছিলেন স্মৃতিত চ্যাটার্জী। ছাত্রদেরকে ভাইয়ের মতো ভালো বাসতেন। ট্রেনিং পিরিয়ডের চার বছর পার হয়ে গেছে। সেকেণ্ড ক্লাস পরীক্ষায় বার দুই ফেল করেছেন। বর্তমানে ভেটিগেশন অফিসারের কাজ করেন। অর্থাৎ খাদে বায়ু চলাচলের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। তখন এই পোস্টের জগ্ন ম্যানেজারী পাশ করতে হতো না।

একবারে উত্তরের ঘরটি এক নম্বর। মহীতোষ সেন ও শিবেন ভট্টাচার্য। দুজনই কোর্থ ইয়ার ট্রেনি। এবছর সেকেণ্ড ক্লাস দেবে।

দু'নম্বরে নবেন্দু ঘোষ, সাধন পাল—থার্ড ইয়ার ট্রেনি। তিন নম্বরে স্বত্রত রুদ্র, অপূর্ব সেনগুপ্ত। চার নম্বরে মহেন্দ্র সিং, স্বরেশ প্রসাদ বা। পাঁচ নম্বরে অসীম ব্যানার্জী সেকেণ্ড ইয়ার ছাত্র। কলিয়ারীর বড়বাবু রামহরির জামাই, শস্তুর ঘরে থাকে না। ওর বউ কাশীমাতা বালিকা বিছালয়ে ক্লাস টেনে পড়ে। দুজনে লুকিয়ে চুরিয়ে প্রেম করে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মারফৎ চিঠির আদান প্রদান হয়। দুজনেই দুজনের ফটো বৃকের ভিতর লুকিয়ে রাখে।

ওর ক্রমমেট স্টিফেন হেমব্রাম। শেরগড় হাসপাতালে মিস টেরেজা ঘুঘু নামে একটা গ্ল্যাক মডেলের নার্স আছে। ওরা দুজনেই আদিবাসী খ্রীস্টান। পরস্পরের সম্পর্ক আছে এবং চুটিয়ে প্রেম করছে।

সেজগ্ন অগ্রদূত মেসের এই ঘরটিকে বলে প্রেম নিবাস। পাঁচ নম্বর তো। তাই অস্থির পঞ্চমের তাড়নায় সর্বদাই অশান্ত। কোনো ছুটির দিনে যদি ঘুঘু বেড়াতে আসে তবে অসীম ঘর ছেড়ে দেয়। হেমব্রাম বন্ধুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলে তোর বাসন্তী কেন আসে না রে? ওকে নিয়ে আয়। বিয়ে করা বউ। অত কিসের লজ্জা ভয়?

অসীম মনে জোর পায়। কিন্তু ওর শস্তুর শান্তুড়ী দুটোই টে'টিয়া। কিছুতেই কাছে ষেঁষতে দেয় না।

ছ' নম্বরে স্থমিত চ্যাটার্জী ও সুনীল নন্দী। দুই মেকর দুই বাসিন্দা। স্থমিতবাবুর জীবনেও একটি প্রেম ফুটি ফুটি করছে। সে বিলবাবু মজুমদারের মেয়ে স্বপ্নার অনারারী টিচার। ও এবছর স্কুল ফাইনাল দেবে। বেশ চালাক চতুর মেয়ে। নাচে প্রাইজ পেয়েছে।

সাত নম্বরে অনিলবাবু, অনন্ত, কমলেন্দু।

আট নম্বরে গুণময় বারুদ কুলি, ওর দাদা হরিহর এবং সুবীর।

নয় নম্বরে দীপক দাস, সত্যেন মোহান্ত। দশ নম্বরে ফটিক দা। ক্যান্টিনের ম্যানেজার। ছাত্রদের বড় ভালবাসার দাদা। বিয়ে হয়েছে, ছেলেমেয়ে আছে। ছা-পোষা ধরনের মাগুঘ। জগহরলাল নেহরুকে দু'বার সামনা সামনি দেখেছে। দারুণ ভক্তি করে ওঁকে। ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া বইটি ওর বাকসোতে আছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কথা বলার সময় তার থেকে রেফারেন্স তুলে দেয়।

এই মেসের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তার বারামাশা, আনন্দ উৎসব উদ্বেগ উত্তেজনা এবং স্থখ দুঃখের সঙ্গে যে একবার ভিজে গেছে সে আর মায়া কাটাতে পারে না। এমন কয়েকজন ছোট সাহেব আছে যারা পাশ করে অন্তর বদলি হওয়ার পরও ছুটির দিনে আড্ডা মারতে আসে। যতদিন না বিয়ে থা হয় ততদিন এ রোগ যাবে না। কারো বা সেই প্রেমটিও এখানে কোনো কোয়ার্টারে প্রতীক্ষায় আছে।

আলাপ পরিচয়ের প্রাথমিক—অধ্যায়টা পার হয়ে অনন্ত নিজেকে খাপ খাইয়ে

নিয়েছে। সকলের সঙ্গে হেসে খেলে বেশ আছে। মেসের ব্যবস্থাটিও ভালো। মাসের শুরুতে স্টাইপেণ্ড পেয়েই কুড়ি টাকা জমা দিতে হয়। তাতে দুপুরে ও রাত্রে ভাত, একটা তরকারি, ডাল, ভাজা এবং আমিষ। মাছ, মাংস অথবা ডিম। সকালে জলখাবার দুটো পরোটা, আলু ভাজা এবং ঝোলা গুড়।

ঠাকুর, চাকর ও ঝি। মেস মেস্বারদের মধ্যে মাসে একজন করে মানেজার হতো। সে-ই সারা মাসের হিসেব নিকেশ রাখত ও মাস ফুরোলেই মিল চার্জ হিসেব করে যা দেনা পাওনা তার তালিকা টাঙিয়ে দিত। কারো অতিথি এলে তাও খাওয়ার চার্জ ঐ দরে। মাসের শেষে একদিন ফির্ট। লুচি, মাংস ও পায়স।

স্নানের সময়ে নগ্ন বিভঙ্গ এবং খাবার সময় অশ্রাস্ত কোলাহল। দিনে বেলা একটা থেকে দুটো, রাত্রে নটা থেকে দশটা। যারা ডিউটি থাকার জন্তু সময়ে হাজির হতে পারত না, ঠাকুরমশাই তাদের রুমে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতেন।

গজল্লাটা বড়ই মূখরোচক। হরেক কিসিমের আলোচনা। নারীর যৌবন, মিথুনের পূলক, প্যার কি নগমা, ফুটবল, ক্রিকেট, রাজনীতি, সমাজনীতি, অঙ্ক, ইংরেজি, লেজিসলেচর, মাইনিং টেকনোলজি এবং মজতুরি মাইফেল। মেসের দেওয়াল পত্রিকা।

নানারকমের চুটকি, ভাস্ক্র, আলোচনা, চিঠি, বক্তৃতা, ব্যঙ্গচিত্র, ইত্যাদি মোটা মোটা অক্ষরে হাতে লেখা। ছদ্মনামী লেখক গোষ্ঠী, পানস্বপারী, পানমোরি, চুন জর্দা, মজতুর, কাকভূষণী ইত্যাদি। এরা নিশ্চয়ই এই মেসেরই। কিন্তু কার কি নাম এটা জানবে কী করে? সিনিয়ারদিকে জিজ্ঞাসা করলে মিটি মিটি হাসে। কেউ বলে—দেখো না-তুমিও যদি কবি হতে পারো।

অনন্তর প্রথম প্রবেশটা আর পাঁচজন ট্রেনির মতো হয়নি। আগে যারা এসেছে তারা সবাই অল্প বিস্তর র্যাগিংয়ের শিকার হয়েছে। কিন্তু অনন্ত বিয়ের রাতে বিড়াল মেরে হিরো হয়ে গেছে।

ঐ যে মোকাবিলা করবেন খেলার মাঠে—ঐ কথাতে স্টিফেন যেচে আলাপ করেছে। সুবীর ও কমলেন্দু ওর পরম বন্ধু হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় স্মৃতিতবাবু ওকে তারিফ করলেন।

দিনকয়েকের মধ্যে ঘটল আরেকটি ঘটনা। নবেন্দু ঘোষের জামাইবাবুর নাম জটিল পাত্র। তিনি হাফ সাহেবের পোস্ট নিয়ে এসেছেন এবং যতদিন না ওর কোয়ার্টার রেডি হচ্ছে ততদিন মেসেই থাকবেন। মুখে বড় বড় বুলি ঝাড়েন। ধোপ দুরন্ত ধুতি পাঞ্জাবী পরে খেতে বসেন জামাইবাবুর মতোই।

খাবার সময় তো হাজার আলোচনা হয়। সেদিন ফুটবল খেলোয়াড়দের আলোচনা হচ্ছিল এবং অর্বাচীন অনন্ত প্রস্ন করে বসল—রাম বাহাদুর কি জাত?

কিন্তু তার পরেই মনে মনে জিত কাটল। এ যে বড় বেফাঁস কথা হয়ে

গেছে। এবং জটিলবাবুও তা লুফে নিয়ে উত্তর দিলেন—বালখিল্য প্রস্ন। তোমার জানা উচিত সব বাহাদুর নেপালী।

অনন্ত বাক্যে তুথোড়। হেরে যেতে যেতে ও জবাব দিল—তবে কি রায় বাহাদুরও নেপালী ?

—হিয়ার। হিয়ার।

সবাই হো—হো—করে হেসে উঠলো।

এটা তো দুপুরের ব্যাপার। সন্ধ্যায় আরেকটা ঘটনা ঘটল। পংক্তিভোজনে সামিল হয়ে খেতে বসেছে সবাই। এলুমিনিয়ামের বাটিতে হুন্ খাকতো। এটা কমন ইউটেনসিল। ঠা হাতে করে এ ওর দিকে ঠেলে দিত। সাধন বসেছিল চার পাঁচজনের পরে। ওর ডালের বাটিটা খালা বাটির মারি থেকে একটু উপর দিকে ছিল। এ ওর দিকে হুনের বাটি দেওয়াটা রেওয়াজ ছিল।

অনন্ত ক্যারাম বোর্ডের ঘুঁটির মতো হুনের বাটিটা ঠেলে দিল। ঠকাস করে ধাক্কা মারল সামনের ডালের বাটিকে। ডাল ছিটকে পড়ল জটিলবাবুর ধুতি পাঞ্জাবীতে। কিছুতকিমাকার অবস্থা। অনন্ত ভীষণ অপ্রস্তুত।

—আহারে চু-চু-চু।

এটা দুঃখের হাসি এবং কোঁতুকের ব্যাপার। হাসিতে ফেটে পড়বার জন্ম সবারই পেট কুল কুল করছে। হাসাও যায় না। সে এক বিষম ঠ্যালা!

পরদিন সকালে মেসের দেওয়াল পত্রিকায় কার্টুন চিত্র। রায় বাহাদুরের মতো ডেস মেক আপ করা একটি বৃদ্ধ ফুটবলে শট মারছেন আর তার মাথায় ডালের বাটি উপুড় হয়ে পড়ছে। রঙচঙে ছবি। নীচে ক্যাপসন রায় বাহাদুর ডাল খায়। ফুটবল খেলে।

অনন্ত এই দেওয়াল পত্রিকাটির প্রতি ভীষণ আকর্ষণ বোধ করত। প্রায় তিন ফুট লম্বা দু'ফুট চওড়া কাঠের বোর্ড দেওয়ালে ঝুলত। লেখাগুলি গোল পিন দিয়ে শাঁটা হতো। আবার নতুন লেখা আসত পুরানো লেখা চাপা পড়ত। ভালো লেখা এবং ছবি বেশ কিছুদিন ধরে থাকত। একদিন সে একটা কবিতা লিখে টাঙিয়ে দিল। কবির নাম—কয়লা কুলি।

কবিতার নাম—‘মালকাটা’

চৈ চম্পা হাজারিবাগের জঙ্গল ফুঁড়ে

সিধু কাছ চাঁদ ভৈরবের কপাল ভেঙে

আদিবাসী মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে

কে তুমি বেরিয়ে এলে মালকাটা ?

গাঁইতি হাতে ঘাম চিক্ চিক্ আত্ম গায়ে

নিকষ কালো পাললিক শিলাস্তরের আ-চোট ভূমিতে

চোট বসাবার আগে তোমার কি মনে পড়ে না

আদিবাসী মায়ের কালো মুখটার কথা ?
 মনে পড়ে না—
 গোরা সাহেবেরা একদিন তোমার মায়ের
 আ-চোট ভুমিতে
 চোট বসিয়েছিল—১৮৫৫ সালে ।
 সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ।
 তখনো তুমি যুবক ছিলে এখনো যুবক
 দাঁড়িয়ে আছো স্থিরচিত্তের মতো
 শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে
 কালো কয়লার প্রেক্ষাপটে ।

ছয়

সেই একটা যুগ । নারীদেহ ভোগ্য পণ্য । তামাম কোলফিল্ডে অমন কত
 শোভারাগী বিউটি কুইন হয়েছিল । নারীত্ব, সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে সাদা কুকুরের
 রঙিন মাইফেল জমিয়ে তুলত । তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা ছিল না । প্রতিবাদ
 করার সাহস ছিল না ।

তাই বিউটিরও ভিতরে প্রেম ছিল না । তার শরীরটারই যখন দাম তখন
 সেটাকেই সে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত । নানা প্রসাধনে স্নগন্ধী ও সূচিক্রম করে
 তুলত । কখনো নিরাভরণা হয়ে দাঁড়াতে ড্রেসিং টেবিলের সামনে হাই পাওয়ার
 বাষের আলোতে ।

ডি. ডি. সাহেব তাকিয়ে দেখতেন । এই শরীর । পুঞ্জীভূত যৌবন এবং তার
 জালা । নিজেও জ্বলেছে অন্তকেও জ্বালাচ্ছে । এমন অর্পূর্ব সৌন্দর্য প্রাণহীন ।
 প্রাণের জন্মও দিতে পারে না । বিউটি নামের একটা মেয়ের বিউটিই আছে ।
 মন নেই । সে শিল্পীর গড়া প্রতিমা ।

খুলে দেয় হুইকীর বোতল । দুজনেই পান করে । দুজনেই মাতাল হয় ।
 ডি. ডি. সাহেব চান একটু প্রেম, ভালবাসা, -উষ্ণতা ।

একদিন তিনি ফেটে পড়লেন—তুমি জানো না বিউটি তোমাকে আমি কত
 ভালবাসি । কিন্তু তোমার মন নেই । তুমি একটা শিল্পীর গড়া প্রতিমা ।

—তাই বুঝি ?

সুন্দর ভঙ্গীতে জানালো ও । বলল—ভালবাসা তো একতরফা হয় না । তুমি
 যদি ভালবাসো তাহলে আমিও বাসি ।

—এই কি তার নমুনা ?

মাসের তলানি পর্ষস্ত শেষ করে আবার ঢালতে ঢালতে বলল—কেমন নমুনা

চাও ? যখন খুশী যেমন খুশী তুমি আমাকে এনজয় করছো। আমি কখনো প্রতিবাদ করেছি ?

—কেন করোনি ? তাহলে তো বৃকাতাম তোমার মন আছে। রাগ অহুরাগ আছে।

—কেন ডি. ডি. ওসব তিক্ত প্রসঙ্গ টেনে আনছো ? আজ যদি তোমার সি. এম. ই. ফোন করে বলেন ভূত বাংলোর পার্টিতে বিউটিকে পাঠিয়ে দেবেন। তখন আমি কাকে রাগ দেখাবো ? পিছনে ফ্যাপা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে ভালবাসার কথা বোল না।

ডি. ডি.-র মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বারমান সাহেব বিউটিকে হস্তান্তর করে দিয়েছিলেন বলেই যে তার কোবালা সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল তা নয়। গুদামজাত দ্রব্যের যেমন তালিকা থাকে বড় বড় রসিকদের কাছেও তেমনি বিউটীদের তালিকা থাকে। প্রয়োজন হলেই তাঁরা রিকুইজিশন করেন গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে। অথবা টেলিফোনে।

উনি একটা সিগারেট ধরিয়ে গুয়ে পড়লেন। একটু পর বিউটিও তার পাশে গুলো। দুজনের চোখেই ঘুম নেই।

রাত বয়ে গেল কালের নিয়মে। ভোরের হিমেল বাতাসে অজস্র শিশির বিন্দু টুপ-টাপ খসে পড়ল গাছের পাতায়, ঘাসের উগায়। সকালের সোনারোদে ঝিলঝিল করে উঠল শিশির ধোওয়া প্রকৃতি।

জেগে উঠল শিল্পনম্বরী, কুলিধাণ্ডা, বাবু কোয়ার্টার। কে কত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে রাত কাবার করে দিল তার হিসেব কে রাখে ?

অনিবার্থ নিয়মে বয়লার হাউসে গন-গনে আঙনের তাপে জল বাষ্পীভূত হলো। চিমনি দিয়ে ধোয়া উঠল। হস হস শব্দে ইঞ্জিন চালু হলো। বন্ বন্ করে হেড গীয়ারে পুলি চাকা ঘুরল। সারা কলিয়ারী ভরে গেল যান্ত্রিক শব্দে।

ডি. ডি. সাহেব দাঁড়ালেন পিট টপে পরনে থাকি হাফপ্যান্ট, হাফশার্ট, মাথায় হেলমেট, পায়ে বুট জুতো, হাঁটু পর্যন্ত থাকি মোজার ভিতর গৌজা একটি পেনসিল। না পাশ দেশী সাহেব। আদি এবং অকৃত্রিম মাইনিংম্যান। স্থিরচিত্তের মতো দাঁড়িয়ে আছেন ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। বশব্দ ভূত্য। স্বদক্ষ অফিসার। পরম বিশ্বাসী দাস।

শিল্প সভ্যতার পটভূমিতে একান্ত প্রয়োজনীয় চরিত্র।

ফুটবল মরশুমে অগ্রদূত মেস জম-জমাট। প্রায়ই ওদের ফুটবল টিম হিপ হিপ ছররে করতে করতে মেসে আসে। গুলজার ধরিয়ে দেয়। তাদের মুখে বিজয়ীর হাসি। স্টিফেন হেমব্রাম কাপ্টেন। এ বছরের নয়। আমদানি সুবীর বোস, অনন্ত শর্মা। দুজনেই দুর্ধর্ষ প্লেয়ার। ইন্টার কোম্পানী টুর্নামেন্টে একটার পর একটা খেলা যে জিতে যাচ্ছে তা এই দুটি খেলোয়াড়ের জন্ত।

কিন্তু সেমি ফাইন্সালে শিমুলিয়ার সঙ্গে খেলায় অনন্ত হাঁটুতে চোট খেয়ে গেল। খেলায় জিতল। আর তার ওপর পড়ে গেল সবারই চোখ। ওর চিকিৎসার জ্ঞান ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ডাক্তারবাবু বললেন সাতদিন রেস্ট। কলিয়ারীতে ছুটি করিয়ে দিলেন। ফুটবলে পা দেওয়া বারণ। ফাইন্সাল খেলার দিন যেন হান্ডেড পারসেন্ট ফিটনেস নিয়ে মাঠে নামতে পারে। কত লোকের কত উপদেশ। এমন কি ডি. সি. সাহেবও ওর খবর নিতে মেসে আসেন।

অনন্তর এতটা পছন্দ নয়। চোট এমন কিছু নয়। ফুটবল খেলোয়াড়দের হামেশাই এমন চোট লাগে। তাতে কি আছে ?

অথও অবসর। কোনো কাজ নেই। কোনো কাজে মনও নেই। বর্ষার আকাশে মেঘ ডব্বুর বাজছে। দামোদরে দু'বেলা বান উত্থাল-পাখাল করছে। কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে অনন্ত বেরিয়ে পড়ল দামোদরের দিকে। হলেজ ঘর, বয়লার হাউস, স্রাও লাইন পার হয়ে উঁচু পাড়ের ওপর খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। একদিকে ধানক্ষেত। অন্যদিকে দামোদরের হরস্ত জলধারা। জল-তরঙ্গের অদ্ভুত শব্দ। মেঘলা আকাশে সূর্যের ফিনকি দিয়ে পড়া লাল রশ্মি। পরপারে শ্রামল বনভূমি। তটভূমির ওপর ঘনসবুজ ঘাস। ঠাই ঠাই দু'একটি পলাশ ও শিমুল গাছ।

হঠাৎ ওর চোখ আটকে গেল এক আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যে।

একটি গাই আপন মনে ঘাসে মুখ ডুবিয়ে চরছে। ঈষৎ শ্রামল গায়ের রঙ। মশ্ণ গা চিক্ চিক্ করছে। কপালে সাদা চাঁদ। আর তার কাছেই একটি বালিকা বধু বাছুরটির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। কখনো বা তাকাচ্ছে পঞ্চকোট পাহাড়ের দিকে।

পরনে হলুদ রঙের শাড়ি। চুলগুলো পিছনে সাপটে বাঁধা। সিঁথিতে লম্বা করে সিঁদুর। কপালে টিপ। দু'হাতে কাঁচের চুড়ি। পায়ে মল।

অনন্তর মনে হল এই কি কৃষ্ণকলি ?

কিন্তু না। এ কৃষ্ণকলি নয়! চাঁপার কলি! কি সুন্দর গায়ের রঙ! লাবণ্যে উদ্ভাসিত কচি মুখ। চোখ দুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কোন শিল্পী তৈরি করেছে এমন সৌন্দর্যময়ী বালিকা? না, ঠিক বালিকা নয়। কৈশোরের কলি ফুটেছে শরীরে।

দৃশ্যটির রূপে, লাবণ্যে, ঐশ্বর্ষে অনন্ত এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি তখন বাছুরটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছে গ্রীবা ভঙ্গী করে। ওর একটা হাত কোমরে। দু'চোখে অপার বিস্ময়। অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি খুকি ?

—গৈরী!

—হ্যা! গৈরীই বটে! তা তোমার মহাদেবটি কোথায়?

—কি করে জানবো?

—সেকি? তোমার তো বিয়ে হয়েছে।

—হ্যা। কিন্তু আমার কি অত মনে আছে? কখন সেই চার পাঁচ বছর বয়সের কথা। মুল্লী—আয়!

ছুটেতে ছুটেতে গাইটার কাছে চলে গেল। ওর পায়ের মল বাজলো ঝুম ঝুম করে। গাইটা মাথা তুলল। ওর গলায় ঘণ্টা বাজল ঠুন ঠুন শব্দে! বাছুরটাও কাছে এল। ওদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবার।

অনন্ত দৃষ্টি ফেরাতে পারছিল না। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছিল। একটা মেয়েকে এমন করে দেখলে সে কি মনে করবে? অথচ উদার প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে কি অপূর্ব এই দৃশ্য ও শব্দ।

হঠাৎ মেয়েটি বলে উঠল—আপনি তো অনন্তা দা। আমি আপনাকে চিনি।

অবাক হয়ে গেল ও। বলল—আমাকে চেনো?

—হ্যা!

—কি করে চিনলে?

—আপনার মেসের দুয়ার দিয়ে রোজ স্কুল যাই যে। আমরা সবাই চিনি আপনাকে। আপনি কবিতা লেখেন—ফুটবল খেলেন।

অনন্ত হাসল। বলল—বাঃ, তুমি তো অনেক খবর রাখো অথচ আমি তোমাকে চিনতাম না।

—কি করে চিনবেন? কুড়ি বাইশটি মেয়ের মধ্যে আলাদা করে কাউকে চেনা যায়?

—এবার চিনতে পারবো—কোন ক্লাসে পড়?

—ক্লাস সিন্ধ। যাই?

গাইবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল মল ঝুম ঝুম করে।

কাদের মেয়ে কার বউ কিছুই তো জানা হলো না। অথচ ভাল লাগে ঐশ্বর্যময় প্রকৃতির বৃকে সৌন্দর্যের এই মূর্তিটিকে।

অপার মুগ্ধতা নিয়ে ফিরে এল মেসে।

বাঁক বাঁক প্রজ্ঞাপতির মতো কালীমাতা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে যেত মেসের সামনে দিয়ে। কত রকমারি সাজপোশাকে, কারো ফ্রক, কারো সালোয়ার কামিজ, কারো শাড়ি। নানা ধাঁচে চুল বাঁধত। কারো বা বেগী দুলাত। কারো খালি পা, কারো পায়ে চটি। নানা ধরনের, নানা জাতির। সিঁদুর পরা মেয়েও কম ছিল না।

গুচ্ছ গুচ্ছভাবে কলতানে পথঘাট মুখরিত করে যখন যেত তখন অনন্ত

তাকিয়ে থাকত সেই কিশোরী বধুটিকে দেখবার জন্ত। শুধু সম্ভব হতো না দিন পালি ডিউটি থাকলে।

দুশটা বড় ভাল লাগত ওর। একদিন কবিতা লিখে মেসের দেওয়াল পত্রিকায় টাঙিয়ে দিল।

তাতে কেউ একজন টিপ্পনী কাটল—রূপ মুগ্ধ কবি।

কবিতাটা ঠিকমতো উৎরায়নি। তাই সে নিজেই ওটা ছিঁড়ে দিল। অনিল-বাবু বললেন—ছ্যাঃ !

শেরগড়ের মাঠে ফাইন্সাল খেলা। ডি. সি. সাহেব সেদিন একটা ট্রাক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ওদের যাবার আসবার জন্ত। ওরা যখন ড্রেস করে মাঠে নামার জন্ত তৈরি তখন দামুলিয়ার এজেন্ট, ম্যানেজার, মিঃ চৌধুরী, ডি. ডি., ডি. সি. সব এসে হাজির হলেন সেখানে। এজেন্ট সাহেব খোলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করে পরিচিত হইলেন। হেমব্রামকে তো আগে থেকেই চিনতেন। ডি. সি. সাহেব বিশেষ করে চিনিয়ে দিলেন স্ত্রীর ও অনন্তকে। এজেন্ট সাহেব পিঠ খাপড়ে মাবাস দিলেন। বড় বড় কথায় উৎসাহ যোগালেন।

খেলার বাঁশি বাজল। শেরগড়ের দুর্দান্ত ফরওয়ার্ড লাইন তুখোড় ষোড়-সওয়ারের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু অনন্ত সেদিন দুর্বীর। পর পর তিনটে আক্রমণ তিনবারই দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে গেল অনন্ত। ওর হুঁপাশে দুজন কেপ্টে! বাউরী ও বাবু মুচি। অনন্তর লড়াই হিম্মৎ দেখে তারাও দুর্বীর হয়ে উঠল। মিনিট দশেকের মধ্যে দেখা গেল দামুলিয়া চেপে ধরেছে শেরগড়কে। হেমব্রামেরও রুদ্র মূর্তি। বিশ মিনিটের সময় পেয়ে গেল গোল।

দুর্দান্ত বেগে বল নিয়ে যাচ্ছিল হেমব্রাম। তাকে তাড়া করে যাচ্ছিল তিনজন। হঠাৎ সে ব্যাক পাস করে সরে গেল। স্ত্রীর টুক করে ঠেলে দিল অলোক দেকে। সে শট নিল সরাসরি গোলে। যেন একটা ছবি।

তারপর শেরগড় যত মরীয়া হয়ে ওঠে অনন্ত তত শক্ত হয়ে যায়। সে এক বাফার। কার সাধ্য তাকে টপকে যায়? শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। বহুদিন পর দামুলিয়া শিঙ পেল। অভিনন্দনের পর অভিনন্দনে ভেসে গেল ওরা। বড় বড় সাহেবরা এসে করমর্দন করলেন। কি বিরাট হিরো!

ট্রাক, প্রেসেমান, ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা, সাহেবদের গাড়ি সব মিছিল করে কলিয়ারী ফিরল। জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। এতবড় জয় অনন্তর জীবনে এই প্রথম। ক্যাপ্টেন হেমব্রাম বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ওকে এনকারেজ করার জন্ত মিস ঘুঘু এসে পড়েছে মেসে।

অগ্রদূত মেসের সামনে সবুজ ঘাস বিছানো লনটা মাহুঘের পায়ে পায়ে কাঁদা হয়ে গেল। স্মৃতিবাবুও শিঙ হাতে নাচতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু অনন্ত

ও সূবীরের মাথায় হাত দিয়ে বললেন—সোনার ছেলে! এমনি করে তোরা এ বছর ফার্স্ট এন্ড কম্পিটিশনের শিল্ডটা এনে দিস।

সেই বিরাট জয়োল্লাসের তলায় চাপা পড়ে গেল সেদিন অস্ত্র নৃর্ধের রক্তিম রশ্মিতে নারী ও প্রকৃতির যে রূপকল্প অনন্তর অন্তরে স্থিরচিত্রের মতো ধরা পড়েছিল।

অবশ্য এইভাবেই হৃদয়ের পরতে পরতে ছবির পর ছবি ও মাজিয়ে রাখছে। কিসের জন্ম—কে জানে। বড় ভাবালু ছেলেটা।

মাত

দেশে কয়লার চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। তাপ-বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি চালু হলে এই চাহিদার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। রেলওয়ে একটা বড় কনজিউমার। তাদের সম্প্রসারণ চলছে। উৎকৃষ্ট মানের কয়লা যাচ্ছে লোহা, ইস্পাত, এলুমিনিয়াম ও ধাতুর কারখানায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০-২১ সাল থেকে ১৯৩০-৩২ সাল পর্যন্ত যে তীব্র মন্দার বাজার ছিল তাতে কয়লা শিল্প ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বহু কলিয়ারী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে নিম্নমানের কয়লা যে স্তরে। বহু কোম্পানী লাটে উঠেছিল। বহু কোম্পানী হস্তান্তরিত হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে মাত্র কয়েকটি দেশী শিল্পপতির কয়লার বাজারে ব্যবসা ছিল ও কলিয়ারি ছিল। সিংহভাগ ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীর মালিকানাধীন! সেসব কোম্পানীতে দেশী কোম্পানীগুলির শেয়ার ঢুকতে শুরু করে তখন থেকেই।

বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত মন্দা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতা ব্রিটিশ কোম্পানীগুলিকে শক্তিত করে তুলেছিল। তাঁরা ব্যবসা গুটোচ্ছিলেন। একবার বিলেতের ব্যাঙ্কে যে টাকা পৌঁছে গিয়েছিল মন্দার বাজারে সে টাকা তুলে নতুন বিনিয়োগ অনেক কোম্পানীই বন্ধ করে দিয়েছিল।

এদিকে নতুন নতুন কয়লার স্তরও আবিষ্কৃত হচ্ছিল। তাতে দেশী কোম্পানী-গুলি ১৯৩০-৩২ সালের পর বাজার তেজী হয়ে উঠলে কয়লা খনির প্রসারে মনোযোগী হয়ে উঠল।

এইভাবেই দেশী কোম্পানীর মালিকানা এবং শেয়ার দুইই বেড়ে যাচ্ছিল। তবুও কয়লা শিল্পের উপর আধিপত্য ছিল ব্রিটিশ কোম্পানীদের।

বার্ড এণ্ড হিলজারস, এন্ড্রিউ ইয়ুল, ম্যাকনীল ব্যারী, টারনার মরিসন প্রমুখ ম্যানেজিং এজেন্টরা ডিসেরগড়, সাকতোড়িয়া, হাটনল, পনিহাটা, কোয়থী রানা প্রভৃতি নামী দামী স্তরগুলির পাট্টা ভোগ করছিলেন। ডিসেরগড় বাকশিমুলিয়া ও জামুরিয়া অঞ্চলে তাঁদের একচেটিয়া কারবার ছিল।

ভারতে দামোদর কোল কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। এই বছরটি নানা কারণেই ভারতের ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম গণ আন্দোলন সীপ্তাতাল বিদ্রোহ হয়েছিল এই বছরেই।

দামুণ্ডা, শেরগড়, জাঁটুডি, ভজুডি অঞ্চলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বিঘার কোল-প্রপার্টি বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে নয়শো নিরানব্বই বছরের লীজ বন্দোবস্ত নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। তখনো কয়লা চালান যেত দামোদরের ফেরীঘাট দিয়ে নৌকা করে। হুগলীর মহাসভা ঘাটে। সেখান থেকে উল্বেড়িয়া ক্যানেল দিয়ে কলকাতা।

১৮৬০ সালে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেল চালু হলো। রেলওয়ের ক্রমশ প্রসার ও বিস্তার পরিবহনের ক্ষেত্রে নিয়ে এল এক বিরাট বিপ্লব। নৌকার পরিবর্তে রেলে কয়লা পরিবহন শুরু হলো।

শুরু হলো দামোদর কোল কোম্পানীর বাড়বাড়ন্ত। বিশ্বযুদ্ধের পরে যদিবা ধাক্কা খেল কিন্তু তার আগে ছিল বাম্পার মার্কেট। ১৯০৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত কয়লার দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছিল। ভালোমন্দ সবরকম কয়লাস্তরে একটির পর একটি নতুন কলিয়ারী চলছিল। সে এক বাজার। কয়লার ধুলোও চড়া দরে বিক্রি হচ্ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মন্দার বাজার কাটিয়ে উঠে দামোদর কোল কোম্পানী নতুন করে বিনিয়োগ শুরু করে দেয়। ১৯৩০-৪০ সাল পর্যন্ত চলেছিল দামুনিয়ার এক দু'নম্বর চানক। তারপর তিন ও চার নম্বর চানক সিংকিং হয়। সে দুটি চানকে এখন পুরোদস্তুর উৎপাদন চলছে। পাঁচ নম্বর চানক সিংকিং হয়েছিল ১৯৪৫-৪৭ সালে। তাতেও পুরো উৎপাদন চলছে।

বন্ধ হয়ে গেছে এক ও দু'নম্বর চানক। তবে চানক দুটি আছে। ভিতরে কয়েকটা হুড্গ পথ ও চানকের চারিদিকের স্তম্ভগুলি অটুট আছে। হেডগীয়ার পাল্লা দুটি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইঞ্জিন ও বয়লার তুলে নেওয়া হয়েছে। একটা ক্রেন ফিট করা আছে। সেই ক্রেনের রসায় বালতি বেঁধে মাহুঘ ওঠানামা করতে পারে অনেক কষ্টে।

পুরানো অফিসঘর ও গুমাটিঘরগুলি এখন চাপরাশীদের খাটাল। তারা দিবি সোসব বে-দখল করে বসে আছে। তারই পাশে পুরানো আমলের গোল গোল ছাদের একসারি কোয়ার্টার দখল করে আছে জনকয়েক সর্দারজী। কাজ করে টিনডেল ও শ্রাওস্টোয়িংয়ের ফিটারের। তেজু সিং, ফিজু সিং, দরবারা সিং এই রকম সব নাম। ওদেরই একটা ছেলের নাম গুরুনাম সিং। উঠতি অ্যাথলিট। হেমব্রাম কলিয়ারী অঞ্চলের দ্রুততম দোঁড়বীর। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দোঁড়ছে। অফুরন্ত দম।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই বার্ষিক স্পোর্টস এর প্রস্তুতি শুরু

হয়ে গেছে। অনন্তরও ডাক পড়েছে। প্র্যাকটিশ করতে গিয়ে এই ছেলেটির সঙ্গে আলাপ থেকে বন্ধুত্ব বেশ জন্মে উঠেছে। এখন গুরনামও সন্ধ্যাকালে মেসে আসে আড্ডা মারতে।

অগ্রদূত মেসের সরস্বতী পুজোয় নায়িকা, হবু নায়িকা, দূর ভবিষ্যতের নায়িকা এইসব কিশোরী ও বালিকার দল মা মামীদের শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরে ফুর ফুর করে বেড়াচ্ছে। যেন প্রজাপতির ঝাঁক।

বীণা হস্তে মাটির সরস্বতী তার আগের দিন এসে গেছেন। সঙ্গে প্রমাণ মাইজের একটি খেত শুভ রাজহংসী। জলজ্যান্ত হলে কত না ডিম দিত।

ইহ বাহু! ট্রেনি বাবাজীরা তো সিং ভেঙে বাছুর সেজে যৌবন কালে বালক ছাত্রের ভূমিকায় নেমে পড়েছে। বৌদিদির শাড়ি, দাদাদের ধুতি, দোকানের লাল নীল কাগজ ইত্যাদির লাগসই খাঁচা বানিয়ে মা সরস্বতীর একখানা চিকন আস্তানা করে ফেলেছে। এদিক ওদিক থেকে দেখে নিজেরাই তারিফ করছে—বহুত আচ্ছা! ফাস্ট ক্লাস ডেকোরেশন।

অনন্ত সদাই উত্তোপী। সেজন্ত প্রসাদ বিতরণের ভার গুর ওপরই পড়ল। চিঁড়ে গুড়ে চটচটে হয়ে থাকো সারাদিন। লোকজন তো আসছেই। বেচারীর খাওয়ারও অবসর নেই। শুচি, কল্যাণী, বাসন্তীর দল গুকে পেয়ে বসেছে। হারিস্টিটার সঙ্গে প্রসাদ বিতরণ সেজন্তই বুঝি ক্লাস্তকর হচ্ছে না।

সন্ধ্যাকালে বিচিত্রাভূষণ।

কলিয়ারীতেই জনকয়েক শিল্পী আছে। যেমন স্বপ্না স্কুল থেকে প্রাইজ পেয়েছে। অসীমের বন্ধু রজত ভালো গান করে। কবিতা আবৃত্তিটা তো কমন ব্যাপার। রবি ঠাকুর বাঙালী বাচ্চাদের মগজে ঢুকে বসে আছেন। অনন্ত দেবে কমিক নকশা। একজন আনাড়ী দেহাতী আদমী কলকাতা শহরে গিয়ে কিরকম ভেবাচেকা খেয়ে গিয়েছিল তারই আঞ্জাশ্রদ্ধ। ইতিপূর্বে মেসের আড্ডাখানায় দু'একবার মকশো করে নিয়েছে।

আর বার্ণপুর থেকে জনকয়েক ভাড়াটিয়া শিল্পী আসবেন।

ব্যবস্থাটি বেশ ভালো। ট্রেনিরা স্টাফদের কোয়ার্টারে গিয়ে দাদা বৌদি ও ছানা পোনাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। আরো কি না এসে পারে?

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী মহিলাদের ব্যাপারটা দেখছেন।

তখন অলিতে গলিতে ডেকোরেশনার কোম্পানী ছিল না। চেয়ার টেবিলের রেওয়াজ নয়। সাহেবদের জন্য অফিস থেকে খান কয়েক চেয়ার আনা হতো। বাদবাকী বিস্তৃত জমির ওপর খাদের ব্লাটিশ ক্লথ বা চট।

সন্ধ্যা থেকেই লোকজনের যাতায়াত চলছে। মেয়েরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরছে।

শুচি, কল্যাণীর দলে চার পাঁচটি মেয়ে ফুর ফুর করে বেড়াচ্ছিল। অনন্তকে জেচিও কাঁচিছিল। গুদের মধ্যে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ আলাপচারিতা গড়ে উঠেছিল।

অনন্ত এখন গ্রীনরুম নিয়ে বাস্তু। হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা এবং বাঁয়ার বিড়ে, তবলার হাতুড়ি ঠিক ঠাক রেখে যাচ্ছে। তখন সেই বাঁকটি গ্রীনরুমেই ঢুকে পড়ল।

এতগুলি মেয়ের মধ্যে অনন্তর দৃষ্টি বিশেষ করে পড়ল একটি বালিকা বধুর দিকে। পরনে লাল শাড়ি, পায়ে রূপোর মল, গলায় রূপোর হার, হু' হাতে কাঁচের চুড়ি, সিঁথিতে আঁকা লম্বা সিঁদুর। কপালে টিপ। ঘোমটা টেনে ঢেকে রেখেছে মাথার খোঁপা। নাকের নোলক ছলছে লুক্ লুক্ করে।

অভিভূত বিষ্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে অনন্ত স্মর করে বলল—

কাদের কুলের বউ গো তুমি—কাদের কুলের বউ—

বলতে বলতে ওর চিবুক ধরে নাড়া দিলো। শুচিরা সব খিলখিল করে হেসে উঠল। সেই মেয়েটি লজ্জায় মরে যায় আর কি।

ধোং! মুখ ঝামটা দিয়ে সরে গেল। হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল। রাগে এবং লজ্জায় হয়তো বা চলেই যেত, শুচি ছুটে গিয়ে ওকে ধরল।

অনন্তও ততক্ষণে ওর কাছে পৌঁছে গেছে।

বলল, কি হলো খুকি? রাগ করছো কেন?

—খুকি নই। আমার নাম গৈরী। আপনি তো চেনেন আমাকে। তবে এমন তামাশা করছেন কেন?

গৈরীর নাকের পাটা ছলছিল। চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছিল।

অনন্তর তখনো তামাশার নেশা যায়নি। বলল—আহা! আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে এই ডেসে মঞ্চে নামিয়ে দেবো। একটা বধু ড্যান্স দেবে।

—পারবেন আপনি সঙ্গত করতে? আসরে নামবেন তাহলে। আমি নাচতেও জানি—গান করতেও জানি।

—ওরে বাপরে! এ যে সাক্ষাৎ অম্পরা।

—বটেই তো! আপনার মতো শুধু মুখেই ফুটানি নাকি?

মেয়েগুলি খিলখিল করে উঠল—দিয়েছে গৈরী, অনন্তদার মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে।

গৈরীকে তাকিয়ে দিয়ে অনন্ত বেশ মজা পাচ্ছিল। ওর ঘাড় বাঁকানো রাগের ভঙ্গি, চোখ ডাগর করা চাউনি এবং ঘোমটা খুলে পড়া পুঁতির মালা দিয়ে মাজানো খোঁপা সবই কেমন অভিনব মাত্রা নিয়ে মনে চমক দিচ্ছিল। সেই সময়ে মেয়েগুলির খলবলানিতে বড় বিরক্ত হলো।

বলল—তোরা চুপ কর তো!

স্ববীর এসে ওর ঘাড় ধরল। বলল—শালা! কচি মেয়েগুলির সঙ্গ নষ্টামি হচ্ছে। আয় এদিকে।

বিচিত্রানুষ্ঠান হলো। যেমনটি হবার, তেমনি ছেলেভুলানো ছড়া কাটার অ/৩

মতো। অবশেষে স্মৃতিবাবু ঘোষণা করলেন—এবার অনিল সরকার তাঁর গোড়ীয় ঘরানার বদ খেয়াল পরিবেশন করবেন।

মণ্ডপে হৈ হৈ উঠল। ছেলেছোকরাদের ফাজলামি শুরু হবে। তাই সব একে একে চলে গেলেন। আসর ফাঁকা। ট্রেনিরা জিনিসপত্র গুটোতে বাস্তু। হঠাৎ অনন্তর নজর পড়ল তিন চারটি কুলি ধাণ্ডার মেয়ের সঙ্গে গৈরী একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। শুচি কল্যাণীরা চলে গেছে।

অনন্ত বলল—কি হলো গৈরী? এখনো দাঁড়িয়ে আছে? বাসায় যাও।

—যাবো তো! দাদারা আমাদিকে নিয়ে যাবে বলেছে। এখনো তো এল না।

—ওঃ, তাই বুঝি আটকে পড়েছে। তা আমি তোমাদিকে এগিয়ে দিলে যেতে পারবে তো?

—হ্যাঁ—পারবো। ফাটকবাজার পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

—আচ্ছা—একটু দাঁড়াও! স্ববীরকে বলে আসি।

পথে যেতে যেতে গৈরী বলল—আপনাকে কি সব যা তা বললাম। কত না রাগ করেছেন অনন্ত দা?

—আরে না না। রাগ করবো কেন?

—হ্যাঁ! করেছেন। তারপর আমার সঙ্গে কথাই বললেন না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। খালি খালি কান্না পাচ্ছিল।

—আচ্ছা পাগল তো! রাগ করলে এই রাত্রে তোমাদিকে পৌঁছাতে আসতাম?

—আপনি খুব ভালো!

দেখতে কিশোরী হলে কি হবে? মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে ভিতরেও পাক ধরেছে। না হলে স্মৃতি চ্যাটার্জীর অত ব্যস্ততার মধ্যেও কেন সে কাছে এসে দাঁড়াবে? প্রাণের টান আছে বলেই তো। সম্পর্কটি গুরু শিষ্টার। স্মৃতিবাবু ওকে ক্লাস সেভেন থেকে পড়াচ্ছেন। কোনো বেতন নেন না। বয়ঃসন্ধিকালে সেই অবৈতনিক শিক্ষককে হৃদয়টি দিয়ে ফেলল। নিরুচ্চার প্রেম। কেউ কারো কাছে মুখ ফুটে বলতে পারে না। এ তো বড় বিষম সঙ্কট।

স্মৃতিবাবু বললেন—স্বপ্না। তুমি এখনো যাওনি?

—না। একা যাবো কি করে?

—তোমাদের পাড়ার এত ছেলেমেয়ে এসেছিল, তাদের সঙ্গে যেতে পারতে।

—না। আপনি চলুন।

—আচ্ছা একটু দাঁড়াও।

জিনিসপত্র গুটানোর কাজকর্ম চুকিয়ে ওকে নিয়ে যাচ্ছিল। ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর কাছে বললেন—আমার ইচ্ছা ছিল না যে তুমি অল্পষ্টানে আসো।

অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। কি করে মেক-আপ দেবে? অনেক পড়তে হবে।

—ধ্যৎ! সব সময়ে পড়াশোনার কথা শুনতে ভালো লাগে না।

—সেকি? তোমার সামনে ফাইন্সাল পরীক্ষা।

—হোক্ গে।

—পড়বে না?

—না।

—কেন?

—ভালো লাগে না।

—নাচতে ভালো লাগে?

—না।

—আড্ডা মারতে ভালো লাগে?

—না।

—তবে তোমার কি ভালো লাগে?

তোমাকে।

একটি শব্দ যেন সমুদ্র মন্থনের সুধাভাণ্ড। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণরস। পাহাড়ী ঝর্ণার অশ্রান্ত কলধ্বনি। বিপুলা পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি। অব্যক্ত আকাজ্জ্বল্য বাণীরূপ।

স্বমিতবাবু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তখন, সে ঝাঁচল দিয়ে পুরো মুখটিই ঢেকে নিয়েছে।

ওর পিঠে হাত রাখলেন। বললেন—অত লজ্জা কি? মুখটা খোলো।

স্বপ্না তখন কাঁপছিল। বলল—কি বলে ফেললাম আপনাকে? আমাকে ক্ষমা করুন স্বমিতদা।

স্বমিতবাবু ওর মুখ থেকে ঝাঁচলটা টেনে সরিয়ে অবনত চিবুক তুলে ধরে বললেন—যে কথা আমার বলা উচিত ছিল তা তুমি বলে দিলে। তোমার যেমন আমাকে ভালো লাগে আমারও তো তেমনি তোমাকে ভালো লাগে। নিজেরই অজান্তে কখন যে এই ভালোলাগা ভালোবাসা হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনি। আজ তুমি আমাকে জাগিয়ে দিলে স্বপ্না।

স্বপ্না তখন একটু স্বাভাবিক হয়েছে। স্বমিতবাবু ওর একটা হাত নিজের হাতে চেপে ধরেছেন। সে হাত কাঁপছে।

স্বপ্না বলল—পরীক্ষা দিয়েই চাকরীতে ঢুকতে হবে। তা না হলে বাবার সংসার চলবে না। ভাই বোনেরা মানুষ হবে না। কি জানি আমার ভালোবাসা কোনো দিন সার্থক হবে কি না?

আমি তোমার জন্ম অপেক্ষা করব স্বপ্না। যতদিন না তুমি তৈরি হচ্ছ ততদিন অপেক্ষা করব।

—তুমি কত ভালো ।

রাস্তার উপরেই নিচু হয়ে ওকে প্রণাম করল ।

অনন্ত তখন ফাটকবাজারে গৈরীকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে । দূর থেকে সেই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল । অশ্রুদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলতে লাগল । কারণ ওঁরা ওকে দেখতে পেলে লজ্জা পেতে পারেন ।

তারপর একদিন অনিলবাবু কোয়ার্টার পেয়ে মেস থেকে চলে গেলেন । এতগুলো দিন যে চার দেওয়ালের মধ্যে তিনটি মানুষ বাস করত তাদের মধ্যে একটি চরিত্র সদা সর্বদাই ছিল অন্তঃকল, আত্মমগ্ন । না, চক্রান্তকারী ছিলেন না, সদাশয় ভদ্রলোক ।

যাবার সময়েও বেডিং ও স্ফটিকেশটি একটি লোকের মাথায় চড়িয়ে টুক টুক করে বেরিয়ে পড়ছিলেন । অনন্ত বলল—দাদা । এতদিন এক সঙ্গে বাস করলাম । যাবার সময় আমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে যান । উনি ওর দিকে তাকালেন । বললেন—নারে ভাই । তোমাদের ছুঁজনকে আমি ভাইয়ের মতো ভালোবাসি । দোষত্রুটি দেখি না ।

অনন্তর বুকটা ব্যথায় মুচড়ে উঠল ।

আট

রবিবারের সকাল । অগ্রদূত মেস প্রায় ফাঁকা । শনিবার থেকেই বাড়ি যাবার হিড়িক । অনন্তর দুই রুমমেট চলে যাবার পর সে একা । ওদিকে স্থমিতবাবুও একা ।

বাইরে এসে মেসের ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ ক'জন মেথার ?

—পাঁচ ছ' জন হবে ।

—ব্যাস । লাগাও মাংসের ঝোল, আলু-পোস্ত ।

স্থমিতবাবুর গলা পেয়ে অনন্ত বাইরে এসে বলল—রয়্যাল কম্বিনেশন । এখন একবার গরম মুড়ি ঝাল পকুড়ি হয়ে যাক ।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হোক ।

স্থমিতবাবুর মনটা বেশ খুশি খুশি । ঠাকুরমশাইকে সব যোগাড়পত্র করতে দিয়ে অনন্তর সঙ্গে গল্প করতে বসলেন । ওদের ছুঁজনের বয়সের ব্যবধানটা প্রায় সাত-আট বছরের । কিন্তু বেশ একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে । অনেকটা গুরু-শিষ্যের মতো । তবে শিষ্যটি এঁ'চড়ে পাকা । তাই ভাবী গুরুপত্নী নিয়েও হাসি-ঠাট্টা করে ।

একদিন স্বপ্না কি একটা কাজে মেসে আসছিল । অনন্তরা বেশ কয়েকজন ছিল । হঠাৎ সে বলে উঠল—সরে যাও, সরে যাও । নায়িকা এখন অভিনায়িকা ।

সেই শুনে স্বপ্না তো ওকে এই মারে কি সেই মারে । এমন টিল ছুঁড়েছিল যে কপালে লাগলেই রক্তপাত । তারপর জানাজানি ।

মুড়ি পকুড়ি খালায় নিয়ে চিবুতে চিবুতে স্মিতবাবু বললেন—যাবি অনন্ত—আমার সঙ্গে ?

—কোথায় দাদা ?

—ডিসেরগড় হাটে আজ দেবেন সেনের মিটিং আছে ।

অনন্ত একপায়ে খাড়া । তৎক্ষণাৎ রাজী ।

খেয়েদেয়ে স্মিতবাবুর সাইকেলের ক্যারিয়ারে চড়ে বসল ।

ছা শেরগড় হল, ডিসেরগড় । তার দক্ষিণে দামোদর নদ । ওপারে জিলা মানভূমের রক্ষ দিগন্তে তালবীথির সারি । দামোদরের ধারে-ধারে বয়লার চিমনি আর হেডগীয়ার পাল্লা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে । চোখ মেললেই দেখা যায় শিল্প বিপ্লবের ছবি—গল্ গল্ করে ধোঁয়া উড়ছে বয়লার চিমনি দিয়ে । বন্ বন্ করে ঘুরছে হেড গীয়ারের পুলিচাকা ।

ডিসেরগড়ে হাট বসে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার । দারুণ জম্-জমাট হাট । রবিবারে কয়লাকুঠির কুলি-কামিন বাবু-ভাইয়াদের ছুটির দিন । সারা সপ্তাহের সওদা বেসাতি, আনাজপাতি কেনাবেচার দিন । মাদারীওলা ডুগডুগী বাজায় । চুড়িউলি ঝম্কা গিরায় ।

তারই পাশে সামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ তৈরি হয়েছে । দেবেন সেনের মিটিং হবে । কি যেন নিয়ে এসেছেন উনি । হাতের মোয়া-পানের বাটা-মহুয়ার রস—কে জানে কি ?

কুলি-কামিনদের কানাকানি । লোক জড় হচ্ছে কাতারে কাতারে । মিছিল আসছে একটি দুটি করে । শেরগড়, সালুঞ্চি, শালবনী, দামুলিয়া, দারম, আঙার চক, হাটডি, পটডি, পানমোহরা, সাতঘরিয়া এমন কত কয়লাকুঠির কত কুলি-কামিন ।

হাড়ি, ধাড়ি, মাহাতো, কুম্ৰী, জুনিয়া, পাশমন, হুশাদ, মশহর, সিদ, বিদ, যাদব, গোয়লা, ধোবী, ক্যাণ্ট, সিং, রায়, দুবে, চৌবে, পাণ্ডে, মিছির, সৎনামী, সুরঘবংশী, হরিবংশ, হরিজন, সাঁওতাল, বাউড়ী, মুচি, মেথর, চণ্ডাল—এমন কত জাত, কত নাম, কত মাছষ ।

আরো এসেছে স্মিত চ্যাটার্জী, হরিহর গান্ধী, স্মধীর রুদ্র, প্রমথ মণ্ডল, জগদীশ রায়, নগেন মল্লিক প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির নেতা । শম্ভু বাউরী, কালো বাউরী, রতন ধীবর, রামপ্রসাদ, চরিতর, কিষণ, চামরু, ঝামরু মতো খাড়া ডিউটবালা আদমী ।

এবং অনন্ত । সব ঘাটেই যে জল থায় । ছুনিয়াদারীর হরেক তামাশা দেখতে যার অদম্য কোঁতুহল ।

দেবেন সেন এলেন বক্তৃতা দিতে। মাঝারী গড়নের মানুষটি। গায়ের রঙ তামাটে। যত নামডাক শোনা যায়, দেখে কিন্তু তা মনে হয় না।

বৈশাখের গরমে প্রাণ আইটাই করছিল। উনি খুব ঘেমে গিয়েছিলেন। কপাল দিয়ে ট্‌স্ ট্‌স্ করে ঘাম পড়ছিল। গায়ের জামাটা ভিজে সপ্ সপ্ করছিল।

উনি বলতে শুরু করলেন—ভাইসব!

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কত অশ্রু, কত রক্তের বান ডেকে গেছে। আমরা জেল খেটেছি। পুলিশের অত্যাচার ও নির্ধাতনে হাড় মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু পরিবর্তনটা কি হলো? দেশের শ্রমিক কৃষক তো সেই তিমিরেই। আট-দশ ঘণ্টা খাদে খেটে পনেরো আনা মজুরী। কোনো কোনো কলিয়ারীতে মালকাটারা আজ খাদে নেমে কাল গুঠে। সেই ব্যারাকলউ সাহেবের আমলে যেমনভাবে চলত তেমনি চলছে। শ্রমিকদের জান মানের কোনো দাম নেই। অ্যান্ড্রিডেন্ট হয়, লোক মরে, ক্ষতিপূরণ খুঁজতে গেলে মালিক ম্যানেজাররা বলে—কই হাজিরা খাতায় তো গুর নাম নেই।

এই যে হাজিরা খাতা—এর ব্যাপারটা কী?

সরকারি আইন আছে যে প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট হাজিরা খাতায় হাজিরা লিখিয়ে কাজ করতে যাবে। সেই হাজিরা মোতাবেক সে বেতন পাবে। বেতনের অল্পপাতে টাকায় এক আনা হারে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কাটা হবে শ্রমিকের তরফ থেকে আর এক আনা দেবে কোম্পানী। জমা দু' আনা। এই টাকা তার হিসেবে বছরের পর বছর স্‌দ সহ জমা হবে। মারা গেলে তার পরিবার, বেঁচে থাকলে চাকরী যাবার পর সে পাবে ভবিষ্যনিধি হিসেবে।

আর আছে বোনাস। একটা কোয়ার্টারে অর্থাৎ জাহ্নুয়ারি থেকে মার্চ, মার্চ থেকে জুন এইভাবে বছরে চারটি কোয়ার্টার। প্রতি কোয়ার্টারে ৬৬টি দিন হাজিরা থাকলেই সে বোনাস পাবে প্রতি মাসে বেসিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যদি হাজিরা খাতায় নাম না থাকে তাহলে এসব পাওনা গণ্ডা মারা যাচ্ছে। এমন কি সে যে একটা কলিয়ারীর কর্মী সেই স্বীকৃতিটুকুও পাচ্ছে না। পাওনা যোওনা পরের কথা।

সব কলিয়ারীতে দুটি করে খাতা। কম পক্ষে পঞ্চাশটা কলিয়ারী আমি জানি যেখানে পাঁচশো জন কর্মী কাজ করে আর হাজিরা হয় পঞ্চাশজনের। বাকী সব দু'নথরী খাতায় হাজিরা। চোখা কাগজে পেমেন্ট।

আইন মোতাবেক কাজের সময়-সীমা হলো আট ঘণ্টা। শিশু শ্রমিক নিষিদ্ধ। মহিলাদের খাদের ভিতরে কাজ নিষিদ্ধ। কিন্তু কার্যকালে হচ্ছেটা কী? একটা

পরিবারের বউ ছেলেমেয়ে সবাই মিলে কাজ করতে যাচ্ছে। মেয়েরাও খাদে নামছে। খাদের অঙ্ককারে তাদের সতীত্ব নারীত্ব লুপ্তিত হচ্ছে। শিশুরা অত্যধিক শ্রম ও অপুষ্টিতে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে।

গৃহ সমস্যা? কুলি-ধাওড়াগুলিতে মাল্লুশ না গরু-শূয়ার বাস করে তাই বোঝা দায়। আলো নেই, বাতাস নেই, ভিল ধারণের স্থান নেই। গু, গোবর মেখে ছেলেমেয়েরা মাল্লুশ হয়। নর্দমার জলে হাবুডুবু খায়। স্থানিটেশন বলে যে একটা কথা আছে তা বৃষ্টি কেউ জানে না।

এক একটি ছোট-খাটো মাহেব বাংলাতে ত্রিশ চল্লিশটি বিজলী বাতি জ্বলে। চার-পাঁচটি ফ্যান ঘোরে, দশ-বারোটি ঘর, বাগান মালি, মেথর, চাপরাশী কত কী? অথচ কুলি-ধাওড়ায় বাতির তেল পাওয়া দায়। ব্রিটিশ আমল থেকে যে কথাটা চালু আছে—কলিয়ারীতে ওয়াটার, কোয়ার্টার, অয়েল, ফুয়েল ফ্রি—তা আজ প্রহসন।

মাথা ঠুঁকে মরে গেলেও কেউ ছুটি পায় না। পেলেও তার দরুন পয়সা পায় না। সরদাররা দেশ থেকে কুলি-কামিন নিয়ে আসে। তাদের আগাম দাদন দেয়। আর তাতেই বন্ধক পড়ে থাকে কুলি-কামিনের জীবন। ঋণ তাদের মাথার বোঝা জন্মজন্মান্তর ধরে। যতই কাজ করুক হিসেবের কারচুপিতে বন্ধকী কোবালার ফারথৎ নেই।

টিক এইভাবে কয়লাকুঠির শ্রমিকদের প্রতি শাসন, শোষণ ও নির্ধাতনের কথা প্রাজ্ঞল ভাষায় বৃষ্টিয়ে বললেন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে। রাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্রের কত কয়লাকুঠির নাম করলেন যেখানে কসাইখানা চলছে। কুলিদেরকে জবাই করা হয়। মেয়েদের সতীত্ব নাশ করা হয়। মালিকরা খুলে রাখে মদের ভাঁটি, কসবিখানা। সেখানে বিক্রয় করা হয় চোলাই মদ এবং নারীমাংস। পোষ্য পায় ঝরিয়ার মান্তান, ভাঙাবাজ, গুণ্ডা।

নিজের আয়নায় নিজেকে আর কতটুকু দেখা যায়? তাই কুলি-কামিনরা নিজেদের দুর্দশার কথাটা টিক বুঝত না। ভাবত এই বৃষ্টি বিধিলিপি। দেবেন সেন তাদের সামনে পর পর ছবি সাজিয়ে আর্ট গ্যালারী তৈরি করে দিলেন। নিজের নিজের ছবি চিনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই।

তাহলে উপায়?

উপায়—সংগ্রাম। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সব শ্রমিক এক হও।

হাজার হাজার কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—সব শ্রমিক এক হও।

মিটিং শেষ হবার পর দশ পনের মিনিটের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল। মধ্যে একটি হাজারকোটি জ্বলছিল। তার আলোতে বিশিষ্ট কর্মীরা কর্মসূচী রচনা করছিলেন। নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল! স্বমিতবাবু ও অনন্তও সেখানে ছিল।

স্বমিতবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন—দেবেন্দা, এই ছেলোটর নাম অনন্ত শর্মা । আমাদের কয়লাকুঠির কবি ।

অনন্ত গুঁকে জোড়হাত করে নমস্কার করল । উনি স্থিত হেসে বললেন—
বাঃ । কয়লাকুঠির মতো রুক্ষ শুষ্ক দেশে একজন কবি পাওয়া ভাগ্যের কথা । কি
কি কবিতা লিখেছ ?

—না স্মার । তেমন কিছু নয় । দু'একটা কবিতা লিটল ম্যাগাজিনে
বেরিয়েছে ।

—বেশ বেশ । তোমার চোখ দুটিতে স্বপ্ন টল টল করছে । কবি হওয়া
তোমাকেই সাজে । লেখো—কবিতা লেখো—শ্রমিকদের ঘামের কবিতা, রক্তের
কবিতা, সংগ্রামের কবিতা । এ যুগের চারণ কবি হও ।

কয়লা কুলির ইতিহাস লেখো ।

মিটিং থেকে ফিরে এসে ঠিক এই কথাগুলিই সে তার ডায়েরীতে লিখে
ফেলল । একেবারে বড় বড় হরফে । যেম কোনো সত্যদ্রষ্টা ঋষির মন্ত্রগুপ্তি ।

ওর স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর । অনায়াসে লিখে ফেলল পুরো বক্তৃতার বয়ান ।
ছোট-বড় ঘটনা ও সংলাপ । ষাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁদের সম্পর্কে
নিজস্ব ধারণা ।

নয়

কেটে গেল আরো একটা বছর । ছয়মাস খুঁটা মিস্ট্রীর সঙ্গে ও ছয়মাস বারুদ
কুলিতে অত্যাবশ্যকীয় ট্রেনিংটি শেষ হলো । এরই মধ্যে ফুটবল মরশুমে দেদার
ম্যাচ খেলল, ট্রফি জিতল, স্পোর্টসে প্রাইজ পেল এবং থার্ড ইয়ারের শুরুতে বিজয়
মঞ্চে দাঁড়াল ফার্স্ট এড কম্পিটিশনে চ্যাম্পিয়ানশিপের প্রাইজ নিতে ।

মেসের দেওয়াল পত্রিকায় বেশ কয়েকটি জোরালো কবিতা লিখল কয়লাকুলির
স্বৈদ, অশ্রু ও সংগ্রাম নিয়ে । কলকাতায় একটা ম্যাগাজিনে দুটো কবিতা
বেরিয়েছে । স্থানীয় পত্র-পত্রিকাতেও বেরুচ্ছে । ক্রমশই অনন্ত শর্মা একটা নাম
হয়ে উঠছে ।

ইহ বাহু ! ওদের জীবনের সব চার্ম বরবাদ হতে বসেছে খাদের অঙ্ককারে ।
১লা জাহুয়ারি থেকেই ডিউটি পড়েছে লোডারের । অনন্ত ও কমলেন্দু দু'জনে
একটি জোড় । পড়েছে ডি. ডি. সাহেবের পাল্লায় । গুঁর কাছে কাজে ফাঁকি
নেই । লোকটার সবদিকে শ্রেন দৃষ্টি । যখন লাইন মিস্ট্রির সঙ্গে কাজ করত
তখন কুলিদের সঙ্গে কাঁধে রেল চড়িয়ে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে চলাটাও বাকি ছিল
না । খুঁটা কুলি ও বারুদ কুলির কাজের সময় তো একটা করে বরাদ্দ কুলি কম
করে ওদেরকে খাটিয়ে নিয়েছিলেন ।

কোম্পানির ট্রেনিং স্কীমটাই এইরকম । হাতে কলমে ট্রেনিং নিতে হবে ।

প্রতিটি কাজেই শিক্ষা, দক্ষতা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। চোখ মেলে তাকালেই ঘন অন্ধকারে রহস্যময়ী প্রকৃতির বুক চিরে স্ফুট কেটে এগিয়ে যাবার ক্রিয়া কৌশল।

ঘড় ঘড় শব্দে কোল কাটিং মেশিন চলে। নিরেট কয়লার স্তরে খাঁজা তৈরি হয়। ড্রিল দিয়ে হোল করে তাতে বারুদ ঠানানি হয়। বিজলী ডিটোনেটার দিয়ে আওয়াজ হয়। তারে তার যোগ করে শট ফায়ারার এক্সপ্লোডারের চাবি ঘুরালেই গুড়ুম। হুড়মুড় করে ধবসে পড়ে কয়লার চাঙড়। ধুলো ও ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। নাইট্রাস ফিউমসের কটু গন্ধ। জল ছিটাও, বাতাস দাও, ঝাড়াই কর। ইত্যাকার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে কয়লা লোডারের দল বেলচা দিয়ে ঝোড়া ভরতে আয়তনে ঢুকে পড়ে।

অনন্ত ও কমলেন্দু এখন সেই কাজ করছে। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কয়লা ভর্তি ঝোড়া কাঁধে নিয়ে খাদের চড়াই ভাঙতে গ্যালন গ্যালন ঘাম ঝরে। বুকটা হাঁস ফাঁস করে। অনন্ত যদি বা পারে কিন্তু কমলেন্দু একদম নয়। সে বড-লোকের ছেলে। ঝুড়িটা কাঁধে চড়িয়ে দিলে কঁকু কঁকু করে।

মহা ফাঁপর। কবিতা টবিতা মাথায় উঠেছে। খাদ থেকে উঠে ঝিলের মড়ার মতো মেসের ঘরে নিঃশাড়ে পড়ে থাকে। কখনো বা চোখ ফেটে জল বেরিয়ে যায়। এই থেকে উদ্ধার পাবার কি যে উপায় তাই নিয়ে হুঁজনে সূদীর্ঘ পরামর্শ করে। কিন্তু আশার আলো পায় না।

ডি. ডি. সাহেব সেদিন মুখে ছিলেন। বিউটির হাত ধরে বললেন—

—একটা কথা বলব ?

—ভনিতা ছাড়ো তো !

—বলছিলাম বাড়িটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

—তা আমি কি করব ?

—একটা ছেলে যদি হতো।

—ভ্রষ্টা মেয়ের পুত্রের সোহাগ ভালো নয়।

—তোমার কি সাধ আহ্লাদ নেই ?

—আমার আবার সাধ আহ্লাদ ! কুমোর ঘরে মাটি মেখে, ধান ভেনে জীবন কাটতো—এখন তো সূখের ভাত খাচ্ছি।

কাটাকাটা কথা। ডি. ডি.-র গুনতে ভালো লাগল না। একসেট ধোবায় কাচা কড়া মাঞ্জা দেওয়া হাফ প্যান্ট হাফ শার্ট পরে জুতোর ফিতে লাগাতে শুরু করলেন।

বিউটি বলল—এখন উঠে পড়লে যে।

হ্যাঁ। কাজ আছে।

—জানি জানি। আমার কথা শুনে গাটা চিড়বিড় করে উঠলো তো !

—ঠেস দিয়ে কথা বোল না। আমি কিছু অন্ডায় আবদার করিনি ?

—এমন কিছু ঞায়ও করনি। আজ আমার দেহে রূপ যৌবন আছে তাড়িয়ে দিলে তোমার চেয়েও বড় ক্যান্ডান পাবো। ছেলে পুলে হলে কে পুঁছবে ?

—আমাকে তুমি এত অবিশ্বাস কর ? তোমার জন্ম জাত সমাজ সব ত্যাগ করেছি তবু ফণা তুলেই আছে ? স্বয়োগ পেলেই ছোবল মারো।

—বিষ তো ওগরায় না। তাহলে অনেক কাণ্ড হয়ে যেত। তোমরা আমার ওপর যত বিষ চেলেছো তা যদি ওগরাতে পারতাম তবে বিষের বান ডেকে যেত। এতগুলো বছর একসঙ্গে কাটতো না।

—একটাই তো আমার আফসোস। এতগুলো বছর একসঙ্গে থেকেও তোমার মনের নাগাল পেলাম না।

—তার কি দরকার ? শরীরটা তো পাচ্ছ। যখন খুশি যেমন খুশি।

—অত তর্কের সময় নেই আমার।

টুপিটা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

শালা মেয়্যার জাত ! এঁটোপাতার মতো উড়ে বেড়াচ্ছিল বৃকে ঠাই দিয়ে রাখলাম তাই ফণা তুলছিস। তোর অত কিসের দেমাক ?

এটা খুবই সত্যি যে বিউটি ওকে মনের ভিতরে ঠাই দিতে পারেনি। ওর মুখের উপরেই চরিজ্রহীন, জুলুমবাজ, স্বার্থপর এই সব বলে ধিক্কার দেয়। তার জন্ম কলহ কচকচি কম হয় না। তবু তাদের সহাবস্থান আছে। একই চুষকের দুটি মেরু একই সঙ্গে অবলীলায় অবস্থান করেছে। কালচক্রের আবর্তনে ঘটে যাচ্ছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলা।

বড় নিঃসঙ্গ জীবন। এত ফাঁকা লাগে যে মাঝে মাঝে কান্নায় বৃক ফেটে যায়। কোলে কাঁখে একটাও যদি থাকত তবে কি এতটা শূন্যতা থাকত ? লজ্জা ঘেন্না ঘাইহোক নিজেই রক্ত মাংস দিয়ে গড়া। ডি. ডি. সাহেব তো কত করেই চাইছে। কিন্তু তার যে অনেক বাধা।

এতোয়ারীয় ধাণ্ডায় অনন্ত বেশ জমিয়ে বসেছে। ষাট-সত্তরজন লোডারের বাস। চারখানা লখা চণ্ডা ঘর। খোলার ছাউনি। মেঝেতে সারি সারি দড়ির খাট। ইয়া ইয়া লাহাঙ্গা জোয়ান। জরু গরু বাল বাচ্চা দেশে। একক জীবনযাত্রা।

খাণ্ডা দাণ্ডা সরদারের জিন্মা। সময় হলেই খালা পেতে বসে পড়ে। রাঁধুনি হাতায় করে ডাল চেলে দেয়। গণ্ডা গণ্ডা রুটি। হস্তা হাজিরা সরদার অফিস থেকে তুলে আনে। মেসের খরচ, কমিশন, হুদ, আসল কেটে কুটে বাদবাকী ওর কাছেই জমা থাকে। মনিঅর্ডার করে দেশের ঠিকানায় পাঠায় তাতেই তাদের বাচ্চা বিবির খরচ চলে।

মাসে ষাট-সত্তরজন মনিঅর্ডার ফর্ম লিখতে হয়। সেই জন্মই অনন্তর এত খাতির। ওকে ধাওড়ায় ডেকে এনেছে ঠিকানা মোতাবেক ফর্মগুলি ভর্তি করতে। না হলে প্রতিটি ফর্মে এক পয়সা কি লাগবে। তারও লোক আছে। অনন্ত পয়সা কড়ির ব্যাপারটা জানতো না। সরল বিশ্বাসে ফর্ম ভর্তি করে দিলো।

ওর সমবয়সী একটি ছোকরা বলল—এ বাবু! হামারা এক খৎ লিখ্ দিহু।

—কিস্কা খৎ ?

—চিঠি! মোর মেহেরারুকা!

—আরে শালা! তোর বউকে আমি চিঠি লিখব কেন ?

—হামরো নাম দিহু।

—প্রেমপত্র ?

—হাঁ মুহাৰুকা চিঠি।

—ঠিক আছে। দেবো লিখে। খামটাম দিও।

ছোকরাটি পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে বলল—ইয়ে লেও। অনন্ত পয়সা ফেরত দিতেই ও হাঁ হাঁ করে উঠল নহি নহি। দু'পয়সা তোর লিয়ে।

—আরে বোকা! তুই আমার দোস্ত। তোর কাছে পয়সা নেবো কিরে ?

—ঠিক বা। সরদারকে পাশ তোর পইসা মিল গইল ?

—কিসের পয়সা ?

—ফরম পুরা করনেকা।

—তার জন্ম পয়সা পাওয়া যায় নাকি ?

—হাঁ! তু তো আচ্ছা বুডবক।

—হাঁরে ভাই। আমি বুডবকই বটে। তবে এইরকম বুডবকই যেন থাকি। তোদের যখন দরকার আমাকে বলবি—চিঠি লেখা বা মনিঅর্ডার ফর্ম লেখার কাজ বিনা পয়সায় করে দেবো।

—আজীব বাৎ !

ছোকরাটির নাম রামধনি। প্রায় একবছর কাজ করছে। গত বছর দ্বিরাগমনে বউকে ঘরে এনেছে। মাত্র দশটা দিন বউয়ের সঙ্গে শুয়েছে। সেই স্বভিটা বুক দগ্ দগ্ করছে। যতদিন যাচ্ছে ততো চাগিয়ে উঠছে। ছুটির জন্ম মাথা ঠুকছে। কিন্তু কিছুতেই পাচ্ছে না। হাতে টাকাও নেই যে পালিয়ে যাবে। সরদার ওকে চার আনা পয়সা দেয় এক সপ্তাহের হাত খরচ বাবদ। বাদবাকী টাকা ওর বাপকে মনিঅর্ডার করে পাঠায়। সেও সামান্য। সুদ সহ দেনার কিস্তি মেটাতেই চলে যায়। সরদারের কাছে টাকা ধার নিয়ে দ্বিরাগমনে বউ এনেছে। টাকা শোধ না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই, সেই কড়ারে পরদেশে কাজ করতে এসেছে।

অনন্ত হিন্দী ভাষাটা সামান্যই জানত। সংস্কৃত পড়েছিল বলে দেবনাগরী

হয়ফটা লিখতে জানত ; সেইটুকু বিত্তে সঞ্চল করে—প্রিয়তমা সোধোন করে দিল একখানা প্রেমপত্র লিখে। তাতে কিছু খাদের ভয়ভাবনা শ্রম ও স্বৈদের কথা, কিছু যৌন রহস্য রোমাঞ্চ-কামনা-বাসনা, টাকা শোধ হয়ে গেলে দেশে ফিরে মিলন মাঙ্গল্যের স্বপ্ন সোহাগ ইত্যাদি নিয়ে পাতা তিনেক চিঠি। লেখা শেষ করে পড়তে পড়তে অনন্তর নিজেরই মনে হচ্ছিল কোন পরদেশে নোলক পরা একটি কিশোরী নীল রঙের শাড়িতে মুখ ঢেকে তারই প্রতীক্ষায় বসে আছে। টসটসে লাবণ্য ভরা মুখে অপার কৌতুক।

খাদের ভিতর মুণ্ডাবতির আলোতে চিঠিটি পড়ে রামধনিকে শোনা। শুনতে শুনতে ও অভিভূত রোমাঞ্চিত। জড়িয়ে ধরে বলল—বাবু! তু ক্যা লিখ দিয়া। ঈ তো মোর দিলকী বাং!

অনন্ত ভাবল যে বিরহী নায়কটি তার পাশে বসে আছে—নিবিড় অন্ধকারে বৃকের ভিতর জ্বালিয়ে রেখেছে অনিবাণ দীপশিখা তার হয়ে চিঠিটা যাকে লিখল—সে পড়তে জানে তো?

কথাটা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও থেমে গেল। যদি না জানে তাহলে সেই ভুলটা ভেঙে দেবার বেদনাটা না জানি কত মর্মান্তিক হয়ে উঠবে?

সরদারী প্রথার শাসন ও শোষণের নির্মম চিত্রটি সেই ওর কাছে প্রথম তুলে ধরেছিল। এক একজন সরদার দেশ গাঁ থেকে লোক এনে কলিয়ারীতে ভর্তি করে। মাতুষের বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, উৎসব-সামাজিকতা থাকেই। তারই সুযোগ নিয়ে সে পয়সাকড়ি ধার-দেনা দেয়। কড়ার একটাই কলিয়ারীতে খাটতে যাবে। স্বদ-আসলের টাকা শোধ হলেই চলে আসবে। পরে ইচ্ছা হলে আবার যাবে।

প্রক্রিয়াটি আপাত মরল। কিন্তু ভিতরে জিলিপির প্যাচ। স্বদে আসলে টাকা শোধ তো জীবনে কখনো হবার নয়। সরদাররা সে হিসেব শেখেনি। তারপর সে কোম্পানির খয়ের খাঁ। কিছু তাঁদড়ামি করলেই ভাণ্ডা পেটাই। কমিশন হুঁতরফা। কোম্পানি তো পার টন রেজিংয়ে এক আনা দেয়ই। লেবারের কাছেও নেয়। খাবার দাবার রেশন তার উপরেও এক কাট। এই-ভাবে ছাঁটতে ছাঁটতে শ্রমিকের পাওনা কানাকড়ি।

অনন্ত সব জেনে গিয়েছিল। শোষণের প্রক্রিয়াটি এমন চিকন পিছল যে কার সাধ্যি ধরে? এই নিয়ে ও সুমিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছিল। উনি বলেছিলেন—আরো তথ্য সংগ্রহ কর। হাটে হাঁড়ি ভাঙতে হবে।

এই সময় রামধনি ওকে বলল—বাবু মোর হিসাব তেনি কর দিহ।

এতোয়ারী যখন শুনল—রামধনির হিসেব করতে হবে তখন ভীষণ রেগে গেল। তারপর গাঁই ওই করতে করতে একদিন অনন্তের কাছে বসতেই হলো।

সুদ, তন্তু সুদ, রেশনের দাম, দোকানের ধার ইত্যাদি কতরকম ফিরিস্তি করার পরও দেখা গেল রামধনির প্রায় চল্লিশ টাকা পাওনা হচ্ছে।

বদল—টাকাটা দিয়ে ওকে ছুটি দাও।

—বাবু ছুটি তো ডি. ডি. সাহেবের সহি না হলে হবে না।

—ঠিক আছে। আমি ছুটি করিয়ে দেবো। তুমি টাকা পেমেন্ট দাও।

ডি. ডি. সাহেবের কাছে রামধনির ছুটির দরখাস্ত ও সহি করিয়ে দিলো। চাপে পড়ে এতোয়ারীও টাকা দিতে বাধ্য হলো।

রামধনির চোখেমুখে সে কি আনন্দ! অনন্তর হাত ধরে ভালোবাসা জানাতে গিয়ে কেঁদেই ফেলল।

অনন্ত ভাবল—যাক। একটা বিরহীর মনে তো কিছু আনন্দ দিতে পারলাম। লোডারদের সঙ্গে কাজ করে এইটাই নীট লাভ।

কিন্তু অনন্ত বুঝতে পারেনি তার ভাগ্যচক্রের গতি কেমন ধীরে ধীরে দিক পরিবর্তন করছে। অমন কত রামধনি তার কাছে এসে কত অভিযোগ করছে। সাধ্যমতো সেও চেষ্টা করছে যতটুকু সম্ভব স্মার করার। শ্রমিক শোষণের যন্ত্রণা তার বুকেও বাজছে।

দশ

সরস্বতী পুজোর আর তিনটে দিন বাকী। স্মিতবাবু পুজো কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। আর অনন্ত সাংস্কৃতিক অস্থানের সেক্রেটারী। কিন্তু কার্যত স্ববীর ও অনন্তই সব। কারণ স্মিতবাবুর নামটুকু ব্যবহার করা ছাড়া আর বিশেষ কোনো কাজকর্ম তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তিনি ইউনিয়ন নিয়ে আশ্চর্য্য জড়িয়ে পড়েছেন। কাজেই তাঁর বকলমে কাজ করতে হয় অনন্তকেই। অবশ্য স্ববীর আছে ওর বন্ধু, উপদেষ্টা এবং কাজের দোশর।

ফোর্থ ইয়ারের ট্রেনিদেরকে টেকা দিয়ে এই যে ওরা হুই বন্ধুতে যাবতীয় প্রান, প্রোগ্রাম ও আয়োজনের ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেজন্য প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার একটা স্রোত বয়েই যাচ্ছে। সেসবকে ওরা তোয়াক্কা করে না। হুঁজনেই সমান বেপরোয়া। কলিয়ারীর সাহেব, বাবু ও শ্রমিকদের মধ্যে ওদের একটা স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে। বিশেষ করে এবারকার প্রোগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু অংশকে সামিল করার জন্ত ওদের নামটা খুব পরিচিত হয়ে উঠেছে। শ্রমিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন ব্যাপারটাকে ভালো চোখে দেখছে। তাছাড়া অনন্ত তো ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িয়েই পড়েছে। খুব গোপনে ও এখন স্মিতবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারী।

সেদিন সন্ধ্যায় মেসের বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বসে পড়েছে সব অস্থানস্থচী ফাইনাল করার জন্ত। এসেওছে অনেক। ভাহু ও বুমুদলের আধিকারী, শঙ্কু

বাউরী, শবনী, বেলাদাসী। ভাংড়ার জন্ত গুরুনাম ও তার জনাকয়েক পাঞ্জাবী বন্ধু। স্থলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রঞ্জন, রবীন, আলোক, স্বধন, কল্যাণী, ভারতী, শুচি, ও প্রেমা কাউর এবং গৈরী। তাদের নেত্রী স্বপ্না। মেসের গায়ক শিল্পী রজত তো আছেই। ফোর্থ ইয়ারের অসীম ও সাধন পাল। স্মিতবাবু এলেন একটু দেরি করেই।

তারপর—

অল্পষ্টানের দিন হৈ হৈ ব্যাপার। লোক আসছে পিল পিল করে। সবাই অবাক। এটা কি হলো? অগ্নাগ্র বছর এক দেড়শো হলে ওরা মনে করত কি দারুণ সাফল্য! কিন্তু একি ব্যাপার?

কিছু চেয়ার, বেঞ্চি, তক্তা ব্যবস্থা করেছিল! তাতে সাহেব, মেমসাহেব ও স্টাফদের ফ্যামিলি বসবার জায়গা করল বটে কিন্তু অনেকেই বসতে পেল না। ওদিকে মেস কম্পাউণ্ডের একশো ফুট বাই একশো ফুট জায়গাতে তিল ধারণের স্থান নেই।

হিমসিম খেতে খেতে স্বেচ্ছাসেবকরা এসে বলল—স্মিতদা! একি হলো? আমরা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। এত লোক কোথা থেকে এল? কোথায় বসতে দেবো।

স্মিতবাবু হাসতে হাসতে বললেন—তোদেরকে ব্যস্ত হতে হবে না। ওরা মাটিতেই বসে পড়বে।

তাই হলো। দর্শকদের কোনো বিক্ষোভ নেই। ওরা খোলা আকাশের নীচে মাটিতেই বসে পড়ল। কম্পাউণ্ড ওয়ালের উপরে বসে পড়ল যত ছেলেছোকরা।

অনন্ত স্মিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—দাদা! আমিও তো অবাক! এত লোক কোথা থেকে এল?

—ওরে এরা তোর অল্পষ্টান দেখতে আসার দর্শক নয়। সব আপন আপন দলের পৃষ্ঠপোষক। দেখতে পাচ্ছিস না—লুনিয়া ধাওড়া উজ্জার করে যত মেয়ে পুরুষ এসেছে ওদের নিজের মেয়ে নাচবে বলে। জস্মনিয়া বাউরী পাড়ার লোকরাও সেই জন্ত এসেছে। পাঞ্জাবীরা এসেছে তাদের অল্পষ্টান দেখতে। এটা টোটা্যাল ইনভলভমেন্টের ফল। সবাই নিজের নিজের শিল্পীদেরকে উৎসাহ দিতে এসেছে। কমমোপলিটান সমাজের কমমোপলিটান প্রোগ্রাম কিনা! যা তুই, গ্রীনরুমে যা। শুরু করতে দেরি করিস না।

অনন্ত ওর নিজের ঘরটাই ছেড়ে দিয়েছিল গ্রীনরুম করতে। শিল্পী সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্ত স্ববীরের ঘরটাও নিতে হয়েছে। অনন্তর ঘরে ভাদু, বুনুর আর রাম সীতার পার্টি। সেখানে ঢুকতেই মধুগন্ধে নাকটা কুঁচকে গেল। বাউরী মেয়েগুলো খোঁপা বাঁধছে, ড্রেস করছে। মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৈরীর বাপ গুলু ও শম্ভু এক কোণায় বসে গাঁজা টানছে। গৈরী ও তার বান্ধবী ফাস্তনী গদ গদ ভাবে লুটিয়ে পড়ছে। গৈরীর গায়ে রূপোর গয়না। মাথায় ফুল দিয়ে বাঁধা খোঁপা। শাড়ির আঁচল লুটিয়ে পড়ছে। চোখ দুটি ঘোলাটে।

অনন্তকে দেখে চপল ভঙ্গিতে বলল—দেখে নিন অনন্তদা, আমরা হুঁজন, আমার বাপুজী, মামু আর গোবিন চাচা। দেখবেন কেমন নাচ নাচি।

অনন্ত অবাক। এ কোন গৈরী? এ যে বেহেড মাতোয়ালী। কথা না বলে বাইরে এল। স্মৃতিতবাবুকে গিয়ে বলল—দাদা! আজ বোধহয় বেইজ্ঞতের সীমা থাকবে না। মেয়ে পুরুষ সব মদে চুর হয়ে এসেছে। এরা আসরে গিয়ে কি করবে দাদা?

স্মৃতিতবাবু গুর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—ভাবিসনে। ওরা মদ না খেলে আসরে দাঁড়াতেই পারবে না। যা তুই প্রোগ্রাম শুরু করিয়ে দে।

স্বপ্নাদের 'কাটি ধান' প্রোগ্রামের শিল্পীরা তৈরি হয়েই ছিল। স্বপ্নাও নাচের পোশাকে তৈরি। রজতও তৈরি। আসরে হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা, বাঁশি, বেহালা, মন্দিরা ইত্যাদি এসে গেছে।

সুবীর ঘোষণা করল—আমরা অগ্রদূত মেসের পক্ষ থেকে দর্শকদেরকে স্বাগত জানিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি। প্রথমই একটা ক্লাসিক ড্যান্স করছেন স্বপ্নাদেবী।

অনুষ্ঠান চলছে। অনন্তর মন পড়ে আছে বেহেড মাতোয়ালীদের দিকেই। কি যে করবে ওরা? স্মৃতিতবাবুর অতটা ভরসা রাখবার যে কি কারণ তা ওর মাথায় ঢুকছে না।

আবার ওদের গ্রীনরুমে ঢুকল। ততক্ষণে ঝুমুর দলের সাজগোজ হয়ে গেছে। এক জায়গায় গায়ে গা দিয়ে বসে আরামসে বিড়ি ফুঁকছে। ঘরটা ভরে গেছে কড়া নিকোটিন ও মহয়ার মধুগন্ধে। অনন্তর এসব অভ্যাস নেই। নাকটা বিদ্রোহ করে উঠছে।

গৈরীর দিকে তাকাল। বোধহয় কোনো চুষক বসানো আছে ওর মুখে যা অনন্তর চোখ দুটোকে অবলীলায় টেনে আনে।

ফাগুনী গৈরীর চেয়ে বয়সে বছর খানেকের বড়ই হবে। রঙটা উজ্জ্বল শ্রামল। প্রায় পরিণত যুবতী। বুক পাছার ভোল এসে গেছে। বিয়ে তো হয়েইছে স্বামী সোহাগের আশ্বাদনও পেয়ে গেছে। সেজন্য ওর মধ্যে তেমন অহেতুকি চাপল্য নেই। খুব যত্ন করে গৈরীর কপালে ফোঁটা দিচ্ছে। অনন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। ফোঁটা দেওয়া শেষ হবার পর ওকে বেশ বিয়ের কনের মতো দেখাচ্ছিল।

অনন্ত বলল—বাঃ বেশ হয়েছে। এটা কি সাজলি রে গৈরী?

গৈরী বলল—সীতা !

স্বভাব দোষে অনন্ত রসিকতা করে বলল—তাহলে রাম মাজবে কে ?

ভাবালু চোখ নাচিয়ে গৈরী বলল—তুমি মাজবে ।

অনন্তর নাভিমূল ছাৎ করে উঠল । বাউরী মেয়েগুলো হি হি করে হাসলে তখন । শব্দু থিক্ থিক্ করছে । ফাগুনী কেমন একটা ভঙ্গি করে অনন্তর দিকে ছুঁড়ে মারল দৃষ্টিবাণ । গৈরীর চোখে উজ্জ্বল প্রত্যাশা ।

অনন্ত ভাবল—না । এদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না ।

সেখান থেকে বেরিয়ে গেল ।

স্বপ্নার নাচ, রজতের গান, 'কাটি ধান' হবার পর সূবীর ঘোষণা করল—
এবার শুরু হচ্ছে আমাদের বিশেষ নিবেদন—গুরুনাম সিং ও সম্প্রদায়ের ভাঙা
নাচ ।

আঃ বোলে বোলে বোলে !

সরদারজীরা ঘোষণা শুনেই উল্লাসধ্বনি করে উঠল । নাচ জমে গেল ঝম্ ঝম্ করে । দর্শকরা হাততালি দিয়ে দিয়ে উৎসাহ দিতে লাগল ।

মুখচোরা গুরুনাম গান ধরেছে—

ক্যা ম্যায় বুট বোলিয়...

জহর গোলিয়...

কোই না...

বোলে—বোলে—বোলে—

প্রেমা চোখ ভাগর করে সেদিকে তাকিয়েছিল । অনন্ত ওর পিঠে হাত দিয়ে বলল—কিরে প্রেমা ? গুরুনামকে কেমন দেখছিস ?

—উঃ । অনন্তদা—তোমার পেটে এত বুদ্ধি !

—কেন ? জখম হয়ে গেলি নাকি ?

—যাও ! আমার সঙ্গে কথা বোল না ।

অনন্ত হাসল । ওর পিঠে কয়েকটা আদরের থাপ্পড় দিয়ে চলে গেল ।

এগারো

ত্রৈতাযুগের রামসীতা বিংশ শতাব্দীর দর্শকদেরকে কতটুকু আকৃষ্ট করতে পারবে এ বিষয়ে কার না সংশয় ছিল । তার পরে এইসব বেহেড মাতাল আমরা দাঁড়িয়ে হাবা বলতে বাবা বলবে নাকি সেই ভয়ে অনন্ত কাঁটা হয়ে ছিল । একবার ভেবেছিল সেজেগুজে গ্রীনরুমে বসে থাক, ওদের প্রোগ্রাম বাতিল করে দেবে । কিন্তু বড় সাধ করে এসেছে । তাও একা নয় ধাওড়া উজাড় করা দর্শক নিয়ে । তবু ও দ্বিধা ছন্দেই রয়ে গেল । -

সূবীর ঘোষণা করে দিল ওদের প্রোগ্রাম ।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! গুলু আসরে দাঁড়িয়ে ঢোলকে বোল তুলতেই অনন্তর সব ধারণা ওলট-পালট হয়ে গেল। সীতা ও তার সহেলীর সঙ্গে গৈরী এবং ফাগুনী আসরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছাড়া কি করতে পারে ? ফুটফুটে হৃন্দর একটি মুখ দেখে দর্শকদের কিছুটা স্থথাহুভূতি।

গোবিন যখন গান ধরল তখন সব অবাক। এমন কিছু মিউজিক নেই। গুলুর ঢোল, শঙ্খুর বাঁশি, চরিতরের মন্দিরা। গোবিন গেয়ে যাচ্ছে তুলসীদাসজীর দৌহা।

অনন্ত একটা বেঞ্চির উপর বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

স্থমিতবাবু বললেন—কি রে অনন্ত তাঙ্কব বনে গেলি ?

—হ্যাঁ দাদা ! এ তো দেখছি যাছ করে দিয়েছে।

—আরে তুই জানিস না, গোবিন ওদের গানের মাস্টার। তুলসীদাসজীর রামায়ণ পুরোটা গান করে শুনিয়ে দিতে পারে। অথচ মাথায় ঝোড়া বয়ে ওয়াগন লোড করে। এসব ভাবা যায় না রে।

তখন রাত দুটো। ঝুমুর চলছে ঝম্ ঝম্ করে। আসর গম্ গম্ করছে। সাহেব স্থবোধের হুঁচারজন এবং কিছু বর্ষীয়ান বাবু ও তাঁদের ঘরণী ছাড়া বাকী সব জমে গেছে চিটা গুড়ে মাছির মতো।

এখানেও গুলু বাজনদার। শঙ্খু বাঁশিওলা। গোবিনও আছে গায়ক গায়িকাদের সঙ্গে। ভাবপ্রীতার ঝুমুর হচ্ছে—

উজর কাজর আঁথি পানে রাঙল ঠৌর গে।

দাঁড়োয়া পর গিরে লম্বা কেশ।

ঠিক যেন প্রাণের ভিতরে ঠমক দিচ্ছে তেমনি স্থর, তেমনি তাল।

অনন্তর চোখ ঘুরছে সব দিকে। ঢোলকের তালে তালে দর্শক ঘুমে ঢুলছে এমন দৃশ্যও চোখে পড়ল। এক জায়গায় এসে ওর দৃষ্টিটা আটকে গেল। বাউণ্ডারী দেওয়ালের কাছে একটা বেঞ্চের একপাশে বসে আছে প্রেমা। তার পাশেই গুরুনাম সিং। শুধু তাই নয় প্রেমা ঘুমে ঢুলে পড়ছে গুরুনাম পরম যত্নে ওর টাল সামলাচ্ছে।

বড় ভালো লাগল ওর। এই কয়েকদিনের মধ্যে ওরা কত কাছাকাছি এসে গেছে। এবার ওদের বাপদেরকে অনায়াসে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। মনে মনে হাসল। একটা সিগারেট ধরাল।

স্থবীর ও কমলেন্দু কাছাকাছি কোথাও ছিল। ওরা ওর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে নিয়ে ধরাল। শীতটা জাঁকিয়ে উঠেছে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে স্থবীর বলল—তাহলে প্রোগ্রাম সাকসেসফুল ?

—হ্যাঁ ! এত পরিশ্রম সার্থক হলো। বাব্বাঃ সন্ধ্যাকালে যখন মদের গন্ধে গ্রীনরুম ভরে গেল তখন আমার হয়ে গেছল।

—মাইরি! আমারও।

তিন বন্ধুতে পরম তৃপ্তিতে সিগারেট টানতে টানতে ঝুম্ গানের স্বর এনজয় করছিল। অনন্ত বলল—কিন্তু আর কতক্ষণ চলবে?

—চলুক না হোল নাইট।

—বাপরে! তোরা বোস আমি গ্রীনরুমটা দেখে আসি।

—ওখানে আর কি আছে?

—জিনিসপত্র তো আছে। শ্রালা চোর ছ্যাচ্ছোড়ের অভাব নেই।

—যা তবে।

অনন্ত গ্রীনরুমে ঢুকেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চারিদিকে কাপড়-চোপড়, সাজের দ্রব্য, রং তুলি, বাক্সো ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। আর তার মাঝে গৈরী শুয়ে আছে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে। শরীরটা ভেঙেচুরে এদিক ওদিক। খোঁপা খুলে চুলের রাশি এলিয়ে। বৃকের একটা দিকে গুচ্ছেক কাপড় জমে আছে। আরেকটা দিক শুধু ব্লাউজ ঢাকা। যোবনের কলি ফুটেছে। মুখটা ঝকঝক করছে। কপালে কানে চন্দনের ফোঁটা লেপে পুঁছে গেছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নাকের পাটা ছলছে, নোলক ছলছে এবং মুরগির ডিমের মতো বৃকের কুসুম স্পন্দিত হচ্ছে।

আর ভীষণ জোরালোভাবে চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিচ্ছে একটি অনাবৃত পা। শায়া শাড়ি উঠে গেছে হাঁটুর উপর পর্যন্ত। চিকণ উরুর প্রান্তদেশ। আঃ। ভয়ঙ্কর সুন্দর।

বেশ কিছুক্ষণ আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গৈরী ঘুমে ছাতা। সে ওর অস্তিত্বই টের পায়নি।

একটু পর অনন্তর চোখ থেকে পরম বিশ্বয়ের ধাঁধা কেটে গেল। বিবেকটা জেগে উঠে ওকে শাসাল—ছিঃ ছিঃ অনন্ত! পরের বউয়ের কলি ফোঁটা যোবন দেখে তুমি জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছ।

ভাবল বেরিয়ে যাবে। কিন্তু না। পা দুটো কিসে যেন আটকে গেছে। ও আশ্বে করে গৈরীর কাছে এল। খুব যত্ন করে শায়া শাড়ির প্রান্তটা টেনে পা-টা ঢাকা দিয়ে দিলো। তবু গৈরীর ঘুম ভাঙল না। কেমন একটু গৌঁ গৌঁ শব্দ করে পাশ ফিরে গুল। মুখ থেকে লাল ঝরে পড়ল। অনন্ত ওর গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকল—গৈরী! এই গৈরী!

—উঁ!

—ওঠ।

—কেন উঠবো?

—ওঠ বলছি। বেশ কক্ষণেরে বলল ও।

গৈরী কষ্ট করে চোখের পাতা খুলবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না।

অনন্ত ওকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলল—এত ঘুম किसের তোর ? ওঠ বলছি—ওঠ ।

গৈরী চোখ মেলে বিড় বিড় করে কি বলল । তারপর আবার লুটিয়ে পড়ল । মাথাটা মেঝের উপর টকাস করে ঠোকা খেল ।

অনন্ত বলল—ওঃ । কোনো শোর ঘোর নেই ।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এল । ওর চোখে মুখে ছিটা দিয়ে বলল—গৈরী ! এত বেহুঁশ হয়ে ঘুমোাস না । ওঠ ।

—অনন্ত দা !

—হ্যাঁ !

জলের ছিটা পেয়ে চোখের ভারটা কেটে গেছে । ওর দিকে জুল জুল করে তাকিয়ে বলল—আমার যে ভীষণ ঘুম পাচ্ছে ।

—ঘরে গিয়ে ঘুমাবি ।

—বাপুজী কোথায় ?

—বাজনা বাজাচ্ছে ।

—উঃ বাব্বাঃ । একটা মোচড় খেয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল ।

অনন্ত ওকে ধরে বলল—দাঁড়াতে পারবি ?

—হ্যাঁ । আমি বাইরে যাবো ।

—আয় । আমার হাতে ভর দিয়ে দাঁড়া । তোকে নিয়ে যাচ্ছি ।

—ছিঃ । তুমি আমাকে নিয়ে যাবে কী ? লজ্জা করে না বুঝি !

চলতে গিয়ে টাল খেয়ে গেল । অনন্ত ওকে ধরে না ফেললে পড়ে যেত । গৈরী এবারে নিজেই ওর হাতটা শক্ত করে ধরল । ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় কয়েক পা চলার পর পা দুটো একটু শক্ত হলো ।

অনন্ত বুঝতে পেরেছিল ও কোথায় যেতে চায় । তাই বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে লাগিয়ে দিলো ।

বেশ দেরিতে গৈরী বেরুল । মাথার খোঁপাটা পুরো খুলে দিয়েছে । নানারকমের খোঁপার কাঁটাগুলো ওর হাতে । মাথায় জল নিয়েছে । হাত পা ধুয়েছে । আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে স্বচ্ছন্দভাবেই বারান্দার উপর চলছে । অনন্তর কাছে এসে মুখটা নামাল ।

মনে হচ্ছে কিডনী খালি হয়ে যাওয়ার পর চোখে মুখে মাথায় জল নেওয়ার দরুন নেশাটা ছুটে গেছে । খোয়ারি ভাঙার অবসাদে শরীর ক্রান্ত ।

অনন্ত বলল—হ্যাঁরে গৈরী ! এমন করে কি মদ খেতে আছে ? নাকি এমনি একা একা বেহুঁশ হয়ে ঘুমোতে আছে ? যদি কোনো বাজে লোকের নজরে পড়তিস তবে তো সে তোর ক্ষতি করে দ্বিভিত্তে পারত ।

দরজা ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে তাকাল গভীর কালো চোখ দুটি তখন ছলছল করছে। ঠোঁট দুটোও কাঁপছে। কি একটা বলতে গিয়ে পারল না। ঢোঁক গিলে আবার মুখ নীচু করল।

অনন্ত বলল—এবার চলতে পারবি তো ?

—হ্যাঁ।

—তবে যা। এই দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে চলে যা। ওখানেই তোদের লোকজন আছে। তাদের কাছে বোস গে।

—হ্যাঁ! কিন্তু—

—কিন্তু কি রে ?

—আমি কি করে তোমার কাছে মুখ দেখাব ?

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অনন্ত বলল—আর কাঁদিস নে গৈরী। এই ভাঙা রাতে অনেক নাটক হয়ে গেছে। কেউ দেখতে পেলে নিন্দে বদনামের শেষ থাকত না। যা—

গৈরী চলে গেল। অনন্ত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ় হয়ে।

বারো

ব্যাস। পরব ফুরিয়ে গেল। তিন দিন ছুটি নিয়েছিল পুজো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জ্ঞ। তাও শেষ। এবার চল মন খাদে খাটতে। রাত বারোটায় পালি। কমলেন্দু বাড়ি গেছে। এখনো ওর হোম সিকনেস কাটেনি। একদিনের জ্ঞ বাড়ি না গেলে মনটা বড় উসখুস করে। কে জানে সেখানে তার জ্ঞ কোনো নরম কোমল কুমারীর হৃদয় প্রতীক্ষা করে আছে কিনা ? বড্ড চাপা ছেলে। যাক একদিন ঘুরে আসুক। কাল সকালেই তো এসে যাবে।

এখনো ওরা একই পালিতে কাজ করে। এতোয়ারী সরদারের দলের সঙ্গে অনন্ত যে গাড়ি ভর্তি করে তা হুঁজনের নামেই লেখা হয়। এইভাবেই সে বন্ধুত্ব করে। শরীরের ঘাম ও অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে।

কমলেন্দু বড় অপরাধবোধ করে। অনন্ত ওকে দাবড়ে চূপ করিয়ে দেয়। সুবীর বলে তোর কিসের অত সঙ্কোচ রে। ডি. ডি. সাহেবের পায়ে তেল লাগানোর চেয়ে তো এটা ভালো ব্যবস্থা। এই ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হলে তুই একটা জম্পস ফিফট দিবি।

—ইয়া!

অনন্ত খুব খুশি।

সেদিন রাতে বাতিঘরেই এতোয়ারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। মুখে খৈনী নিয়ে বলল—বাবুজী! আপনি কেনো এতো ভুলিফ কোরছেন ? আপনাকে গাড়ি ভরতে হবে না। আমার লোকজনের দেখভাল করিয়ে দেন। মনশীবাবু, মাইনিং

বুককে বলিয়ে দেন আমার দলকে খোড়া জলদি জলদি গাড়ি আউর কোয়লা মাগাড় করিয়ে দিবে।

অনন্ত বলল—আচ্ছা, আচ্ছা! সে ব্যবস্থা আমি করব।

কিন্তু কে জানতো সেই রাত্রেই তাকে গ্যাস পয়জনে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে র্তি হতে হবে। এক রাত্রেই হিরো বনে যাবে। কত লোক তাকে দেখতে এল। কত উদ্বেগ, কত ব্যাকুলতা।

মা এলেন। মাথায় হাত রাখলেন। কি স্বস্তি! বিষাক্ত গ্যাস বাতাসে ঝে গেল। তারপর এল গৈরী। তার সারা মনে ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে ছিল। কেন ওকে এত ভালো লাগে? কেন ওর চোখের তারা দুটি এখনো তার মনে ঝিলিক দিচ্ছে? কেন বাজছে হিপীড় দিপীড় মাদল? বুক পাছা তো তৈরি হয়ে গেছে। বিয়লা পুরুষের সঙ্গে শবুর বাড়ি চলে যা। আমার বুক চাবুক মারছিস কেন? আমি তোর কে যে অত দরদ দেখাতে এসেছিলি। এঃ। হ্যাগ কত!

কিন্তু ওর মুখটি বড় মিষ্টি। প্রতিমার মতো গড়ন। ধ্রুপদী সৌন্দর্য! নাকি যুগ সৌন্দর্য? শিশির ভেজা নকল কিশলয়ে ছলকে পড়া রোদের মতো অপার নাবণ্য তার সর্বাঙ্গে। সেই ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে গেছে ও।

ভোরের আলো ঠিকরে পড়ছে জানালার কাঁচে। এক কাপ চা হাতে নিয়ে বিউটি ওর মাথার চুলগুলো খামচে ধরে টেনে ওঠাল।

মিষ্টি হেসে বলল—ভোরবেলায় কি স্বপ্ন দেখছিলে ভাইটি?

অনন্ত ধড়ফড় করে উঠে বলল—ও দিদি! এত বেলা হয়ে গেছে!

—হ্যাঁ। চা খাও।

এরই মধ্যে স্নান সারা হয়ে গেছে ওর। মুখটি বড়ই প্রসন্ন ও পবিত্র দেখাচ্ছিল। গিয়ে চুমুক দিয়ে ভাবল—কেন লোকে ওর নামে এত কুৎসা রটনা করে?

বলল—দিদি! আমাদের জন্ম আপনার কত কষ্ট হচ্ছে।

—এটা সাহেব সুরবোদের ডায়লগ। যারা স্তাবকতা করে। তুমি দরদ দেখাতে এসো না। আমি তোমার দিদি এবং তোমার জন্ম কোনো কষ্টই আমাকে পীড়া দিতে পারবে না।

অনন্ত মুগ্ধ বিশ্বয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল—গত জন্মে সত্যিই তুমি আমার দিদি ছিলে।

—গত জন্মে নয় এ জন্মেই। তুমি ছোট ছিলে তাই আমাকে মনে করতে পারছ না। তোমার মা, পিসীমা দু'জনেই আমাকে চেনেন। তোমার বাবা যখন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ করছিলেন তখন আমি তাঁর কাছে হাতে-খড়ি নিয়েছিলাম। তিনি আমার শিক্ষাগুরু।

—তুমি কি শোভাদি?

—হ্যাঁ অনন্ত ।

—এখানে কি করে এলে ?

—সে অনেক কথা । তুমি ছোট ভাই । তোমার কাছে বলতে পারব না ।

এঁটো কাপ-ডিশটা হাতে নিয়ে চলে গেল ।

আর একটা দিন । তারপরই ওরা ছুটি পেয়ে গেল । সম্মুখে বিস্তৃত কর্মভূমি । বিরাট মানব-জমিন অনাবাদী পড়ে আছে । রামপ্রসাদ কৃষিকাজ করতে বলেছেন । সে চাষ-আবাদ অধ্যাত্ম জগতের কথা । অনন্তের চাষ-আবাদ তাদেরকে সচেতন করে তোলা । অজ্ঞান ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসা । সেই প্রচেষ্টাতে কেটে গেল আরো একটি বছর । ওরা ফোর্থ ইয়ারে উঠল ।

গৈরীর বাপ গুলু লুনিয়া ছেদিলালের জামাই । ওর মা ডিপোর হাজিরা কামিন । দু'জনের জোড়া লেগেছিল সেই বিশের দশকে । তখন হেনীর বয়স তিন বছর । গুলুর আট বছর । গৈরী ওদের প্রথম সন্তান । তারপরের দুটি ছেলে স্বরেশপ্রসাদ ও মহেশপ্রসাদ । আবার দুটি মেয়ে চম্পা ও চামেলী ।

প্রথম যৌবনে হেনীও সুন্দরী ছিল । কয়লা ডিপোর কয়লা কালি, রোদ জল ও শীতে এখন গায়ের রঙ ঝামা । খসখসে চামড়া, মুখে মেচেতা, হাতে পায়ে হাজাফটা । মেজাজ তিরিকি । সন্ধ্যে হলেই মদে মাতাল ।

ওর দুই ভাই চরিতর ও কিষণ এখন দেড়শো কুলি-কামিনের সরদার । পালে পালে ছানাপোনা । কে অত গুণেগাঁথে । চরিতরের বড় ছেলে দুটি লায়ক হয়েছে । বিয়ে তো বাল্যকালেই হয়েছে । বোঁদের ঘর বসত হয়েছে । বড় ছেলে জগদীশের বউয়ের নাম বৈশাখী । ঢলঢলে লম্বা । উজ্জল শ্রামল গায়ের রঙ । মোটা ঠোঁট । মাথায় একরাশ কালো চুল । চোখদুটি পটল চেরা । একটি ছেলে হয়েছে । গা ভর্তি গয়না । এতবড় সরদারের বড় বউ বলে দেমাক আছে ।

মেজো ছেলে হরেরামের বউয়ের নাম কুস্তী । নিকষ কালো গায়ের রঙ । গড়নটি মা কালীর মতো । মুখের ছাঁদটি যেন ছাঁচে ঢালা । এখনো ছেলেপুলে হয়নি । বয়সটা গৈরীর সমানই ।

কিষণের বড়ছেলের নাম রামজী লাল । বিয়ে হয়েছে । বোঁয়ের দ্বিরাগমন হয়নি । এ বছর হবে ।

গৈরীরও দ্বিরাগমন হবে এ বছর । ওর শ্বশুরের সঙ্গে গুলুর এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে । কিন্তু উভয়পক্ষেরই টাকাকড়ির টানাটানির জ্ঞান দিন স্থির হয়নি । চেষ্টা চলছে বোশেখ মাসের এক শুভদিনে সে কন্যা বিদায় করবে ।

এই বিয়ে এবং দ্বিরাগমন নিয়ে ওদের সমাজে বিরাট উৎসাহ-উদ্দীপনা । লেনাদেনা, ভোজ নিয়ে খরচ-খরচাও প্রচুর । তিন-চারদিন ধরে কুটুম-বাটুম, মদ-মাংস, নাচ-গানের লাগাতার মাইফেল ।

আর কলিয়ারীর মধ্যে ছেদিলালের গোষ্ঠীই সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীন।

সেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যখন কয়লাকুঠিতে দারুণ শ্রমিকের অভাব তখন সে এসেছিল ব্যারাকলউ সাহেবের পানমোহরা কলিয়ারীতে। আরো দশজন কুলির মতো সেও একটা কুলি।

তার চোখের সামনেই ঘটেছিল দেউলটির বিফোরণ। সে কি আতঙ্কের দিন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ছাঁটাই আর ছাঁটাই। সেই হিড়িকেও সে টিকে গিয়েছিল। মন্দার বাজারেও হেজে যায়নি।

ক্রমে ক্রমে নিজের আত্মীয় পরিজন নিয়ে যেমন গোষ্ঠী বাড়ছিল তেমনি ছানাপোনাও পয়দা হচ্ছিল। বিশেষ দশকের শেষদিকে একবার ঠাই বদল। পানমোহরা কোল কোম্পানি ছেড়ে শেরগড় কোল কোম্পানিতে এসে পঞ্চাশজন কুলিকামিনের গুয়াগন লোডিংয়ের সরদার।

ছেলেদের আমলে সেই পঞ্চাশজন বেড়ে হয়েছে দেড়শো জন।

গুলুরা স্বামী-স্ত্রী সেই গোষ্ঠীভুক্ত হয়েও কাজ করে দিন হাজিরার। এমন আরো বিশ-বাইশ জন আছে। কেউ টালোয়ান, কেউ জেনারেল মজহুর। তাদেরকে ঐ দেড়শো জনের হিসেবে ধরা হয় না।

ওদের গানের মাস্টার গোবিনও ছেদিলালের ছেলে। কিন্তু প্রথম জীবনে গান-বাজনা সাধন-ভজনের দিকে এমন ঝোঁক পড়েছিল যে বিদ্রোহ-আশয়, সরদারি, কমিশন আর উপার্জন কোনোদিকেই তার মন ছিল না। এমন কি ওর বিয়ালা বউকে দ্বিরাগমনে আনেওনি। সে মেয়ের অগ্নিছেলের সঙ্গে স্নান হয়েছিল।

বাপ মরে যাবার পর বেশ আতান্তরে পড়ে গিয়েছিল। তখন চরিত্র ও কিশণ ওর মাথায় ঝোড়া আর বৃকের উপর একটি সবলা যুবতী প্রায় একই সঙ্গে চড়িয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দায়িত্ব পালন করেছিল। এখনো সে ঐ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। অবশ্য তার বউও চাকরি করে এবং সম্ভান প্রসব করে। ফাণ্ডনী তার বড় মেয়ে।

এত সম্বন্ধে গোবিন কিন্তু নিরাসক্ত। হারমোনিয়ামটি নিয়ে একবার বসলে সে সব ভুলে যায়। গুলু ওর সম্পর্কে ভগ্নীপতি। তারও রীত চরিত্র ওর মতো অতটা বাউণ্ডলে না হলেও ঢোলকটি কাছে পেলে বোলের তুফান তুলে দেয়।

সেজ্ঞা চরিত্রের চবুতরা সন্ধ্যা হলেই জমজমাট। তুলসীদাসজীর রামায়ণ গান নিত্যকার ব্যাপার। রামধূনের স্বরে বিরহ মিলনের নিত্যসঙ্গীত।

মজার কথা যে মেয়েটি দীর্ঘ দশ বছর ধাবৎ গোবিনের নামে সিঁথিতে সিঁদুর পরেও তার ঘর-সংসার থেকে বঞ্চিতা সেই নতুন সংসার পেতে যে ছেলেটি প্রসব করেছিল সে-ই গৈরীর স্বামী। সেও দশ বছর থেকে সিঁদুর পরছে।

ওর খসুরের নাম মনিলাল। বরের নাম রবিলাল। ওরা সব ম্যাকনীল

কোম্পানির কলিয়ারীতে খাদে লোভারের কাজ করে। দামুলিয়াতে আরো যে একটা গুয়াগন সোজিংয়ের দল আছে তাদেরই নিকট আত্মীয়। বিয়েটা হয়েও ছিল ওদেরই যোগাযোগে।

গৈরীর বন্ধুবান্ধবরা জানত যে আগামী বৈশাখে ওর দ্বিরাগমন হবে সেজন্ত বর বর করে স্বেপাতো।

স্তুচি বলত বিরহিনী রাখা।

কখনো অন্তমনস্ক দেখলে ঠোঁকর দিত কার ধ্যান করছিস লো? বরের?

বর সম্পর্কে ভাবতে তো ভালো লাগে। কেমন একটা স্বপ্নের আবেশ। বৃকের ভিতর ড্রিমি ড্রিমি শব্দ। অনাদ্রাত স্নুথের পিপাসা। কার্তিক মাসে পনেরো পেরিয়ে ধোলোতে পা দিলো। এই তো জোয়ারের সময়। সে সব চাওয়া পাওয়ার বাসনা কার বা না থাকে?

কিন্তু ও যে কিছুতেই বরের মুখটা মনে করতে পারে না। যখন তখন এমন একটা মুখ সারা অন্তর জুড়ে ফুটে উঠে যে তার ভাবনাতেই বিভোর হয়ে যায়। কাঁচামাটিতে দাগ কেটে মূর্তি গড়ার মতো হৃদয়ের কোমল পরতে সেই মূর্তির ছাঁচ গড়ে উঠেছে।

ইতিমধ্যে স্কুলের রেজাল্ট আউট হয়েছে। ও পাশ করে ক্লাস নাইনে উঠেছে। আর দুটো বছর। যদি দ্বিরাগমন না হয়, যদি শবুর বাড়ি যেতে না হয় তাহলেই সে ম্যাট্রিক পাশ করে যাবে। ঐ তো বাসন্তীদির বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে শবুর বাড়ি গেছে। তেমনি কি তারও হতে পারে না?

বাপের কাছে আবদার করে বাপুজী! আমাকে ম্যাট্রিক পাশ করতে দে! তারপরে শবুর ঘর পাঠাবি।

গুলু মেয়েটিকে বড়ই ভালোবাসে। ওর কোনো আবদার অবহেলায় ঠেলে ফেলে না। কিন্তু এবে বড় কঠিন আবদার। তাই ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, কি করবি বিটি? শবুর ঘর তো যেতেই হবেক। উয়ারা বড় জিদ্দ করছে।

—তবে এত লেখাপড়া শিখালি কেনে? শেষটাই যদি না হবেক ত।

—প্রভুজী যদি কপালে লেখে ত হবেক।

—আর হবেক? একটি ভাং মুখুর সঙ্গে বিয়া দিলি—উ কি বুঝবেক লেখাপড়ার মর্ম?

—বিয়ার সময় তো সেকথা বুঝি নাই বিটি।

তা বুঝবার কথাও নয়। ছনিয়া মেয়ের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া ব্যতিক্রম। ওরই কি লেখাপড়া হতো?

ভাগ্যিস তখন হোয়াইট সাহেব ম্যানেজার ছিলেন। বহু কর্মের হোতা। আজ যেখানে ফাষ্ট এড কম্পিটিশনের মহড়া চলছে সেই ডিসপেনসারী, অগ্রদূত

মেস সার্থক অর্থেই কলিয়ারীর সাংস্কৃতিক জীবনের অগ্রদূত তা উনিই তৈরি করিয়েছিলেন।

ভদ্রলোকের রুচিষ্মান ছিল। শ্রমিকদের প্রতি দরদণ্ড ছিল। বছর চারেক এই কলিয়ারীতে ম্যানেজার থাকাকালীন বিশ হাজার টন মাসিক প্রোডাকসনকে বাড়িয়ে চল্লিশ হাজার টন করেছিলেন। পাঁচ ও ছ' নম্বর চানক খোদাই করিয়েছিলেন। পঞ্চাশটি বাবু কোয়ার্টার, শ'পাচেক কুলি ধাওড়া, চারটি ছোট সাহেবদের বাংলো, একটি বড় বাংলো, ক্রেক, ক্যান্টিন ও একটি প্রাইমারী স্কুল তিনিই করিয়েছিলেন।

এই সবে মধ্যাহ্নে তিনি বেঁচে আছেন। লোকে বলে হোয়াইট সাহেবের স্ট্যাচু তৈরি করে অফিসের সামনে রাখা দরকার।

তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাস ছয়েক পর দেখলেন সাকুলো বারোটি ছাত্র। অথচ দুটি মাস্টারকে কোম্পানী পুষ্টি দিচ্ছে।

রেগেমেগে বাবু, চাপরাশী, মাস্টার নিয়ে ধাওড়া পরিক্রমায় বেরুলেন। পাঁচ বছরের উর্ধ্ব ছেলেমেয়ে যে তাঁর নজরে পড়ল তাকেই পাকড়াও করে স্কুলে নিয়ে এলেন। তাদের মা বাপকে কড়া হুকুম দিলেন।

গৈরী তখন খালি গায়ে ফ্যানাড়ি পরে কড়ি খেলছিল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে দেখে সাহেব গুকে টপ করে ধরে ফেললেন। বেনীবাঁধা উড্ডু উড্ডু চুলের মধ্যে সিঁথির সিঁদুর দেখে বললেন, মাই গড! ম্যারেড বেবী। তা হোক। স্কুলে ভর্তি করে দাও।

সেই দিন গৈরীর হাতে খড়ি হলো। ছেলেমেয়েরা সাহেবের ভয়ে যেমন ঝাকের কইয়ের মতো এসেছিল তেমনি একটি করে খসেও পড়ল। আবার নূতন এল। কিন্তু গৈরী রয়েই গেল।

ও প্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ করল। আর কাউকে বলতে হলো না। গুলু তার মেয়েকে হাতে ধরে নিয়ে গিয়ে শেরগড়ের কালীমাতা বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলো।

নেই মেয়ে এখন ভর ভরন্ত যুবতী। মনের উপর এমন কিছু ছাপ পড়েছে যে ভাং মুখ্য স্বামীকে গ্রহণ করতে পারছে না। ওর রহন সহন, দরশ পরশ যে সমাজের সঙ্গে তাতে মনোজগতে প্রতি নিয়তই ঘটে যাচ্ছে পরিবর্তন। সীতা সেজে আসরে নাচলে কি হবে? এই হচ্ছে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া।

ওদের ধাওড়াটিকে লোকে বলে নামো ধাওড়া। কলিয়ারীর পশ্চিমে। দামোদর থেকে হাজার ধানেক ফুট উত্তরে। মাঝে চষা মাঠ ও একটা পুকুর। দামোদরে বড় বান ডাকলে উঠোনে জল ছপ ছপ করে।

যেমন নোংরা তেমনি ঘিঞ্জি। জল, কল, পায়খানা, জল নিকাশের নালা কিছু নেই। শুধু চাপ বাঁধা খোলার ছাউনি করা ইটের ঘর। পনেরো বিশ বছর

আগে কোম্পানী সারি সারি খোলার ঘর বানিয়ে দিয়েছিল। তারপর কুলি কামিনরা নিজের গরজেই তার গায়ে কুঁড়ে ঘর বসিয়েছে।

সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের যৌবনের তাড়না আছে। জৈবিক প্রয়োজন আছে। প্রজন্ম ও প্রসবের জন্ম চার দেওয়ালের আড়ালের প্রয়োজন আছে। সেসব উপেক্ষা করা চলে না।

কত আত্মীয়স্বজন চাকরির লোভে এসে বাসা বাঁধছে। গরু, মোষ, হাঁস, ছাগল, শুয়ার, মুরগি এসব পশুপক্ষী তো আছেই। নিত্যদিন উহুন জলে। তার গাদা গাদা ছাই। গু, গোবর, কুটোকাটা, আবর্জনা। কোনো কিছুরই সাক্ষতরো করার ব্যবস্থা নেই। বাতাস চলে না। আলো ঢোকে না। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার।

যার যেখানে যত অন্ধকার সেখানে তত পাপ; ঐ ঘিঞ্জিঘরের মধ্যেই মদ চোলাই হয়। জুয়ার আড্ডা বসে, মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে ব্যবসা চলে, অবৈধ শিশুর লাশ আস্তাকুঁড়ে পচে। পা ফেলতে গা ঘিন্‌ঘিন করে। বাস করা তো দূরের কথা। যারা থাকে তারা মানুষ না জন্তু-জানোয়ার কে জানে ?

গৈরী সেই ধাণ্ডার মেয়ে !

তবে খাস নেবার মতো বাতাস পায়। কারণ গুলু অনেকদিনের পুরনো কর্মী এবং সরদারের জামাই বলে কোম্পানীর তৈরি দুটি খোলার ঘর পেয়েছে। তাদের ঘর দক্ষিণতুরারী এবং সামনেটা ফাঁকা। উঠোন পার হলেই ধানমাঠ। কুটুস কাঁটার বেড়া দেওয়া একফালি উঠোন আছে বলেই প্রাণভরে খাস নিতে পারে।

অত্নের তো সে স্বেযোগও নেই। দক্ষিণতুরারী ঘরের যে সারি তার বাকীটা দখল করে রেখেছে চরিতর, কিষণ, গোবিন, জগদীশ প্রভৃতি সরদারের গুপ্তিরাই।

উত্তরে পর পর কোয়ার্টারের সারি এবং ঐ বেমক্কা কুঁড়ের কুঁড়োজালি। তারই মাঝে একটি চবুতরা। নামো ধাণ্ডার হুদপিণ্ড। একটি বটের চারা। তার চারপাশে গোল করে সিমেন্ট বাঁধানো বেদি। চারিদিকে ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের মতো ফাঁকা জমি। তাকে ঘিরে আছে ধাণ্ডার ঘরগুলি। ইটের গাঁথুনী, খোলার চাল; মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল, গরুর গোয়াল, শুয়ার খুপড়ী কত কী যে বানিয়েছে গুরা।

ঘরে তো বাস করতে পারে না। বাইরেই পড়ে থাকে। চবুতরায় এসে খাসপ্রখাস নেয়। এখানেই তাদের গঞ্জিকা সেবন হয়। ঢোল করতাল বাজিয়ে হোলী, চৈতা, কাজরী ও রামায়ণ গান করে। ঝগড়ার সালিশ, হস্তার পেমেণ্ট, কুটুস আপ্যায়ন, বিয়ে-সাদী, ভোজ, ক্রিয়া কর্ম, ইউনিয়নের মিটিং কি না হয় সেখানে ? হরদম গমগম করে।

ভেরো

নূতন বছরে নূতন পুরানো মিলিয়ে সিনিয়র, জুনিয়র, মাইনর ও গার্লস টিম তৈরি করেছেন ডাক্তারবাবু। অনন্ত ও সুবীর সিনিয়র টিমে প্রমোশন পেয়েছে। মেয়েদের টিম তৈরি হয়েছে শুচি, কল্যাণী, ভারতী ও গৈরীকে নিয়ে।

গৈরীর নাম শুনেই অনন্তর বুকটা ছ্যাং করে উঠল। সুমিতবাবু ঠাট্টা করে বললেন, এতদিনে ডাক্তার একটা টিম তৈরি করেছে। মেয়েগুলো গায়ে গতরে কি রকম চেকনাই আছে বল দিকি। বেশ একটা ফ্যাশন প্যারেড হবে।

‘চলো গৈরী! হেঙ্গেল হেঙ্গেল করে চলছিস যে!’

হা হা শব্দে হেসে উঠল অনন্ত। সেই সঙ্গে সুবীর ও অন্যান্য টিম মেম্বাররা।

শুচির মুখটা রাগে গন্ গন্ করছে। সে টিমের ক্যাপ্টেন। টিম নিয়ে প্যারেড প্র্যাকটিশ করছিল। দেখনশোভা যেমনই হোক প্যারেড হচ্ছিল না।

অনন্তর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুচি বলল—অনস্তদা! ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

চটুল ভঙ্গিতে অনন্ত বলল—কি ভালো হবে না শুনি?

—আপনার ঠাট্টা ইয়ার্কি!

—আমি একাই দায়ী?

—হ্যাঁ তো! আপনিই তো শুরু করলেন।

—বেশ। যা করবার করে ফ্যাল।

—করবই তো। ডাক্তারদাকে বলে দেব।

—যা বলগে। প্যারেড করতে পারিসনে পায়ে পা মেলাতে পারিসনে, স্ট্রেচার নিয়ে হাঁটতে পারিসনে—আবার রাগ কত। বিষ নেই তা কুলোপানা চক্কর।

ধমক খেয়ে শুচির মুখটা চূপসে গেল। ছুটো ঢোক গিলে বলল—আমরা পারব না কেন? এই দেহাতী মেয়েটার যে পা বংশ হচ্ছে না।

—ওকে শ্বশুর বাড়ি যেতে বলে দে।

—ধ্যৎ। আপনার সব কিছুতেই ঠাট্টা।

—ঠিক বলেছি। তেল চুকচুকে খোঁপায় ফুল গুঁজে রঙদার শাড়ি পরে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া চলে। প্যারেড হয় না। এমন মেয়েকে টিমে নিয়েছিস কেন?

শুচি ঝোঁঝে উঠল—টিম কি আমি তৈরি করেছি

—ডাক্তারদা করেছেন। উনিই বুঝবেন। সবাই চূপচাপ। পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ছে।

তখন এলেন ডাক্তারবাবু। পরনে সাদা হাফশার্ট ও সাদা ফুল প্যাণ্ট। গলায় স্টেথিস্কোপ। হয়তো গুদের কথা শুনে পেয়েছেন। সবারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—কি হয়েছে তোমাদের?

কেউ জবাব দিলো না।

গৈরী হাঁটু মুড়ে বসে ফার্স্ট এইড বইটায় মুখ গুঁজে দিয়েছে। গুচি ওব দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোদেরই কিছু হয়েছে ?

গুচি বলল—কই না তো!

—আমার কাছে লুকোচ্ছিস ? গৈরীর মুখটা তুলে আমাকে দেখা তো।

গুচি যত ওর মুখটা তুলতে চায় তত ও মুখ গুঁজে দেয়।

ডাক্তারবাবু ধমক দিলেন—এই! কি হচ্ছে? মুখটা তোল বলছি।

গৈরী মুখ তুলল। একটি সজল কোমল মুখ! ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখের পাতা ভেজা। কপালের সিঁদুর লেবড়ে গেছে। সিঁথিটা টক্ টক্ করছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছল।

ডাক্তারবাবু বললেন—কি হয়েছে রে তোর ?

গৈরী আবার মুখ নীচু করে গুম হয়ে গেল।

উনি বললেন—চুপ করে আছিস কেন ?

—আমার হবে না ডাক্তার দাদা।

—কেন হবে না ?

—তাই তো বলছে। হাসছে—টিটকিরি দিচ্ছে।

—কে হাসছে ?

—সবাই! আমি যেন ক্যালনা। ফার্স্ট এড না হলো তো কি হয়েছে ?

ডাক্তারবাবু হুকার ছাড়লেন—এই তোমরা কে টিটকিরি দিচ্ছো? নিজের মুখে আমার কাছে স্বীকার কর।

অনন্ত বলল—টিটকিরি নয় দাদা। ওদের প্যারেড হচ্ছিল না। গুচি বলল—চলো গৈরী। হেঙ্গেল হেঙ্গেল করে চলছিস যে! তাই শুনে হেসে ফেললাম। কারণ গুচির মুখে গোঁয়ো শব্দ শুনতে মজা লেগেছিল।

—হ্যাঁ! আপনি বলেননি ওকে শশুরবাড়ি পাঠিয়ে দে।

গৈরী তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করল। তখন ওর চোখে জল নেই।

—সে তো একদিন যেতেই হবে।

—যখন যাবো, তখন যাবো—এখন কি তার ?

ওর রাগ দেখে অনন্তর মনে হলো সত্যি তো ওর এত উন্মার কারণ ছিল না। মেয়েগুলোকে একটু বেশি বকাঝকা করে ফেলেছে।

তবু একটু তামাশার স্বরে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাট হয়েছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—গুধরে নাও।

—কি করে শোধরাবো ?

—গৈরীকে তৈরি করে দাও। এখনো যথেষ্ট সময় আছে। ওদেরকে শেখাও।

—সিঁথিতে সাইনবোর্ড মার্কা মেয়ে অল্প কারো শিক্ষা নেবে মনে করেছেন ?

গৈরী আবার ফুসে উঠল—তবে কি সাইনবোর্ডটা মুছে দিয়ে আসব বলছেন ? কোনো বিবাহিতা মেয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেবে এটা তখন ওরা কল্পনা করতে পারত না। শুচি ধমক দিল—কি যা-তা বলছিস গৈরী ?

কল্যাণী বলল—সিঁথির সিঁদুর মুছবি কিরে ? রাগে তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখছি।

—কি করে থাকবে ? অনন্তদা আমার পিছনে লেগেই আছে। তোমরা ভদ্রলোকের মেয়ে তো—তাই কিছু বলতে পারে না। আমি গরিব, ছোটলোক, লেবারের ঘরের মেয়ে তাই পেয়ে বসেছে। লেখাপড়া শিখতে আসাই আমার পাপ হয়ে গেছে। তোমাদের পিছনে কুকুরের মতো ল্যাং ল্যাং করে ঘুরে বেড়ানোই পাপ হয়ে গেছে।

রাগে, দুঃখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

সুবীর বলল—অনন্ত তুই একটা থার্ডক্লাস। ঠাট্টা-ইয়ার্কির সীমা আছে। তা নয় এমন সেক্টিমেণ্টে আঘাত দিয়ে কথা বলছিস বে বেচারী কেঁদে ফেলল।

—কোন সেক্টিমেণ্টে আঘাত দিলাম বল ?

ভক্তারবাবু বললেন—সাইনবোর্ড মার্কা বলে। ইয়ারে চার-পাঁচ বছর বয়সে ওদের বিয়ে হয়। তখন থেকে সিঁদুর পরে স্বামীর কল্যাণ কামনায়। তুই তাকে পোস্টার বানিয়ে দিলি ! এটা ওর অন্তরে আঘাত দেবে না।

—আমি খুবই দুঃখিত দাদা। এতটা তলিয়ে ভাবিনি।

অনন্ত সত্যিই মরমে মরে যাচ্ছিল। গৈরীর দিকে তাকিয়ে জোড়হাত করে বলল—আমাকে তুই ক্ষমা কর গৈরী !

গৈরীর মাথাটা নীচু হয়েছিল। অনন্তর কথায় আবার সোজা হয়ে গেল।

বলল—এই আরেক পাপ। তুমি বামুনের ছেলে হয়ে আমাকে জোড়হাত করছ কেন। বলতে বলতে উঠে এসে অনন্তর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

এসব আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দায়। মনের উপর জটিল সংস্কারের জাল যে তা ছিন্ন করাও দুঃসাধ্য ! গৈরীর ভাষাও শুদ্ধ নয়। যাকে আপনি বলে তাকেই তুমি।

কিন্তু ভক্তারবাবু তার পুরো স্বযোগ নিয়ে নিলেন। বললেন—বাস বাস, আর কথা নয়। মেয়েদের টিমের দায়িত্ব অনন্তের। প্যারেড টু প্রাইজ !

অনন্ত বলল—তাই হবে দাদা। তবে গুরুতর। আর এদের সেক্টিমেণ্ট-গুলোও ঠিক বুঝি না।

কিন্তু বলল—ষ্টা। আপনাতঃ সাক্ষাৎ।

—তোরা সব সেম্টিমেন্টের বুড়ি ।

—আর আপনি মুক্তপুরুষ । রাগ বিরাগ কিছু নেই ।

কল্যাণী ওকে চিম্টি কেটে বলল—আঃ । চূপ কর না । সেই থেকে শুরু করেছিস তো চলছেই ।

অনন্ত বলল—মাক তোমারই একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে মনে হচ্ছে । চল—
প্যারেড করব । টিম—গেট রেডি ।

চারটি মেয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল ।

অনন্ত এবার খুব সিরিয়াস । প্রত্যেককে নিজের পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে লেফট রাইট করাল । গৈরীর কালঘাম ছুটিয়ে দিলো । শীতের বিকেলেও গলা ও কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম । মুখটা ভীষণ গম্ভীর । নাকের পাটা ঢুলছে এবং গাল দুটোয় সিঁছুরে রঙের ছোপ ধরেছে । ঘন ঘন হাঁফাচ্ছে ।

অনন্ত বলল—ঠিক আছে । একটু জিরিয়ে নে—তারপর আবার—হাঁফ ছেড়ে
বাঁচল । ঘাসের উপর আলু-থালু হয়ে বসে পড়ল ।

ফাঁক পেয়ে শুচি ও কল্যাণী রাস্তার ফিরিঙলার কাছে বাদাম কিনতে গেল ।
একটু পর ভারতীও ওদের পিছু নিল ।

গৈরী একা । শ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে । অনন্ত ফাস্ট এড বইয়ে
স্ট্রেচার ড্রিলের একটা ছবি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল । গৈরী সেদিকে হাঁ
করে তাকিয়ে আছে । অনন্ত চোখ তুলতেই ফিক করে হাসল ।

১৯৪৭ সাল ।

প্রতিদিনের মতো ১৫ই আগস্টের উষালগ্নে সূর্য উঠেছিল নতুন আশা, নতুন
উদ্দীপনা নিয়ে । স্বাধীনতার ডঙ্কা বেজেছিল ভারতের দিকে দিগন্তে । পত পত
করে উড়েছিল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা । কি সে জয় জয়কার ধ্বনি । যেন
নবচেতনার প্রাবন ।

শুণী রায় ও মখন দাসের মতো হাড় কঙ্কণ লোকও গ্রামের দুর্গাখানে বঁদে
বিলি করে দিয়েছিলেন । সাত সকালে সব ছেলেদিকে ঘুম থেকে উঠিয়ে স্নান
করতে পাঠিয়েছিলেন ।

অনন্ত সেই দিনটিকে খুব ভালোভাবে মনে করে রেখেছে ।

মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে দেখে গ্রামের দাদা ও কাকারা দাঁড়িয়ে । তাঁরাই
তাড়া দিলেন—যা-যা চান করে আয় ।

মাকে জিজ্ঞাসা করল—কেন মা ? এত সকালে চান করব কেন ? কি
পুজো হবে ?

যেন পুজো-পাশা ছাড়া সকালে স্নান করতে নেই ।

ওর মা বললেন দেশমাতৃকার পুজো হবে । আজ স্বাধীনতা দিবস । দেশে
ব্রিটিশ রাজ থাকবে না । ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের দেশ হবে ।

আর দেশে রাজা থাকবে না ? কি আশ্চর্য কথা ? রামায়ণ, মহাভারত ও ইতিহাসে কত রাজা মহারাজার কাহিনী পড়েছে। ইংরেজদিকেও রাজা মনে করেছে। সেসব উল্টে দিলো।

কে ?

গণতন্ত্র !

গণতন্ত্র লোকটা কেমন ? তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে।

মনের মধ্যে সেই যে একটা বিতর্কের সূত্রপাত হয়ে গেল আজও তার মীমাংসা হয়নি। যত বয়স বেড়েছে ততো তার মাত্রা বদলেছে। মানে বদলেছে। মূলোচ্ছেদ হয়নি। গণতন্ত্রকে কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়। যেন একটা আইডিয়া। তার কোনো আকার নেই।

সেই থেকে অনন্ত খুঁজে বেড়ায় ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ। ইতিহাস, সময়, সমাজ ও তার বিবর্তন। কয়লা, পাথর, জলবালি ও ফসিল। মহাকালের ঘোড়ার স্কুরে মাল্লুষ মাল্লুষীর স্পন্দিত হৃদয়ের বার্তা। লোভ, লালসা, হিংসা ও রিরংসার কালো ঘবনিকায় ছ'একটি সাদা আলোর ফুটকি। ভূত্বক, ভূতত্ত্ব, নদ নদী, পাহাড়ের আশীর্বাদ ও অভিশাপ।

দামোদর অনার্ঘ নদ !

কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৈসর্গিক বিপর্যয়ের প্রচণ্ড তাড়নায় পৃথিবীর স্বক, মাংস, অস্থি, মজ্জা তোলপাড় করে জন্ম নিয়েছিল সে।

তখন থেকেই সে বয়ে যাচ্ছে ছোটনাগপুরের মালভূমি অতিক্রম করে, অসংখ্য ডুংরিকে পাশ কাটিয়ে, বোকারো, করনপুরা, ঝরিয়া পার হয়ে শেরগড় পরগনার মধ্য দিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে।

ছরন্ত ছুঁবার জলশ্রোত। হুকুল প্লাবী বন্নার তাণ্ডব। পঞ্চকোট পাহাড়ের সৌমান্য বরাকর নদ তার বৃকে আছাড় খেয়ে গড়েছে। হুই নদের ছরন্ত বন্নায় হাজার হাজার মাল্লুষ গৃহহারা, ছন্নছাড়া।

তবুও অনার্ঘ সে সাঁওতালের কাছে পরম পবিত্র। এর জলে তারা অস্থি বিসর্জন দেয়। মৃতদেহ দাহ করে।

প্রতি বছর বর্ষা আসে। আকাশে মেঘ দুন্দুভি বাজে। দামোদর উপত্যকার জনমানুষের হৃৎপিণ্ডে ঘন ঘন হাতুড়ী পড়ে। অনার্ঘ আক্রোশে গর্জন করে দামোদর। কার সাধ্য তার সামনে দাঁড়ায় ?

অথচ তারই বৃকে থরে থরে সঞ্চিত হয়ে আছে নিকষ কালো পাললিক শিলার কয়লাস্তর। অপ্রমেয় তাপশক্তির আধার। আধুনিক যন্ত্রলভ্যতার জীবনীশক্তি ! লক্ষ কোটি টন আধার মানিক।

তোমারই জল, তোমারই বালি, তোমারই কয়লা নিয়ে ব্রিটিশ রাজের শিল্প বিপ্লব। আজ তার অমোঘ প্রয়োজন।

কয়লা ছাড়া মানুষের জীবন ?

ভাবাই যায় না।

এই কথাগুলো, এই ভৌগোলিক তত্ত্ব ও সভ্যতার বিকাশ নিয়ে অনন্ত খুব ভাবে। তার মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগে। প্রকৃতি কত বিচিত্ররূপিনী! কত তার রূপ রস গন্ধ। গাছের পাতা, ফুলের স্নগন্ধ, ফলের রস সব কিছুকে অতিক্রম করে যার জীবন ধারণের অমোঘ প্রয়োজন।

চৌদ্দ

হাতের তালুতে রক্তপাতের জন্ম ব্যাণ্ডেজ বাঁধার তালিম দিচ্ছে অনন্ত।

গৈরী হাতটা বাড়িয়ে দিলো। স্ফুর্জল স্ফুর্গোর। খুব চিকন লোম।

অনন্ত ওর হাতটা টেনে নিজের বাঁ হাতের উপর রাখল। তুলো দিয়ে হাত মুছে দেবার মহড়া দিলো। একটা ব্যাণ্ডেজ পাকিয়ে গোল করে ওর মুঠিতে ধরিয়ে আঙুল মুড়ে মুঠিটা বন্ধ করে দিলো।

আর একটা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মুঠিটা বেশ যত্ন করেই বাঁধছিল। তখনই সে অল্পভব করল ওর হাতটা কাঁপছে।

কজ্জি থেকে প্রায় কহুই অন্ধি বারোটি বিভিন্ন ডিজাইনের কাঁচের চুড়ি। ঠিন ঠিন করে বাজছে। কজ্জিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জায়গা করতে ওর চুরিগুলো উপর দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল—বাবাঃ! এতগুলো চুড়ি!

শুচি মস্তব্য করল—ওর বরকে মাসে দশ টাকার চুরি কিনতে হবে।

—আঃ!

গৈরীর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দটা হতেও পারে শুচির কথার উত্তর কিংবা নিজেদেরও অজ্ঞাত শীৎকার। ওরা কেউই সে ধনির সঙ্গে পরিচিত নয়।

অনন্ত দেখল ওর খুব নরম ও চিকন লোমগুলো সরু সরু পল্লকাটার মতো হয়ে গেছে। হাতটা থর থর করে কাঁপছে এবং ঠোঁটদুটো ফাঁক করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ওর সারা গায়ে তড়িৎ শিহরণের ঢেউ খেলে গেল।

একেই কি রোমাঞ্চ বলে?

স্মৃতিতবাবু কি একেই বলেছিলেন শরীরের প্রতিক্রিয়া?

এক মন্থুর্ভের বিমূঢ়তা।

তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজটা শেষ করে দিয়ে উঠে পড়ল। বলল—তোরা নিজেরা প্রাকটিক কর। আমি এক রাউণ্ড স্ট্রেকার ড্রিল করে আসি।

গৈরী তখনো তেমনিভাবে বসে। শুচি ওকে ধাক্কা মেরে বলল—এই গৈরী। হাতটা আমার দিকে বাড়। ব্যাণ্ডেজটা ভাল করে দেখেনি।

মোরাম রাস্তার উপরে পায়ের শব্দ করে ওরা হাঁটছে। আগে অনন্ত পিছনে গৈরী। তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। সদর রাস্তায় আলো আছে। কুলি ধাণ্ডার পথ অন্ধকার। এখানে সেখানে ডাঁই করা ছাইগাদা। সারি সারি কাঁকরি উনুন জ্বলছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় পথ ঘাট ছেয়ে গেছে।

রেল লাইন পার হয়েছে ফাটকবাজার। ছ'সারি পান গুমাটি। চা পকুড়ির দোকান। চালাঘরে তরিতরকারি, চাল মাছের পসরা। দুটো বড় বড় মুদির দোকান। ছোট বড় খানকয়েক লটকন ও কাপড়ের দোকান।

সন্ধ্যাকালটা বেশ জমজমাট হয়ে থাকে। হাজাক বাতি জ্বলে।

ওরা যখন ফাটক পার হচ্ছিল অনন্ত তখন গৈরীর চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আছে। জনাকয়েক ফচকে ছোঁড়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল—গুলুয়ার বিটি ডাকদার হবেক।

পর পর কয়েকটা মিটি পড়ল।

তাই শুনে অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ওর চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে গেল।

গৈরী ওর কাছে এসে বলল—চলুন চলুন। ওরা রোজ এমনি করে।

—তাছাড়া আর কি মুরোদ আছে ?

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আবার অন্ধকার। আবার ঘিঞ্জি।

অনন্ত ওদের চবুতরায় এসেছিল। সেই রাস্তাটিতেই যাচ্ছিল।

গৈরী বলল—ওদিকে না। এদিকে।

অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার গৈরী আগে চলছে। একটা খুব সক্ষীর্ণ রাস্তা পার হবার সময় অনন্ত বলল—বাবাঃ যমতুয়ার।

—হ্যাঁ।

—এবার তুই একা যেতে পারবি নে ?

—তা পারব না কেন ? এগুলো তো আমাদের জাতকুটুমের ঘর। এখানে আমার কোনো ভয় নেই।

—তাহলে যা।

গৈরী হেসে বলল—আসুন না দাদা। দেখে যান কেমনভাবে থাকি। যখন ম্যানেজার হবেন তখন আপনার কুলি-কামিনদিকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবেন।

—সে কি আমার সাধারে। চল—দেখেই আসি।

কারও উঠোন দিয়ে, কোনো ছাইগাদার পাশ দিয়ে, নর্দমা ভিঙিয়ে কোনো-রকমে একটি খোলার ঘরের উঠোনে এসে পৌঁছাল।

আট ফুট বাই দশ ফুট সাইজের দুটি খোলার ঘর। তারই বারান্দার একপাশে

রান্না হচ্ছে। অন্নদিকে খড়ের চালায় গাই-বাছুর আছে। একটি গুয়ের খুপড়ী এবং মুরগির খোঁয়াড়। সামনে কুটুস কাঁটার ঝোপ-জঙ্গল।

ওর মা রুটি সৈঁকছে। গুলু ডিউটা গেছে। বাচ্চাগুলো কাঁথা ঢাকা দিয়ে— উলুনসালে বসে আছে। একটি ঘরের ভিতর হারিকেন বাতি জ্বলছে। ওর ভাই দুটি বই খাতা নিয়ে বসেছিল। গৈরীর সাড়া পেয়েই পড়তে শুরু করে দিলো।

অনন্ত উঠোনেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওর মা তাকে দেখে ঘোমটাটা বুক পর্যন্ত টেনে নিল।

গৈরী বলল—আম্নন দাদা—ভিতরে আম্নন।

অসীম কোঁতুহলে অনন্ত ভিতরে ঢুকে পড়ল। খাট তক্তা কিছু নেই। ঝুড়ি ঝাপটা হাঁড়ি কুঁড়িতে দেওয়ালের ধারগুলো জ্যাম। একটি তার টাঙানো আছে ঘরের এ পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত। তাতে টাঙানো আছে ছেলেমেয়েদের জামা, প্যাণ্ট, গামছা, ফ্যানাডী, শাড়ি, ব্লাউজ। কোনায় কোনায় মাকড়সার জাল ও বুলকালি চাল পর্যন্ত ছেয়ে দিয়েছে। চারিদিকে ময়লা।

তারই মধ্যে একটি জায়গা পরিষ্কার। সেখানে দেওয়ালে টাঙানো মা সরস্বতীর ফটো। শিব দুর্গার ছবিওলা পুরানো ক্যালেন্ডার। কাঠের বাস্কে বই, খাতা, প্লেট, পেশিল ডাঁই করা।

গৈরী সেই বাস্কেট খালি করে ওকে বসতে দিলো।

সেদিনও সন্ধ্যাকালে ডাক্তারবাবু ক্লাস করতে করতে রাত করে দিলেন। শেষদিনের ব্যাপার। জনে জনে পরীক্ষা করে নিতেই বেলা ডুবে গেল।

গৈরীর সেই পুরানো সমস্তা। একবার ভাবল—একই চলে যাবে।

কিন্তু কিরকম ভয় ভয় ভাবটা মনের ভিতর গুর গুর করে উঠল। কিছুক্ষণ একই রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হন্ হন্ করে মেসে ঢুকে অনন্ত'র দরজায় ধাক্কা মারল।

অনন্ত দরজা খুলে অবাক। বলল—আরে তুই! বাসায় যাসনি?

কেমন অভিমানের স্বরে বলল—একা কি করে যাব? ভয় করে না বুঝি?

—তাতে বটে! কথাটা মনেই ছিল না।

—আমার জন্ম একটু ভাববে তবে তো মনে থাকবে।

কমলেন্দু টিঙ্গনী কাটল—তোমার জন্ম ভাববার সময় কোথা ওর?

—তাই বটে!

অনন্ত বলল—বোস গৈরী। চা খেয়েনি তবেই তোকে পৌঁছে দেব।

গৈরী দাঁড়িয়েই রইল। অনন্ত আবার বলল—বোস।

গৈরী মেঝেতেই বসতে যাচ্ছিল। অনন্ত বলল—আরে ওখানে কেন?

—তবে কি?

—এখানে বোস। বিছানার একটা দিক দেখিয়ে দিলো।

—ও বাব্বাঃ! তোমার বিছানায় বসব আমি?

—কেন? কি দোষ আছে?

—তুমি ব্রাহ্মণ!

—তাতে কি আছে?

—আমি ছোট জাতের মেয়ে অনন্ত দা।

অনন্ত মহূর্তের জ্ঞান শুরু হয়ে গেল। ওর চোখে চোখ রেখে বলল—হে ভগবান! এতদিনে তুই এই শিখলি। আমার বামনাই দেখলি!

মেসের ঠাকুর কেটলিতে চা ও হাতে ছুটি কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল। অনন্ত আরো একটা কাপ আনিয়ে তিন কাপ চা তিনজনে নিল।

কমলেন্দু বলল—গৈরী! তোমার জাতপাত নিয়ে এত সংস্কার কেন?

—তা হবে না?

অনন্ত বলল—না। আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ, শুদ্র সবই সমান।

কমলেন্দু বলল—অনন্তর বাবা বাউরী বাগদীদের মড়া পোড়াতেন, তাদের রোগীর সেবা করতেন, তাদের ঘরে ভাত খেতেন।

—সেজ্ঞ একবার ছ' বছর যাবৎ জাতে পতিত ছিলেন।

গৈরী প্রশ্ন করল—জাতে উঠলেন কি করে?

—গ্রামে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। তিনি আমাদের বাড়িতে তিনদিন ছিলেন। বাবার হাতেই খেতেন। তিনি গ্রামের মাতব্বরদের ধর্মে গৌড়ামি, জাতপাত নিয়ে খুব ভৎসনা করেছিলেন। তারপর থেকে সব ঠিক হয়ে গেল।

—এখন কী করেন? জাত মানেন।

—না।

—জাত মানেন না?

গৈরী কি রকম আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল—কিন্তু আমি যে মানি।

—কে তোকে বারণ করেছে? কিন্তু আমাদের কাছে ওসব আদিথোতা করিস না। আমরা পছন্দ করি না। নিজেই যদি নিজেকে ছোটলোক বলে ঘেঁষা করিস তবে তো কোনো কালেই ভদ্রলোক হতে পারবি না।

—আর বকবেন না তো। দিন কাপটা দিন।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো কাপগুলো নিয়ে বারান্দার একপাশে রেখে এল। সকালে ঝি এসে ধুয়ে নেবে।

রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনন্ত ঠাট্টার স্বরে বলল—চা-টা খাওয়ার পর ধোঁয়ার তেষ্ঠা পায়। তুই একটা বিড়ি ধরিয়ে ফ্যাল গৈরী। কেউ দেখবে না।

গৈরী হাসতে হাসতে বলল—তুমি বলেছিলে না—আর ঠাট্টা করবে না।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম।

—কিন্তু আমি ভুলিনি। বিশ্বাস কর সেদিন থেকে একটাও বিড়ি খাইনি। পকেট খালি।

ওর ফতুয়ার মতো ব্লাউজের পকেটটি উলটে দিলো।

অনন্ত অবাক। একদিন ওর পকেটে বিড়ি দেখে বকেছিল বটে তাই বলে—
বিশ্মিত কণ্ঠে বলল—এক কথায় বিড়ির নেশা ছেড়ে দিলি ?

—বিড়ি তো বিড়ি। তোমার কথায় মরতেও পারি।

ছায়া ছায়া পথ। বাঁদিকে ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেবের জোড়া বাংলা।
পরপর ছুটি শিমুল গাছের চারা। মোরাম বিছানো গেরুয়া পথের জাফরি কাটা
আলো।

অনন্তর ভিতরটা কেমন ছলছে। গৈরীর কাঁধে হাত দিয়ে বলল—হ্যাঁ রে গৈরী !
—ঐ !

—আমার একটা মুখের কথা তোর কাছে এত দামী হলো কি করে ?
জানি না।

মুখটা নীচু করে চলছে। অনন্ত ওর কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে নিল। চলতে
চলতে এগিয়ে গেল। নিঃশব্দ পদযাত্রা। কিন্তু মন মুখর। কত কথার জাল
বুনে যাচ্ছে দু'জনেই।

ক্রমে ক্রমে ফাটকবাজার পার হয়ে গেল। ফচকে ছোঁড়াদের হাসি-টিটকিরী
এবং সিটি শেষ হলো। অঙ্ককার পথ অনন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল।

গৈরী বলল—দাঁড়ালে যে।

তোদের পাড়ায় তো এসে গেলাম। এবার তুই চলে যা।

—আচ্ছা ! গৈরী দাঁড়িয়েই রইল।

অনন্ত বলল—আর একটা দিন। কালকে কম্পিটিশন হয়ে গেলে আর কি
তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে ?

—কেন হবে না ? একবার গৈরী বলে ডেকেই দেখো।

—আচ্ছা গৈরী—একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—কিছু মনে করিস নে।

—বল।

—তোর স্বামীকে তুই ভালোবাসিস ?

গৈরী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—ওর কথা আমি ঠিক মনে করতে
পারি নে। ভালোবাসার কথা ভাবলেই তোমার মুখটা মস্ত ডাগর হয়ে
মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। এ যে আমার কি অলীক কল্পনা—ভাবলেও লজ্জায়
মরে যাই।

অনন্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই কানে বাজল ঝুম ঝুম শব্দ।
ক্রমশ তা মিলিয়ে গেল।

ওর মনে হলো এক জোড়া পা মল ঝুম ঝুম করে তার হৃৎপিণ্ড মাড়িয়ে চলে গেলো। তাকে সে ধরতে পারল না।

পনেরো

পরদিন সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে সব একসঙ্গে বেরুলো। শীতের বাতাস বইছে হু-হু করে। ওদের মনেই হচ্ছে না শীত আছে।

ডিসপেনসারীতে গিয়ে দেখল মেয়েরা আগেই নেমে গেছে। কি সব সাজের বাহার। শুচি ও ভারতী হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। কল্যাণীর পরনে শালোয়ার কামিজ। পায়ে গুঁর তোলা চটি। পিঠে বেণী ঝুলছে। মুখে প্রসাধন।

সব থেকে মজার পোশাক গৈরীর। পশ্চিমী চঙে পরা নীল শাড়ি। ফতুয়ার মতো পকেটওলা ব্লাউজ। হুঁহাতে কছই পর্যন্ত কাঁচের চুড়ি। গলায় মালা। চোখ দুটিতে কান পর্যন্ত কাজল। কপালে ডাগর করে সিঁদুর টিপ। সিঁথিতে লম্বা করে গোলা সিঁদুর। খোঁপা বেঁধেছে পরিপাটী করে। চলতে ফিরতে রুহুঝুহু মিউজিক দিচ্ছে।

ডাক্তারবাবু বললেন—একি রে গৈরী, বিয়ে বাড়ির নেমস্তন্ন খেতে যাচ্ছিস নাকি ?

সবাই হেসে উঠল। গৈরী লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ছেলেরা মজা পেয়ে গেলো। অনন্ত স্বর করে গান ধরল—চুঁড়িয়া বাজে গৈরী ঠুমক ঠুমক...

—অনন্তদা! তুমিও!

গৈরীর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ল এমন এক দ্যুতির ঝলক যে অনন্ত চুপ মেরে গেল। স্ববীর ঠাট্টা করল—এক ধমকিতে তোকে ঠাণ্ডা করে দিল রে।

—কি করবি বল? নারী যে প্রবলা।

মোবনের ধর্ম! বোধ ও অবোধের লীলা চঞ্চল ঢেউ। মনের মধ্যে যখনই জোয়ার তখনই ভাঁটা।

ডাক্তারবাবু ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্তু অ্যাঙ্কুলেটকে ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই ভিতর ঠাসাঠাসি করে উঠে পড়ল। যাত্রী ছাড়াও মালপত্র নেহাত কম ছিল না। ওদের টিফিনের জন্তু লেবু, কলা, আপেল, পাউরুটি, বিস্কুট, ডিমসেদ্ধ, ষোলোজনের নতুন ইউনিফর্ম। ষোলো জোড়া নতুন জুতো মোজা।

গাড়ি স্টার্ট দিলো। হাসিখুশীতে মশগুল হয়ে ওরা চলল।

বেলা নটা নাগাদ শেরগড়ের হাসপাতালে পৌঁছে গেল। বেশ বড়সড় হাসপাতাল। সামনের বাগানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। সেখানেই সামিয়ানা টাঙিয়ে চেয়ার টেবিল পাতা হয়েছে। বাউণ্ডারী কেওয়ালের ধার বরাবর ব্রাটিশ

ক্লথের ঢাকা দেওয়া প্যাণ্ডেল। পনেরো ঘোলো ফুট লম্বা চওড়া জায়গা দিয়ে ব্রাটিশ ক্লথেরই পার্টিশন। সামনেটা ফাঁকা। এগুলো সব প্রতियোগীদের থাকবার জায়গা। প্রত্যেক ঘরে এক হাঁড়ি করে জল। মেঝেতে ব্রাটিশ ক্লথ পাতা।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোমরা ছুটো ঘর দখল নে নাও। একটা মেয়েদের জন্ম। একটা তোমাদের জন্ম।

বেশ একটা অস্থির উত্তেজনার মুহূর্ত।

সামনের মাঠে স্ট্রেচার ড্রিল হচ্ছে। সামিয়ানার নীচে বিচারকরা আছেন। টেবিলের উপর ছড়ানো আছে স্ট্রেচার, ব্যাণ্ডেজ, স্লিপ্ট, ব্ল্যানকেট, আইস ব্যাগ, হট ওয়াটার বটল ইত্যাদি সাজ-সরঞ্জাম। পাশেই হাসপাতালের উঁচু খাটের বিছানা।

ওদের টিমের নম্বর ছিল পাঁচ। মাইকে টিম নম্বর ফাইভ ডাকা মাত্র স্তবীর কমাণ্ড দিল—টিম গেট রেডি। অ্যাটেনশন।

চার নওজোয়ান এক লাইনে দাঁড়াল অ্যাটেনশন ভঙ্গীতে। টানটান পেশী। শক্ত মুখ। ধক ধক করছে। চোখে প্রতিজ্ঞা।

ফরোয়ার্ড মার্চ! একই তালে জুতোর শব্দ তুলে এগিয়ে গেল।

হন্ট! বিচারকের সামনে দাঁড়াল।

টার্ন টু দ্যা রাইট। রাইট টার্ন! সবাই ডানদিকে ঘুরল।

স্মালুট ঞ অফিসারস। স্মালুট!

চারটি হাত একই সঙ্গে স্মালুটের ভঙ্গিতে ফ্রিজড। যেন মিনিটারীর মহড়া। সবাই চোখ মেদিকে। বিচারকদেরকে ম্যাজিকের মতো ধরে নিল। স্তবীরের গলা যেমন ভঙ্গীও তেমন। স্পষ্ট উচ্চারণ।

পলক মাত্র সময়। একজন বিচারক বললেন—একটা খাদের স্তবী পথে পাথর চাপা পড়ে একজন আহত হয়েছে। তাকে ফার্স্ট এড দিয়ে নিয়ে এসো। পথে আসতে একটি নালা ও একটি ভাঙা দেওয়াল আছে। তা অতিক্রম করে আসতে হবে! দশ মিনিট সময়। হ্যারী আপ!

অনন্তর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। হাতও চলে খুব দ্রুত। এটা একটা রঙ্গমঞ্চ। কিভাবে অতি দ্রুত নিপুণ ও নিতুলভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে সেই শিক্ষারই মহড়া। এও এক থিয়েটার।

ওরা তা জানে। টেবিলের ওপর ছড়ানো সাজ-সরঞ্জাম দ্রুত হাতে তুলে নিল হুঁজন। অনন্ত তার রিকুইজিশন স্লিপ ঐখানেই লিখে দিলো। এখন সময়ের দাম খুব। পলকে বহে যুগ চারি।

—টিম ডবল মার্চ!

ওরা বেরিয়ে গেল। কোথাও ফাউল নেই। স্টেপিং-এ স্কুল নেই।

সেখানে পৌঁছে দেখল একটা সাজানো পেশেন্টের হাঁটুর উপর আড়াআড়ি-ভাবে একটা কাঠ রাখা আছে। তাতে লেখা—পাথর। দু'জনে সেটা ধরে সরিয়ে প্লিন্ট দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফেলল।

স্ট্রেচারে তুলে বয়ে নিয়ে আসছে। প্রথমে নালা। সেটা কেতাহুরস্তভাবে পার হলো। তারপর দুটি খুঁটির ওপর গোলপোস্টের মতো দেওয়াল। পেশেন্টকে নীচে নামাল। দু'জনে স্ট্রেচারের হ্যাণ্ডেল ধরে বুক পর্যন্ত তুলল। দু'জন টপ করে ভিতরে ঢুকে হাত উপরে করে স্ট্রেচার ধরল। তৎক্ষণাৎ অণু দু'জনে হাত বদল করে নিল।

গোটা অপারেশনটা এত দ্রুত, এত পরিচ্ছন্ন এবং এমন নিখুঁত সময় ও স্মার্টনেসের সঙ্গে হলো যে তখন তাদেরকে ছবির মতো দেখাচ্ছিল।

চারিদিক থেকে চট চট হাততালি পড়ল।

ওদের সাজঘরে অণুটিমের মেম্বাররা আনন্দে হাততালি দিচ্ছে। মেয়েরা লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছে ও হাততালি দিচ্ছে।

শুচি বলল—উঃ কি স্মার্ট!

—সুবীরদার কমাণ্ড!

ওরা হাততালি শুনল। কিন্তু মনোযোগ বিঘ্নিত হলো না। পেশেন্টকে এনে তার জন্ম নির্দিষ্ট বেডে শুইয়ে দিলো। সময় লাগল নয় মিনিট দশ সেকেন্ডে।

একজন বিচারক বললেন—ওয়েল ডান!

ফিরে এল সাজঘরে। রীতিমতো হল্পা পড়ে গেছে তখন। কেউ কেউ জড়িয়ে ধরল! শুচি ওদেরকে একটা করে কমলালেবু দিলো।

সুবীর বলল—ধন্যবাদ! তোরা ফিরে এলে আমরাও কমলালেবু দেবো।

মেয়েদের ডাক পড়ল বেলা ছুটায়। তখন ওদের মুখ শুকিয়ে আমসী। সকাল বেলাকার ঝকঝকে উজ্জ্বল সাদা পরীর দলটি ভয়-ভাবনা ক্ষিদে তেঙায় মলিন। পা কাঁপছে ঠক ঠক করে। হাঁটুতে হাঁটু লাগছে। দাঁতে দাঁত।

অনন্ত ছুটে এল হাঁ হাঁ করে—আরে আরে। করিস কি? এত নার্ভাস হলে চলে নাকি! চল্ চল্ এগিয়ে চল।

ওরা করুণ চোখে গুর দিকে তাকাল।

অনন্ত প্রায় ধমকের সুরে বলল—ঘাবড়াস না। জরুর ফার্স্ট হবি। ফার্স্ট! ফরওয়ার্ড মার্চ।

ওরা কমাণ্ড নিয়েই বেরিয়ে গেল। বিচারকের কাছে যখন পৌঁছাল তখন ধাত ফিরে পেয়েছে। ওদের প্রাণ সহজ ছিল। বেশ করল।

ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুবীর একটি করে কমলালেবু ধরিয়ে দিলো।

তারপর মৌখিক পরীক্ষা। প্রত্যেকের পঁচিশ নম্বর করে। আবার বুক দুক-দুক ভাব। কি হয়—কি হয়!

উদ্বেগ অস্থিরতা ও উত্তেজনার পর প্রায় সন্ধ্যার মুখে রেজার্ণ্ট আউট হলো। ডাঃ মণি ব্যানার্জীর জয় জয়াকার। সিনিয়ার, মাইনার ও গার্ল টিম ফাস্ট। জুনিয়ার টিম সেকেন্ড।

হাসিতে হাসিতে ছয়লাপ। ডাক্তারবাবু বললেন—মেয়েরা স্ট্রেচার ড্রিলে ফাস্ট হয়েছে।

সুবীর বলল—অনন্ত ভালো কারিগর।

—গৈরী একাই মৌখিকে বাইশ নম্বর পেয়েছে।

—অনন্ত ওর কানে কানে মন্ত্র দিয়েছে।

গৈরী চোখ পাকিয়ে সুবীরের দিকে তাকাল।

ডাক্তারবাবু বললেন—তোরা আমার মুখ রেখেছিস। কাল আমার বাংলাতে তোদের নেমস্ক্রম, লুচি পায়ের খাওয়াবো।

অনন্ত বলল—আর মাংসের ঝোল।

—উঃ। আবার একটা খরচ বাড়িয়ে দিলি। ঠিক আছে—তাই হবে।

—থিউ চিয়ারস্ ফর ডাক্তার দা।

—হিফ্ হিফ্ হুররে!

আলো ঝলমল মঞ্চ। টেবিলের উপর ফুলদানি। তাজা গোলাপের মোড়ক। সারি সারি পুরস্কার সামগ্রী। শিল্ড, কাপ, মেডেল।

টাই পরা সাহেবরা চেয়ারে বসে আছেন। সামনে বেক্ষির উপর প্রতিযোগিরা। প্রথম সারিতেই মেয়েরা। ইউনিফর্ম ছেড়ে আবার সেই রঙবাহার শাড়ি পরেছে। মুছে গেছে মুখের মলিনতা। প্রসাধন বলতে পাউডার।

বক্তৃতা হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণ। একজন বিলিভী মেমসাহেব প্রাইজ দিচ্ছেন। বয়সে বৃড়ী সাজ-পোশাকে ছুঁড়ি। প্রাইজ দিয়ে সবারই সঙ্গে হাওসেক করছেন।

গৈরীকে প্রাইজ দিয়ে বললেন—আঃ! ম্যারেড গার্ল!

পাশ থেকে একজন সাহেব বললেন—ইয়েস ম্যাডাম! সি ইজ কামিং ফ্রম এ ওয়ার্কিং ক্লাস।

মেমসাহেব ঘাড় নাড়লেন। গৈরী এসব কথাবার্তার বিন্দু বিসর্গও বুঝল না। আসলে ওর চোখ, কান কিছুই যেন কাজ করছে না। প্রাইজের কেরোসিন-স্টোভটি বগলদাবা করে চলে এল।

অনন্ত ওর দিকেই তাকিয়েছিল। বিপন্ন কিন্তু উদ্ভাসিত মুখের ভঙ্গী দেখে সুবীরের দিকে তাকাল।

সুবীর বলল—আহা! বেচারী নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

সে কি একটা কথা? যে জীবনে কখনো প্রাইজ পায়নি তার কাছে এ যে অভাবনীয়। এত আনন্দ ও সছ করতে পারছে না। কতক্ষণে ও মা, বাবা,

ভাই বোন ও আত্মীয় স্বজনদিগকে দেখাবে সেই ভাবনাতেই আকুল। আর ব্যাকুল অনন্তর জন্ম। মনে হচ্ছে ওকে ধরে চুমু খায়।

অনন্ত ও সূবীর চ্যাম্পিয়নশিপের শিল্ডটা হাতে নিয়ে আছে। ঠিক পিছনে আছেন ডাক্তারবাবু। একজন ফটোগ্রাফার ফটো তুলে নিলেন।

এই শিল্ড থাকবে ম্যানেজারের অফিসে। প্রাইজগুলি সব আপন আপন।

হৈ হৈ করতে করতে গ্র্যাণ্ডলেসে চড়ে কালিয়ারী এসে পড়ল। কি আনন্দ! ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে নাচতে লাগল।

পরদিন ডাক্তারবাবুর বাংলা সাত-সন্ধ্যাতেই সরগরম। কিসে গুলজার। যেন হাট বসেছে। ওঁর চেলা-চামুঁগুরা চিংকার এবং হাসিতেই আসর জমিয়ে দিয়েছে। তবু তো এখনো নাচ-গান শুরু হয়নি।

ডাক্তারবাবুর পাশের বাংলাটি মিস্টার নিকলসের। কালিয়ারীর ঠিকাদার। জাতে আংলো ইণ্ডিয়ান। বয়সে প্রবীণ। ওর বাংলাতে দুটি মেয়ে থাকে। বয়সে যুবতী। মেড-ইন-ইণ্ডিয়া বডি। বাং করে ফরেনের। ধূসর রঙের চুল। নীল রঙের চোখের মণি। লোকে বলে খাস বিলাইতি সাহেবের পয়দা। ওরাই নাকি মিঃ নিকলসের ক্যাপিটাল অ্যাসেট। না হলে এখন ভগ্নদশা। ইউরোপীয়ান সাহেবরা যখন ম্যানেজার এজেন্ট ছিলেন তখন ওঁর রমরমা ছিল। দেনী ম্যানেজারদের পাল্লায় পড়ে চার আনা পয়সার হিসাব-নিকাশের ছকে পড়ে গেছেন! অমন যে বিউটিফুল হিরোইন পুষেছেন তাদেরও বাজারদর নেমে গেছে। আজকাল রইস কাপ্তান কই?

এদের হৈ হুল্লাড় শুনে ওরাও গ্রামোফোন রেকর্ডে বিলিভী মিউজিক বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। কখনো বা উঁকি মেরে দেখছে—বাউগারী দেওয়ালের ওপার থেকে।

তাই দেখে ছেলে-ছোকরাদের উৎসাহ শতগুণে বেড়ে যাচ্ছে। ওরা তো দূর থেকে দেখেই চোখের সূথে মগ্ন হয়। গায়ে হাত দেবার মুরোদ নেই।

লুচি ভাজার গন্ধ ভাসছে। মাংস কেটে মশলাপাতি মেখে উলুনে চড়াবার প্রস্তুতি চলছে। অনন্ত খাটাল থেকে এক বালতি দুধ নিয়ে পৌঁছাল।

ডাক্তার বৌদি গাছকোমর বেঁধে রান্নার আসর তদারক করছেন। হাঁক-ডাক হুকুম চলছে অবিরত। ঈষৎ পৃথুলা এবং অলসমুখর শ্রোণীগতির প্রাবল্যে হুলছে। কোমরে দু' থাক মাংস। ঢাকা দেওয়ার অবকাশ নেই। দেবররা লক্ষণ তুল্য।

শঙ্খ বাউরী একটি ঢোলক নিয়েই হাজির। রঙ চড়িয়েই এসেছে। সন্ধে তার দেহরক্ষী। কুস্তিবাস বাউরী। খাদের টলোয়ান। মাইনার্স টিমের মেম্বার। জুড়ে দিলো ভাটুগান—

ভাহুর মনে রঙ লেগেছে
 শান্তিপুরা শাড়ি পরেছে
 আলগা খোঁপায় গাঁদা ফুল
 কৃষ্ণ কোমল চাঁচর চুল ।
 দীঘল চোখে—
 দীঘল চোখে কাজল পরেছে
 উজল কাজল রঙ ফিরেছে ।
 শান্তিপুরা—
 শান্তিপুরা শাড়ি পরেছে
 ভাহুর মনে রঙ লেগেছে ।
 তেটে-থেটে ধুম, তেটে-থেটে ধুম—
 চাড়ুম, চাড়ুম ।

এক পদ গাইতে না গাইতেই আসর জমে গেল ।

রাত দশটা । মাথার উপর চাঁদ উঠেছে । মোরাম রাস্তাটি গেরুয়া নদীর মতো দেখাচ্ছে । ছ' পাশে গাছ-গাছালির ছায়া । কেমন অদ্ভুত লাগছে তার মধ্যে হেঁটে যেতে ।

শীতের বাতাস বইছে হু হু করে । হাড় পাঁজর কাঁপছে । গৈরী শাড়ির আঁচলটা টেনে গায়ের উপর সাপটে নিল । বেচারীর গায়ে একটা উড্ডনীও নেই । সোয়েটার তো নয়ই ।

অনন্ত ওর গায়ে হাত দিলো । বরফের মতো ঠাণ্ডা । হি হি করে কাঁপছে । ঠোঁট দুটো থর থর করছে । দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক ঠক করে । অনন্ত কষ্ট পেল । বলল—গৈরী ! তোর খুব শীত করছে নারে ?

—খুব !

—আমার গায়ের চাদরটা নিবি ?

—তুমি কি গায়ে দেবে ?

—আমার গায়ে একটা হাক সোয়েটার আছে ।

—তাহলে দাও ।

তুষের চাদর । অনন্তর গায়ের গরম ওম্ জড়ানো । গৈরী পরম আগ্রহে সেটা নিজের গায়ে জড়িয়ে নিল । এদিক ওদিক বুলে পড়েছিল অনন্ত তা ভালো করে সঁটে দিলো । শীতের উষ্ণতা এবং প্রেমিকের স্পর্শ দুই-ই পেল ।

অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক করে হাসল । বলল—বাবাঃ । বাঁচলাম । ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছিলাম ।

অনন্ত বলল—তোর গায়ের চাদর নেই ?

—না ।

—তাকে যদি একটা নতুন চাদর কিনে দিই তাহলে তুই নিবি ?

—না।

—কেন ? আমার কি তোকে কিছু উপহার দেবার অধিকার নেই ?

—নিশ্চয় আছে। কিন্তু নতুন চাদর তুমি কিনে নিও। এই চাদরটা আমি তোমাকে ফেরৎ দেব না।

—বাঃ রে ! এ তো জুলুম !

—হ্যাঁ। জুলুম। খুলে নিতে পারবে ?

—তাই কি বলছি ? কিন্তু উপহার দিতে হলে তো নতুনই দিতে হয়। পুরনো ময়লা চাদর কেন ?

—কেন ? শুনে—এতে তোমার গায়ের গন্ধ লেগে আছে।

অনন্ত হেসে বলল—বাঃ রে গৈরী। বেশ রোমাণ্টিক ডায়লগ দিলি তো !

—রোমাণ্টিক ডায়লগ কি অনন্তদা ?

—তোর মাথা।

—বল না ?

—ওটা ভালোবাসার কথা।

—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ। তোর বরকে বলবি ?

—বরকে কি বলব অনন্তদা ? সে কি ইংরেজি জানে ? আকাট মুখ্য—
কয়লা কুলি।

অনন্ত মুখে চুক চুক শব্দ করে বলল—আহারে ! কি আফসোস !

—আফসোস না ছাই। আমি ওর ঘর করতে যাবই না।

—সে কি ? অনন্ত চমকে উঠল।

—হ্যাঁ তো ! দেখতেই পাবে।

কথা বলতে বলতে রেল ফাটক পার হয়ে গেল। বাজারটা তখন নিঃশব্দ। সব দোকানের বাঁপ বন্ধ। কুকুরগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল। ওদেরকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। শীতের বাতাসে উড়ে যাচ্ছে এঁটো পাতা। কাগজের ঠোঙা।

রাস্তার সেই মোড়াটিতে এসে দাঁড়াল যেখান থেকে ঘন বসতি ধাওয়ার অলি গলি, উঠোন বাদাড় পার হয়ে যেতে হয়। সেখানটা কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার।

গৈরী ওর বুকের কাছাকাছি সঁটে দাঁড়িয়ে বলল—এবার একাই আমি যেতে পারব।

—ভয় করবে না ?

—না। আর কিসের ভয় ?

—আচ্ছা! তাহলে আমি ফিরে যাচ্ছি।

অনন্ত ফিরতে গিয়েও ওর কাঁধে হাত রাখল। চিবুকটা তুলে ধরল। গৈরী দু'হাতে চেপে ধরল সেই হাতটা।

কেমন বিশ্বয় বিমূঢ় কণ্ঠে বলল—কি ?

চিরস্তনী নারীর সত্তা নিংড়ানো শব্দ—কি ?

তার অর্থ বোঝার মতো অভিজ্ঞতা অনন্তের নেই। গৈরীর তো নয়ই। তথাপি স্বতঃউৎসারিত ভাবোদ্দীপক শব্দ অনন্তর অন্তর প্রবলবেগে নাড়িয়ে দিলো। কি এক জ্বালা ফেটে পড়ছে শরীরে—মনে!

গৈরী বলল—অনন্তদা! আর তো আমাদের দেখা হবে না।

ওর গলাটা ভাঙা। কণ্ঠস্বরে বাষ্প জড়িত তাপ। অনন্ত জবাব দিতে পারল না। গৈরী বলল—কত সহজ আনন্দে দিনগুলি কাটল। যা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি তাই তুমি আমাদের হাতে তুলে দিলে। না হলে ছুনিয়ার মেয়ে কোনোদিন প্রাইজ জিতে আনবে তা কি ভাবা যায় ?

—আর কিছু পাসনি ?

—হ্যাঁ। পেয়েছি তোমার ভালোবাসা। কত ঠাট্টা করতে আমাকে। আমি রাগ করতাম। তখন তো তোমাকে চিনতাম না। যখন চিনলাম তখন বুক জুড়ে শুধু তুমি—আর তুমি। তোমার একটা ফটো দেবে। বুকে বেঁধে রাখব। রোজ সকালে উঠে দেখব।

অনন্তর ভিতরে বিরাট কিছু একটা হচ্ছিল। তোলপাড় করা ব্যাপার। ঠিক বুঝতে পারছিল না এটা কিসের অস্থিরতা। কেন এই তাড়না।

—কথা বলছ না কেন অনন্তদা ?

ওর হাতটা দু'হাতে করে বুকে চেপে ধরছে। নরম স্তনদুটিতে গভীর চাপ পড়েছে।

অনন্ত বলল—তোর সিঁথির সিঁদুরটা যেন এক রক্তনালা।! যদি ওটা না থাকত—যদি তোর বিয়ে না হতো—তাহলে—

—তাহলে ? তাহলে কি বল ? কি ভীষণ ব্যাকুলতা !

—স্বপ্ন দেখতাম।

—কিসের ?

—বলব না।

—উঃ! কথাটা খোলসা কর অনন্তদা।

বলতে বলতে ওর হাতটা জোড়ে কামড়ে ধরল।

—আঃ! করিস কি ? ছাড়—ছাড়। জোর করেই টেনে নিল হাতটা।

—এঃ মা! ছিঃ ছিঃ! তোমার হাতটা নোংরা করে দিলাম।

বলতে বলতে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে দিলো। অনন্ত গুর কাঁধজুটো চেপে ধরল। বলল—কি করে ডিঙোব ঐ রক্তনালা।

তুমি না পুরুষ!

প্রকৃতি ডাক দিয়েছে। পুরুষের সাধ্য কি তাকে উপেক্ষা করে? অনন্তর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। দোলায়মান দ্বিধা জাগ্রত পৌরুষের কাছে পরাভূত হলো। মরে গেল আজন্ম সংস্কারের গাঢ় কুহেলিকা। প্রবলভাবে চেপে ধরল প্রকৃতিকে!

ক্ষণিকের বিমূঢ়তা। চিবুক তুলে গৈরী বলল—কি?

অশ্রুট শব্দ। শব্দের তরঙ্গে অশ্রুত রিমিম্বিমি। চিবুক উচু করে দাঁড়িয়ে আছে গৈরী। টলটলে চোখের তারায় নিবিড় প্রত্যাশা।

—একটি চুমু দে!

—আঃ—

একটি চুম্বন। বিশাল চৌম্বক শক্তির একটি চেউ। দাবদাহী যন্ত্রণার একটি শূলিন্দ্র। অনন্ত রহস্যময় প্রকৃতির বৃকে খসে পড়া ফুলের একটি পাপড়ি। দেশ, কাল, জাতি, সমাজ ও সংস্কারের একটি ব্যতিক্রম। নিরয়ন কালচক্রে একটি স্থির মুহূর্ত!

অনন্ত সেখান থেকে চলে গেল ভূতে পাওয়া মাহুষের মতো। গৈরী তখন চিরন্তনী নায়িকা। কিশোরীর পূর্ণ কৈশোর যৌবনের তরঙ্গ বিক্ষেপে চঞ্চল। মানস লোকের গহীন অন্ধকারে বলকিত দামিনীর উদ্ভাস। অন্তরটা ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেল। বাকী রইল কত রাতের স্বপ্ন। কত রজনীগন্ধার সুবাস। মর্মের তিয়াস! অনার্ঘ আকাজক্ষা!

সতেরো

১৯৫৫ সাল। দামোদর কোল কোম্পানির শতবর্ষ পূর্তি। সেই উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, সভা সমিতির প্রস্তুতি চলছে। অল্পদিকে চলছে শোষণের অবাধ রাজত্ব। এ একটা বিরাট জাল। সারা কয়লাক্ষেত্রব্যাপী বিছানো। রুই, কাংলা, হাঙ্গর, কুমীর আশায় গুঁৎ পেতে থাকে। চুনোপুঁটির ঘুরতে ঘুরতে তাদের মুখে এসে পড়ে। তারাও গপ করে গিলে ফেলে।

সব কলিয়ারীতেই আছেন মালিক, ম্যানেজার, গোমস্তা, ঠিকাদার, সরদার, ক্যাশিয়ার, হাজিরাবাবু, গুদামবাবু। তাদের মাথার ওপর এজেন্ট। ম্যানেজার হতে হলে ম্যানেজারী পাশ করতে হয়। কিন্তু এজেন্ট হবার জন্ম তার দরকার নেই। মালিকের আস্থাভাজন চাপরাশী কিংবা খাজাঞ্চীবাবুও এজেন্ট হতে পারতেন। এমন দৃষ্টান্ত ছিল ভুরি ভুরি।

কিন্তু দামোদর কোল কোম্পানি বিলিভী সংস্থা। সেই যখন গল্পরগাড়ির

জমানা ছিল, ঘোড়া ছিল দ্রুতগামী বাহন তখন সেই ঘোড়ার যুগে যাদের পশু ও বিস্তার শিল্প-বিপ্লবের নামে একশো বছর ধরে ভারতীয় কয়লা ক্ষেত্রের মুনাফাভোগ, তাদের মালিক বলতে কোনো ব্যক্তিকে বোঝাত না। ছিল বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্স। ভারতবর্ষে এক বা দু'জন রেসিডেন্সিয়াল ডাইরেক্টার থাকতেন বাদবাকী সব বিলেতে অথবা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে।

মেথান থেকেই কোম্পানি পরিচালনার নীতি নির্ধারিত হতো। শক্ত সমর্থ ঋণ থাকত সর্বত্র। এজেন্ট, ম্যানেজার, গোমস্তা, সরদার ও চাপরাশী দিয়ে শ্রেণি ডাঙাবাজীর উপর নির্ভরশীল যে প্রশাসন দামোদর কোল কোম্পানী তা থেকে কিছুটা ভিন্ন। যদিও সেই সবই আছে। শুধু একটি লেবার সাহেব নিয়োজিত হয়েছেন ইন্টেলেকচুয়াল চামচাগিরির জন্ম। আইনত যার নিয়োগ শ্রম কল্যাণের জন্ম। প্রথাগত কারণে তিনিই শোষণের পুরোহিত।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। তাই শাসন ও শোষণের ব্যাপারগুলি বৃদ্ধি করে চালায় নিতে হয়। একটা সফিস্টিকেটেড ম্যানার্স চাই তো!

পঞ্চাশের মধ্যস্তরে এবং পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের কারণে খাণ্ডদ্রব্য বাজার থেকে উধাও হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা এবং মুনাফা শিকারী ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা তা গুদামজাত করে ফেলেছিলেন। যুদ্ধের জন্ম জ্বালানীর প্রয়োজন মেটাতেই হবে। খনি শ্রমিকরা যদি না খেয়ে মরে হেজে যায় তাহলে কয়লা তুলবে কে? এই জ্ঞানটা সব মালিকের টনটনে ছিল। তাই রেশন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

তাতে দেওয়া হতো চাল, ডাল, গম, কেরোসিন তেল, সাবান ইত্যাদি। যাকে বলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য।

কিছুদিন সাবান বস্তাটা বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাই দেওয়া হতো সাজিমাটি। ঘাম, তেল, কয়লা, বালি মাথা শরীর সাজিমাটি দিয়ে ধুতে হতো। গাগুলি খর খর করত। চামড়া ফেটে যেত। মেয়েরা মাথা ঘসত লাল রঙের চিট মাটি দিয়ে।

দিন বদলে গেছে। মধ্যস্তর ফুরিয়ে গেছে। বাজারে চাল ডাল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু রেশন প্রথা বন্ধ হয়নি। তাহলে যে ডি. ডি., ডি. সি., মজুতদারের শিরে সংক্রান্তি। অবিরল শ্রোতাধারায় পুষ্ট ঝর্গা। তার ভাগ সবাই পায়। এজেন্ট থেকে রেশনবাবু পর্যন্ত।

সব কোম্পানীতে রেশন সাপ্লায়ের ঠিকাদার থাকত। বাজারদর মোতাবেক দাম পান তিনি। সরবরাহ করেন বাজারের অবিক্রীত মাল, তার সঙ্গে পাইল হয় যুদ্ধের সময়ের গুদামজাত মাল। মিশ্রণের অঙ্কটা ভালোই বোঝেন।

শ্রমিকরা সেই মাল নিতে বধ্যি থাকে। ফলত কুলি ধাণ্ডায় যখন ভাত রান্না হয় তখন এক বিটকেল দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যায়। ওদের পাকস্থলী

কি দিয়ে তৈরি তা ভগবান জানেন। কিন্তু কি আশ্চর্য তার জন্ম বিক্ষোভ হয় না। শ্রমিকরা হয়তো মনে করে এর চেয়ে ভালো মাল পয়দা হয় না।

পবন এখন রেশনবাবু। একদা লেবার সাহেব হতে গিয়ে ল্যাঞ্জে গোবরে হয়ে এসে রেশনের দৌলতে জিন্দেগীর রোশনাই পাণ্টে নিয়েছেন। তাঁর উপরওলা ডি. সি. সাহেব।

ওহো! কি অপূর্ব মনিকাঞ্চন সংযোগ।

স্বমিতবাবু এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দিন থেকে ভাবছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যে করবেন তার মতো জনমত চাই তো! এই নিয়ে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। তাঁরাও আন্দোলনের পক্ষপাতী? কিন্তু কিভাবে?

এই স্ত্রেই একদিন তিনি রেশনবাবুকে বললেন—আপনারা রেশনে যা দিচ্ছেন তা কি গরু ছাগলেও খেতে পারে?

উনি বিনয় দেখিয়ে হাত কচলে বললেন—কি বলবো ভাই? যেমন সাপ্রাই আসছে তেমনি দিচ্ছি। আমার তো জমিদারী নেই যে চাখের চাল এনে দেবো।—থামুন। জমিদারী থাকলে আর চাকরী করতে আসতেন না। জমিদারী বানাবার জগুই এসেছেন।

—বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছেন।

হ্যাঁ। আমার কথা এই রকমই। মনে রাখবেন কুলি কামিনরাও মাছুষ। ভালো মাল না দিলে ফল বুঝবেন। বারমান সাহেবের জমানা ফুরিয়ে গেছে।

ওর শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পবন লেজ গুটিয়ে পালালেন।

বিকলেই ডি. সি. সাহেবের অফিসে স্বমিতবাবুর ডাক পড়ল। অনন্ত তখনই খাদ থেকে উঠে এসেছে। নাওয়া খাওয়া হয়নি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কয়লা কালিতে মুখটা বাদরের মতো দেখাচ্ছে।

স্বমিতবাবু বললেন চল অনন্ত! আজ ডি. সি.-র সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। অনন্ত তৎক্ষণাৎ ওর সঙ্গে নিল।

ডি. সি. গস্তীর মুখে বসে আছেন। মতবাবুকে বসতেও বললেন না। উনিও বসলেন না। মনে মনে উষ্ণ হয়ে উঠলেন। বললেন, কি ব্যাপার দেবুদা! হঠাৎ তলব কেন?

—তুমি খুব বাড়াবাড়ি করছ স্বমিত।

—কিসে দেখলেন?

—আজ পবনকে শাসিয়েছে?

—শামাইনি ঠিক। তবে রেশনের মালটা সাপ্রাই যাতে ভালো হয় সে কথা বলেছি।

—গুণাথো এটা তোমার বিজনেস নয়।

—বিজনেস নয়। প্রয়োজন। মাছুষের প্রয়োজন।

অনন্ত বলল—ঐ চালের ভাত কি কেউ খেতে পারে ? জঘন্য অথাচ্ছ !

—এসব ব্যাপারে তুমি কেন নাক গলাচ্ছে! অনন্ত ?

—আপনিই বা কেন উল্টো গাইছেন ?

—তুমি বুঝবে না। এটা আমার ডিউটি।

—থারাপ মাল সাপ্লাই দেওয়া ?

উনি উফ হয়ে উঠলেন। যদিও স্ত্রীর নিষেধ আছে অনন্তর সঙ্গে থারাপ ব্যবহার করতে তবু ওর অহংকার আক্রান্ত হওয়ায় বেতাল হয়ে গেলেন।

বললেন—স্বমিত ! এই ছেলেগুলির মাথা খেয়ে বসে আছো।

স্বমিতবাবু বললেন—ছেলেটার মাথা আপনার আমার চেয়েও সাফ। দিন কয়েক পরে আপনারই না মাথা খেয়ে বসে।

—তাই দেখছি। পেকে ঝুনো হয়ে গেছে। এদিকে মুখ টিপলে দুধ বেরাবে। গায়ে আঁতুরের গন্ধ যায়নি।

তেমনি কৌতুক কটাক্ষে এক পলক তাকিয়ে স্বমিতবাবু বললেন—আপনারই তো স্বজাতি কুটুম্ব। দেখুন না মেয়ের পাত্র হিসেবে বেছে নিতে পারেন কিনা ? ছেলে ভালো। মানাবেও বেশ। এবং হয়তো আপনার মেয়েটিও এ প্রস্তাব লুফে নেবে।

উনি গর্জন করে উঠলেন—স্বমিত ! তুমি কি আমাকে অপমান করতে কোমর বেঁধে এসেছো ?

—ঠিক উল্টো ! আপনিই আমাকে অপমান করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু দেবদা, বাজারের যত রিজেক্ট মাল নিয়ে যে শ্রমিকদিকে দিচ্ছেন এ খবর হয়তো আপনার চীফ মাইনিং ইনজিনিয়ারও জানেন না।

—তবে যাও। তাঁর কাছেই দরবার কর গে।

—সেটা আপনি না বললেও করবো।

—অলরাইট ! তবে জেনে রেখো আমার স্টাফদিকে যদি শাসাও তাহলে আমাদেরও শাসাবার উপায় আছে।

স্বমিতবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন—তা আবার নেই ? বিশাল ঠাঙাড়ে বাহিনী পুষে রেখেছেন। একশো বছর ধরে শ্রমিকদের বৃকে স্টিম রোলার চালাচ্ছেন—এসব কি জানি না ?

—তবে আবার কি ? মনে রাখলেই মঙ্গল। যাও—ফালতু তর্ক করো না।

স্বমিতবাবু ও অনন্ত চলে আসছিল। উনি আবার অনন্তকে ডেকে বললেন—দেখো অনন্ত, তুমি একটা ব্রাইট স্টুডেন্ট। তোমার সম্ভাবনা আছে। স্বমিতের সঙ্গে ঘুরে কেন তা নষ্ট করছ। ওর সঙ্গে গাঁটছড়াটা কাটাও। স্বমিতবাবু জনাস্তিকে বললেন—তারপর গাঁটছড়াটা ওর মেয়ের সঙ্গে বেঁধো।

ডি. সি. সাহেব তা শুনেতে পেলেন কিনা কে জানে কিন্তু অনন্তর খুব থারাপ

লাগল। বলল—ঐ একটা কথা বলে ওকে কেন খোঁটা দিচ্ছেন দাদা? এটা ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

—তা ঠিক। তবে এটাই গুর মনোবাসনা। তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসে এ প্রত্যাব গ্রহণ করতে পারো। তাতে দামোদর কোল কোম্পানীতে তোমার চাকরি-বাকরিতে আয় উন্নতির নূতন দিগন্ত খুলে যাবে। আফটার অল এই ঘুঘু সাহেবগুলির কোম্পানীর উপর তলায় খুব কদর।

অনন্ত জবাব দিলো না। মাথা নীচু করে হাঁটতে হাঁটতে মেসে ফিরল। স্নান করে ভাত খেতে বসে গেল। কখন সেই সকাল সাড়ে সাতটায় চারটি পরোটা, তরকারি ও গুড় দিয়ে জল খাবার খেয়ে খাদে গিয়েছিল।

সেটা ১৯৪৭ সাল। সোদপুরের বটতলায় বসে জনাকয়েক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা খনি শ্রমিকদের জন্ম আন্দোলনের একটা কর্মসূচী গ্রহণ করছিলেন। বেতন, ভাতা, বোনাস, ভবিষ্যনিধি, বার্ষিক সবেতন ছুটি, চাকরির স্থায়িত্ব, চিকিৎসা, জল সরবরাহ, শিক্ষা, কাজের সময়সীমা, কয়লাটবের সমতা ইত্যাদি সতেরো দফা দাবিপত্র পেশ হয়েছিল। সরকারী হস্তক্ষেপের দরুন তা নিয়ে প্রথম বোর্ড অফ কন্সালিয়েশন বা আপস মীমাংসা পর্যন্ত। তাতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সরকারী আমলা, কোল কোম্পানীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

ফয়সালা একটা হয়েছিল। কাট-ছাঁট, দর মোলাই করে নীতিগতভাবে ট্রেড ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া কিছুটা পূরণ করা হয়েছিল। তার দরুন একজন মালকাটা গাঁইতি দিয়ে কয়লা কেটে ছত্রিশ ঘনফুট কয়লা টব গাড়িতে বোঝাই করার মজুরি দাঁড়াল—মূল বেতন আট আনা। পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধিজনিত চার আনা। ভাতা একশো পঞ্চাশ শতাংশ এক টাকা দু'আনা এবং খাণ্ড সঙ্কটের দরুন চালু রেশন বাবদ ছয় আনা। সাকুল্যে দু' টাকা চার আনা। তাতে ভবিষ্যনিধি কাটা যেত মওয়া শতাংশ হিসেবে নয় পয়সা।

দিন হাজারী শ্রমিকদের মূল বেতন দৈনিক আট আনা। ভাতা—বারো আনা। রেশন বাবদ ছয় আনা। সাকুল্যে এক টাকা দশ আনা। মহিলা শ্রমিকদের তার চেয়েও কম।

স্বমিতবাবু ফাইল খুলে হিসেব-নিকেশ করতে করতে বললেন—আমরা রেশন তো নাও নিতে পারি। কোম্পানী তার দরুন ছয় আনা পয়সা দিয়ে দিক। বাজার থেকে মাল কিনব। দাম দু' পয়সা বেশী লাগবে কিন্তু মাল ভালো পাবে। পচাধসা জোয়ার বাজরা চাল গুম খেয়ে যে পেটের অস্থখে ভুগে ভুগে লোকগুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে তা থেকে বাঁচবে।

—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

—আমরাই বাঁধবো।

—সুন্দরী তো সাহেবরা সব খাল্লা হয়ে যাবে। তখন শুরু হবে শ্রমিক নির্ধাতন।

অনন্তর আশঙ্কা অমূলক নয়। তা স্মিতবাবু জানেন।

বললেন—তা তো হবেই। তার মোকাবিলাও আমাদের করতে হবে। ব্রিটিশরা নির্ধাতন কম করেনি। তা দিয়ে তো গণ-আন্দোলন রোধ করতে পারেনি। তেমনি গণআন্দোলন যখন শুরু হবে তখন কোথায় হারিয়ে যাবে ডি. ডি., ডি. সি., বারমান, পডিস, গুপ্তা, ভাবা, তেওয়ারী, পাণ্ডে, সিং, লাল।

অতন্ত বলল—তাই যেন হয় দাদা।

আঠারো

অনন্তর এখন গৈরী ছাড়া দেবী নেই। ডায়েরি লেখার শুরুতেই সে গৈরী বন্দনা সেরে নিল। পারলে-উলফৎ, জিন্দেগী, মুহব্বৎ, ঘুঘুট, ছুনরী, পায়েল, পয়োধর ইত্যাদি শব্দ যেটে একটা গজল লিখে ফেলত। কিন্তু এত এলেম নেই।

তারপর লিখল এই সময়টাই কয়লা শিল্পের এক ক্রান্তিকাল, স্বাধীনতার পর ভারত গঠনের প্রয়াস শিল্প বিপ্লবের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সজাগ হয়ে উঠেছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট বড় মাঝারি নানা শিল্পাঙ্গণ শুরু হয়েছিল সরকারী ও বেসরকারী পরিচালনায়।

ভারতের রূর এলাকা বলে খ্যাত আসানসোলকে ঘিরে আমলাদহির সাঁওতাল পাড়া উঠিয়ে চিত্তরঞ্জন লোকামোটিভ ওয়ার্কস, রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্থান কেবলস, কল্যাণেশ্বরীর উপরে বরাকর নদে মাইথন ডাম, দুর্গাপুর ফরিদপুরের জঙ্গলে ব্লাস্ট ফার্নেস, কোক-ওভেন, বার্নপুরের এক্সটেনসন এসব তো হচ্ছিলই সেই সঙ্গে চালু হচ্ছিল নতুন নতুন কয়লা কুঠি।

১৯২৬ সালে যে ইন্ডাস্ট্রিয়েল ডিসপিউট অ্যাক্ট পাশ হয়েছিল তার হাওয়া এতোদিনে এসে পড়ল কয়লা শিল্পে, মাঝে রয়েছে গেছে আঠাশটি বছর। তীব্র মন্দা ও স্ফূর্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মধ্যস্তর, দেশভাগ এবং স্বাধীনতা ঐতিহ্যবাহু বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কয়লাখনির কয়েক লক্ষ শ্রমিকের অঙ্কুপে জীবন যাপন নিয়ে ভাববার অবসর কারো ছিল না।

দেবেন সেন এসেছেন সেই ভাবনা নিয়ে। প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মী। কয়লা কুঠিতে শ্রমিকদিকে সংঘবদ্ধ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আশ্রয় চেষ্টিয়ে লেগে আছেন। কিন্তু কুলিকামিনরা এমন ধাতু দিয়ে তৈরি যে একটা প্লাটফর্মে, একটা পতাকার নীচে দাঁড়াবার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না।

বড় সাহেব তো অনেক দূরের মানুষ। ডি. ডি., ডি. সি. কটকট করে তাকালে কাপড়ে পেছাব করে ফেলে। খাণ্ডায় একটা চাপরাশী এলে বাচ্চা থেকে বড়ো

পর্যন্ত সবারই বুক ধরফড় করে। ভিতরে আশ্রয় বলে কিছু নেই। মনের ব্যাটারী কখনো চার্জ হয় না। বেবাক ড্যাম্প হয়ে গেছে। সেলগুলো বিলকুল ড্যামেজ।

একে কি করে জাগাবে? কি করে বোঝাবে এক টাকা ছ' আনা মজুরি আর ছ' আনার পচাধসা রেশনে সংসার চলে না। ভাত চাই, কাপড় চাই, মাথা গুঁজবার ঠাই, শিক্ষার সুযোগ।

চাওয়া পাওয়ার এই বোধটাই ওদের নেই। কতটুকু পেলে একটা শ্রমিকের চলতে পারে তাই তারা বোঝে না।

আসলে ওরা জীবন ধারণ করে ভীষণ ভয়ের জগতে। আরা, বালিয়া, ছাপরা দেওরিয়া, রায়পুর, বিলাসপুর, মুন্সের, মধুপুর, ভাগলপুর, বেনারসের দূর দূর গ্রামাঞ্চল থেকে যারা কয়লাকুঠির শ্রমিক রাজপুত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ভূমিহার-জমিদার জ্যোতদার মহাজন ও ব্যবসাদারের কুক্ষিগত তাদের জমি, জিরেত, হাল, ফাল, বলদ, মোষ। ওরা শুধু শ্রমিক জোয়ার, বাজরা, পচাগম খেয়ে গায়ের ঘাম রক্ত ঢেলে দেয়। মেয়েদের ঘোঁষন স্বদের দায়ে বন্ধক থাকে।

তাই ইউনিয়ন করতে গিয়ে যদি চাকরী চলে যায় তবে ঐ সব চশমখোর খুন পিয়াসীদের পাল্লায় গিয়ে পড়তে হবে। যদিও খুন পিয়াসীরা কলিয়ারী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অনেক আগেই।

তারা সব বাবু চাপরাশীর চাকরী করে। স্বদ ও ছুধের ব্যবসা করে। মালিকের হুকুমে শ্রমিকের ঘাড়ে ডাঙা মারে। তবু তার মধ্যেও যৎসামান্যই হোক মজুরি তো পায়। দেশ গাঁয়ে যে তারও উপার নেই।

কাজেই আন্দোলন যদি করতে হয় তবে সবারই আগে ভয়কে জয় করতে হবে। এক জুজুর ভয়ে যে বেসামাল অবস্থা তার পরিবর্তন চাই।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পেল একজোড়া কবুতর কবুতরী তার জন্ত অপেক্ষা করে বসে আছে। বারান্দায় বেরিয়েই দেখতে পেল রামধনি দাঁড়িয়ে আর শাড়ি পড়া একটি মেয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসে। তার পাশে একটি গোলাপ ফুল আঁকা টিনের স্ম্যটকেশ এবং চটে বাঁধা একটি পুঁটুলি। হয়তো বা বেড়িং।

রামধনি গুকে সেলাম করল—সেলাম বাবুজি!

—কি হে? দেশ থেকে ফিরলে বুঝি?

হাঁ বাবুজী? আপনা জরুকো লে আঙুল বাড়িয়ে লালশাড়ি ঢাকা মেয়েটিকে দেখিয়ে দিলো। অনন্ত সেদিকে তাকাতেই মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে পেল একটি নাক ও নোলক। বাকীটা ঘোঁমটায় ঢাকা।

অনন্তর তদবির সুপারিশে রামধনি এখন বছরে একবার করে ছুটি পায়। তাতে যে ভূষণ মেটেনি সে তো বউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা দেখেই বুঝতে পেরেছে।

বলল, ঠিকেরই কিয়া।

—আর বাবুজী হামকো খোড়া মদৎ করিয়ে ।

—ক্যা মদৎ—বলো ?

এই রামধনিকে দিয়েই ও লোডারদের বৃহভেদ করেছে । না হলে জ্বরদস্ত সরদার এতোয়ারীর দলে ঢুকে অত তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করা এবং বেশ কিছু সংখ্যক লোডারকে ইউনিয়নের মেম্বার করা সহজ ব্যাপার ছিল না । এখনো রামধনি অগ্নাশ্র দলের লোডারদের মধ্যে খুব গোপনে প্রচার চালাচ্ছে । তাকে মদৎ দেওয়া অনন্তের নৈতিক দায়িত্ব ।

রামধনির চাহিদা সামান্যই । বউকে রাখবার জন্য একটা চার দেওয়ালের আড়াল ও মাথার উপর একটা ছাউনী ।

অনন্ত বলল ছুটি ঘাবার আগে যদি একথা বলতে তবে এতদিনে কিছু করতাম । হঠাৎ যে বউ নিয়ে এলে তা এখুনি কোথায় থাকতে দেবো ? ও বলল—নেহী বাবুজী । জলদি বাজীকো কুছ নেহী । দু' দশ রোজ কেই দোস্ত, রিস্তেদারকো পাশ গুজর লেব ।

—তবে ঠিক আছে । আমি ডি. ডি. সাহেবকে বলছি যেয়ে ।

ওর বউ উঠে এসে দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল । তারপরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল । আগে আগে রামধনি । ওর কাঁধে স্নাটকেশ । হাতে চটের পুঁটুলি । কলিয়ারী গিয়ে অনন্ত প্রথমেই রামধনির জন্য দরবার করল । উনি বললেন—এই মালগুলিকে কোথা থেকে জোটাও অনন্ত ?

কটির ব্যবস্থা করবে ?

—এইটার তো করে দিন ।

অনন্তর কথা উনি ঠেলতে পারেন না । তাই গুদামে টিপ করে করে দিলেন এককাহন খড়, দু'কেজি রকুই দড়ি, এক কেজি পেরেক দশটি রোলা কাঠ আর ছয়টি কাঁচা বাঁশ । খাদ থেকে একটা মিস্ত্রীও ব্যবস্থা করে দিলেন ।

রামধনি তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মাটির দেওয়াল দিয়ে ঐসব পালপত্র চড়িয়ে নিজের একটা ছোট ঘর বানিয়ে নিল । ব্যস স্বপ্ন সার্থক । ছোট্টাশা ঘর হোগী বাদলো কো ছাউনী ।

ওর বউ বাসমতী নূতন করে বাসর শয্যা পাতল । এতদিনে তাদের শোবার জন্য একটা ঘর হলো । না হলে কি দেশে কি কলিয়ারীতে স্বামী স্ত্রী যে একটা রাত এক বিছানায় শোবে তার জো ছিল না ।

ভাব ভালবাসার প্রাকৃতিক প্রয়োজনটুকু মেটাবারও ঠাঁই ছিল না । অন্ধকার ছাড়া আড়াল ছিল না । ছাঁচতলে, বাদারতলে মিলন হতো । তাও সদাই শঙ্ক পাচ্ছে কেউ দেখে ফেলে ।

তার অনন্তকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে ?

এদিকে গৈরী তখন বিরহিনী । এক চুষনের ঠালায় দশ দশার বিকার ।

লেখাপড়া দায় হয়েছে। গুলু যে কত কষ্টের টাকা দিয়ে ওর জ্ঞান নতুন বই কিনে দিয়েছে তার পাতায় পাতায় অনন্তেরই ছবি দেখে ও। খাতাতে প্রেমপত্র সেখে—শ্রীচরণ কমলেশু সন্মোদন করে। কিন্তু কোনো চিঠিই দিতে সাহস হয় না। খাতার পাতাতেই থেকে যায়। যদি কখনো স্মরণ পায় তবে খাতা শুদ্ধ অনন্তকে দিয়ে বলবে—তুমি বড় নিষ্ঠুর। এইগুলো পড়ে দেখবে আমি তোমার জ্ঞান কেমন করে মরে যাচ্ছি।

কি ভাগ্যিস এসব দেখবার লোক নেই ওদের বাড়িতে। কেউ তো আর লেখাপড়া জানে না। বাংলা তো নয়ই।

বিরহে হা হতাশ করার স্মরণও অনেক। বাপে তিনপালিতে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করে। ঘরের চেয়ে চব্বতরাতেই থাকে বেশী। ওর মায়ের বরাবর দিনপালি।

মেজান্ন রান্না বান্নার ব্যাপারটিও সরল। ভোরে উঠে ভাত চড়িয়ে ঘাটে যায়। কিরে এসে ডাল তরকারি রাঁধে। তারপর ঘরগুটি খেতে বসে যায়। সকাল আটটার মধ্যেই একটা পাট চুকল। হাঁড়িতে রইল কিছু ভাত তরকারী। ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে লাগলে নিজেই নিয়ে খাবে।

বাপ মা তো ডিউটি বেরিয়ে গেল। বেলা দশটা নাগাদ ছোটদেরকে খাইয়ে দাইয়ে সেও বই বগলে স্থল চলে যেত।

গুলু ও গোবিন শালা ভগ্নীপতি। দুজনেই সঙ্গীত শিল্পী। কাজেই ভাব-রাগটা বরাবরই জম্পেশ ?

এখন ফাস্তন মাস। সামনে ফাগুয়া। তাই ওরা দুজনে এক রবিবারের দুপুরে ডিসেরগড় হাটে এসেছে সওদা বেসাতি করতে। আসতে আসতেই গলা খস খস করছিল। তাই এক প্রাইভেট ভাটিখানায় ঢুকে পড়েছে। এসব স্বলুক সন্ধান ওদের ঠিক জানা আছে।

মাল-ফাল নিয়ে মুড়ি-কলাই ভাজা দিয়ে বেশ আয়েস করে খাচ্ছিল। নেশাটাও জমে উঠেছে। তখন এল মনিলাল। সঙ্গে তার বউও আছে। ওরাই গৈরীর শস্তর-শাস্তি।

গুলুকে দেখেই মনিলালের কুটুখ পীরিত জেগে উঠল। গোবিনের একদা পরিত্যক্তা বউটি তার সামনেই হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ল মদের বাটিটি নিয়ে। এক নারী তিন পুরুষ। সম্পর্কটা হামি-ঠাট্টার। অতঃপর আসর জমে উঠল। বিয়াই-বিয়ানের সঙ্গ পেয়ে গুলুও খুব খুশী। খরচ-খরচার হিসেব কে করে ? ঝানাৎ ঝানাৎ পয়সা কেলছে আর মদ কিনছে।

মনিলালের বউ বলল—বিয়াই ! কতদিন আর বিটিটিকে ঘরে পুরে রাখবি ? ঝ-বারে গাওনা করাও দে।

গুলু চোখ পিট পিট করে বলল—গাওনার তো খরচ আছে।

—সে তো আছেই।

—তারপর আমার বিটি পড়ালিখা শিখছে।

—সে শিখুক কেনে ?

—আর দু-বছর পরে ম্যাট্রিক পাশ করবেক।

—ওঃ বাবা। তাকে আবার বেটাটি আওয়ারা হঞ্জে যাবেক।

—তা কোনে হবেক ?

—হবেক নাই কোনে ? জুয়ান বয়েস। তুর বিটিটিও তো ছুটু নাই।

উও তো ভাগর হঞ্জেছে। বেশি দিন ঘরে পুখে রাখলে রীত-প্রীত বদলে যাবেক।

—অমন কথা বলিস না। আমার চাঁদের পারা বিটি। মস্ত বুঝিলদার।

বিন্মাই বিন্মান পালা করে কথা বলছে। গুলু একা। তাই গোবিন যোগান দেবার জন্ত বলল—দুটা বছর পড়তে দে। ম্যাট্রিক পাশটি করুক। একটি নাম থাকবেক লুনিয়া ঘরের বিটি পাশ করেছে।

মনিলালের বউ বেঁবে উঠল—অমন কথা বলিস না। দু বছর আমি ঘরের বউকে বাপের ঘরে থাকতে দিব নাই।

গুলু বলল—তাই বলে তুরা নিঞ্জে যেঞ্জে আমার বিটিকে ডিপুতে কামিনের কাজ করাবি নাকি ? সেটি হবেক নাই।

—আগে পাঠাঞ্জেই ঝাখ—আমরা কি করি ?

—ঘরে যেঞ্জে বুঝাবুঝি করতে হবেক তো।

—সে করগা। কিন্তুক বলে দিছি এই বোশাখ মাসে গাওনা করতে হবেক।

গুলুর নেশা কেটে গেল। এই তো ফাস্তন। বোশেখ মাসকে দেরি কোথায় ? এরই মধ্যে অত টাকাকড়ি পাবে কোথায় ? পয়লা প্রথম মেয়ে দ্বিরাগমনে খুশুরবাড়ি যাবে। তাকে কাপড়, চোপড়, গয়নাগাঁটি দিতে হবে। তারপর কুটুমদিকে ভোজ।

বলল—খাম। টাকাকড়ি যোগাড় হোক !

—তার লেগে বসে থাকব নাকি ? আঘন মাসে যে খবর পাঠাঞ্জেছিলাম তখন যোগাড় করলি নাই কোনে ?

মনিলালের চেয়ে ওর বউয়েরই জিভের ঝাল বেশি। গোবিন একটা সমঝোতা করার জন্ত বলল—টাকা তো বললেই আসবেক নাই। আরও দু'চার মাস সবুর কর কোনে ?

—তুর কথাতে ? কুহু দাম আছে তুর কথার ? মনে করে ঝাখ ঈ-মাসে লয় উ-মাসে করে দু-বছর বুলাঞ্জে আমার বাপকে বিদায় করে দিঞ্জেছিলি। আমার জীবনে বিন্মালা পুরুষের ঘরকন্মাও হলো নাই, গাওনাও হলো নাই। সেই যখন স্ত্রী করতেই হলো আগেই জবাব দিতিস তবে দু'বছর আগে আমার ঘরকন্মা হতো।

কতকাল আগেকার কথা নিয়ে এমন ঠোঙ্কর দিলো যে গোবিনের আর রা বেকল না। তুুেবর আশুন্ন আর কাকে বলে ?

মনিলাল বলল—সে যা হবার হঞেছে। বল বিয়াই তুর কি মতলব ? বৈশাখ মাসে গাওনা হবেক ?

—তা কি করে হবেক ?

ওর বিয়ানের নেশাটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই চুড়ি বাজিয়ে ঝনঝন করে বলল—তা ক্যেনে হবেক ? বিটিকে লেথাপড়া শিখাছিস। বড়লোক নাগর ধরবেক। পয়সা কামাবেক। গাওনা করাতে যাবি ক্যেনে ?

গুলুর ব্রহ্মতালু জলে গেল ! গর্জন করে উঠল—খবরদার ঈসব কথা বলিস না। সীতার পারা বিটি আমার। তার নামে যদি বদনাম দিস তবে খেঁকালে মুখ ভেঙে দিব। শালা বেজন্মা ম্যেয়া এই জন্তে তুর বিয়ালা পুরুষের ঘর হয় নাই।

ও উঠে পড়েছিল। মনিলাল হাত ধরে বসাল। নিজের বউকেই ধমকি দিলো—শালী তুই বাৎ করতে জানিস না। ঐ বিটি ছোলাটি এসে আমার ঘরের বহু হবেক। তার নামে বদনাম।

মাতালের ঝগড়া লাগু হয়ে গেল। তারপর বেধড়ক খিস্তি খেউড় ! অবশেষে গোবিনের মধ্যস্থতাতেই আপাতত মিটল।

কথা হলো বৈশাখ মাসে মনিলাল একবার গুলুর ঘরে আসবে গাওনার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে।

তারপরে মনিলাল ওর বউকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। ওর চলবারও সাধ্য নেই।

গুলুর পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে। সওদাবেসান্টি মাথায় উঠল। মুখ আধারী সন্ধ্যায় খালি হাতে ঘরে ফিরল।

তাই দেখে হেনী একেবারে রণরঙ্গিনী। এই মারে কি সেই মারে। কাঁটা হাতেই লক্ষ্মবম্প।

যতই হোক গোবিন ওর বড় ভাই। তাই সে যখন বলল—গৈরীর শস্তর শাস্ত্রীর সঙ্গে মদ দোকানে দেখা হলো। কুটুমের খাতির রাখতে হবেক তো। উয়ারা কত দূর থেকে আসছে। তাখেই গুলুর পয়সাকড়ি খরচ হঞে গেল।

—খব হঞেছে। খাবি ঈ-বারে উনানের ছাই। তীব্রকণ্ঠে গরল উগরে দিয়ে চলে গেল।

খাবার সময় করেও দিলো তাই। গুলু ছিল চবুতরায়। তাকে ডাকলই না। ছেলে মেয়েগুলিকে ভাত বেড়ে দিয়ে নিজেও এক খাল নিয়ে বসে পড়ল।

গৈরী বলল—ঈ বাবা ! বাপুকে যে দিলি নাই।

—উয়ার খাবার কি দরকার ? দমে মদ খেয়ে এসেছে ।

—ধক্তি মা তুই ! কি করে খেতে রুচছে ?

—আঃ বাপ সূয়াগী ! বুক টাটাছে । অত যদি দরদ তবে খাওয়াগা ।

—খাওয়াবই তো ।

হন হন করে চলে গেল । হেনীর তাতে বিকার নেই । কোং কোং করে ভাত গিলতে লাগল ।

চবুতরায় তখন রবিবারের মাইফেল । ফাণ্ডার গান চলছে । ছেলেমেয়ে-বোঝিরাও জুটে গেছে । বসবার জায়গা নেই । গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে বসে আছে । ওকে দেখে ফাস্কানী কাছে ডাকল । বৈশাখী ও কুস্তী সরাসরি করে বসবার জায়গা করে দিলো ।

বসতে বসতে গৈরী বলল—বাপুকে ডাকতে এসেছিলম খাবার লেগে ।

—থাম তো । সারা রাত বাকী খেলেই হবেক ।

গৈরীর মনটা উসখুস করছিল । তারপর সেও গানে সুর মিলিয়ে দিলো । চলছে তো চলছেই ! আসর ভাঙতে রাত বারোটা ।

গৈরী ওর বাপের হাত ধরে ঘরে এল । তখন বেবাক অঙ্ককার ! লক্ষ জ্বলে রান্না ঘরে ঢুকল । অবশিষ্ট ভাত তরকারি ছুটি খালায় বেড়ে নিয়ে এল ।

গুলু বলল—ঈ-কি বিটি ? তুই খাস নাই ।

—না বাপু । মা বড় রেগে গেইছে ।

ভাতের গ্রাস মুখে তুলে গুলু বলল—উ রাগলে কি হবেক ? তুর শাশুড়ী আবার আরো । বলছে বৈশাখ মাসেই গাওনা করতে হবেক ।

গৈরীর ভিতরটা ছ্যাং করে উঠল । আর্তকণ্ঠে বলল—এই বাবা !

—ই । বললল এখন টাকাকড়ি নাই তো সাতঝুড়ি কথা শুনালেক ।

—শুনাক গা । উরাদিকে বলে দিবি—আমি শ্বশুর ঘর করব নাই ।

—অমন কথা বলতে নাই বিটি ।

—হঁ । ভাং মুখুর ঘর করব ন'কি ?

—কি করবি ? বিয়ার সময় জানি নাই ।

—ক্যোনে আমার শাশুড়ীর ত শ্রাঙ্গার সংসার । আমি ম্যাট্রিক পাশ করে লিই । তারপরে লেখাপড়া জানা কারুর সাঁথ শ্রাঙ্গা দিবি । বিয়াল পুরুষের ঘর নাই বা করলম । উয়াদিকে জবাব দিঞে দেগা ।

—না বিটি । অমন কথা মনে আনিস না । আজ দশ বছর যার নামে সিঁড়ুর পরছিস তা ক্যোনে পুঁছবি ? তুর কপালে মুখ্য বর লেখা আছে তো কি করবি ?

—কপালের লেখা আমি উঁন্টাঞে দিব । তুকে আবার বলছি অমন শ্বশুর ঘরকে আমি যাব নাই ।

রাগে রাগে উঠে পড়ল ! মধ্যবিত্ত ঘরের নেকু মেয়ে নয় ও । বাপকে এত ভালোবাসে যে তার কাছে মনের কথা লুকোবারও প্রয়োজন বোধ করে না । একদা বাল্যকালে যেমন জামা কাপড়, খেলনার জগ্গ আবদার করত আজ তেমনিভাবেই বিয়ে ভাঙার আবদার করে ।

উনিশ

অনন্তর পিসীমায়ের নাম অন্নপূর্ণা । সর্বদাই প্রসন্নময়ী । বয়সটা অনন্তর চেয়ে ছ'শাত বছর বেশী, পরস্পরের স্নেহ ভক্তির সম্পর্কটিও নির্মল । আবার হাসি ঠাট্টা খুনসুটিও করে । ডি. সি. সাহেবের নিমন্ত্রণে তিনি এসেছিলেন কল্যাণীকে দেখতে ।

কুটুস্থিতা সেরে ওরা হস্তনিয়া মোড়ে বাস ধরতে যাচ্ছেন । পিসেমশাইয়ের লম্বা পা । আগে আগে চলছেন । পিসীমা আস্তে আস্তে । অনন্ত তার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল পিসীমা ?

—কিরে ?

—তোমরা এ ব্যাপারটা নিয়ে এগিয়ে না ।

—কেন রে ? অমন সুন্দরী মেয়ে ।

—তাতেই তো আরো বেশী ভয় ।

—কেন ? স্বভাব চরিত্রের দোষ আছে নাকি ?

—না পিসীমা । পরের মেয়ের দোষ দেবো কেন ? মেয়েটি সত্যিই ভালো ।

—তাহলে অমত করছিস কেন ?

—আমাকে পাশ টাশ করতে দেবে তো ? নীতুর বিয়ে হবে তবে তো ?

—সেসব কথাও হয়েছে । একটা কথাবার্তা ঠিক করে রাখা । মেয়েটিও ম্যাট্রিক পাশ করুক । তুইও ম্যানেজারী পাশ কর । নীতুর বিয়ে হোক তারপর হবে । দেনা পাওনার কার্পণ্য করবে না । শুধু একটা পাকা কথা চাইছেন ।

অনন্ত কাঁদো স্বরে বলল—হেই পিসীমা তোমার পায়ে পড়ি, কোনো কথা দিয়ে বেসো না ।

অন্নপূর্ণা দেবী দাঁড়িয়ে পড়লেন । অনন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন কেন এত অমত করছিস অনন্ত ?

অনন্ত একটু থেমে সময় নিয়ে বলল—তোমরা যে' ভাবছো অনন্ত পাশ করে ম্যানেজার হবে তা এখন হচ্ছে না পিসীমা । আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিও না ।

—সে কি রে ? তাহলে কি করবি তুই ?

—কাউকে যদি না বলো তাহলে বলবো ।

—বল । কাউকে বলবো না ।

—কলিয়ারীর শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা আমি সহ করতে পারছি না । সেজন্য

শ্রমিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছি। সামনে বিরাট সংগ্রাম। আমি যে হারিয়ে যাবো না ফুরিয়ে যাবো তার নিশ্চয়তা নেই। এ সময়ে কেন একটা ফুলের মতো মেয়ের মনে ধোঁকা দেবো বলা? আমি কারো স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ হতে চাই না পিসীমা।

অল্পপূর্ণা দেবী আশ্চর্য হলেন না। চলতে চলতে বললেন—যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। দাদা তখনকার দিনের ইংরেজিতে ফাস্টক্লাস অনার্স। ইচ্ছা করলে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন। তা না হয়ে একটা এঁদো পাড়ারগায়ে মাস্টারী করে, আদর্শের জ্ঞান সংগ্রাম করতে করতে অকালে চলে গেলেন। তুই তো সেই বাপের বেটা। আন্দোলন, সংগ্রাম তোর রক্তে। তোকে কি করে ফেরাবো?

—কাউকে বলবে না তো।

—আমি না বললেও কি কথা চাপা থাকবে? ছাই চাপা আগুন একদিন দাবানলের মতই জ্বলে উঠবে।

—তাই আশীর্বাদ কর পিসীমা।

—বেশ। করলাম।

হোলীর মাতামাতিতে কটা দিন কাটল। তারপর ডিসেরগড়ে পীরের মেলা। পীর সাহেবের সমাধিতে চাদর পরাবার জ্ঞান বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। এক সপ্তাহের উপর মেলা চলে।

ট্রেনিরা সব সন্ধ্যাকালটা মেলাতেই কাটিয়ে দেয়। আমোদশুভির নানা উপকরণ। জম জমাট ব্যাপার।

ততদিনে পুরানো বছরটাও খসে গেছে। বৈশাখের গরম পড়েছে। অগ্রদূত মেসের মেথারদের শোবার খাটিয়া সন্ধ্যাকালে বারান্দায় পাতা হচ্ছে।

সেই সময় একদিন অনন্ত ফিরল প্রায় রাত দশটায়। স্মৃতিবাবু তখন বারান্দায় গুর খাটের পাশে একটি ফাঁকা বারুদ বাকসের ওপর ফাইল পত্র নিয়ে বসে আছেন।

অনন্ত আসতেই ডাকলেন, এদিকে আস অনন্ত!

—কি দাদা?

উনি খাটের একপাশে সরে গিয়ে ওকে বসতে দিলেন। ফাইল খুলে একটা চিঠি দেখিয়ে বললেন—পড়। খুব গোপনীয়। রেসিডেন্সিয়াল ডাইরেক্টারের চিঠির কপি।

কোম্পানীর ডাইরেক্টারদের এক একটি সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের কাছে মরণ সমান। এক তো ভারত স্বাধীন হবার পর বিলিভী কোম্পানীর তাঁদের আখের ভেবে নিয়েছিলেন। বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের মেহনতে যে শিল্প চলে তার জ্বলুমের রাজ কায়ম রাখা সম্ভব হবে না। আর তা না হলে মুনাকার কড়ি সমুদ্র জিভিয়ে বিলাতে/ব্যাকগুলিকে স্মৃত করে তুলবে না।

শেয়ার বাজারে বেচাকেনার হার বেড়ে যাচ্ছিল। কাচ্ছী, মাড়োয়ারী, সিঙ্ক্রি-মালিকরা সেসব শেয়ার কিনছিলেন। তার আঁচ দামোদর কোল কোম্পানীতেও এসে পড়েছিল এবং ন্যূনতম যতগুলি শেয়ার হাতে থাকলে পরিচালনা ক্ষমতা নিজের হাতে থাকে তাই রেখে বাদবাকী শেয়ার বাজারে ছেড়ে দিচ্ছিলেন।

আবার শ্রমিক ঐক্য, ট্রেড ইউনিয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেতন, ভাতা বোনাস, ছুটি ও বাসস্থানের দাবি যেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠছিল তাতে মাহুঘের বদলে মেশিন চালাবার কোঁশলটাই বেশী করে আরোপ করছিলেন। কারণ মেশিন প্রতিবাদ করতে জানে না।

এবার চোট পড়তে যাচ্ছে ওয়াগন লোডারদের উপর। চার-পাঁচটি সরদারের প্রায় পাঁচশোজন কুলিকামিন। তার মধ্যে একা চরিতরের দেড়শো।

বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের চিঠিতে শুধু দামোদর কোল কোম্পানীতেই তিন হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করতে হবে। তার জ্ঞান বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনের উপর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে স্কিনিং প্ল্যান্ট তৈরি হচ্ছে। বড় বড় গারডার পুঁতে বাক্সার তৈরি হবে। চালনা বসবে। কনভেয়ার বেন্ট দিয়ে কয়লা এসে পড়বে চালনার উপর। ঘটাং ঘট শব্দে চাসনা চলবে। সোজাহাজি ওয়াগনে লোড হবে। তাহলে লোডার কুলিকামিনের দরকার কি ?

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে ওদের বাকী রইল না।

অনন্ত বলল—তাহলে দাদা—এর উপায় ?

—সেই তো ভাবছি।

—ওরা অতদিনের পুরানো লেবার। এক কথাতেই ছাঁটাই।

—এখনো হয়নি তবে হবে। কোম্পানী যদি মেশিন বসাতে চায় তবে আমরা বাধা দিতে পারি না।

—কিন্তু ছাঁটাইও তো করতে পারে না। কন্সলিডেশনে চাকরীর স্থায়িত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে।

—কোম্পানী তা নাও মানতে পারে। কন্সলিডেশন কোনো আইন নয়। আপস মীমাংসা।

—তাহলে আমাদের আন্দোলনে নামতে হবে।

—হ্যাঁ। আমরা একবার দেবেনদার সঙ্গে আলোচনা করে নিই। তারপরে সরদারদিকে ডাকবো। তারা যদি আন্দোলনে রাজী হয় তবেই নামবো।

কিন্তু যাদের নিয়ে এত ভাবনা চিন্তা তারা নির্বিকার। সারা দিন-রাত সাইজিংয়ের কয়লা ডিপোতে পড়ে থাকে। সেখানেই তাদের আহার নিদ্রা এবং মৈথুনও। জোয়ার এলে ধাওড়া পর্বন্ত ঘাবার ধৈর্ষ বা ক্লেস স্বীকারের সম্মত থাকে না। লগ্ন তো বয়ে যেতে দেওয়া চলে না।

সাইজিংয়ে সারি সারি ওয়াগন। খোলা ঢাকা ছ' রকমই। সেগুলো ধাওড়ার চেয়ে কিসে খারাপ? তার ভিতরেই বাসর শয্যা। নীচে দানা দানা কমলা। বড় বড় রিভেট। গামছা পেতে শোওয়া। পিঠে বড় লাগে। হাঁটুর ছাল চামড়া উঠে যায়। তাতেই স্বর্গস্থ। পরক্ষণেই মাথায় ঝোড়া নিয়ে দরু দরু করে হেঁটে যায়।

গৈরী সেই সমাজের মেয়ে। ওর মা বাপ হাজিরির কাজ করে এই যা। ঠিকাদারের ওয়াগন লোডর হলে ওরাও তাই করত। স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে কাজের পরিবর্তনের জগ্ন।

গৈরীর শ্বশুর এসেছে ওর ভাই বাঁকেলালকে নিয়ে। সে নাকি বহু চলতা পূরজা আদমী। সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম। বোলচাল জানে।

কুটুমের খাতির রাখতে একটা শুয়োর কেটে মাংস রান্না হচ্ছে। চাট চলেছে। ধেনোমদে কুটুমের কাছে দর কমে যাবে তাই বোতলের মদ এসেছে। সব খানেগুলো আদমী। চোঁ চোঁ টেনে নিচ্ছে। কাচ্চা বাচ্চা মেয়ে পুঙ্খদেরও ঢুক ঢুক করে চলছে। তাদের মধ্যে অটল সংগ্রামে স্থির হয়ে আছে গৈরী। সে মদ ছোঁবে না। চামড়া পোড়ার গন্ধটা বড্ড বিটকাল্। নাক মিঁটকে গলা পর্যন্ত টেনে গল্ গল্ করে ঘামছে।

আহা! বেচারী!

গুলু ও তার শালা সশঙ্কী বনুই চব্বতরায় বসেছে। জোর দরমোলাই চলছে। গুলু বলল—আমার জোয়ান বিটি ছিল। যেখানেই ঘরবশত হবেক। ডিপুতে খাটতে দিব নাই। সে কথা করার করতে হবেক। আমার বিটি লেখাপড়া জানে। খরচ খরচার জন্তে একশো টাকা দিতে হবেক।

কিন্তু একশো টাকা অনেক টাকা। ওদের কাছে পাহাড়ের সমান। ভাত, মদ, কাপড়, কানি, ছাওয়াতি, পোয়াতি, অস্থখ বিস্থখ, সুদ আসল ধার উঠার শোধবোধ নিয়ে খরচের ঠালায় জেরবার। একলপ্তে পায় কোথা?

বাঁকেলাল বলল—এইটি কথা হলো বিয়াই?

—হঁ।

—কিন্তুকি বিটি তুকে পাঠাতেই হবেক।

গুলু নেশার ঘোরে চোখ পিটপিট করে বলল—বিটিটিকে ঘরে রেখে কি আমি চাটব? তুদের বউ তুরা নিঞ্চে যা। কিন্তুকি আমার পাওনা মিটাঞ্চে দে।

—তা কোনে দিব। বিয়ার সময় তো ঙ্গ-কথা হয় নাই।

—তবে তুই বিয়া দিঞ্চেই নিঞ্চে গেলি নাই কোনে? আমি কিছুই লিতম নাই। কিন্তুকি এতদিনে খাওয়ালম, পরালম, ভাগর করলম তার খরচ হিসাব কর।

বাঁকেলাল রাগে রাগে বলল—এইটি উল্টা কথা বলছিল বিয়াই। কুন বাশে

না নিজে'র বিটিকে খোরাকী দিঞে পালপোষ করে ? বিটি ডাগর হলেই তো গাওনা হয় । ছুটুতে নিঞে যাব বললেই তুঁই পাঠাতিস ?

—উয়াকে লেখাপড়া শিখাতে তো আমার খরচ হঞেছে ।

—যা শিখাঞেছিস তা তুর বিটির পেটেই থাকবেক ।

—শুশুর ঘর করতে য়েঞে তো বিটির পেটে ছেলাও থাকবেক । সেটি তুরা লিবি নহি ?

এমন সব আশু'মে'ন্ট য়ে শুনলেই লোকের মাথা বিগড়ে যাবে । কারো বিশ্বাসই হবে না । অথচ এই তাদের সংলাপ । বিচিত্র এবং বিসদৃশ ভোকাবুলারী ।

সন্ধ্যাটা বোলচালেই কেটে গেল । মদ খেতে খেতে বেহঁশ । তবু ফয়শালা হলো না । পরদিন সকালে ফিরে যাবার তাড়া । ঠেটি ধুতির ওপর সবুজ রঙের ফতুয়াটি চড়িয়ে মনিলাল বলল—অনেক কথাই তো বললি বিয়াই । টাকা না হলে বিটি দিবি নাই সেইটাই বুঝলাম । কিন্তুক আমার ব্যাটার বহুকে একবার দেখতে দিবি তো ?

—ই-ই । তা ক্যেনে দিবি নাই ? এগে—গৈরী ! আয়গে—তো'র শুশুরাকে পরণাম কর ।

ঐ নোংরা, খ্যাংরা লোকগুলোকে প্রণাম করবার কথাতেই গৈরীর সর্বাঙ্গ রী রী করে উঠল । কিন্তু করবে কি ? ওর মা য়ে হাত ধরে টানছে । অশুট চাপাকঠে বলল—উয়াদিকে বলে দে মাঈ—আমি শুশুর ঘর যাব নাই ।

ওর মা ধমকে উঠল—চূপ কর ধুমসী । শুশুর বটে—পরণাম করগা ।

ওকে টেনেই নিয়ে এল । সারামুখ কাপড়ে ঢেকে টিপ টিপ করে প্রণাম করল ।

ওর শুশুর ওর হাতে একটি রূপোর টাকা দিয়ে বলল—মুখটা খোলগে মাঈয়ি ।

গৈরী ঘোমটাটা আরো টেনে নিল । ওর মা বস্কার দিলো—আঃ ! লাজ সরমে মরে য়েছে । উয়াদেরই তো ঘরকন্না করতে হবেক গে । খুল—মুখ খুল ।

ও নিজেই ঘোমটাটা টেনে খুলে দিলো । গৈরী মুহূর্তের জন্ম হতচকিত । তারপরই ঘোমটায় মুখ ঢেকে দ্রুত পায়ে চলে গেল ।

কিন্তু !

পদ্ম পলাশের বিকশিত সৌন্দর্যের একষ্টি ঝলক । ভীত চকিত ছুটি চোখের তারার বিহ্বং প্রভা । নিতম্ব ঈষং ভারী । চলার ছন্দে যাতুকরী মায়া । পায়ের গোছে মল । পাতা ছুটি চিকন । আঙুলে চুটকি । হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি । ঝুম ঝুম শব্দে মল বাজল । রিনি ঝিনি চুড়ি ।

মনিলাল থ । বাকেলালের চোখ ট্যারা ।

খানিক পর মনিলাল বলল—ঠিক আছে। শ'টাকায় দিব।

বাকেলাল বলল—এ-হে-হে দাদা তুই টাকা কবুল করে দিলি ?

—হঁ। ঙ্গ-মক্ষিচোষ বিয়াই বিনা পয়সায় বিটি দিবেক নাই।

—তাই বলে এত টাকা। কুথায় পাবি ?

খেতি-জমি বিচে দিব।

—ছুটি পাবি—দেশে যাবি—খরিদার দেখবি—জমি বিচবি—টাকা আনবি।

তাকে তো বৈশাখ মাস শেষ হঞে যাবেক।

—না হয় জষ্টি মাসে হবেক। না হয় আষাঢ় শাওনে। কিন্তুক এই বছকে আমি জন্মর ঘরে নিঞে যাব।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনিলাল যাবার জন্ত পা বাড়াল। গুলু ওর কাছে ল্যাজ নাড়তে শুরু করে দিলো—কিছু মনে করিস না বিয়াই। টাকা আমি নিজের জন্তে খুঁজি নাই। আমি তো বাপ বিটি। সাধ তো আছে। টাকা নাই বলেই তুর কাছে খুঁজছি। তুই বিশ্বাস লে—এ টাকাটি সব আমি বিটিকে জেবর গড়াঞে দিব। চাঁদের পারা বিটি আমার জেবর না পরালে মানাবেক কোনে ? তুই রাগিস না। টাকা তুর ঘরকেই যাবেক। সাধটি পুরা হতে দে।

—ওরে বিয়াই ! আমার জমি জায়গা তুর বিটিতেই পাবেক। তো তুদের কাছে যদি মাটার য়েঞে জেবরের দাম বেশী হয় তো তাই লিবি। মনের স্থখে সাধ মিটাবি।

চলতে চলতে আবার বলল—দেশ থেকে এসেই টাকা পাঠাঞে দিব। গাওনার দিন ঠিক করে দিস। আমার বেটা এসে নিঞে যাবেক। বিটি জামাই পাঠাঞে দিবি। ফের যদি বাহানা করিস তবে তুর বাপের নাম ভুলাঞে দিব। আমি রাগি না তো রাগি না। রাগলে চণ্ডাল।

কুড়ি

দামোদরের কিনারে গ্রীষ্মের সন্ধ্যা বড়ই মনোরম। স্নিগ্ধ শীতল বাতাস। দামোদরের কলোচ্ছ্বাস। ঝক ঝকে বালুকা রাশি। পঞ্চকোট পাহাড়ের সুনীল প্রেক্ষাপট। পরপারে মানভূম জেলার তালবীধি। দিগন্ত ছোঁয়া আকাশের গায়ে চুম্বকি জ্বালা নক্ষত্র।

নদীর গর্ভে বালি ভোলার জন্ত লোহার তৈরি বাস্কার। ছ'পাশে উঁচু মাটির বাঁধ। সবুজ চাপড়া ঘাস হয়েছে তাতে। বাঁধের ক্ষয় রোধের জন্ত রীতিমত চাষ করা হয়েছে। একজন মালী থাকে তার হেফাজতের জন্ত। সে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো কয়েকটা ব্লেসিফুলের ঝাড় লাগিয়েছে। ফুল ও কুঁড়িতে ভরে আছে। ভারী স্তম্ভের স্তম্ভ। আর আছে সাজানো বাগান। সেখানে ঢুকতে পায় না কেউ। অনন্ত সেখানে ডিউটি পেয়ে খুব খুশী। প্রথম সপ্তাহে দিন

পালি। দ্বিতীয় সপ্তাহে চারবাজা পালি। অর্থাৎ বিকেল চারটে থেকে রাত বারোটোটা।

পালির শুরুতে বেশ কিছু কাজ থাকে। লোকজনের বিলি ব্যবস্থা, নোঁকার পাশ্প হলেজ ও বাঁকার চালু করা। দিন পালিতে কোনো বিশেষ কাজ যদি অসমাপ্ত থাকে তবে তা শেষ করা। ঘণ্টা দুয়েক সময় কিভাবে কেটে যায় বুঝতে পারে না।

তারপর খবরদারী। যদি কোনো ব্রেকডাউন হয় তবে তার মেরামত। সেজ্জা মশী, মিস্ত্রী সবই আছে। কাজের এমন সিস্টেম যে ফাঁকি দেবার জো নেই। কোথাও একজন ফাঁকি দিলে অল্প জায়গায় টান পড়বে।

কাজেই যেসব ট্রেনির ডিউটি থাকে তারা যথেষ্ট সময় পেয়ে যায়। বসে থাকে, বই পড়ে, কেউ কেউ মেসেও চলে আসে।

দিনপালিতে মাথার উপর খররোঁত্র। বসবার জায়গা নেই। বাঁকারের ছায়াটুকু সম্বল। কোম্পানী একটা চালাঘর বানিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তা দেবেন না। তাহলে ডিউটিওয়ারা ঐ এক টুকরো ছায়ার লোভে সেখানে গিয়ে জুটবে।

কিন্তু চারবাজা বা রাতপালিতে প্রকৃতি নিজেই মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে দেয়। রাত নামে। অসংখ্য তারকা জলে। চাঁদ ওঠে। চাঁদের জ্যাংলায় দামোদরের আশ্চর্য সব দৃশ্য ফুটে ওঠে। দেখবার চোখ থাকলে অপার্থিব আনন্দে মন ভরে যায়।

সেদিন সোমবার। অনন্ত বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চকোট পাহাড়ের কোলে অন্তঃস্বর্ষের রক্তরাগ রঞ্জিত আকাশের বুকে বর্ণালীর চেউ দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেছে।

বাঁধের নীচ দিয়ে রাস্তা। ধাঙড়ার মেয়েরা দামোদরে বালি খুঁড়ে জল বের করে কলসিতে ভরে নিয়ে যায়। সকাল সন্ধ্যা মেয়েদের মিছিল চলে দলে দলে। তারা হাসে, কথা বলে, গান করে। কোনো জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই। সহজ ও স্বচ্ছন্দ চলার ছন্দে রূপ ও যৌবনের নানা যাদুকরীভঙ্গীর চিত্র বিচিত্র বিস্তার।

কত রকম সাজ পোশাক পরে আসে। রঙ বেরঙের শাড়ি ব্লাউজ। গলায় রূপোর টাকার গাঁথনী করা হার। পায়ের মল। কোমরে ছুড়ের কোমর বন্ধ। নানা ফুলের মালা। কানে নুমকা। বাহুতে তাগা। চোখে গুর্মা। সিঁথিতে সিঁদুর। কপালে টিপ। কৃষ্ণ খোঁপায় রূপোর ফুল, প্রজাপতি। হাতভর্তি চুড়ি।

সবুজ ঘাসের আশ্রয়ণে বসে নারী ও প্রকৃতির রূপে মুগ্ধ হবার মতই দৃশ্যাবলী। আকাশের বর্ণ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তারও নানা মেজাজের খোলতাই।

হঠাৎ অনন্তর দৃষ্টি আটকে গেল দামোদরের গর্ভে বালিতে চলা শুঁড়ি পথে। পাঁচ-ছটি প্রায় এক বয়সের মেয়ে হাসতে হাসতে আসছে। তাদের মাথায় এলুমিনিয়ামের চার পাঁচটি করে হাঁড়ি। মোটা মোটা বিড়ের ওপর প্রথমে ঘড়াটি তারপর তার থেকে ছোট এইভাবে সাজানো। হাত ছুটি খালি। হুলিয়ে হুলিয়ে চলছে।

সারির প্রথমেই গৈরী।

বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। তার প্রথম প্রেম মাথায় জল ভরা কলসি নিয়ে নদীপথে হেঁটে যাচ্ছে। কি স্মরণ তার চলার ছন্দ।

বেশ লম্বা দেখাচ্ছে। গায়ের রঙটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটি প্রতিগার মতো। তার পিছনে গুর সহেলী। বুক জোড়া ফাগুনের আগুন। প্রায় ঝলক দিয়ে বলল, এলো গৈরী! ঝাথ কে বটে?

গৈরী চোখ তুলে তাকিয়েই চমকে উঠল। মাথার হাঁড়িগুলি টাল খেয়ে পড়েই যেত। হাত ছুটো তুলে সামাল দিলো। সামনে পা দিলো।

অনন্তর কত কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু ওরা চলে গেল। নূতন ঘোঁবনের মিছিল কি সুন্দর দেখাচ্ছে। গৈরী সবার সেরা।

সন্ধ্যা নামল। আকাশের নক্ষত্র সভা চাঁদের জ্যোৎস্নায় প্রাবিত হলো। তিথিটা বোধ হয় শুক্লাদশমী। তাই বুঝি চাঁদের এত দপ্দপানি। অনন্তর লগ্ন চক্রে চন্দ্রের বলবান প্রভাব।

ল্যাম্প পোস্টের নীচে বসে পকেট থেকে একটা বই বের করল এই তার স্বভাব। খাদে গেলেও পকেটে বই, কাগজ কলম নিয়ে যায়। অবসর পেলেই বসে পড়ে। সময় সময় রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ, অজুন-উর্বশী, হেডগীয়ার পাল্লা, বয়লার চিমনি সব একই মাত্রা নিয়ে তার কাছে হাজির হয়।

কিন্তু পোকাকার বড় উপদ্রব। কালো, সবুজ, খয়রা কত রং-বেরং, জামার মধ্যে ঢুকে গিজ গিজ করছে। মাথার চুলে শুড়সুড়ি দিচ্ছে। ধোৎ! ভীষণ বিরক্তিতে সেখান থেকে সরে গেল। বেশ কিছুটা দূরে ফিকে অন্ধকারে বসে গুর হাতের হাও ল্যাম্পটা জ্বলে দিলো। ওটা খাদের বাতি। এবার পড়াটা বেশ হচ্ছে।

মুনশীবাবু বান্ধারের কাছাকাছি এক জায়গায় চট পেতে ঘুমিয়ে পড়েছে। টালোয়ানরা ক্রমাগত খালি টবের লুস লোল হাবিস করছে। এখন কোনো কাজ নেই। পালি শেষ হবার আগেই বইটা শেষ করে ফেলবে।

বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ও বইয়ের পাতায় পুরোপুরি মগ্ন তখন হঠাৎ কে যেন পিছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিলো। মুহুঃ স্বেদ ও মধুর ঝিনি ঝিনি শব্দে চমকে উঠল।—

—কে?

একটি কোমল হাত টপ করে ওর মুখের উপর চাপা পড়ল এবং অতি পরিচিত কণ্ঠের ধ্বনি শুনল—আঃ। চোঁটাচ্ছে কেন ?

একটা চাপা হাসি। পিঠের উপর পেলব কোমল স্পর্শ। অনন্ত রোমাঙ্কিত হয়ে ঘাড় ফেরাল এবং একটা হাত দিয়ে তার গলাটা বেঁধন করে বলল খুব দুষ্ট হয়েছিল তাই না ?

—বটেই তো ! চাপা হাসি অপরূপ ছাতিতে ঝলকে উঠল।

—তোর তো খুব সাহস ?

—না হলে কি আসতে পারতাম ?

—কেউ যদি দেখে ফেলে ?

—তোমার নামে নিন্দে হবে ?

—আমি পুরুষ মানুষ। নিন্দেতে কি এসে যায় ? কিন্তু তোর যে সাড়ে সর্বনাশ। আরো কি বিয়ালা পুরুষে ঘরে নেবে।

—নাই বা নিল। আমার প্রেমিক পুরুষটির ভালোবাসা তো থাকবে।

—এঃ। কথায় পেরে ওঠা দায়।

চিবুক ধরে আদর করল। বলল—এই রাস্তার ধারে বসে থাকা কি ঠিক হচ্ছে ? কত লোক যাওয়া আসা করে।

—চল। নদীতে নেমে যাই। ওখানে—ঐ দূরে বালিয়াড়িতে বসে গল্প করি গে। কতদিন মন খুলে কথা বিনি।

—তাই চল।

পরস্পরের হাত ধরে অনায়াসে নেবে গেল অনার্ধ দামোদরের গর্ভে। ধু ধু বালুকারাশি। তার বুকে হেঁটে যাচ্ছে বিমূঢ় নায়ক-নায়িকা।

বড় বড় বালির চিপির মধ্যখানে ছুজনে বসে পড়ল। সেখান থেকে দামোদরের জলরেখা সামনেই, চিক্ চিক্ ঝিক্ ঝিক্ করছে। চেউয়ে চেউয়ে কাঁপন লাগছে। নদীর বালিতেও চুমকি জ্বলছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাইকার টুকরো টাড়ের আলোতে ঝিক্ মিক্ করছে।

অনন্ত বলল—তাকে এখন বেশ ভাগর ভোগর দেখাচ্ছে গৈরী।

গৈরী ঠোঁট টিপে বলল—ঘোঁবনটা ভরাট হয়েছে তো।

—আরো সুন্দর দেখাচ্ছে।

—তোমার চোখে রঙ লেগেছে তো।

—তোর চোখে লাগেনি ?

—না হলে এলাম কেন ?

—তা বটে ! অনন্ত হাসল। দাঁতের পর দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল।

বলল—পাকাবুড়ির মতো কথা বলছিল।

—মেয়ে তো ! বারো বছর বয়সেই পেকে যায়।

—আচ্ছা। তুই বাড়ি যাবি কি করে ?

—হেঁটে হেঁটে।

—তা বলছি না। বাড়িতে যখন জিজ্ঞাসা করবে এত রাত্রে কোথায় ছিলি তখন কি বলবি।

—সে ভাবনা আমার নেই। ভাই বোন দিকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি ? মা নেশায় বেছ'শ। বাবা ডিউটি গেছে ! ফিরতে রাত বারোটো পার হয়ে যাবে। ততক্ষণ অনায়াসে তোমার কাছে থাকতে পারি।

কিন্তু আমার যে ডিউটি আছে।

—জানি জানি। খুব কাজের লোক তুমি।

অভিমান তরল কর্ণের আহত উত্তর। অনন্ত গুর কপাল থেকে কয়েকটি চুল সরিয়ে দিলো পরম যত্নে। কি দুর্নিবার আকর্ষণ ঐ মুখে। কিন্তু ভীষণ নিষেধাজ্ঞা গুর সিঁথিতে। কপাল থেকে মাথার তালু পর্যন্ত যেন এক জমাট রক্তের নালা। তার উপরে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, এই লাল সাইন বোর্ডটাই ভিতরে প্রবেশ নিষেধ বলে আমাকে শাসায়। কি করে তোর কাছে পৌঁছাবো গৈরী ?

—ভালোবাসার সেতু দিয়ে।

—এটা ভুল হচ্ছে গৈরী যতই হোক তুই বিবাহিতা। একদিন তোর স্বামী এসে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই।

—তার আগে তুমি দখল করে নাও।

—গৈরী !

—ওদিকে তাকাচ্ছ কেন ? আমার বাপ মায়ে কখন যে আমার অজান্তে কাকে দিয়ে একটা দাগ মেরে দিয়েছে সেটাই তো আমার মনের খবর নয়। আমি তোমার। তুমি দখলদারী কায়ম কর। আচোট ভূমিতে চোট বসাও। তবেই তোমার জানমানের টান পড়বে।

অনন্ত ভয় পেয়ে গেল। ভয়র্ক কর্ণে বলল—না না। তা হয় না। ভুল একবার হয়ে গেছে। ঐ পর্যন্তই থাক। আর নয়।

—কি নয় ? গৈরী গুর কাছ থেকে সরে এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

—এই লুকোচুরি ! পরের বউয়ের সঙ্গে প্রেমের খেলা।

গৈরী শাস্ত, স্থির এবং দৃঢ় প্রত্যয়ী কর্ণে বলল—আমি কুমারী শরীরে, মনে। ঘুরে ফিরে পরের বউ পরের বউ কোর না।

—বড় বেশী এগিয়ে গেছিস গৈরী।

—তুমি আঙ্কারা দিয়েছো বলেই। না হলে সেই সরস্বতী পূজার রাত্রে যেদিন তুমি অনায়াসে আমার স্তম্ভ নষ্ট করে দিতে পারতে কিন্তু তা না করে যেভাবে মান রাখলে তাতে আমি তোমাকে দেবতার মতো ভক্তি গুরু করলাম।

সেখানেই যদি থেমে যেতে তাহলে পুজোই পেয়ে যেতে। প্রেম আদায় করার জ্ঞান চুন্নু খেলে কেন।

এই তিরস্কার অনন্তর প্রাপ্য ছিল। মাথা নীচু করে গুনল। আন্তে আন্তে তাকাল—ভুল একটা হয়েছে। তবুও ফিরবার সময় আছে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—ভীতু! ডরপুক। এই তোমার ভালোবাসা? পরিষ্কার করেই বল—আমি তোকে ভালোবাসি না।

অনন্ত ঘাবড়ে গেল। বলল—কেন এত রাগ করছিস গৈরী?

—রাগ? কিসের জ্ঞান? যার মনে ভালোবাসা নেই তাকে রাগ দেখিয়ে কি হবে? আমি ছোট জাতের মেয়ে। মদ খাই বিড়ি খাই আমাকে কি তুমি ভালোবাসতে পারো? তুমি ভালোবাসবে শুচিকে, কল্যাণীকে তারা ভদ্রলোকের মেয়ে।

গৈরীর এই চেহারা অনন্ত আগে দেখেনি। ওর মনে হলো তার প্রথম প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। তাকে ফেরাতেই হবে।

বলল—আঃ। কি বাজে বকছিস? জাতের রেয়াত আমি করি না। আমার ভাবনা তোর মিঁখির মিঁহুরটার জ্ঞান। না হলে তুই আমার সারা অন্তর জুড়ে আছিস। আজ যদি ডায়রীর খাতটা কাছে থাকতো তবে দেখাতাম কত কথা লিখেছি শুধু তোকে নিয়ে। কত ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছি তোকে পাবার জ্ঞান।

—মতি?!

—ই্যা!

—আমিও তোমাকে অনেক চিঠি লিখেছি। কিন্তু একটাও পাঠাতে পারিনি। সব খাতাতেই আছে। কাল তোমাকে দেবো।

বিবশ বিহ্বল গৈরী ওর বুকের উপর মুখ ঘষতে লাগল। তখন ওর শিরা উপশিরার রক্তশ্রোত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। অস্থির পঞ্চমে অশান্ত রাগিনী বেজে চলেছে অন্তরের কানায় কানায়। অনার্ঘ আকাজ্জায় উদ্বেল।

অশান্ত উত্তেজনায় ভেঙে যাচ্ছে অনন্ত। পুরুষ যাকে কামনা করে, হৃদয়ের শোণিত প্রবাহে যার নাম রঞ্জিত হয় সেই নারী তার বুকের ওপর। অক্ষত, অনাস্রাত, নিটোল।

মাথার উপর তারা ভরা আকাশ। চন্দ্রমা বিরাজ করছে রাজ-রাজেশ্বরের মতো। ঠোঁটের সামনে দুটি ঠোঁট। আবেগে কম্পিত। চোখের তারায় গহিন গাঙের আছান।

নৌকা ভাঙ্গাও মাঝি। আর দেরি হলে জোয়ার কেটে যাবে। ভাটার টানে চড়ায় আটকে যাবে। সময় বড় বলবান। এই মুহূর্তটি পার হয়ে গেলে পৃথিবী দ্রুত গতিতে টাঁদকে পিছনে ফেলে চলে যাবে।

চোখের সামনে একজোড়া পদ্ম কোরক। চড় চড় করে বেড়ে যাচ্ছে গৈরীর শরীরের উত্তাপ। নিস্তব্ধ বালুকাবেলায় ঘন শ্বাস ও বিলম্বিত শিৎকারের চাপা ধ্বনিতরঙ্গ অনন্তর অন্তর বাহির ভূমিকম্পের তাড়নায় কম্পিত করে তুলেছে। দামোদর গর্জন করছে। কুল ভাঙা বস্তুর তাণ্ডবে ভেঙে যাচ্ছে চামড়ার ছাউনি দেওয়া হাড়ের ঘর খানি।

ভয়ে, বিশ্বয়ে ও অসহ জ্বালায় উত্তাপে ঘটে গেল বিস্ফোরণ। তীব্রতম মূর্ত্তে শোচনীয় ব্যর্থতায় এলিয়ে পড়ল অনন্ত। বালির উপর মূখ খুবড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ পর বলল—আমরা একদম আনাড়ী।

গৈরীও বৃকে মূখ গুঁজে দিলো।

কবির কাম শুধু যন্ত্রণাই দেয় না। সৃষ্টিও করে। সাড়া জাগে প্রাণের। মুকুলিকা প্রশ্ৰুটিত হয়। মধুকর গুঞ্জন করে। ব্যর্থতাই শেখ কথা নয়। তার পরই আসে সাফল্য।

রুমক্ রুমক্ রুম্ রুমক্ রুম্।

সারা সত্তাজুড়ে তালবাগের মধুর ঝঙ্কার। কল্লোলিত দামোদর ঢেউ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আকাশ জোড়া নক্ষত্রের মেলা। সূনির্মল পূর্ণচন্দ্র। বালুকাবেলায় ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু চন্দনের মতো স্নিগ্ধ গুঞ্জ জ্যোৎস্না ধারা।

পরপারে শ্যামল দিগন্ত। নিবিড় নীল ট্রাপিজিয়ামের মতো পঞ্চকোট পাহাড়। পশ্চাৎপটে আকাশ ছোঁয়া চিমনি থেকে ঝলক ঝলক অগ্নিশিখা। কালো ধোঁয়া নীল আকাশের বৃকে ঐঁকে যাচ্ছে শিল্প বিপ্লবের ছবি।

প্রেম তার অপার মহিমা নিয়ে সব যন্ত্রণা মুছে দিয়েছে নায়ক নায়িকার মন থেকে। যেন কত যুগ যুগান্ত পার হয়ে, বাথা বেদনার সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তারা পৌঁছে গেছে স্বপ্নের রাজ্যে। সেখানে আকাশের নক্ষত্র সভায় পরীরা নাচে। তাদের স্ঠাম দেহ, উত্ত্বিন্ন যৌবন, ফুলের কাঁকন পরা হাতের মূদ্রা, ধৌপায় সাজানো ফুলের মুকুট কত না বিভঙ্গ তোলে রাগ অল্পরাগের স্থথাস্থভূতি। মুখরিত তালবাগে দ্রুতলয়ে চলে হৃৎপিণ্ড।

আনন্দে, আশ্লেষে, মিথুনের পুলকে আবেশ জড়ানো চোখ দুটি মেলে অনন্তের দিকে তাকিয়ে আছে গৈরী। ঢেউ ভাঙা জলে চাঁদের ঝিকিমিকি। অনন্ত গুয়ে আছে বালুকাবেলার স্খশয্যায়। স্থপ্তি মগ্ন। জেগে আছে চাঁদ। জেগে আছে গৈরী।

অনার্য দামোদরের বৃকে অনার্য কন্ঠার অশান্ত প্রণয় স্খধা পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে ভরে গেছে। অনন্তর বৃকে কান পেতে শুনছে হৃৎপিণ্ডের ছন্দোবদ্ধ স্পন্দন। বিমুক্ত কবরী। সারা পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে রাশিকৃত কালোচুলের বোঝা। ঢেকে দিয়েছে নগ্ন নীবিবন্ধের লঙ্কা! লাভণ্যময় জাম্বু অক্সেশে বেটন করে আছে অনন্তর কটিদেশ। এবার সেও ঘুমিয়ে পড়বে। চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে।

প্রায় ভোর রাতে মেসে ফিরে অনন্ত তার ডায়েরীতে লিখে রাখল—কবে এমন নিবিড় মিলনের স্থখে পার হয়ে যাবে তারা জাগা রাত ।

হে দামোদর ! তুমি অনার্থ । তাই তোমার বুকের পরিসর অত বিরাট । গভীরতা এমন অতলস্পর্শী । তোমার শিরা উপশিরা অস্ত্রোপচার করে শুধু তাপশক্তিরই উৎপাদন হয় না । আমার জগ্ন নিটোল প্রেমের পসরাও সাজিয়ে রেখেছো ।

তাই তোমাকে লাখো সেলাম ।

একুশ

ঘুম ভাঙল স্মৃতিবাবুর ডাকে । তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে ।

উনি বললেন, কাল কত রাতে ফিরেছিলি অনন্ত ? আমি তোর জগ্ন বারোটা পর্যন্ত জেগেছিলাম ।

অনন্ত বেশ অপরাধ বোধ করল । কিছু না বলে বাথরুমে চলে গেলো । ও ফিরে আসার পর স্মৃতিবাবু বললেন—তৈরি হয়ে নে । বেরুতে হবে ।

—এখনি ?

—হ্যাঁ । কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন । আমাদেরকে অবিলম্বে রেশন বন্ধ আন্দোলন চালু করতে হবে ।

তখনকার রাজনীতিতে নেতারা ডাক দিয়েছেন বললেই যে জনগণ তৈরি হয়ে যাবে তা ছিল না । সর্বব্যাপ্ত ভয়ের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে কেউ চায় না ।

তবে স্কিনিং প্র্যান্ট বসাবার কাজ যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন থেকে দুশাদ, পাশমন সাঁওতাল, বাউরী ওয়াগন লোডাররা বুঝতে পেরেছে যে তাদের ছাঁটাই আসন্ন । এমন কি সরদাররাও ভয় পেয়ে গেছে । আগে চরিতরের দলটাই ইউনিয়নে যোগ দেবার জগ্ন রাজী হয়েছিল এখন ফুলবনির সাঁওতাল দল, শকুন্তলার বাউরী দল, রামদেওয়ার পাশমন দল রাজী হয়ে গেছে ।

এই কাজটির সব কৃতিত্ব অনন্তের । সেই ঘরে ঘরে গিয়ে সবকে বুঝিয়েছে, কানে মন্ত্র পড়েছে । ওদের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছে ।

একটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওদেরই বিভিন্ন দলের সঙ্গে মিটিং করতে করতে গেল । পরের দিন গেল সরদারজীদের ধাওড়ায় । তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে । গুরুনাম ইতিমধ্যে তেজ সিং, ফৈজু সিং, দববারা সিং প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিকে ডেকে এনেছে । ওরা কেউ ফিটার মিস্ত্রী, কেউ টিনভেল, জমাদার । প্রেমার বাবা মহীন্দার সিং মাইনিং সরদার ।

আলোচনা হচ্ছে । নীতিগতভাবে ইউনিয়নের প্রস্তাব সমর্থন করতে রাজী হয়েছে । কিন্তু সামনে যাবার সাহস নেই । তাই তারা দ্বিধাগ্রস্ত । স্মৃতিবাবু ও অনন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলে বোঝাবার চেষ্টা করছে ।

গুরুনাম অনন্তকে ডেকে বাইরে নিয়ে এসে বলল—আরে ইয়ার তু তো বে-রহম আদমী হো।

কিঁউ ?

—আও।

ওকে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরে। প্রেমা ওকে কিল দেখিয়ে বলল—

—বড় লীডার হয়ে গেছো তাই না ? আমি যে এখানে আছি সেকথা খেয়াল নেই।

গুরুনামের ঘরটি কুলি ধাওডার মতই। টালির চাল ইটের দেওয়াল। আটফুট সাইজ। একপাশে কাঠের তক্তাপোষের ওপর বিছানা। দরজার সোজাতেই দেওয়ালে সাঁটা গুরুনামকের ফটো। একদিকে ছোট একটা আলনা। তাতে শাড়ি, ব্লাউজ, সালোয়ার, কামিজ, ফুলপ্যান্ট হাফপ্যান্ট ইত্যাদি। তাকের উপর সাজানো গুরুনামের নানা প্রাইজ, মেডেল, কাপ, শিল্ড।

বিছানার একপাশে ওদের তিনমাসের বাচ্চা। অনন্ত ঘরে ঢুকে খাস নিল। পবিত্র ধূপের গন্ধ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বাচ্চাটির গাল টিপে আদর করল

বলল—তাহলে স্মৃথের সংসার পেতেছিস ? লাকি কপাল। চিয়ার উ!

—আগে বোস তো ! তারপর কথা বলবি। তক্তাপোষের ওপরই বসল। প্রেমা বাইরে গেল। বেশ ভরট দেখাচ্ছে ওকে। আগে লম্বা পাতলা ছিল। নাকটা বিসদৃশভাবে সামনে বেড়ে থাকতো। এখন স্মৃথ ও সোহাগের আনন্দে গালগুলো ভরট হয়েছে বলে অতটা বেমানান দেখায় না। তবে একটি নূতন মাত্রা যোগ হয়েছে। যেন গৌফের রেশ দিচ্ছে।

গুরুনাম বলল—ইয়ার তু মেরা নয়া জিন্দেগী বানা দিয়া। ম্যায় দিওয়ানা ধা। তু প্রেমা মিলা দিয়া।

প্রেমা ঢুকল হাতে একটা ডিশ নিয়ে। লাজুক হেসে বলল—তুমি এসেছো শুনে একটু পায়ের করেছি। খাও।

অনন্ত বলল, এটা তুই কি করেছিস প্রেমা ?

—বাঃ রে ! তোমাকে মিষ্টি মুখ করাবো না তো কাকে করাবো ?

—খুব হয়েছে। কিন্তু আমি একা কি করে খাবো ? স্মৃতিতদা আছেন।

প্রেমা গুরুনামের দিকে তাকাল। ও বলল—ঠিক হয়। আভি বুলাকে লাভ। প্রেমা আরো একটা ডিশে পায়ের, মিষ্টি এনে রাখল।

বলল, কতদিন পরে এলে দাদা ? সেই বাচ্চাটার ছাঁদিনে একবার এসেছিলে। তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

ওড়না দিয়ে মুখ মুছল।

অনন্ত বলল—তোদেরকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

—তোমার মনে আছে তো আমি বলেছিলাম তোমার বিয়ের ঘটকালি করবো। তা তোমার যে কি পছন্দ তাই বলছো না। তারপরে শুনলাম কল্যাণীর বাপের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছ।

স্মিতবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন—তোমরা কি চাও অনন্ত গরিবের বন্ধু না হয়ে বড়লোকের জামাই হোক ?

না দাদা! তা চাইব কেন ?

অনন্তর পাশে বসতে বসতে চোখ নাচিয়ে বললেন—তবে ?

ওর দিকে ডিশ এগিয়ে দিয়ে প্রেমা বলল—খান দাদা।

—হ্যাঁ। তোমাদের পাড়ায় এসে খেয়েই যাচ্ছি। একবার তোমার বাপের খাতিরে, একবার তোমার খন্তরের খাতিরে আর এবার তোমার খাতিরে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না।

—কি কাজ ?

—শ্রমিক ঐক্য। ইউনিয়নের টিকিট কাটতে বড়ই নারাজ।

প্রেমা গুফনামের দিকে একবার তাকাল। বলল—ঐরকম দরবার ডেকে কিচ্ছু হবে না। ওদের জন্ম চাই হুকুম। বিনা হুকুমে চলতে জানে না।

—কিন্তু হুকুমটা দেবে কে ?

—আপনি ভাববেন না। ও পাড়ায় আমার বাবা, এ পাড়ায় আমার খন্তর। দু'পাড়ার দুজন মাতব্বর। ওদেরকে রাজী করাবার ভার আমার।

অনন্ত বলল—আঃ। বাঁচালি যাহোক।

স্মিতবাবু বললেন—তোমাকে আমি এইটুকু থেকে বড় হতে দেখলাম। এরই মধ্যে কত বুঝে গেলোছো। যাক ভারটা তোমার উপরেই রইল।

পরদিন সন্ধ্যায় মিটিং হলো নগেন মণ্ডলের ঘরে। সে পাম্প খালাসী। বেশ কিছু হাজরীবালা শ্রমিককে জুটিয়েছিল। তার পরদিন হরিহর গাঙ্গীর পাড়ায়। ও টিম্বার মিস্ত্রী।

রাজকিশোর সিং পিট মুনসী, তিলক সিং মাইনিং সরকার, রাবণ মান্নি পাথর কাটা প্রমুখ কয়েকজন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওদের কাছে এল এবং সংগঠনের কাজে লেগে পড়ল। ওরা অবশ্য আগেও ছিল।

তারপর টালোয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা। ওরা নানা জাতের মিশাল। কিন্তু ইউনিয়নের কাজে বেশ অগ্রণী ভূমিকা নিল। বরং বলা যেতে পারে একটা শক্তপোক্ত শ্রমিক ফোরাম তৈরি করে নিল।

কিন্তু সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে লোভার। প্রায় এক হাজার। তাদের তিন চারশো জন গোরখপুরী শ্রমিক। ওদের সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। কোনো ফাঁক দিয়েই ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের ঢুকবার জো নেই।

বাকি সব আরা, বালিয়া, ছাপরা, মতিহারী, দেওরিয়া, হুমকা, মুন্সের, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গার রাম, হরিজন, চামার, ধোবী, ক্যারট, পিন, বিদ, ধাঙড়, কুর্মা, মাহাতো।

সবারই আচার ব্যবহার, সংস্কার, পাল পার্বণ, উৎসব, আনন্দের আলাদা রকমফের। এক একটি সরদারের খবরদারীতে শ' পঞ্চাশ আদমী। সেই তাদের শাসন শোধনের জাঁতাকল। শ্রমিকরা সেটা বুঝেও বুঝে না। লোডার ছাড়া অত্যাগ্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের ওপর সরদারী প্রথা এত প্রকট নয়। বস্তুত ঠিকাদারের শ্রমিকদের ওপর সরদারী রাজ কায়ম রাখা যতটা সুবিধাজনক ততটা অগ্ন শ্রেণীর ওপর হয় না।

এক এক সরদারের দশ বিশটা চোখ। পঞ্চাশটা কান। কোথাও কিছু গোলমাল বুঝলে গোমস্তাবাবুর কাছে চুগলি করে। উনি তার ব্যবস্থা করেন। না পারলে ডি. সি. সাহেব তো আছেনই।

এইরকম চেইন সিস্টেমে বাঁধা। অনন্ত ভাবেই থাকে কি করে ওদের মধ্যে ঢুকবে ?

সেদিনটা ছিল শনিবার। সকাল থেকেই অনন্তর বুক উথাল পাখাল করছিল। এই বারটি ওর জীবনে বোধহয় একটা আলাদা মাত্রা নিয়ে স্থায়ী হয়ে যাবে।

মনে পড়ল গৈরী ওর একটা ফটো চেয়েছিল। কিন্তু তেমন ভালো ফটো তো নেই। মাইনিং সরদারী পরীক্ষা দেবার জন্ত পাশপোর্ট সাইজ ফটো আছে। তাই একটা দেবার জন্ত আলাদা করে খামে ভরে রাখল।

কিন্তু গৈরীর ফটো ? সেটা সে পায় কোথা ?

হ্যাঁ। আছে। ফাস্ট এইড কম্পিটিশনের দিন সব টিমেরই ইউনিফর্ম পরা ফটো তোলা হয়েছিল। চারটি মেয়ের একসঙ্গে একটা গ্রুপ ফটো আছে।

তাতে মন ভরবে কেন ? ওর আলাদা ফটো চাই। বৃকের ভিতর লকেট করে রাখবো।

কুলিকামিন নিয়ে ভাবতে ভাবতে মাথাটা জ্যাম ধরে গিয়েছিল। গৈরীর ভাবনা যেমনি এল অমনি কেমন আনন্দবোধ করল।

না। গৈরীকে আজ চাই-ই চাই !

রামধনির রাত পালি ডিউটি। নতুন ঘর সংসার নিয়ে সে এখন বেশ সুখী। বাসমতী ভাত রাঁধে, চুল বাঁধে, সোহাগে আদরে ভরে রাখে স্বামীর মন। যৌবনে কুকুরী ধন্ডা। বাসমতীর রূপের বাহার না থাক যৌবনের ঠমক আছে।

সন্ধ্যাবেলায় বসে বসে রুটি বেলছিল। রামধনি সৈঁকছিল।

হঠাৎ ঢুকে পড়ল অনন্ত।

ওরা দুজনেই অবাক। বাসমতী ঘোমটায় মুখ ঢাকল। রামধনি অবাক-চোখে তাকিয়ে বলল—আরে বাবু আপ ?

—হাঁ। খোড়া বাৎ হায়।

ওকে বুঝিয়ে বলল আসন্ন আন্দোলনের কথা তারপর দেখা করতে চাইল সেইসব বন্ধুদের সঙ্গে, যারা রাজী হয়েছিল।

রামধনি ওকে ঘরে বসিয়ে রেখে বন্ধুদের ডাকতে গেল।

টিমটিম করে হারিকেন বাতি জ্বলছে। ঘরের বাইরে উলুন জ্বলছে। বাসমতী উলুনের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করছে। প্রেমা যত সংজে ওর সঙ্গে কথা বলতে আসে ও তা পারে না। ঘোমটার আড়ালে কুলকুল করে ঘামে।

ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই। এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়াল পর্যন্ত পেরেক গেঁথে তার টাঙানো! তারই উপর লুঙ্গি গামছা লেঙ্গট শাড়ি ব্লাউজ। এক কোণায় একটি কাঠের বারুদ বাক্সো তার উপর সেই ফুলতোলা স্কটকেশটি। অণ্ড কোণায় মাটি, এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ডেচকি, রান্নার সরঞ্জাম। আর একটি দড়ির ঝোলা খাট, অন্তর খাতিরে খাদ থেকে আনা ব্রাটিশ ক্লথের উপর একটি শাড়ি বিছিয়ে দিয়েছে।

তার উপরে বসতেই খুরা বাবু মচ মচ করে উঠল। কি করে শোয় ওরা ? আপন মনে একটু হাসে ও। ভালোই হয়। শরীরের ওজনেই পরস্পর গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে।

খাটের উপর বিছানো শাড়ি কুঁচকে গেল। ঘর ভর্তি ঘামের গন্ধ। বসতে পারল না। গরমে ঘাম জ্বজ্ববে হয়ে গেছে সে নিজেও। উঠে পড়ল। বাইরে এসে রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

বহু কষ্টে দশ-বারোটি লোক যোগাড় করে নিয়ে এল। তাও কত ভয়ে ভয়ে। তাদেরকেই পাখী পড়া করে বোঝাতে লাগল ও। সেই একই কথা—শ্রমিক ঐক্য, সংগঠন, আন্দোলন, সংগ্রাম ইত্যাদি। হাজারবার বলা হয়ে গেছে বলে ওরও সেসব মুখস্থ হয়ে গেছে।

বিশেষ কোনো সাড়া নেই। তবে একজন বলল—বাবুজী ? আমরা ইউনিয়নের কথা জানি। আপনারা কি করতে চান তাও জানি। মনে মনে আপনাদের সাহসের তারিফ করি। সমর্থন করি। কিন্তু কি করবো ? সরদাররা জানতে পারলে আমাদের জ্ঞান খতরা করে দেবে। বউ-বিটির ইজ্জত লুট করে দেবে। দেশে যে ক্ষেতি-বাড়ি আছে তা বে-দখল করে বাপ-মাকে ভিখমাঙ্গার দশা বানিয়ে দেবে। এর যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন তবে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো।

অনন্ত বলল—সরদার একজন তোমরা একশোজন, হাজারজন, লাখোজন।

সবাই যদি এককাত্তা হও তাহলে কোন সরদারের হিম্মৎ হবে তোমাদের উপর অত্যাচার করে ?

—হবে বাবুজী। সরদার একজন নয়। তাদের মাথার উপর গোমস্তাবাবু। ডি. সি. সাহেব, ম্যানেজার সাহেব, খুদ কোম্পানী। তাদের চাপরাশীর হাজার লাঠি। বন্দুক। আমরা কি করে মোকাবিলা করব ?

—মোকাবিলা আমরা করবো। তোমরা শুধু সঙ্গে থাকবে।

এইভাবে রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা চলল। আর অনন্তের সময় নেই। গৈরী হয়তো একাই বসে আছে। সোমবারে আসার কথা দিয়ে উঠে পড়ল।

রুক্ষপক্ষের রাত। সবেমাত্র চাঁদ উঠেছে। তখনো লালিমা কাটেনি। গা ছমছমে অন্ধকার। পিছনে পাড়ের ওপর গাছগাছালির ছায়া। শিয়াল ডাকছে হুকা-হুয়া। শিমূল ডালে শকুনির ছানা কাঁদছে। খানিক দূরে শ্মশানভূমি।

তারই মধ্যে চূপচাপ বসে আছে গৈরী। বুক তোলপাড় করা অস্থিরতা। কান পেতে আছে পরিচিত পায়ের শব্দটির জগ্ন।

এক সময় সেই শব্দ কাছে এল। খুব কাছে। তার চোখ, কান, ত্বক, মাসের অতি সন্নিকটে। তখন সে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিল।

অনন্ত কৈফিয়তের স্বরে বলল—দেরি হয়ে গেল রামধনির ধাওড়ায়। লোডারদের নিয়ে মিটিং করলাম।

তবু গৈরী সাড়া দিলো না। অনন্ত হাঁটু গেড়ে কাছে বসল। মুখে হাত দিতে গেল ও জোর করে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

অনন্ত বলল—গৈরীর মান হয়েছে। মনে মনে হাসল।

একটি ফুলের মালা নিয়ে এসেছিল ওকে দেবার জগ্ন। আর একটি আংটি।

বলল—বেশ। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। আমিও এটা দিয়ে চলে যাই। মালাটি পরিয়ে দিলো।

গৈরী গলে জল। অশ্রুট কণ্ঠে বলল—মালা!

হ্যাঁ তো। আরো একটা জিনিস আছে। ডানহাতটা দে।

ও হাত বাড়িয়ে দিলো। অনন্ত ওর অনামিকায় আংটি পরিয়ে দিলো। এই তার জীবনে প্রথম সোনার গয়না। তাতে নাম লেখা অনন্ত। সেটা এখন পড়তে পারল না। তারপরে দিলো ওর ফটোটি।

গৈরী অভিভূত হয়ে ওর মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকাল। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করল।—অনন্ত বলল—এ কিরে ?

—তুমি আমার স্বামী। তুমিই আমার গুরু।

বাইশ

ফাটকবাজারে প্রকাশ জনসভা। মঞ্চ হয়েছে। মাইক এসেছে, নেতারাও উপস্থিত। চার পাঁচশো কুলিকামিন জড় হয়েছে মিটিং দেখতে। প্লোগান চলছে। ব্যস্ততা বাড়ছে ?

ততদিনে বর্ষাও নেমে গেছে। আষাঢ়ের আকাশে ছায়া ছায়া মেঘ। পর পর কয়েকদিন বৃষ্টিও হয়েছে। মাটি ভিজ্জে। তারই উপর বসে পড়েছে সবাই। অনন্ত আর গোপনে থাকতে চায় না। সেইদিন প্রথম সে আত্মপ্রকাশ করল। অবশ্য অধিকাংশ কুলিকামিন জানতো। কিন্তু প্রকাশ জনসভায় মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মাইকে ভাষণ দেওয়া সেই প্রথম।

উক থেকে হাঁটু পর্যন্ত থর থর করে কাঁপছে। প্রথম দিকে গলাটাও তারপর সব ঠিক। মামুলি কিছু কথা বলার পরই চডাস্তরে বলতে লাগল—ভাই সব। আমি বহুলোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা বুঝেছি তা হলো আমাদের শ্রমিকরা ভয়ের রাজত্বে বাস করছে। কিন্তু তাদের কিমের ভয় ? সাহেবরা কি জুজু বটে ? নাকি গোমস্তা চাপরাশীদেরই লাঠি আছে ? সরদাররা কি লাটের বাঁট। তোমরা সব এক হও সব যাহুর মোকাবিলা করবো।

চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল।

ওদের যদি একটা লাঠি বের হয় আমাদের একশোটা হবে। ওদের যদি একশো হয় আমাদের হাজারটা হবে। আমরা একা নই। তামাম হিন্দুস্তানের কয়লা কুলি আমাদের সঙ্গে। মালিক ম্যানেজার, গোমস্তা চাপরাশীর কালো হাত ভেঙে দেবো।

আবার হাততালি।

আমরা চাই শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। কিন্তু মালিকের দালালরা যদি অশান্তি সৃষ্টি করে তবে তাদেরকে হালাল করতে পেছপা হব না।

আবার হাততালি।

শ্রমিকের কল্যাণের জন্তই শ্রমিক সংগঠন। যার নাম ট্রেড ইউনিয়ন। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এর সঙ্গে বেইমানি করবো না। সমস্ত শ্রমিকের জন্ত আমাদের দুয়ার খোলা আছে কিন্তু কেউ যদি চালাকি করে তবে তার জবাবও দিতে জানি।

আরো বলে রাখছি অবিলম্বে রেশন আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি। সব শ্রমিক তাতে যোগ দিন। কেউ রেশন তুলতে যাবেন না। যদি কেউ যায় তবে জানবো সে বেইমান। কোম্পানীর দালাল। তার কি ব্যবস্থা নিতে হয় জানি। সরদার, গোমস্তা, চাপরাশীদিকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—লাঠি আমাদেরও আছে। তা চালাতেও জানি।

হাততালির পর হাততালি।

তার কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে আরো উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল। বক্তব্য তীব্র থেকে

তীব্রতর। শাসানির পর শাসানি। আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতার শেষে সে যখন সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে কথা শেষ করল তখন কুলিকামিনদের মনে নেতার আসনটি পাকা হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। এই রকম মাল্লুষই চাই। এমনি হিম্মৎবলা, এমনি বোলনেবালা। যে নেতারা এতদিন থেকে অনন্তকে দেখে এসেছে শান্ত, স্থির, বক্তব্য দৃঢ় কিন্তু ভাষায় সংযত; চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ এবং পাণ্ডা যোগ্যতার লাভক্ষতির উপর যত্নবান তারা অবাধ হয়ে গেছে। সে যে এমনভাবে জলে উঠবে মালিকের কালো হাত ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি প্রকাশে ঘোষণা করবে তা কেউ ভাবতেই পারেননি। কিরকম আবিষ্ট হয়ে গুনছিল। ওর বলা শেষ হলে অগাচ্ছ বক্তারাও ঐ একই সুর ধরে উত্তেজনা বাড়িয়ে দিলো।

ফলত শ্রমিকদের মধ্যে একটা টগবগে ভাব জেগে উঠল। যারা দ্বিধা স্বন্দে ভুগছিল তারা মনঃস্থির করল তাদের মনে ভয় এবং প্রতিহিংসা দুইই জেগে উঠল। মেসের দিকে ফিরবার সময় স্মৃতিবাবু বললেন—তোর বক্তব্য শ্রমিকরা খুব নিয়েছে। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে তুই এত গরম হলি কি করে?

—দাদা! কম পক্ষে দু'হাজার জনের সঙ্গে গোপনে কথা বলেছি তাতে দেখেছি সবাই একরকম ভয়ের শিকার। ক্রৈব্য তাগ করে উঠবারও ইচ্ছা নেই। সেইজগুই আমি মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম একটা গরম হাওয়া বইয়ে দেবার জগু। ভয়কে জয় করতে হলে পান্টা ভয়ের সৃষ্টি করাই ভালো। তাতে শ্রমিকদের মানসিক ক্ষমতা বাড়বে। আমি কি ভুল করেছি?

—না। ঠিকই করেছিস। বরং হিরো বনে গেছিস।

পরদিন কলিয়ারীর সামনে একটা নূতন দৃগু। বেশ বড় সড় শ্রমিকের মিছিল। পুরোভাগে স্মৃতি চ্যাটার্জী, অনন্ত শর্মা, হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, যনুা যাদব, মগনু হুনিয়া, রাবণ মাঝি, কালো বাউরী, শম্ভু বাউরী, শকুন্তলা বাউরিনী, ফুলমনি প্রমুখ।

বড় সাহেব অফিসেই ছিলেন। ড্র কুঁচকে সামনের দিকে তাকালেন। পুরো চাতালটা লোকে লোকে ভরে গেছে। সবাই এই কলিয়ারীর শ্রমিক। তারা যে একসঙ্গে জমায়েত হয়ে ম্যানেজারের অফিসে আসতে পারে এই ধারণাটাই গুঁর ছিল না।

ভিতরে ভিতরে শ্রমিকদিকে একতাবদ্ধ করার, আন্দোলনে সামিল হবার বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করার, চলতি রেশন ব্যবস্থা তুলে দেবার জগু যে কাজ চলছে এবং গতকাল বিকেলে ফাটকবাজারে খুব গরম গরম লেকচার বাজী হয়েছে, অনন্ত নামে একটা কোর্থ ইয়ারের ট্রেনি কোম্পানীকে শাসানি দিয়ে বক্তৃতা করেছে এসব সংবাদ গুঁর কাছে আছে। নেই শুধু এই মিছিল ও সমাবেশের খবর।

ভিতরে ভিতরে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। এরকম অবস্থার মোকাবিলা তো করতে হয়নি কখনো। ব্রিটিশ আমল থেকে ম্যানেজারী করে আসছেন। দাপট ও শাসনের ব্যাপারগুলোই জানা আছে।

কলিংবেল টিপে বড়বাবু রামহরিকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ডি. সি., ডি. ডি., হেড চাপরান্শী, গোমস্তাবাবু, ও ইনচার্জবাবুকে ডাকো।

ফোন করলেন, এজেন্ট, সি এম. ষ্ট, পারমোন্টাল অফিসার ও চীপ সিকিউরিটি অফিসারকে। তাঁদের পরামর্শ জানতে।

বাইরে শ্লোগান চলছে। মিটিং হচ্ছে। উচ্চকণ্ঠে ভাষণ দেওয়া হচ্ছে রেশন বন্ধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে। সবই কানে আসছে। কি অসহ্য ব্যাপার। কি স্পর্ধা।

দেখতে দেখতে হু'তরফেই ভিড় জমে গেল। গাড়ির পর গাড়ি এল সাহেব স্ত্রী নিয়ে। হু পক্ষের পুরো টেনশান।

সুমিতবাবু এলেন জনকয়েক সহকর্মী নিয়ে। ম্যানেজারের অফিসে ঢুকবার মুখে দারোয়ান তাদের পথ আটকে দিলো।

উনি বললেন—আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

ম্যানেজার বললেন—আগে জনতা হটাও। তারপর আলোচনা।

—জনতা তো বাইরে আছে।

—তাহলেও এটা জুলুমবাজীর চাপ সৃষ্টি করেছে।

—বেশ তাহলে যে যেখানে আছেন থাকুন।

কিরে গিয়ে শ্রমিকদিকে বললেন কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় না তাহলেও হটব না। এখানেই বসে পড়।

ব্যাপারটা বেশিক্ষণ চলল না। হু'ভ্যান পুলিশ এসে বেপরোয়া লাঠি চালিয়ে শ্রমিকদিকে ছত্রভঙ্গ করে দিলো। সুমিত চ্যাটার্জী সহ শতকজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

যাবার সময় ওরা শ্লোগান দিতে দিতে চলল শ্রমিক ঐক্য-জিন্দাবাদ। রেশন আন্দোলন—সফল কর।

মালিক ম্যানেজারের কালো-হাত ভেঙে দাও ভেঙে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ হে হুলা, গোলমাল, চিংকার, ও আর্তনাদ চলল। তারপর সব ঠাণ্ডা। ভারী বৃট পরা চাপরান্শীর দল অফিসের সামনে মার্চ করতে লাগল। এই মহড়া সারা দিনরাত চলবে। একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করতে হবে তো।

—আজই শ্রমিক ঐক্যের শ্রীংখ ও সপিওকরণ করে দিচ্ছি। ম্যানেজারের সদস্ত ঘোষণা।

বয়লার ফার্নেস দাউ দাউ করে জ্বলছে, চিমনী দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, বন বন করে পুলিচাকা ঘুরছে।

পুলিশের লাল পাগড়ি, বেঁটে লাঠির ত্রাস দু'হাজার ফুট নীচের পাতাল পুরীতেও ছড়িয়ে গেছে। মাল্লুঘ আর কথা বলছে না। মেসিন চলছে। ঘর ঘর কর কর শাঁ শাঁ ঘটঃ ঘট—

ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ভিন্ন শব্দ। আবহ সঙ্গীতের মতো বাজছে।

কুলিধাওড়গুলো একদম ফাঁকা! ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকে গেছে। কে কোথায় ভয়ে পালিয়েছে। রেল ফটকের বাজারে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে। কারো পা বাড়াবার জো নেই। চাপরাশীদের পায়ে নাগরা জুতো মচ মচ শব্দে স্বাধীন ভারতের শ্রমিক এক্যকে খতম করে দিতে হরদম টহল দিচ্ছে।

গ্রীষ্মের ছুটির পর স্কুল খুলেছে। সামনে ষাণ্মাসিক পরীক্ষা। কিন্তু গৈরীর পড়তে মন নেই। থাকবার কথাও নয়। যে অবস্থায় ও পড়েছে অল্প মেয়ে হলে স্কুল যেতেই পারতো না। শক্ত ধাতের মেয়ে বলেই পারছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝবারও জো নেই। না হলে ভিতরে ভীষণ টানাপোড়েন প্রচণ্ড অস্থিরতা।

ওর খবুর ওর বাপকে একশো টাকা দিয়ে দিয়েছে, শ্রাকরার দোকানে রূপোর গহনা তৈরি হচ্ছে—বিছে হার, বাজু বন্ধ, ঝুমকা, হাতের চুড়ি, কঙ্কন, দ্বিরাগমনের দিন ধার্য হয়েছে পাঁচই শ্রাবণ। তার আর সময় কোথা?

এদিকে রাত্রে ঘুম হয় না। সকালে উঠতে কষ্ট হয়। ঘন ঘন হাই তোলে শরীরটা যেন দশমন ভারী। এমনটা আগে ছিল না। গা জর জর বমি ভাব দুদিন স্কুল যেতে পারেনি।

কে বা ওর খবর নেয়? হেনী তো সকালে কলিয়ারী যায়। বিকেলে ফেরে। সন্ধ্যা হলেই মদে মাতাল। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে প্রজনন। ছেলে মেয়েদের খবর কে রাখে?

সেটা গৈরীর পক্ষে শাপে বর। পার হয়ে গেল একটা বিঘ্ন সময়। এবারও বুঝতে পেরেছে। ধরা পড়েছে নিজের কাছেই। নারীদেরহের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে রজঃশ্রাবও একটি। মিলনের সুখ পেতে না পেতেই অসময়ে ঘটে গেল ঋতু পরিবর্তন। তারপর জীবনের সেই স্মরণীয় শনিবারের রাতে পৌঁছে গেল প্রাণের বার্তা।

কিন্তু যার জন্ম এত সেই জানে না। তাকে জানাবে কি করে?

শনিবারের পর শনিবার পার হয়ে গেছে শ্রেণি রাত জেগে। কত আশা করে বসে থেকেছে তবু খবর আসেনি। শনিবারের রাত অভিসারের রাত হতে পায়নি কত যুগ যুগান্তর থেকে।

তবে কি অনন্ত তাকে ফেলে দেবে? তার গর্ভে সন্তানের জন্ম দিয়ে সরে পড়বে?

না না। অসম্ভব। তার ভালোবাসা অতলম্পর্শী। সমুদ্রের মতো গভীর।
কাঠের বাস্তোর ভিতর কাপড় চোপড় দিয়ে ঢাকা সমস্তে রাখা শুকনো ফুলের
মালাটি বের করে গলায় পরে, শুঁকে আবার রেখে দেয়। আংটি বের করে আঙুলে
পরে। চোখের সামনে জলজল করে অনন্ত নামটি। ফটোটি চেপে ধরে
ঠোঁটে। হুঁচোখ বেয়ে দর দর ধারায় জল গড়ায়। ভিতরটা ডুকরে ডুকরে
কাদে।

হায়। কি মরনে মরলাম!

এই যখন তার মনের অবস্থা তখন খবর এল পুলিশের লাঠি চালনার।
তারপর একটির পর একটি দুঃসংবাদ—স্মিতবাবু ধরা পড়েছেন। তার সঙ্গে
গোবিন্দ মামু, হরিহর গান্ধী। অনন্ত ফেরার। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভীষণ মুষড়ে পড়ল ও।

তবু সে পরের দিন স্কুল গেল। কারণ ঘরের বাইরে না গেলে খবর পাবে কি
করে? কিন্তু কোথায় বা খবর নেবে? অনন্তই বা খবর দেয় না কেন?
না দিক। নিজেই যাবো খোঁজ করতে? কিসের লজ্জা? সব লাজ শরম তো
তাকেই দিয়েছি? লোকে কি বলবে? বলুক।

কমলেন্দু শনিবার বাড়ি গিয়েছিল। সোমবার ফিরতে পারেনি। মঙ্গলবার
মেসে ফিরে ছন্ন ছাড়া ভাব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল। স্ববীর ও অনন্ত দুজনকেই
পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ট্রেনিদের অনেকেই মেস ছেড়ে চলে গেছে। এত
পুলিশের হিড়িক, কে থাকবে? মেস ফাঁকা।

ও পৌঁছবামাত্র একবার পুলিশ, একবার চাপরাশীর কাছে জবাব দিহি করতে
হলো। পিওন এসে ডেকে নিয়ে গেল ডি. সি. সাহেবের কাছে। উনি রীতিমতো
ধমকি দিলেন—অনন্তের নামে বডি ওয়ারেন্ট আছে। ও মেসে আসবেই।
তখন নিশ্চয়ই খবর দিও। না হলে তোমার দশাও খারাপ।

কমলেন্দু ওকে কিছু বলল না। ডিউটিও গেল না। অনন্তের খোঁজে বেরিয়ে
পড়ল। কিন্তু পুলিশ যাকে খুঁজে বের করতে পারছে না তাকে ওকি খুঁজে বের
করতে পারবে? দুপুরের বাঁ বাঁ রোদে যখন মাথাটা কামড়ে খাচ্ছে পেটে
খিদে কল কল করছে তখন ওর সেই বোধটা এল।

মেসে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে বই খুলল। কিছুতেই মন বসল না। আই
চাই করে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। হঠাৎ দরজায় মৃদু ঠক ঠক শব্দ।
খুলেই থ।

—আরে গৈরী! তুমি?

ম্লান হেসে গৈরী বলল—হ্যাঁ দাদা।

—কি হয়েছে তোমার? মুখটা এমন শুকনো কেন?

—কিছু না স্থল থেকে ফিরছি তো ।

মেয়েদের সঙ্গে কথায় আচরণে কমলেন্দুর একটা জড়তা আছে । সে ওকে ঘরে এসে বসতে বলতেও পারছে না । গৈরীও বসল না ।

জিজ্ঞাসা করল—আপনার বন্ধুর খবর পেলেন ?

—না । সকাল থেকে অনেক ঘোরাঘুরি করলাম ।

—পুলিশে ধরা পড়েনি তো ?

—কি জানি ?

—আচ্ছা চলি—তাহলে ।

—ওকে কিছু বলতে হবে ? মানে যদি খবর পাই ।

গৈরী একটু হেসে বলল কি আর বলবেন ? আমি খবর নিতে এসেছিলাম । এইটুকুই বলে দেবেন । আবার একবার আসবো না হয় তো ।

ও চলে গেল । ক্লান্ত ও অবসন্ন ভঙ্গীতে ।

কমলেন্দুর মনে খটকা লাগল । অনেক লোকই তো অনন্তর খোঁজ নিতে আসছে কিন্তু এত ব্যগ্রতা তো কারো মুখে দেখেনি । কি রকম যেন উদাস উদাস ভাব । ওর উপরে এত টান কেন ?

আঃ । বেচারী অনন্ত ! গরীবের ছেলে । বিধবা মায়েয় জ্যেষ্ঠ পুত্র । সংসারে তার কত দায় দায়িত্ব । একটা গোটা পরিবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে । সে আজ এমন ঝামেলায় পড়ল যে বডি ওয়ারেন্ট !

রাত বন্ম বন্ম করছে । কলিয়ারীর যান্ত্রিক শব্দতরঙ্গ আবহমণ্ডলকে ছেয়ে রেখেছে । সারাদিনের ধকলেও ঘুম এল না ।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালো । তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে । আকাশটা ঘোর অন্ধকার ।

তেইশ

অনন্ত মেসে ফিরল বুধবার রাত্রে । তখন চারিদিক নীরব । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে । পিছন দিক থেকে এসে জানালায় মুখ বাড়িয়ে ডাকল—কমলেন্দু !

শ্মশানঘাতীর মতো মলিন ও রুক্ষ একটি মুখ । খোঁচা খোঁচা কালো চাপদাড়ি । অতিশয় উজ্জ্বল দুটি চোখ এবং ঈষৎ উঁচু শব্দন্ত দেখেই তড়াক করে উঠল ।

দরজা খুলে চাপা কণ্ঠে বলল—তুই ?

—হ্যারে ! তুই কবে ফিরেছিস ?

—গতকাল ।

—এদিকের খবর সবর মদ্র শুনেছিস ?

—হ্যাঁ । সেজন্তই তো ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না ।

—ভাবিস না । সব ঠিক হয়ে যাবে ।

বলতে বলতে জামা, প্যান্ট, জুতো মোজা খুলে ফেলল। কি বিটকেল দুর্গন্ধ ! নাকে গামছা চেপে বলল—শালা। কোন নর্দমায় পড়েছিলি ?

—নর্দমাই বলতে পারিস। এক কাপড়েই তো চলছে। ঘামে, বুষ্টির জলে কতবার শুকোল। যাক গে এগুলো কামিনকে দিয়ে কাচা করিয়ে রাখিস। আমি স্নান করে আসি। কিছু খাবার আছে রে ?

—দেখছি।

হাতে তেলের শিশি ও সাবান নিয়ে গামছাটা গায়ে দিয়ে জন্মদিনের পোশাকে বেরিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

কমলেন্দু মেসের ঠাকুরকে উঠিয়ে বলল খাবার আছে ?

—এখন কি থাকবে বাবু।

—অনন্ত এসেছে, খাবে কি ?

—ওঃ তাই নাকি ! ধড় ফড় করে উঠল। একটু ভেবে বলল ভাতে জল দিয়ে দিয়েছি। তাই হেঁকে দিচ্ছি। আর পোস্ত বাটা, ডিম ভাজা করে দিচ্ছি।

—তাই কর। ঘরেই খাবার আনবে।

অনন্তর স্নান করতে একটু সময় লাগল। গায়ে অনেক ময়লা ছিল তো। কাচা কাপড় পরতে পরতে বলল—মনে হচ্ছে প্রাণটা এল।

ঠাকুর খাবার নিয়ে এল কাঁচা লঙ্কা, পিঁয়াজ, পোস্ত বাটা, ডিমভাজা দিয়ে জল ছাঁকা ভাতেই অমৃতের আশ্বাদন।

খেতে খেতে বলল—পুলিশ যখন লাঠি চালু করে দিলো তখন ভীষণ হাউ মাউ শুরু হয়ে গেল। আমি এক ব্যাটার লাঠি কেড়ে যা কতক বসিয়েছিলাম কিন্তু কি বলব যত শালা কাওয়ার্ড। এমন পালাতে লাগল যে প্রতিরোধ করার কোনো চেষ্টাই নেই। আমারও ঘাড়ে ছুঁচার লাঠি পড়ল। কেমন বেঘোর হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম কালো বাউরী আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে বাউরী ছেলেরা ছিল ওরা পিছন ফিরতে দিলো না ধাওড়া পেরিয়ে এক দু-নম্বর চানকের পাস দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম হুন্নিয়ার বাউরী পাড়ায়। সারা দিনরাত রেকতে দিলো না। মাইরি। এই লোকগুলোর আমার উপরে এমন মায়া পড়ে গেছে যে আশ্চর্য না হয়ে পারি না।

—তারপর ?

—ওরাই কলিয়ারীর খবরাখবর এনে দিলো। সুমিতদার অ্যারেস্টের খবরে বিচলিত হয়ে পড়লাম। রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে ভোরে উঠে আসানসোল। সেই থেকে পার্টি, লীডার, উকিল, মোক্তার করে বেড়াচ্ছি সুমিতদাকে জামিন করাবার জন্য। কিন্তু আমি তো কখনো কোর্ট দেখিনি। শালা হৃদিশ করতেই দুদিন খরচ হয়ে গেল।

খালার উপরেই হাত ধুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

বলল—এখন রাত বারোটা। ঠিক চারটের সময় উঠিয়ে দিস।

—আর সূবীর কোথায় ?

—হ্যাঁ। ওর খবর জানি। পুলিশে খুঁজছে শুনেই হাওড়ার ট্রেনে চড়ে বসেছে। ওর মেসোমশাই কলকাতার পুলিশ অফিসার। তাঁর কাছেই গেছে। ঐ শালা ডি. সি. ওকে ফাঁসাল। শুধু একটাই রাগ ও আমার বন্ধু। না হলে সূবীর আমাদের আন্দোলনে ছিল না।

—ও শালা আমাকেও ধমক দিয়েছে কিন্তু তোর সঙ্গে ওর এত কিসের রাগ ? অনন্ত হাসতে হাসতে বলল—তাও বুঝিস না।

—ওঃ। কল্যাণীর জ্ঞান।

—হ্যাঁ। আশাভঙ্গ সঞ্জাত ক্রোধ। শালা! সুন্দরী মেয়ে প্যায়দা করেছিল বাজারে হটকেকের মতো বিক্রি হবে। তো আমার পিছনে লেগেছিল কেন ? আমি ছাড়া কি কাস্টোমার নেই।

ওর রাগের কথায় কমলেন্দু হাসতে হাসতে বলল—সে তুই যাই বল এই অফারটা নিতে পারতিস। তার উপরে কল্যাণীর একটা ভালোবাসার টান আছে।

—সে তো শুচিরও আছে। কিন্তু আমি কি ভালোবাসার দোকান খুলেছি ? একটাই হৃদয় একজনকেই দেওয়া যায়। বুঝেছিল। ঘুমো।

পাশ ফিরে চোখ বুজল। একটু পর ঘুমিয়ে পড়ল।

কমলেন্দু জেগে রইল। অনেক ছুঃখ কষ্টের সময় পার হয়ে তার বন্ধুটি ঘুমিয়েছে। ওকে পাহারা দিতে হবে তো। ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিতে হবে তো। না হলে যে ধরা পড়ে যাবে। অনন্তকে ও বড্ড ভালোবেসে ফেলেছে।

ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল।

বলল—দশটা টাকা দে।

কমলেন্দু টাকা বের করে বলল—একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গেছি। গৈরী এসেছিল তোর খবর নিতে। বেচারীর মুখ শুকিয়ে আমসি। এমন ব্যাকুল চাউনি যে দেখলেই তোর মন টন টন করবে। অতটান কেন রে ?

—ও আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

—শালা ! ওর পিঠে ধাপ্পড় মেরে বলল সব মেয়ে তোর প্রেমে পাগল।

—দেখতেই তো পাচ্ছিল। তোর মতো নেকু পাটি আছে। দস্তুর মতো হিরো।

বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছিল। কমলেন্দু বলল—সাবধানে থাকিস।

—হ্যাঁ।

—গৈরী আবার আসবো বলেছে—কি বলবো ?

—কি আবার ? বলবি এসেছিল চলে গেছে। আবার শনিবার আসবো।

—আচ্ছা! কিন্তু ওকে ডেট বলা কি ঠিক হবে? যদি ফাঁস করে দেয়।

—যতই হোক প্রেমিকা তো! প্রাণের টান আছে। কাউকে বলবে না।
বুকে গেঁথে রাখবে। বলে দিস শনিবার।

হাসতে হাসতে চলে গেল।

অনন্ত যে হাসির ছলে তার জীবনের ধ্রুব সত্যটি বলে দিয়ে গেল এবং শনিবার শব্দটিতে বিশেষ অর্থ রেখে গেল অন্ধতে লেটার পাওয়া কমলেন্দু তার তাৎপর্য ধরতে পারল না। সেও হেসে হাত তুলল।

তখনো আঁধার কাটেনি। তাই শুয়ে পড়ল।

আকাশ মেঘলা। টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে। দামোদরের জল মাটির পাড়ে এসে আছাড় খাচ্ছে। গুর গুর শব্দ। ভেজা মাটির পথ দিয়ে ছুটি ছায়ামূর্তি হেঁটে যাচ্ছে প্রাণের আবেগে। কারো মুখে সাড়া নেই।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। ঝক ঝক করছে নদীর জল। মিট মিট করছে কলিয়ারীর বিজলী বাতিগুলো। পথ দেখা দায়।

তবু এই বৃষ্টিপাত এই অন্ধকার তাদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অন্ধকারেই গা ঢাকা দিয়ে পুষ্টিশ ও গুপ্তচরের চোখ এড়িয়ে গৈরী যে ঘরটায় থাকে তার জানালায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ছাঁচ দিয়ে জল পড়ছিল। জানালার টিনের আগল ও ছুটি লোহার রড। সেইখানে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে ডাক দিয়েছিল।

শনিবারের রাত। গৈরীর কান খরগোসের মতো খাড়া। অনন্তেরই প্রতীক্ষায়। কমলেন্দু মারফৎ ঐ একটি শব্দেই বুঝে নিয়েছিল তার ইঙ্গিত। তারপরে কি ঘুম হয়?

অথচ বাদলা রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে পরম আয়েসে। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসেছিল ও। ঠিক জায়গায় হুজনের দেখা। পরস্পরের হাত ধরে এগিয়ে চলল দামোদরের দিকে।

একটি শ্বাণ্ডা গাছ। নিবিড় ঘন পত্র পল্লব। অসংখ্য জোনাকীর আলো। পায়ের নিচে ভিজে মাটি। কচি কচি ঘাস।

অনন্ত বলল—এইখানেই বোস গৈরী। শুকনো মাটি তো পাবি না। ভিজে ঘাসের উপরেই বসে পড়ল। পরস্পরের গায়ে গা দিয়ে খুব কাছাকাছি। অনন্ত ওকে আরো কাছে টেনে নিল।

অশ্রুট কণ্ঠে গৈরী বলল—উঃ কতদিন পর।

—হ্যাঁ! শালা প্রেম নয় বুকফাটা ব্যাপার। কি করে যে দিনরাত কাটে?

—ক'দিন থেকেই তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছিলাম।

—কেন রে?

—নতুন খবর আছে।

—কি ?

—ফল ধরে গেছে ।

—এঁা অনন্ত চমকে উঠল ।

গৈরী একটু হেসে ওর বৃকে মুখ দিয়ে বলল—খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল ।
তাই না ?

—যার হবার তার তাড়াতাড়িই হয় । শরীরে ক্রটি বিচ্যুতি না থাকলে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু ব্যাপারটা তো কেলেঙ্কারী হয়ে গেল ।

—তাতে কি ? আমার মাথায় তো সিঁদুর আছে । ঐ দোহাতেই কেটে যাবে ।

—পরের নামে সিঁদুর পরবি আমার সন্তানের মা হবি ?

—সে কি করবে ? একটা তো আড়াল চাই—কৈফিয়তও চাই । সিঁদুরটা দেখে ভয় পাচ্ছিলে এখন ওইটাই রক্ষা কবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অনন্ত বলল—নীতি ও বিবেকের সঙ্গে কি চূড়ান্ত বেইমানি । মিথ্যা পরিচয়ের গ্লানি নিয়ে জন্ম নেবে আমার সন্তান । মনে হয় সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ছারখার করে দিই । খুলে যাক মুখোশ । বেরিয়ে আসি সাদা মুখে । মিথ্যার সঙ্গে কোনো আপস নেই ।

গৈরী ওকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল—তার কি সময় চলে যাচ্ছে ? তোমার বড় রাগ । দপ করে জলে ওঠো । একটু ঠাণ্ডা হও তো । এতদিন পর কাছাকাছি এসেছি—ভালো করে আদর কর

অনন্ত শান্ত হলো । ভিতরে নয়—বাইরে ।

জোনাকী জ্বলা শাওড়া গাছের নিচে জননী হবার সন্তাবনা নিয়ে যে প্রেয়সী তার বৃকের সঙ্গে সঁটে আছে অসীম মমতায় তার মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—তোর মুখটা দেখতে পাচ্ছি না রে ।

—আমিও তো !

—চুমু দে ।

—নাও ।

হৃদয়ের সেই তন্ত্রীগুলি প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে জেগে উঠল যার জাগরণ না হলে প্রাণের বার্তা উহুই থেকে যায় । গাছের পাতা বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল টপ টপ করে । ব্যাঙগুলো নানা স্বরে ডাকছে । বৃষ্টি বা মিলন রাগিণী ।

অনেকক্ষণ পর গৈরী নিজেকে সামলে নিল । ভিজ্জে কাপড়-চোপড় গুছিয়ে পরে বলল—আরো একটা খবর আছে ।

—কি ?

—আমার গাওনার দিন টুঁক হয়ে গেছে । এই শ্রাবণ ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠল অনন্ত । বিহ্বলতা কাটতে সময় লাগল ।

ধীরে ধীরে শাস্ত হলো। ক্লাস্ত ও খিন্নকণ্ঠে বলল—এই ভয়ই করেছিলাম। এই আমাদের প্রেমের পরিণতি। জেনেগুনে বিষ করেছি পান। অথচ নীলকণ্ঠ হবার সাধ্য নেই।

—কি করব বল ?

—কি করবি ? পেটে বাচ্চা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে যাবি। লোকনিন্দা থাকবে না। ভয় ভাবনা থাকবে না। অনায়াসে অবলীলায় ঘরগী, গৃহিণী, জননী হয়ে যাবি। ছোটলোক আর কাকে বলে ?

কি বিস্ময়কর হতাশা সেই কণ্ঠস্বরে। কত তিক্ত, কত বিষাক্ত তার অর্থ।

—আমাকে এত ছোট মনে করছ ?

—বড় মনে করবো কি করে ? আজ আমি অন্ধকারের জীব। পঁচাত্তর মতো লুকিয়ে থাকি। সূর্যের আলোতে মুখ দেখাবার জো নেই। হাজতের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। বিচারকের রায় শুনবার জন্ম প্রতীক্ষা করছি। চাকরীটা তো যাবেই। এই সময়ে তুইও আমাকে দাগা দিবি গৈরী ? তবে আমি কি নিয়ে বাঁচবো ?

গৈরী খর খর করে কাঁপছিল। অনন্তকে ধরে টাল সামলাল।

বলল—উঃ ! কি বলবো তোমাকে ? গা-ঢাকবার চিন্তাতেই ডুবেছিলাম। কিন্তু তোমাকে দাগা দেবো একথা ভাবলে কি করে।

—তাহলে ওসব কথা বললি কেন ?

—সে তো খবর হিসাবেই বলেছি। তুমি মাথা গরম করে আছো। একটু তলিয়ে বুঝলে না। আমি কি তোমাকে দাগা দিতে পারি ? তাহলে আকাশটা ভেঙে মাথায় পড়বে না ? এই বুঝলে আমাকে—

কান্নায় ভেঙে পড়লো ও।

আঘাতটা বড় তীব্র হয়ে গেছে। অনন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেয়ে ওকে বুকে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিলো।

গৈরী বলল—যতই ছোট জাতের মেয়ে হই তোমার সন্তানের গায়ে দাগ লাগাতে দেবো না। এই আমার প্রতিজ্ঞা !

—আঃ বাঁচলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল অনন্তর বুক থেকে।

আবেগের ধাক্কাটা কাটতে একটু সময় নিল। তারপর অনন্ত বলল, চল গৈরী। এবার ফেরা যাক।

চল। গৈরী উঠে পড়ল।

চলতে চলতে অনন্ত বলল আজ শনিবার। কমলেন্দু বাড়ি চলে যাবে। আমি যে কার কাছে যাবো ? কি যে থাকবো ?

—সে কি ? তুমি খাওনি ?

—না রে গৈরী ! দিতে পারবি ? কিছু খাবার ?

—কেন পারব না? কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণ। আমার হাতে থাকবে?

অনন্ত হাসল। বলল হে ভগবান! আমি কি জাত মানি? তাহলে এই কদিন বাউড়ী ঘরে থাকছি কি করে? তাছাড়া তুই আমার সম্ভানের মা হতে চলেছিস তারপরেও একথা জিজ্ঞাসা করলি কি করে?

স্বভাব দোষে। আবার কী? চলো ঐ জানলার কাছে দাঁড়াবে। আমি ঠোঙাতে ভরে খাবার পার করে দেবো। নাকি এখানে বসবে? আমি এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবো?

—না-না। অত করতে হবে না। জানালা দিয়ে পার করে দিলেই হবে।

—কিন্তু আমার তো সাধ যায় তোমাকে কাছে বসে খাওয়াই।

মেসে গিয়ে দেখল কমলেন্দু বাড়ি যায়নি সে শুয়ে আছে এবং ও ডাকবার পূর্বেই উঠে এসে দরজা খুলে দিলো।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—তুই আজ বাড়ি যাসনি?

—কি করে যাবো? তুই শনিবারে আসবো বলে গেলি।

—মাইগড! তাহলে তো আরো আগে ফিরতে পারতাম।

—ঠিক আছে। ফিরেছিস তো! সেদিন ভালো করে খেতে পাসনি সেজন্য আজ মাংসের ঝোল ভাত রেখেছি।

অনন্ত আরেকবার মাইগড বলল।

গৈরীর দেওয়া রুটি তরকারিতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়েছিল। পেট ভরেনি।

তাছাড়া গুর খাওয়ার পরিমাণটাও বেশী। গৈরী অত জানবে কি করে? ঘর সংসার তো করেনি।

অনন্ত জামা কাপড় ছেড়ে বেশ আয়েস করে স্নান করল। তারপর আরো একবার মাংসের ঝোল ভাত স্টেটে নিল। মনে মনে ভাবল খোদা যব দেতা হায় তো ছপ্পড় ফাড়কে দেতা।

একটা দুর্বিসহ সপ্তাহ পার হয়ে গেল প্রেয়সীর প্রেম, উথলে পড়া যোঁবন, পেটভর্তি খাবার। এবার একটু ঘুমোতে পেলেই ষোলো আনা স্মৃথ। সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল।

কমলেন্দু বলল—তোর ওদিকের কি খবর।

—আর বলিস না। কোর্ট কাছারীর ব্যাপারটা বড়ই জটিল। আর এত বিলম্বিত লয় যে তাল রাখা দায়। অনভিজ্ঞতা তো বটেই। তবে এই কদিন ঘোরাঘুরি করে বহুত রকম অভিজ্ঞতা হলো। যাইহোক, আশা করি সোমবার স্মৃতিদ্যাকে জামিন করাতে পারবো। স্বপ্না কিছু টাকা কড়িও দিয়েছে।

—তোকেও তো জামিন-নিতে হবে?

হ্যাঁ। সেজন্য স্থবীরকে খবর পাঠিয়েছি। ও এসে গেলেই হাজিরা দেবো। এবার ঘাঁং ঘোঁং কিছু বুঝেছি।

কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ল। আবার ভোরে উঠে যাবার তারা। সেদিন দাড়িটাও কামিয়ে নিল। কাচা জামাপ্যাণ্ট পরে ফিট।

কমলেন্দু ওর ছেড়ে দেওয়া জামাপ্যাণ্ট একদিকে সরিয়ে রেখে বলল এত কাদামাটি কেনরে ?

—মাটিই তো মা-রে! সেই মায়ের কোলে শুয়ে মা-হবার সস্তাবনাময়ী প্রেমিকার সস্তাষণ করছিলাম।

—শালা! সব সময়ে ইয়ার্কি! এত কষ্টেও স্বভাব গেল না।

এতবড় একটা সত্যবর্তাও কমলেন্দুর কাছে ইয়ার্কির মাত্রায় পড়ে গেল। অনন্ত ভীষণ আবেগে জড়িয়ে ধরল। কত কথা বুকপেট তোলপাড় করে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ঠিক এই মুহূর্তে কমলেন্দুর কাছে স্বীকারোক্তি দিতে পারলে ও খুব হাল্কা বোধ করত। কিন্তু পারল না। বুকটা ভারী হয়েই রইল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলল—তুই আমার কত জন্মের বন্ধুরে ?

বলতে বলতে ওর কর্কশ গালে চুমু খেয়ে জ্বত বেরিয়ে গেল।

সেদিন আসানসোলার মা-ভিভিক্টোরাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত উকিল, মোক্তার, আসামী, ফরিয়াদী, পুলিশ দারোগায় গিজ্ গিজ্ করছে। বাইরে বহুলোক। পতাকা ফেস্টুন উড়ছে। নেতারা খন্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

একটা জাল দেওয়া ভ্যান এসে দাঁড়াল। তা থেকে স্মিতবাবু নামলেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। পতাকাগুলারা স্লোগান দিয়ে উঠল। স্মিতবাবু হাত নেড়ে বন্ধুদিকে স্বাগত জানালেন।

অনন্ত ঠিকই বলেছিল কোর্ট কাছারির কাজ বিলম্বিত লয়ে।

ওরা যে এল তো ভিতরে ঢুকতে পেল না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। সেই অবসরে আত্মীয় বান্ধবরা দোকান থেকে মিষ্টি জল এনে ওদেরকে খাওয়াল। অনন্তও ওর এবং বিশেষ করে স্মিতবাবুর জন্ম মিষ্টি জলের ব্যবস্থা করেছিল। তখনই দু'চারটে কথা!

আদালতে ডাক হলো বেলা একটার সময়। সেই একই কাঠগড়া। চোর, ছিনাল, বেঙ্গা, লীডার, মালিক, ম্যানেজার সবারই জন্ম এক। সে হিসেবে দৃষ্টর মতো সাম্যবাদ।

ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বে-আইনী জন সমাবেশ, মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে মিছিল এবং কলিয়ারী কর্তৃপক্ষকে শাসানি, অপমান, ভীতি প্রদর্শন ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার ধারাগুলি দিয়ে সাজানো মামলা। আসামীর সকলেই বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং খালাস পেলে কলিয়ারীর শাস্তি বিদ্বিত হবে সেই কারণে জামিন যাতে মঞ্জুর না হয়—তার জন্ম পাবলিক প্রসিকিউটর মহামাণ্ড বিচারকের নিকট সুনানীর আবেদন করেছেন।

সেজন্তই সাতটা দিন জেল হাজতে পচতে হয়েছে। জামিন যদি না হয় আরো পচতে হবে। আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন সত্যেন চ্যাটার্জী। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। বয়স ষাটের উপর বক্তা ভালো।

তিনি বলতে শুরু করলেন, মিনিট কয়েক ধরে শাসন, শোষণ, নির্ধাতন, পুরানো রেশন ব্যবস্থার গলদ, পচা চাল গম, সভাসমিতি, জন সমাবেশ, গণতান্ত্রিক অধিকার, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ইত্যাদি নিয়ে।

মহামান্ন বিচারক হাতের পেন্সিলটা তুললেন।

সত্যেনবাবু খেমে গেলেন। জিজ্ঞাস্তা দৃষ্টিতে তাকালেন।

উনি বললেন—আপনার এটা আর্গুমেন্ট হচ্ছে না। জনসভার ভাষণ হচ্ছে।

—ধন্ববাদ ইয়োর অনার। শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার কথা বলতে গেলে আমি মাঝে মাঝে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ি। দয়া করে মার্জনা করবেন।

মহামান্ন বিচারক কোঁতুকের ভঙ্গীতে বললেন—আবেগটা কম করে বলুন।

—ইয়োর অনার স্মার। ধন্ববাদ। আসামীদের জামিনের আবেদন পেশ করেছি। আশা করি আমাদের দেশের অসীম দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকদের প্রতি মহামান্ন বিচারকের সহানুভূতি আছে। তাই তাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হবে এই বিশ্বাস রাখি।

এরপর পাবলিক প্রসিকিউটার সাতবুড়ি মিথ্যেকথা বলে জামিনের আবেদন নাকচ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহামান্ন বিচারক তা গ্রাহ্য করলেন না।

জামিনের আবেদন মঞ্জুর হলো। ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে আসামীদের প্রতি আনীত অভিযোগের গুনানীর তারিখ দিলেন।

বাইরে মহামান্ন বিচারকের নামে জয়ধ্বনি হলো।

কাঠগড়া থেকে নেমে এসে স্মিতবাবু অনন্তকে জড়িয়ে ধরলেন। অনন্তর দোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল।

উনি বললেন—কাদিস নে। এই তো লড়াই শুরু হলো। আরো অনেক পথ বাকী। এই ক’দিন তুই যে কি করেছিস তার সব খবর আমি পেয়েছি। এই না হলে কাজের ছেলে।

—আর দাদা সাতদিন লেগে গেল জামিন করতে।

—ওর জন্ত ভাবিস নে। এরপর দু’তিন দিনেই জামিন করতে পারবি। কোর্ট কাছারির কাজটা ভালো করে শিখে নে।

স্বপ্না এসে কাছে দাঁড়াল। মুহকর্থে বলল খুব কষ্ট হলো তোমার।

—বেশী কি? তোমাদিকে দেখতে পাইনি এটাই যা কষ্ট।

অনন্ত ওখান থেকে সরে গিয়েছিল ওদেরকে কথা বলতে দেবার জন্ত। স্বপ্না বলল আমার যে কি ভাবনা হয়েছিল তা তোমাকে কি বলব? ওর চোখ দুটো ছল ছল করে বুষ্টি নামল।

পান্টে গেল অগ্রদূত মেসের চেহারা। মুক ও বিষন্ন মেঘারগুলি আনন্দে ফেটে পড়ল। ডাক পড়ল শম্ভু বাউরী ও সশ্রদায়ের। টোলক করতাল বাজিয়ে ছেলেরা নেচে গেয়ে মাং করে দিলো। শম্ভু বাউরী গুরু করল ভাদুগান—

ভাদু তুই দেখে যা—দেখে যা—
কলিকালের রঙ্গ।

ডি. সি. সাহেব হার মেনেছে
মলিন হলো অঙ্গ

এবার ভাদু চল-ছুটে চল পুলিচাকা বন্ধ!

ওদের আনন্দ উল্লাসের শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডি. সি. সাহেবের বাংলা থেকে সব শোনা যাচ্ছে। ঊঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার গো? মেসের ছেলেরা এত উন্নত কেন?

—পিপীলিকার পাথা গজিয়েছে।

—সেটা আবার কি কথা হলো?

—সুমিত, অনন্ত, সুবীর আজ জামিন পেয়েছে তো। তাই এত ঢাক চোলের বাজি। কিন্তু আমিও ডি. সি. সাহেব। তোদের কোন বাপে চাকরী রাখে তাই দেখবো।

—এই ঠাথো! ওদের উপর তোমার এত রাগ কিসের?

—সব শালা বিচ্ছু! গুনতে পাচ্ছে না আমার নামে ছড়া কাটছে।

ডি. ডি. সাহেবও গম্ভীর। অনন্তর একদিনের উপকার বা তার উপরে বিউটির স্নেহ তার নিশ্চয়ই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু তা একজনের জন্তই। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। উনি কোম্পানীর ইমানদার আদমী। কোম্পানীর স্বার্থ ঊঁরও স্বার্থ।

বিউটি খুব খুশী। হাসতে হাসতে বলল—ওগো গুনছো ওরা সব ফিরেছে। মেসে দারুণ হট্টগোল।

—তাতে তোমার এত আহ্লাদ কিসের?

—বাঃ রে! তা হবে না? ওরা আমাদেরই ঘরের ছেলে।

—দিখিজয় করে ফিরে এল নাকি?

—জেল হাজত থেকে তো ফিরে এল?

—তাহলে ফুলের মালা নিয়ে যাও। বরণ করগে।

—তাই তো যাওয়া উচিত।

—না হলে আমার মুখে কালি পড়বে কি করে?

—কি সাদা মুখ যে কালি পড়ে কালো হয়ে যাবে। তোমরা দুটি বন্ধুর ভিতর বাহির বেবাক কালো। জানো সেদিন ডি. সি. সাহেব আমায় কি অপমান করেছে? আমি যদি তোমার সাতপাকে বাঁধা হতাম তাহলে টাঙ্গি

নিয়মে কাটতে যেতে। কিন্তু আমি যে রক্ষিতা! আমার আবার মান সম্মত!

ওর অভিমান ক্ষুদ্র কর্তৃষ্ণর, কম্পিত ঠোঁট এবং জলাভরা চোখের দিকে তাকিয়ে ডি. ডি. মাহেব বিচলিত হয়ে পড়লেন।

বললেন—কি হয়েছে বলবে তো?

—তোমাকে বলেই বা কি হবে? বন্ধু প্রীতিটাই বড় হোক তোমার।

—বন্ধু প্রীতি আছে এবং থাকবে। তাই বলে তুমি তো ফ্যালনা নও।

—ওনে ধন্য হলাম।

বিউটি চলে যাচ্ছিল। ডি. ডি. মাহেব হাত ধরে বললেন রাগ করো না।

যাক ডি. সি. কি বলেছে?

—তোমাকে আজীবন কামনা করে আসছি। একবার ধরা দাও।

—এতেই অপমান হয়ে গেল। তোমাকে যে দেখবে সেই কামনা করবে সেই তো তোমার রূপের গরব।

বিউটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—আমি বাজারের বেগুন নই। অসতী হয়েছি তোমাদের পাল্লায় পড়ে। পালা করে বলাৎকার করেছে। না হলে যার সঙ্গে ঘর ছেড়েছিলাম দুখ ভিখ করে তার সঙ্গেই থাকতাম।

—তোমার যা রূপ তাতে আমরা না করলেও অগ্নি কারো হাতে নষ্ট হতে। মানিক রাজার ঘরেই শোভা পায়। ভিথিরীর হাতে থাকলে তা হাত মুচড়ে কেড়ে নেয়। ঐ রাঁধুনীটা তোমাকে রাখতে পারতো?

বিউটি চূপ করে গেল। ডি. ডি. ওকে টেনে বিছানায় বসাল। আদর করে গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে—রাগ করো না বিউ। পুরানো কথা মনে এনো না। আমি তোমাকে অনাদর করি না। ভালোবাসি।

বিউটি নরম হলো। ওঁর একটা হাত বাঁ হাতের উপর নিয়ে ডানহাতের আঙুল বোলাতে বোলাতে হিজিবিজি কাটছিল। ডি. ডি. ওর বালাটি ঘোরাতে ঘোরাতে বলল—এ দুটো পুরনো হয়ে গেছে। একজোড়া নূতন গড়িয়ে দেবো।

ও নীচু গলায় বলল—তাই দিও।

ডি. ডি.-র লোমশ হাতের উপর সরু সরু আঙুলের চালাচলে একরকম স্তম্ভবোধ হচ্ছিল। বিউটি আঙুল দিয়ে তার উপরে লিখল—ভালোবাসি!

সে লেখা ফুটে উঠল না। বিউটি হেসে ফেলল।

বলল—কি লিখলাম বলো তো?

—কি?

—ভালোবাসি!

—আ! কি মিষ্টি! জাপটে ধরে চুমু খেলেন। বললেন—বিউ! তুমি মা হও। অনেক জ্বালার উপশম হবে।

—তোমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হবে।

—ত!তো বটেই! প্রয়োজনও তো আছে। অস্তিমকালে জল পিও তো দেবে।
অসতী মায়ের গর্ভে কি সং ছেলে পাবে ডি. ডি. ?

—ঐ তো! একটা কথাই গোঁ ছাড়তে পারলে না।

বিউটি অনেকক্ষণ চুপ কবে থেকে বলল—কিন্তু আমার তো শরীরেও
গোলমাল আছে। না হলে হাজারবার না বলেও কি আটকাতে পারতাম?

খুব আশান্বিত কণ্ঠে উনি বললেন—ওটা কিছু ব্যাপার নয়। ডাঃ সেনকে
আমি বলেছিলাম। উনি বলেছেন একটা অপারেশন করতে হবে। তুমি রাজি
হলেই হবে।

—বেশ। তোমার কথাই রইল।

—ওহ! বিউ! তোমাকে আমি আর কেমন করে ভালোবাসবো?
চুষনে চুষনে ভরে দিলো।

পঁচিশ

মেয়ের দ্বিরাগমন নিয়ে গুলু খুব ব্যস্ত ও চিন্তিত। বিয়াইয়ের কাছ থেকে
একশো টাকা পেয়েছে। সন্তিপ্রসাদ গোমস্তার কাছে পঞ্চাশ ধার নিয়েছে মাসে
প্রতি টাকায় দু'আনা সুদে। ব্যাপারটি তার কাছে ভয়ানক অবিমুগ্ধকারিতা।
স্বামী স্ত্রী দুজনের মাসিক উপার্জন পঁচিশ টাকার মতো। আর সুদ দিতে হবে
ছ'টাকা চার আনা।

কিন্তু না নিয়েই বা উপায় কি? দ্বিরাগমনের খরচ খরচা তো আছে।
মেয়েকে গহনা দিলেই তো হবে না। শায়ী, শাড়ি, ব্লাউজ, রং, তেল, সাবান,
চুলের কাঁটা, মাথার ফিতে কতো কি টুকিটাকি জিনিসপত্র। জামাইকেও ধুতি
জামা গেঞ্জী দিতে হবে।

নতন জামাইয়ের সঙ্গে আত্মীয় কুটুমরা আসবে। ওর শ্রালাদের বিরাট
গুপ্তি। মংগু সরদারের ধাওড়ায় বহু আত্মীয় স্বজন। তাছাড়া নিজের গুপ্তি
তো আছেই। তাদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে ভোজ্য দিতে হবে। শূয়ার
নিজের খোঁয়াড়ে আছে। মদ তৈরি হচ্ছে। ভাত তরকারির যোগাড় চাই।

জামাই দু'তিনদিন থাকবে মেয়ে ভাগর হয়েছে। আর কি একসঙ্গে গুতে না
দিলে চলে? যাকে বলে ফুলশয্যা তাকেই বলে রাসপন্ধি। ওটা হওয়া একান্ত
বাস্তবীয়। সেজন্ত ঘর দুয়ারের সংস্কার ও সাফস্বতরো হয়ে গেছে। একটা
চালাও বানিয়ে নিয়েছে।

গুলু তার বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ সেরে যাচ্ছে।

অবশেষে একদিন সে পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। এবার জামাই এলেই
হলো।

কিন্তু গৈরী যে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাট গোয়াতুমি না যাবো না। শ্বশুর ঘড় যাবো না।

ওর মা স্বভাবে হান্ফেনে। গলা চড়িয়ে ধমকি দেয়। গুলুর সঙ্গে মেয়ের ভাবরাগ নিয়ে কথা হয়। গুলু বলে গৈরী আমার নাদান ছোকড়ী। কি বুঝবেক ভাতারের মর্ম।

ওর মা বলে—এক রেতেই বুঝে যাবেক। রসগন্ধি হোক। ভাতারের স্ময়াদ পেঞে যাবেক।

গৈরীর বুকে তখন হামানদিস্তে চলছে। কারো সঙ্গে কথা কইতেও নারাজ। গর্ভাশয়ের জ্রণ যেন তাকে চোখ রাঙিয়ে বলছে—‘মা! আমি তোর জারজ সন্তান হব, আমাকে জনম দিলেক একজন বাপ বলব অগ্রজনকে। কেনে এমন পীরিত করলি?’

হে ভগবান! প্রেম নাকি পরম পবিত্র বস্তু তবে কেন এত নির্ধাতন?

এখন তার সবাই শত্রু, তাকে হাড়িকাঠে কেলে দিতে চায়। কেঁদে কঁকিয়ে, চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে দিয়েও মা-বাপকে বোঝাতে পারেনি। কি করেই বা পারবে? তার সমস্তা তো খুলে বলতে পারেনি।

একি বলা যায়? কোন মুখে বলবে? লজ্জা যে সবারই বড়। সত্য যে ভীষণ নিষ্ঠুর। প্রকাশ হবামাত্র দাবদাহী অগ্নি জালা।

আজ যদি তার মনটা হতো সেইসব মেয়ের মতো যারা অনায়াসে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সহবাস করে আনন্দ পায়। তাহলে সেও শাড়ি গয়না পরে ধর ধর ভাবে বিয়লা পুরুষের মোহাগ নিতো। কে বা এমন সবজান্তা আছে যে বলে দিতে পারবে। তার পেটের সাতপুর মাংসের ভিতর জন্ম নিয়েছে একটি জ্রণ? কিন্তু ঐ জ্রণটা যে ওকে ~~শেখ~~ রাখাচ্ছে।

দামোদরের বালুচরে তাদের সেই মিলন রাতগুলি যখন কত না কথার মালা গেঁথেছিল দুজনে তখন যে শপথ করেছিল জীবন থাকতে দ্বিতীয় পুরুষের কাছে যাবো না তা কি ঝুটা হয়ে যাবে? দামোদর রাগ করবে। না? গুপ্তি শুদ্ধ ভাসিয়ে দেবে না উদ্ভ্রাম বন্ডায়? অথবা সেদিন আকাশে যে চাঁদ ও নক্ষত্র ছিল তারা কি আশ্রয় হয়ে ঝড়ে পড়বে না? অনন্ত দেবে না ঘৃণার ফুৎকার?

প্রেম কি ফুরিয়ে যাবে?

গুলুর ঘরে জামাই এসে গেল মহাসমারোহে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় কুটুম্ব নিয়ে দশ বারোজন। গুলুর সম্বন্ধীরা জোর খাতির করে চবুতরায় বসল। দেদার খাতির হলো কুটুম্বদের। শুম্বোরের মাংস দিয়ে মদের চাট বনল। হাড়ি ভর্তি মদ এনে নামানো হলো চবুতরায়। চারিদিকে শোরগোল উঠে গেল।

পালে পালে মেয়েরা সব ঘরের আনাচ কানাচ থেকে উঁকি খুঁকি মেরে বর দেখছে। সবাই খুশী। বেশ বর হয়েছে গৈরীর। লম্বা, তাগড়া, লাহাঙ্গা গড়ন। গায়ের রঙটি আবলুশ কাঠের মতো কালো। বয়স চব্বিশ পঁচিশ।

হ্যাঁ। মরদ বটে একখানা। গৈরীর বৃকের দুধ মইয়ে ঘোল বানিয়ে দেবে। ছুঁড়িটার কপাল ভালো। এমন আখাশা মরদ পায় কে ?

থাওয়া দাওয়া চলছে। আসল খাবার মদ মাংস। কিন্তু নিয়ম রক্ষা বলে একটা কথা আছে। সেই কারণে কুটুমজনদিকে আপ্যায়ন করা হয় চোভাচানা দিয়ে। সে গুড় জল, ও বুট কলাই। তারপর দই চিঁড়ে। সেই পর্ব সমাধা হলে আদিম পর্ব স্বরূ হবো। কিন্তু কুটুমরা তো খালি পেটে আসেনি। সাদাচোখেও নয়। সব রঙ চড়িয়েই এসেছে। দই চিঁড়ের স্বাদ পাবে কি করে ?

তাই নিয়ে হাসি ঠাট্টা। সন্ধ্যাও হয়েছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। মিট মিট করে হারিকেন জ্বলছে। বেজে উঠলো মিউজিক। প্রথমে মৃদুতালে রিনিক ধিনিক। চুড়ির বাঘ। তারপর হাত তালির সঙ্গে ঝমক ঝমক। গোবিন ও গুলু দুই লোকশিল্পী তালে তাল ঠুকল।

মেয়েরা নেপথ্যে আছে। চবুতরা থেকে দেখবার জো নেই। সব দুয়ারে দুয়ারে পুঞ্জ পুঞ্জ ভাবে সাত আটটি ঘর থেকে একই তালে চুড়ির বাঘ হচ্ছে। কেউ তাল কানা নয়। স্বরূ হলো নেপথ্য সঙ্গীত—

থায়া তো থায়া কুছ মোছমে

লাগায়া—কায়সা ভেডুয়া।

ওহো! কিবা বাক্য! খেয়েছে তো খেয়েছে কিছু মোছেও লাগিয়েছে কেমন ভেডুয়া।

ভেডুয়া মানে বেশার পতি।

সেই সম্বোধনেই কুটুমরা সব আহ্লাদে আটখানা। এঁটো হাতেই তাল ঠুকছে।

বর বাবাজীর নাম রবিলাল। ওর বাপ—মনিলাল। কাকা বাঁকেলাল। সব লালে লাল। বেশ জমিয়ে বসেছে। -ফুক ফুক বিড়ি টানছে। ঢুক ঢুক করে মদ। বরের বন্ধু হারকু হুশাদ লিগ্যাল অ্যাডভাইস দিচ্ছে—এই রবিয়া! বেশি মাল খায় না। তাহলে আসল মালটাকেই চোখে দেখতে পাবি নাই।

রবিলাল দাঁত বের করে হাসে। ওর চোখের পাতা ভারী। মনের ভিতরটা কুব কুব করছে। বউয়ের নাকি বড় রূপের ছটা। দেখতে বড় চখ। ডাগর-ডোগর ভরস্তু গড়ন। কাছে পেলে চেটে খাবে। সেই ভাবনাতেই মশগুল। বন্ধুর বাক্যকে মনে হলো—কোনো দেবতার প্রত্যাশে।

গুলুর আয়োজনে কোনো ক্রটি ছিল না। থাওয়া দাওয়া ভারী হয়ে গেল।

যে যেখানে পারল চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। বাণ্ড বাজনা এবং নেপথ্য সঙ্গীতেও ভাটার টান। গায়িকাদেরও পেট ভারী। পান পাত্র তো একা পুরুষদের জন্ত নয়। তাদেরও।

রবিলালকে আদর করে ডেকে নিয়ে গেল গৈরীর মামাতো ভাইয়েরা। এবার সে খাস কামরাতেই পৌঁছে গেল। সেখানে পালে পালে মেয়ে। নানা বয়সের, নানা রঙ চঙয়ের। আদিরসের খিস্তি খেউড় দিয়ে ছড়া কাটতে কাটতে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ। সে এক বিবম প্রমাদ! হাতির মতো মেয়েগুলো গায়ে পড়ছে। এক একটির ওজন দেড় মন দু'মন। লদু করে গায়ে পড়ছে আটার বস্তুর মতো।

কিসব রসিকতা! যেন ওর জন্তই যাবতীয় মৌ জমিয়ে রেখেছে। সে নিলেই ধগু হবে। সেই ভিরের মধ্যে কোথায় যে তার আশলি মোতি তাই ঠাহর পাচ্ছে না।

পাবার কথাও নয়। ঘরের কোনায় কাপড় ঢাকা দিয়ে সে জ্বথবু হয়ে বসে আছে। এত যে আনন্দ উল্লাস কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। হাসি কান্নার উষ্ণ অদ্ভুত এক জ্বালা জগতে বাস করছে সে।

বৈশাখী একবাটি মদ নিয়ে কত সাধাসাধি করেছে—এই টুকটুক খা বুন। জানি তুই ঈ-সব ছেড়ে দিগ্বেছিস। কিন্তুক আজকার রেতে খেতে হয়। শরীরে ধকল বুঝায় না।

গৈরী বাটিন্দু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছে—খবরদার। ঈ-সব আনিস না।

মাঝরাত কাবার হয়ে গেছে। যতসব পাড়ার মেয়ে যদি জামাইকে এভাবে দোহন করতে থাকে তবে বিটিটির জন্তে কি থাকবে? এখনো বাঘের খেলা বাকী। গৈরীর বুক পাথর চাপা থাকবে নাকি? এই দেহাতী হস্তিনীদের দলাই মালাই দেখবে?

তার সাধ নাই? ঈ-বাবা! ডাগর মেয়া!

আসরে নামল ওর মা ও মামীরা। যতসব আলু খালু, মাতোয়ালী মেয়েদিকে টেনে টেনে বের করল। অশ্রাব্য খিস্তিও ঝাড়ল।

এই সোহাগরাত সবারই জন্ত একবার করে এসেছে। কারো একাধিকবার। বিয়লা পুরুষের সঙ্গে ছাড়াবিড়া করে স্ত্রী করেছিল এমন মেয়ের সংখ্যাও কম নেই। নাগরের ব্যাপারও আছে কার। তবুও কামনার কি উলঙ্গ প্রকাশ!

একে একে সবাই বেরিয়ে যাবার পর ঘরে রইল গৈরী ও রবিলাল। সেই ঘরটি ঘর মেঝেতে কাঁধা পেতে ভাইবোনদিকে সঙ্গে নিয়ে গৈরী শুয়ে থাকত। দেওয়ালে টাঙানো মা সরস্বতীর পট। হারিকেন জ্বলছে। কালি উঠে কাঁচটা কালো করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে ঝাপসা অন্ধকার।

বৈশাখী ঘরে ঢুকে নতুন কাঁথা পেতে ছুখানি বালিশ দিয়ে বিছানা করে দিলো। বলল—আয়গে গৈরী! এইথেনে শু।

ও বাইরে চলে গেল। দরজাটাও বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরটা গরম। কুলু কুলু করে ঘাম ঝরছে সারা গায়ে। রবিলালের নতুন জামাটা ঘামে ভিজ়ে গেছে। সে ওটা খুলে রাখল।

গৈরী তখনো ঘরের কোণে বসে। যেন লাল কাপড়ে ঢাকা একটি ঝুড়ি। রবিলাল সেইদিকে তাকিয়ে আছে। বউ যে নড়েও না চড়েও না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো সাড়াশব্দ পেল না। যেসব সংলাপ মুখস্থ করে আমরা নেমেছে তাও ভুল মেরে গেছে। নেশাটাও ছুটে গেছে। ঘুম ঘুম লাগছে। ক্লান্তিও আছে। তবু সে এই মুহূর্তে পাহাড় ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু বউ যে রা কাড়ে না। এখন কি বলে যে তাকে সম্বোধন করবে, কাছে ডাকবে তারই কোনো যুতসই সংলাপ খুঁজে পাচ্ছে না।

অনেক ইতঃস্তত করে ডাকল—বউ—এ—বউ!

গৈরী সারা দিলো না। কঠোর থেকে কঠোরতরভাবে নিজেকে প্রস্তুত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে ওর ভিতরে।

রবিলাল একপা একপা করে কাছে এল। আরো বারকয়েক বউ-বউ বলে ডাকল। কোনো সাড়া না পেয়ে অবাক হলো। অন্তত নড়ন চড়ন তো হবে। যে ডাকে মেয়েদের বুকে হৃন্দুভি বাজে তা তার কানেও পৌঁছল না একি হয়? তবে কি বউ কালা? রূপেই শিমূল ফুল। নাকি নেশার ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত পাঁচ ভেবে ওর মাথার কাপড়টায় আলতো টান দিয়ে বলল—ঘুজ্জট খোল বউ! তোর মুখটা দেখতে দে।

গৈরী কাপড়টা ঝট করে তুলে নিল।

রবিলাল কাছে বসল। হুঁহাতে স্পর্শ করে বলল—বাৎ বোল রে বউ! বউ কথা বলল তবে তা বড়ই অপ্রত্যাশিত। যাকে মনে হচ্ছিল লাল কাপড়ে ঢাকা দেওয়া ঝুড়ি তার থেকেই ঝুপড়ি খোলা সাপিনীর মতো খাড়া দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঝঙ্কার দিয়ে বলল—ছুঁয়ো না আমাকে। • তফাৎ যাও।

স্বরিনং গতিতে ও নিজেই সরে গেল ঘরের অগ্ৰদিকে।

রবিলাল হতভম্ব। এমনটা সে ভাবেনি। এমন কথাও কারো কাছে শোনেনি। গ্রাঘ্য বিয়ে করা বউ এত ঢাকা খরচ করে নিতে এসেছে আর সে বলে কিনা ছুঁয়ো না!

আরে বউকে ছৌব না তো ছৌব কাকে? ঐ হস্তিনীগুলোকে?

মনের অমুরাগ ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে রাগে। উত্তাপ বাড়ছে এ যেন পাললিক শিলার মেটামরফোজড্ হবার প্রক্রিয়া।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একপা একপা করে কাছে গেল। কঠম্বরকে যথাসম্ভব কোমল করে বলল ঠে তোর কি বাৎ রে বহু ?

—আমি তোর স্বামী।

—না।

—কি ? আমি তোর স্বামী নই ? তোকে বিয়া করি নাই ?

ক্রোধ এবং বিস্ময়ে ফেটে পড়লো ও। গৈরী এতক্ষণে ওর দিকে তাকালো। এক লোমশ জোয়ান। বুকটা চিতিয়ে আছে। আন্তে আন্তে বলল কখন কোন বচপনে চার পাঁচ বছর বয়সে বিয়া হয়েছে। তারপর ছুনিয়া বহুত আগে বেড়ে গেছে। এখন সেই বিয়ার কি মানে ? আমি মানি না।

—তুই পড়ালিখা লেড়কী—তুর মুখে এই কথা ?

—হাঁ। এই সাক্ষ্য কথা।

—কিস্তি কেনে ?

—আমি মুখ্য মরদের ঘর বসত করব নাই। বিয়া মানি না।

রবিলালের বৃকে শেল বাজল। যে বউয়ের জন্ম সে এত স্বপ্ন দেখেছে এই তার মনের কথা। প্রত্যাখ্যানের যন্ত্রণা এত মর্মান্তিক। এখন সে কি করবে ? ঐ সুন্দর মুখটাকে খেঁৎলে দেবে ? ঐ সুন্দর শরীরটার যাবতীয় আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দেবে ?

জুলুমসে কায়ম করবে পৌরুষের আধিপত্য ?

ক্রোধ এবং আক্রোশের এই ভাবনায় তার মুখটা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো তো লাল ছিলই। এখন তার থেকে আগুন বরছে। শরীরটা কাঁপছে এবং লোমগুলো কাঁটার মতো দাঁড়িয়ে গেছে।

স্থির দৃষ্টিতে গৈরীর দিকে তাকিয়ে ছু'পা এগোল।

ঠিক তেমনিভাবে গৈরীও ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল জুলুম করবি ন'কি ?

রবিলাল থেমে গেল। চিবিয়ে বলল—তবে তো কিস্তি খতম। তোরও গরম খতম। দেখবি নাকি ?

—কি দেখাবি ? গৈরী ছুঁসে উঠল।

সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিলো রবিলাল। বলল—শালী ? তুই কি মনে করেছিল আমি এত বড়বক বটি ? তোর এত কিসের গরম বৃষ্টি না ?

চড় খেয়ে গৈরীর মাথাটা ঝামরে গেল। উন্টে পড়েই যেত দেওয়াল ধরে টাল সামলাল। আত্মরক্ষার জন্ম ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু রবিলাল আর কিছু করল না।

বিছানায় বসে ফোঁস ফোঁস শব্দে খাস ছাড়তে লাগল।

গৈরী ঠায় দাঁড়িয়ে। রবিলাল বলল—আরে ছোকাড়ী, মরদের সঙ্গে শোওয়া

যদি তোর এত হারাম ভবে সিঁদুর পরেছিল কোনে ? চুড়ি পরেছিল কোনে ? কোন ভাতারের নামে ? শালী রাণী কাঁহিকা ।

গৈরীর ভিতর বাহির রাপে, ছুখে, লঙ্কায়, বেদনায় হাহাকার করছে । হ্যা । এই তার গায্য পুরস্কার । স্বামী তো বটে । তার প্রেম ভালোবাসা পাবার সেই তো হৃদয় । সমাজের স্বীকৃতি নিয়ে এসেছে । বিয়ের লাইসেন্স আছে । তাকে বঞ্চিত করেছে বলেই তো এত ক্রোধ । এই তো পুরুষ মানুষের স্বভাব ধর্ম ।

সে যদি আগে থাকতেই মনটাকে অল্পত্র বাঁধা না দিত তবে এই সোহাগ রাত কত না পুলকে শিহরিত হতো । এমন মরদ কটা-মেয়েতে পায় ? এ যে পৌরুষের জলন্ত প্রতিমূর্তি ।

চোখ কেটে জল বেরুচ্ছিল । গালটা চিন্ চিন্ করছে । রবির চড়টা খুব জোরেই পড়েছে । একেবারে বেমক্কা ঝাড় । গালে হাত বুলোতে বুলোতে ঝাঁচল দিয়ে চোখ মুছল ।

ক্রোধ ও কান্নার মিশ্রিত আবেগ তার গলা দিয়ে ফুটে বেরুল তুই কি মানুষ ? না জন্তু জানোয়ার ? একটা মোয়াকে চড়াঞ্জে মরদ হঞ্জে গেইছিল ।

রবি গর্জন করে উঠল—চোপ ! বক্তাম বন্ধ কর । নহী তো হালত রন্ধি করে দিব ।

গৈরী ফুঁসে উঠল—কর । তোর যা মন চাই তাই কর । কিন্তুক শুনে লে যদি কোনো বেইজ্জতি করেছিল তবে আমার লাশ পড়ে যাবেক ।

—আরে যা যা । হালন্ত এ্যায়সা রন্ধি করে দিবো যে তুই আমার পা ধরে মাফি মাগবি ।

গৈরী অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল—আমি এখনি তুর পা ধরে মাপ চাইছি ভিখ মাগছি তুই আমাকে ছেড়ে দে ।

গৈরী সত্যি সত্যিই গুর পায়ে ধরল ।

রবি বলল—ছাড়ব কোনে ? ছাড়বার জন্তে ত বিয়া করি নাই ।

—বলছি তো বিয়া মানি না । উঠে দাঁড়িয়ে আবার বেই তেরিয়া ভাব ।

—কোনে মানিল না ?

—আমার দুরা আদমী আছে । তার সাঁথে মুহাক্কত আছে । আর আমাকে ঘরকে লিবি ? ঘরে নিঞ্জে কি করবি ?

রবিলাল ধম্ মেয়ে গেল । একটু চূপ করে থেকে বলল—হাঁ । ঘরকে লিবি । তোকে আমার দিলকী রাণী করে রাখব ।

গৈরীর অটাক ধর ধর করে কেঁপে উঠল ।

ছাব্বিশ

রবিলাল ওর কাছে এসে দাঁড়াল। দুপা তফাত থেকে বলল—স্বাথ পিয়ারী !
পয়লা জোয়ানীতে বহত আওরৎ তুল করে। তুইও করেছিল। আমি মানিয়ে
লিবো। তুই আমার কাছে আয়।

আঃ! কী ভীষণ আকর্ষণ! এই বৃষ্টি সে হেরে যায়। এই লোকটা তার
স্বামী। তাকে সিঁদুর দিয়েছে। তার পরপুরুষকে নিবেদিত দেহমন ও প্রেমের
গ্লানি মেনে নেবে! সে সংসার পাবে। স্বামীর সোহাগ পাবে। চোখ দিয়ে
জল গড়াচ্ছে যেন পাহাড়ী ঝর্ণা।

একটু—আর একটু সময় দাও—

রবি ওর কাঁধে হাত দিয়ে আহ্বান করল—আয়!

বনন—একটা ঝাঁঝ পড়ল গৈরীর মাথায়। যেন একটা করুণ সুরের
রাগিনীতে আচ্ছন্ন হয়েছিল। হঠাৎ বাঘ ডাকল হালুম করে।

ভয়ে এবং প্রতিবাদে চিংকার করে উঠল—না। আমার গায়ে হাত দিস
না। তাহলে মরামুখ দেখবি। ছিটকে গেল দূরে।

ক্রুদ্ধ আক্রোশে রবিলালের শরীরটা হুলছে।

কর্কশ কণ্ঠে বলল—শালী—কুস্তীর বাচ্চী! তোর বাপে লেডকীর বিয়া
দিঞেছে, রুপিয়া লিঞেছে আর আজ দখল দিবার সময় বাহানা। বিটিকে
দুসরা মরদের সাথে পটরি খিলাঞে রুপিয়া কামাবার মতলব। বাপ-বেটি
দুজনকেই এমন শিক্ষা দিব যে জিন্দেগী ভর খেয়াল থাকবেক!

ওঃ এইসব বাক্যবাণ—যার এক একটি কথাই ধার ছুরির মতো, ভার লোহার
মতো, তাই তার বৃকে অবলীলায় এসে আঘাত করছে এবং সে তা সহ্য করছে।
না করে উপায় নেই। সে যে সত্যিই তাকে বঞ্চনা করেছে। তাদের দেশ ও
সমাজের রীতিপদ্ধতি অল্পসারে গঠিত মানসলোক এই ভাবনাতে জর্জরিত।
একটা পাপবোধ মনের মধ্যে জিয়া করছে কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে যে পাপের
মাত্রা সহ্য সীমার বাইরে চলে যাবে—তার সন্তানের কাছে চিরকালের জন্য
অপরাধিনী হয়ে পড়বে। প্রেমের মুঢ়া ষটবে। এই লোকটা তাকে যে ভাষায়
গালাগাল দিচ্ছে সে তাই হয়ে যাবে। লড়াইয়ের ময়দানে একবার যখন নেমে
পড়েছে তখন জান কবুল করে লড়েই যাবে।

চোখের জল মুছে ছুয়ারে বার বার ধাক্কা দিলো—মা! এ মা! ছুয়ার
খুলগে।

ছুয়ার খুলল না! কিন্তু বাইরে যে অনেকগুলি মেয়ে আড়ি পেতে আছে তা
বুঝতে বাসি থাকল না। ওরা তাহলে কি ভাষা দেখছে? এই লোকটা
যদি তাকে বলাৎকার করে তবুও তো কারো সাহায্য পাবে না।

ওঃ ভগবান!

বুক ফেটে কান্না এল। চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে আসছে। ভিতরে তীব্র শ্রোত। বেদনার তীক্ষ্ণ মোচড়! মাথা ঘুরছে।

খুলে গেছে ঘোমটা। টাল খেয়ে গেছে যত্ন করে বাঁধা খোঁপা।

রবিলাল খাবা দিয়ে ওর খোঁপাটা ধরে মোচড় দিয়ে বলল—আবে ছোকড়ী! আর তোকে কোন বাপে রাখবেক?

গৈরী হ্যাঁচকা টানে ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। এক গোছা চুল গেল রবির হাতে। কয়েকটা চুলের কাঁটা ফুটল গৈরীর ঘাড়ে এবং রবির হাতেও। যন্ত্রণায় মাথা ঝন্ঝন্ করছে গৈরীর! কিন্তু সে ক্রোধে অজ্ঞান। সাপের মতো হুলছে। কোথায় গেছে ঘোমটা পরা বোঁয়ের কমনীয় মুখ। দু-চোখ ভর্তি জল এবং বিদ্রোহ। খোঁপা খুলে বেনী লুটোচ্ছে পিঠে। কাপড় টেনে গিঁট দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলছে—ডোকরা হারামজাদা! বহুদ বরদাস্ত করেছি। আর নয়। এই ঝাং তুর সোহাগ সিহঁর পুঁছে দিলাম। চুড়ি ভেঙে দিলাম।

ঝন্ঝন্ শব্দে দেওয়ালে হাত ঠুঁকে কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে দিলো। সিঁহুর দিলো মুছে।

এই লে তুর বাপের টাকার গহনা!

পটাপট টান মেয়ে গয়নাগুলো খুলে ফেলে দিলো।

বলল—আর আমি তুর কেউ লই। আজ থেকে রাঁঢ় হলাম।

ঠকঠক করে দরজায় মাথা ঠুকতে লাগল।

রবিলাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বলল—শ্রালী! রাঁঢ় যদি হলি তবে ইজ্জত নিয়ে যাবি কুথায়?

বাবের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণকাটা চিৎকার করে উঠল গৈরী—বাপু আমাকে বাঁচাও!

রবিলাল ওর মুখটা চেপে ধরে কাপড় নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলো। গৈরী এই চরম মুহূর্তটির জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেকটি কাপড় গিঁট দিয়ে পরেছিল। শাড়ি ব্লাউজের ভিতর ডবল ইজার ফ্রক ব্রা। প্রাণপণে প্রতিরোধ করতে গিয়ে ঘরের হাঁড়িকুঁড়ি উলটে পড়ল। টিন নানা শব্দে বেছে উঠল। গলা দিয়ে কথা বেরোচ্ছিল না কিন্তু গোঙানীর শব্দে ঘর কাঁপছিল।

নতুন শাড়ি পড় পড় শব্দে ছিড়ে ফর্দ ফাঁক। কিন্তু তখন সে দ্রোঁপদী। একটা ছেঁড়ে তো আরেকটা। গৈরী ছিটকে পড়ল দরজায়। চিৎকার করে উঠল—বাপু—আমাকে বাঁচা—

দরজা খুলে গেল। একই সঙ্গে অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ। তাদের মুখে ভয় ও বিশ্বাস।

গুরু সবাইকে ঠেলে ভিতরে চুকে বলল—আরে বিট্টিয়া!

গৈরী গুর বাপকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সে এক বৈসাদৃশ্য দৃশ্য। শাড়ি ছিঁড়ে ফালা ফালা। চুল খুলে আলু খালু।
ভীষণ হাঁফাচ্ছে। ধর ধর করে কাঁপছে।

রবি গর্জন করে উঠল—শালা বেইমান! বিটির সাদী দিলি রুপিয়া লিলি।
জর বলে ঘর করবো নাই।

কে বা কারা গুকে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলল এত রাগারাগি করিস না
জামাই। গৈরীকে আমরা বুঝাঞ্জে রাজী করাবো।

রবি বলল—উ রাজী হবক নাই। আমার কাছে কবুল করেছে। যে
উয়ার হুসরা আদমীর সাথে মুহব্বৎ আছে। পড়া-লিখা শিখেছে নাকি মুহাব্বত
করছে। আমি ইয়ার বদলা লিবো!

ভোর হয়ে গেছে। ঘর ফাঁকা, হাঁটু ভাঁজ করে মুখ খুবড়ে পড়ে আছে গৈরী।
সন্ধ্যাবেলায় কত পারিপাটি করে খোপা বেঁধে দিয়েছিল গুর সহেলীরা। তা
এখন ছিঁড়ে খুঁড়ে আলু খালু চুলের রাশি মেঝেতে লুটিয়ে আছে। ঘাড়ের উপর
ফোঁটা ফোঁটা রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শাড়ি ব্লাউজ ছিঁড়েই গেছে। ফুলে ফুলে
কাঁদছে। দমকে দমকে পাজর কাঁপছে।

গুলু গুর কাছে এসে দাঁড়াল। মাথায় হাত রেখে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকল—
গৈরী। বিটিয়া।

গৈরী মুখ তুলল। করুণ কোমল মুখটি কাজলে, সিঁড়রে, চোখের জলে চুব্‌চুবে
হয়ে গেছে। বামগালে পাঁচ আঙুলের কালশিটে ছাপ। নাকের নোলক ঝুলছে
মাংস কেটে। ঠোঁট, কপাল কাটা কাটা রক্ত জমে আছে।

গুলু শিউরে উঠল। ওঃ এত মার মেরেছে তার সাধের বিটিকে। লোহার
মতো কঠিন হাতটা তার মুখে বুলোতে লাগল।

অসীম ব্যাকুলতায় বাপের পা দুটি ধরে গৈরী বলল—বাপু! আমাকে তুই
বাঁচা বাপু। খত্তরাল আমি যাবো নাই।

গুলু বলল—ক্যেনে অমন করছিস বিটি? সব বিটি ছেলা খত্তর ঘর যায়।
তার লেগেই বিয়া সাদী। তুই ক্যেনে অবুক হছিস?

—আমি যাবো নাই বাপু।

—ক্যেনে?

—কি করে উয়ার ঘরকে যাবো? আমার পেটে যে বাচ্চা আছে।

—গৈরী!

বিশ্বয়ের সীমানা পার হয়ে কেমন আর্ডকণ্ঠে ডেকে উঠল গুলু। মনে হলো
এখনই এই কুলখাগী বিটিকে গলা টিপে শেষ করে দেয়।

ক্রোধ এবং বিশ্বয়ের বিমূর্ত্তা কাটিয়ে সে বলল—এই জঞ্জাই তুকে লেখাপড়া
শিখতে ইঙ্কলে পাঠাঞ্জেছিলম?

—ক্যেনে পাঠালি বাপু? যদি না পাঠাতিস তবে জে কিছু হতো নাই। ডাং মুখ্য মরদের ঘর করতে যাবক নাই। আজ ই কথা বললে কি হবেক? তুরা আমার মরদের সঙ্গে ছাড়াবিড়া করাঞে দে-গা!

গৈরী সোজা হয়ে বলল। গুলু ওর দিকে তাকিয়ে আরেকবার চমকে উঠল। ছুটি হাত খালি। ব্যাটাছেলের মতো পবিষ্কার। একটিও চুড়ি নেই। মাথার সিঁদুরটাও লেপা পৌছা। সারা মাথায় ও কপালে লেগে আছে।

—ঐ কি করেছিল বিটি?

—বিধবা হঞেছি।

—হে ভগমান! পেটে বাচ্চা আছে বলছিল। তার বাপটি কে হবেক?

—যে আজ্ঞাঞেছে সেই হবেক?

—নাম?

—না। এখন বলব নাই।

—না বললে কি করে হবেক?

—সেটি আমি বুঝব। তুইও যদি এমনি করবি তবে জীবনটি ঘুচাঞে দিব। দামুদরে সান্ত্বিন বান পড়েছে। দিব ঝাপাঞে।

—তাই করগা। তুর জালাতে ঘরগুটি জলে গেলম।

ভীষণ ব্যথিতভাবে গুলু চলে গেল।

ফৌড়া পাকবার সময়ই যত টনটনানি ব্যথা। অসীম যন্ত্রণা ফুটবার সময়। কিন্তু একবার ফুটে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে গেলেই সব ব্যথার অবসান।

গৈরীর জীবনেরও পাকা ফৌড়া ফুটে গেছে। নারী জীবনের যা কিছু লজ্জা, গ্লানি, অপযশ নিজের মুখেই প্রকাশ করে দিয়েছে। আবার কিসের ভয়? এবার এসপার কি ওসপার। কে আছে বদলা লেনেওলা মরদ। সৈণ্ড হুনিয়ার মেয়ে।

সকাল হতে যা দেরি। চবুতরায় লোক জমে গেল। রবিলাল এসেই তার নিস্ত্রিত বাপ কাকাকে টেনে তুলে জানিয়ে দিয়েছে এক রাণ্ডী কসবির সঙ্গে তুরা আমার বিয়া দিঞেছিল। স্থাথ গা কেমন বলছে আমার দুসরা আদমী আছে। ভাতারের ঘর করব নাই।

ওর বাপ কাকা এমন করে উঠল যেন খরিষ সাপের ল্যাঞ্জে পা দিয়েছে! সাপটা ফশা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখুনি ডাং মারতে হবে।

মনিলালের রাগ বেশী। সে লাড়িয়ে উঠল। চল বহুকে এখনি ধরে, নিঞে ঘরকে ধাবো।

বাকেলাল চলতা পুরজা আদমী। দাদার লিগ্যাল অ্যাডভাইসার। তার রাশ কেই টেনে ধরতে পারে। বলল দাঁড়া। হুড়বড় করিল না। বিহান হোক। সবু সরদারের পাড়ায় খবর বিই। আমরদের লোকজন আহুক।

সবুদের প্রতিক্রিয়া সবার কানসেই এক হয়ে গেল।

তারপর গুলুকে ডাকা হলো। লে এত লোকজন দেখে ঘাবড়ে গেল।

মনিলাল জ্বরদন্ত গলায় বলল—ক্যাবে শ্রালা চোর চুহাড়। তোর রাণ্ডি বিটিকে লিয়ে আয়। আমরা এখনি লিয়ে যাবো।

গুলু মিন্ মিন্ করে বলল—ইঁ ইঁ। আমরা উয়াকে বুঝাছি।

—বুঝাবি কিরে ? টাকা লিবার সময় মনে ছিল নাই। যা বিটি লিয়ে আয়।

—উ আসবেক তবে ত !

—কোনে আসবেক নাই। শ্রালা বেইমান। মেরে খাল খিঁচে দিবো।

গুলুর চুলগুলো ধরে ফটাফট চড় বসিয়ে দিলো ! টানতে টানতে নিয়ে গেল গুলুর ঘরকেই। তার পিছনে দশ পনেরো জন লোক। হাঁক দিয়ে বলল—ডাক তোর বিটিকে।

মেয়েরা সব তটস্থ। হাউ মাউ করে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

গৈরী দাঁড়াল চৌকাঠের সামনে। চার পাঁচটি নানা বয়সের মেয়ে গুকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলল। গৈরী বলল—ছাড় তুরা। কে কত মরদ আছে তাই দেখব। জুলুম বাজী করতে এসেছে—বাবা মরদ।

রবিলাল গুর দিকে তর্জনী তুলে বলল—এই শ্রালী এক নম্বর রাণ্ডি !

গৈরী ঝঙ্কার দিলো।—চোপ। ভোকুরা বেজন্মা। মুখ সামলে বাৎ কর। আমি যদি রাণ্ডিই হব তবে কোনো তেড়ে দিব ?

মনিলাল বলল—এত কিসের নখড়া ! চল রবিয়া আপনা আওরৎ হিন্মতসে দখল করে লে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে রবিলাল লাফ দিয়ে গৈরীকে ধরে ফেলল। টানতে টানতে উঠোন পর্বস্ত নামাল। গৈরী প্রাণফাটা চিংকারে গোটা পাড়া কাঁপিয়ে দিলো। ওরা আক্রোশে গর্জন করে উঠল।

ঝনাৎ করে পড়ল রবিলালের মাথায় এক লাটি। গৈরীকে ছেড়ে রুখে দাঁড়াল ও। তখন ওদের সামনে ছুটি ছোকরা। হাতে লাঠি। দুজনেই চরিতরের ছেলে। গৈরীর মামাতো ভাই জগদীশ—হরেরাম।

জগদীশ বলল শ্রালা ! তু এতো মরদ।—আমাদের ঘর থেকে জুলুমসে বিটি লিয়ে যাবি।

পটাপট চালের বাতা ভাঙতে লালল। ফটাফট লাঠি চলতে লাগল। গুলুর ঘর থেকে চবুতরা পর্বস্ত রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র। মেয়েদের চিংকার ও আর্ডনায়ে, দাকাবাজ মরদগুলোর গর্জনে, রক্তলহান চেহারায় উৎসব মুখরিত পাড়াটা অন্ধকার হয়ে উঠল।

মনিলালের দলে মৎগ মরদারের লোকগুলি নিয়ে বিশ পঁচিশজন। আর চাক্ষুণ্ডিত কিশোর সব কুলি। একর কি মেয়েরাও লাঠি, ধাঁটা নিয়ে দাঙ্গা করছে। হাতাছাতি চুলোচুলি, লাঠালাঠি। মনিলালের দলকে দাঁড়িয়ে রাখতে যেল লাইন

পার করে দিলো। ওদিকে মংগু সরদারের লোকজনও লাঠি, বন্ধন, টাঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। রেললাইনের দুদিকে দুই দাঙ্গাবাজ দল পরস্পরেব প্রতি তীব্র আক্রোশে যুদ্ধ ঘোষণা করে খিষ্টি খেউড়ের বান ডাকাচ্ছে।

আসরে নামলেন ডি. সি. সাহেব। তিনি শ্রম কল্যাণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি! শ্রমিকরা যদি নিজেদের মধ্যেই দাঙ্গা করে তাহলে আর কল্যাণ হলো কী? অথচ তাদেরকে স্বল্প বিক্ষুব্ধ অবস্থাতেই রাখতে হবে! না হলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবেন কি করে? শ্রমিকরা এখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছে। ফাটল ধরাবার এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়।

কোম্পানীর আর্মি ফোর্স অর্থাৎ চাপরাশীদিকে হুকুম দিলেন আসামী গুলু, চরিতর, কিষণ, জগদীশ, হরেরাম ও তাদের দলের দাঙ্গাবাজ ছোকরাদিকে বেঁধে আনো। আচ্ছাসে ধোলাই দাও। শ্রালাদের গরম হয়েছে। বিটির বিয়া দিবি আর খন্তর ঘর পাঠাবি নাই।

চাপরাশীরা হৈ হৈ করে আসামী ধরতে গেল। কিন্তু এক গুলু ছাড়া কাউকে পেল না। সবাই সটকে গিয়েছে। গুলুও পালিয়ে যেতে পারত কিন্তু গৈরীকে ঘরে রেখে কোথাও যেতে মন সরেনি।

মংগু সরদার ডি. সি. সাহেবের পেয়ারের লোক। তিনি তো তাদেরকে মদৎ দেবেনই। ডাক পড়ল হেড গোমস্তা সজিপ্রাসাদের। উনি শ্রমিকদের মহাজন গুলু তার খাতক। এই সুযোগে বেশ করে দোহন করে নিক।

জগদীশ ও হরেরাম তরতাজা জোয়ান। ইউনিয়ন করে। ভীষণ একরোখা। দাঙ্গার স্বরূপাত তাদের লাঠি থেকেই। গৈরীর লাঙ্ননা তাদের সখ হয়নি।

পিসতুতো বোনকে নিজের বোনের মতোই ভালোবাসত! গৈরী লেখাপড়া করত বলে পাড়াতে আলাদা খাতিরও ছিল। যে কারণেই হোক সে যখন খন্তর ঘর যাবো না বলছে তখন কেন জুলুম করবে? জামাই কেন গৈরীকে অমন নিষ্ঠুরভাবে মারধোর অভ্যাচার করবে? ওর চোখের জল করুণ মুখ এবং গায়ের রক্ত দেখেই তো মাথার ভিতর ক্রোধ উঠছিল শন শন করে।

তাছাড়া মেয়ে যে সমাজের ক্যাপিটাল অ্যাসেট সে সমাজে বুকের উপর দিয়ে জুলুমসে মেয়ে নিয়ে যাবে এটা তারা বরদাস্ত করে কী করে? তাঙ্গারক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল। আর লাঠি যখন একবার চালু হয়ে গেল তখন অগ্ন্যান্ধরা তো দাঁড়িয়ে দেখতে পারে না।

হুনিয়ার হরেক হুকুমের পিছনে জড়, জমিন, যোনী।

রাম বাবণের লড়াই থেকে আজও চলছে এবং চলবে। হুনিয়া যতই সস্তা হোক। সে গুলু পাড়ি, বাড়িতেই। ভিতরটা একই রকম।

সাতাশ

রেশন আন্দোলনের ব্যাপকতা দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে। দামুলিয়াতে কোনো শ্রমিক নিতে আসেনি। তারা রেশন বয়কট করছে। সেই আন্দোলন অস্ত্রাশ্র কলিয়ারীতেও ছড়িয়ে পড়ছে।

স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, চীফ পারসোনাল ম্যানেজার, সেক্রেটারী টু দ্য প্রাইম মিনিষ্টার, লেবার মিনিষ্টার, লেবার কমিশনার প্রভৃতি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায়।

মেসে বসে স্মৃতিতাবু সেই সব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছিলেন। কাগজ কলমের কাজে, চিঠিপত্র লেখা ও হিসেব নিকেশে অনন্ত খুব তুখোড়। সে স্কটবলের কোচিং ক্যাম্পে গেছে বলে স্মৃতিতাবু অসুবিধা ভোগ করছেন। বাকী যেসব স্থানীয় নেতা তারা হুকুম তামিল করতে পারে, লড়তে পারে, ভাষণ দিতে পারে কিন্তু কাগজে কলম ঠেকাতে গেলেই তা ভাঙবার উপক্রম হয়ে যায়।

সেই সময়েই রক্তলহান শরীরে ছুটে ছুটে হাজির হলো জগদীশ ও হরেন্দ্রাম। ওদের মুখে দাঁকার খবর শুনেই থ হয়ে গেলেন। গৈরীকে কেন্দ্র করে এত বড় দাঙ্গা? কিন্তু সে খস্তর ঘর যাবে না কেন?

এর কারণ মেসের মধ্যে কমলেন্দুর এক আধটু জানা। সে মুখে কুলুপ দিলো।

স্মৃতিতাবুকে যেতেই হবে। ডি. সি. সাহেবের হাত যখন পড়েছে তখন সে যে কতভাবে ঘোঁট পাকাবে, কত রকম নকশা দেবে তা উনি জানেন।

সামনে লড়াই। শ্রমিকদিকে একতাবদ্ধ করে বৃহত্তর আন্দোলনের সামিল করতে হবে আর এই সময়েই অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাও একটা মেয়ে নিয়ে। এত অকিঞ্চিৎকর কারণে এরা এত বৃহৎ কাণ্ড করে বসে যে তার সামাল দেওয়াই দায়।

হরিহর গাঙ্গী, ভিঙ্গক সিং, যমুনা যাদব ও আরো জনকয়েককে সঙ্গে নিয়ে অফিসের দিকে রওনা হলেন।

ডি. সি. সাহেবের অফিস জম জমাট। গুলু আসামী। একদিকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ধোলাইও হয়েছে।

‘মংগু সরদার লক্ষ লক্ষ করছে—গাওনার দিনে বিটি পাঠাবেক নাই আবার স্কটমদিকে মেরে লাশ বানাবেক ইয়ে নেহী চলে গা। হাম লোগ বদলা লোগা।

জাতকে জাত বৈরী। সেই ফরমুলায় চরিত্তর কিধাপের সঙ্গে ওদের বাপের আমল থেকে রেধারেধি। আবার গৈরীর সঙ্গে রবিলালের বিয়ে হয়েছিল ওরই বটকালিতে। কাজেই ওর জালাটা সবচেয়ে বেশী।

সভিপ্রসাদও এসে পড়লেন। লেবার সাহেবদের সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় দ্বন্দ্বতা। ওদের পারস্পরিক অন্তত আঁতাত গুলুকে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে? দলবল সহ স্মৃতি চ্যাটার্জীর প্রবেশ অনেক কিছুই ভেঙে দিলো।

উনি এসেই হুকুম জারির গলায় বললেন, হরিহর গুলুর বাঁধনটা খুলে দে ।
শুকে চা জল খেতে দে ।

হরিহর গুলু বাঁধন খুলে দিলো । গুলু গুদের পায়ে পড়ল ।

ডি. সি. সাহেবের তখন গা জঙ্গছে । বললেন, ওহে স্মৃতিবাবু! তুমি
এখানে কি ফোপার দালালি করতে এলে ?

—আপনাদের শ্রমিক নির্ধাতন বন্ধ করতে ।

—ভারী যে দরদ । জানো ওরা দাঙ্গা ফোঁজদারীর আসামী ।

—তাতে আপনার কি ? দেশে ফোঁজদারী আদালত আছে ।

—তবে কি পুলিশের হাতে তুলে দেবো ?

—নিশ্চয় ! কিন্তু একা গুলুকে নয় । যারা বাড়ি থেকে মেয়ে ধরতে
গিয়েছিল তাদেরকে বাঁধতে হবে ।

—ঐ মেয়েটি গুদের ঘরের বউ । গাওনা করাতে এসেছিল । এটা সামাজিক
সমস্তার ব্যাপার । ইউনিয়নের মাথা গলাবার নয় ।

—ম্যানেজমেন্টের মাথা গলাবারও নয় ।

—সভিপ্রসাদ বললেন—ঠিক আছে । এই মামলা আমার হাতে ছেড়ে
দিন । আমি উভয় পক্ষকে ডেকে, পঞ্চায়ৎ করে দেবো ।

—সে মীমাংসা যদি শ্রমিক নির্ধাতনের প্যাচকল হয় তাহলে আমরা মানবো না ।

—আচ্ছা বাবুজী, আপনি আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতে দিন যদি
মীমাংসা না হয় তবে আপনারা যা ভালো হয় করবেন ।

—আচ্ছা ।

গুলুকে নিয়ে উনি চলে গেলেন ।

সভিপ্রসাদ উত্তর প্রদেশের লালা কায়ত । গুঁর বাপ ছিলেন ছোট
গোমস্তা । উনি হয়েছেন বড় গোমস্তা । রেল লাইনের পাশে তিন চার বিঘে
জায়গা নিয়ে গুঁর বাসা । তারের বেড়া দেওয়া বাউগারী । পাঁচখানা গোলঘরের
একটা সারি । পুরোটা দখল করে নিজের লোকজন ঢুকিয়ে রেখেছেন । তারা
সব কলিয়ারীতেই কাজ করে । একদিকে খাটাল । আঠারোটা গাই মোষ ।
ফাটকবাজারে তিনটে দোকান । একটি মুদিখানা, একটি কাপড়ের আর একটি
লোহা-সকড়ের । নিজস্ব আঁটাচাকী । গম পেবাই হয় । দামোদরের ধারে
ধারে যেসব পতিত জমি কোম্পানির কেনা ছিল তাও দখল করে চাব আবাদ
করেন নিজস্ব হালজোতে । নিজের কোয়ার্টারের পাশেই একটি চাপরানী খাণ্ডা ।
প্রায় দশ-বারোজন চাপরানী থাকে । তারা ভজন ভজন আটার রুটি সাঁটে ।
ডন বৈঠক কুস্তি লড়ে । কোম্পানির বিষয় সম্পত্তি পাহারা দেয় । কুলি খাণ্ডায়
কেউকে তোল করে এবং পেশাদার লড়াই হয়ে দাঙ্গা করতে যায় । কেউ কেউ
কুস্তি ছাঁকাত্তিও করে ।

সজ্জিপ্রসাদ নিজে কুশীদজীবী। কুলিকামিন দিকে ধার উদ্ধার দেয়। ক্যাশ কাউটারে বেতন পেমেণ্টের সময় কেটে নেয়। এসব কায়দাকাহ্নন বাপের আমল থেকে চলছে। এই যে সম্পদ মজুত করেছেন তাও হুঁপুরুষ ধরে। গুঁর বাপ এখনো বেঁচে আছেন। দেশে গিয়ে জমিদারী কিনেছেন।

তাহলে কি রমরমাটাই না চলছে। কোথায় লাগে ডি. ডি., ডি. সি.। তাদের রোজগার তো ওয়াইন, উস্তম্যান, ভাক্তার, উকিলেই খেয়ে দেয়। দমে ফুটানি উড়ায়।

যীর অথচ অনিবার্ধভাবেই ষটে যাচ্ছে যুগের পরিবর্তন। একদা কয়লা শিল্পে শ্রমিক রিক্রুটমেন্ট ছিল প্রধান সমস্যা। সেইজন্তই ছোট বড় গোমস্তা, চাপরাশী, দালাল, সরদার, আড়কাঠি।

একবার সেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাণিজ্যিক মন্দার কারণে নিম্নমানের কয়লার চাহিদা ছিল না। তার ঠ্যালাতে বেবাক কুলিকামিনকে বিনা টিকিটে আপট্রেনে চড়িয়ে দিয়েছিল গোমস্তা চাপরাশীর দল। বেচারীরা ঠাসাঠাসি ভিড়ে পেচ্ছাব, পায়খানা মাখামাধি করে রেল পুলিশের ধোলাই খেতে খেতে ঘরে ফিরেছিল। কতক বা রাস্তাতেই মরে হেজে ফুরিয়ে গেল।

কিন্তু যারা সেই সময়টা কোনোরকমে গজাল ঘষড়ে বছর পাঁচ-সাত টিকে গিয়েছিল তারা আজ শেঠ। অবশ্য যাদের সে এলেম ছিল।

বহু কলিয়ারী জলের দরে বিক্রি হয়েছিল। কত যন্ত্রপাতি, লোহা লক্কড়, ঘরবাড়ি, কয়লা ডিপো নিলামে চড়েছিল। সেই সময় যারা যুদ্ধের বাজারে পয়সাকড়ি কামিয়েছিল তারাই ক্রেতা। কত জমিদারী হস্তান্তর হয়েছিল।

সজ্জিপ্রসাদের বাপ সেই সময়টা মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন বাজারের মন্দা কেটে গিয়ে তেজী ভাব দেখা দিলো। তখন তার তেজারতি ব্যবসাও ফেঁপে উঠল। কিনে ফেললেন জমিদারী।

যুদ্ধের সময় শ্রমিকের চাহিদা ছিল যুবতী মেয়ের মতো। কয়লা বিক্রি হতো হট কেকের মতো। গোরখপুরী শ্রমিকদিকে আনবার জন্ত এক বিরাট সংস্থা চালু হয়ে গেল।

সেই সময়ে সজ্জিপ্রসাদ প্রচুর সংখ্যায় গাজীপুরী, ভোজপুরী, ভাগলপুরী শ্রমিক আমদানি করেছিলেন। তারা অথবা তাদের বংশধর বা আত্মীয়-স্বজনেরা আজও আছে। খাদে লোভারের কাজ করে। তারা সব কায়িকশ্রমে ও মাথার বুদ্ধিতে গরু মোষের সমগোত্রীয়। কিন্তু স্বভাবে হিংস্র। বড়ই স্বার্থপরবশ। একটা টাকা, এক বোতল মদ বা একটা যুবতীর জন্ত আন লড়িবে দিতে পারে।

মনিলাল, বাঁকেলাল, রবিলাল, মংগুরা তো সেই গোত্রের এক প্রজন্ম। গৈরীর উপরে কতকণ্ণে দখল কান্নেম করতে পারে সেজন্ত মরিয়া। সে যে জন্ত কাউকে

ভালোবাসে, তার জীবন যৌবন বন্ধক পড়ে গেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। তার হাতে কোবালা দলিল আছে! চাই দখল।

ভোগের জন্ত, বংশবিস্তারের জন্ত। রমণী যে ক্ষেত্র। সন্তানরা বিষয়-আশয়। তাহলে সে হলো ক্যাপিটালের ক্যাপিটাল।

আর তাদের অহঙ্কার। দ্বিরাগমনে বউ নিতে এসে খালি হাতে ফিরে গেলে লজ্জা রাখবার জায়গা থাকবে না। অপমানের চূড়ান্ত। কুটুমদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?

দিওয়ানী, বে-শরম, বে-রহম যাইহোক বউ তো বটে! জোয়ানী তো আছে। মরদের মহড়া নিতে তো পারবে। ছেলে তো বিয়োবে। তাহলেই হলো।

সন্ধ্যার আকাশে মহুয়ার গন্ধে বাতাস ম-ম। গোমস্তাবাবুর চবুতরায় সিমেন্ট বাঁধানো চত্বর। একটু দূরে একটি অশ্বখ গাছ। তার গোড়ায় সিঁড়র মাথা হুড়ি পাথর।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন এক ও হুঁনঘর চালু ছিল তখন এখানে একটি সাঁওতালপাড়া ছিল। সাহেব কোম্পানী তাদেরকে উঠিয়ে নেবুলিয়া রোডের ধারে ধাণ্ডা বানিয়ে বসত করতে দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেই ধাণ্ডার নাম জামজুড়ি। সেখানকার বহু সাঁওতাল কুলিকামিন খাদে কাজ করে।

সেও আজ অনেককাল হলো। কিন্তু তখনকার অশ্বখ গাছ ও সিঁড়র মাথা হুড়ি-পাথর এখনো আছে। বীদনা পরবের সময় রাবণ মাঝি আর গুপ্তির মাঝি মিঝানরা এসে পূজো দেয়। মুরগি বলি করে। লাগরা বাজিয়ে গায়। সেই বোঙার থানটিও সন্নিপ্রসাদ দখল করে নিয়েছেন। তার জন্ত হলমাল বা সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়নি। বেচারীরা বড়ই গরীব।

চবুতরা গুলজার। গৈরী হরণ মামলার গুনানী হচ্ছে। আসামী ফরিয়াদীরা আপন দলবল নিয়েই এসেছে। গৈরীকেও আনা হয়েছে। সঙ্গে এসেছে মাশী পিসিরা!

কোলাখাটে কঞ্চল পেতে সন্নিপ্রসাদ বসে আছেন। হাতে হাতে খৈনী টেপা হচ্ছে। এবং হাত বদল হচ্ছে গাঁজার কলকের।

মনিলালের দাবি সোচ্চার। গৈরীর বিয়ে থেকে শুরু করে দ্বিরাগমনের দিন করা পর্ষস্ত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ, টাকা-পয়সার লেনদেন, গয়না গড়ানো, দ্বিরাগমনে বউ আনতে যাওয়া, কুটুমের আদর অ্যাপ্যায়ন, ছেলের ফুলশয্যার আয়োজন, সেখানে গৈরীর প্রত্যাখ্যান, সিঁড়র মোছা, চুড়ি ভাঙা, গুলুর প্রবেশ ও মায়িকা উদ্ধার, তারপরে ধোলাই পর্বের জানমান জখমের বিবরণ বাঁকেলাল তার ঠেট দেহাতী ভাবায় এমন বর্ণনা করল যে উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনে একটা ছাপ এঁকে দিলো। গুলুর সমর্থকরাও এই কাজটি যে বোরতর অস্তায়

হয়েছে তা স্বীকার করতে বাধ্য হলো। গুলুও কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না।

রবিলাল তার এজাহারে বলল—বিলকুল ধোঁকাবাজি! গুলু উয়ার বিটিকে বাজারে ভাড়া খাটায়। সেই গরমে উয়ার বিটি সোহাগ রাতে মরদকে বলে— ছুঁও মৎ! উ নিজেই মৃত্যু কবুল করেছে যে উয়ার দুসরা আদমীর সঙ্গে মুহাব্বৎ আছে।

গৈরীর মাসী, পিসি ও আত্মীয় স্বজনরা তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল— খবরদার আমাদের বিটির নামে বদনাম দিস না। ডোকরা হারামজাদা ঠেঙাঞে মূখ ভেঙে দিব।

সেই সময় বাদ-প্রতিবাদে একটা শোরগোল উঠল। সভিপ্রসাদ তা থামিয়ে দিয়ে আসামী পক্ষকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিলেন।

ওদের সারকথা—গৈরী আমাদের লেখাপড়া জানা বিটি। সোহাগ রাতে ঐ আখাষা মরদের কাছে যায় নাই ভয়ে। তো এমন চড় মেরেছে যে উ মরেই যেত। তারপরে কোন মোয়া সে মরদের ঘর করতে রাজী হবেক? উ রাজী হয় নাই ত উয়ারা বিহানবেলায় লোকজন নিঞে জুলুমসে টানতে নিঞে যেছিল। আমরাও জুলুমসে ছাড়াঞে নিঞেছি। খোড়া বহুত চোটঘাট লেগেছে। আমার বেটা দুটিও ঘায়েল হঞেছে।

সে তো দেখাই যাচ্ছে। দশ-বারোজন চোট খেয়ে রক্তলাল শরীরে ডাক্তার-বাবুর কাছে পৌঁছেছিল। এখনো তাদের রক্তমূখ শুকায়নি। ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কঁকিয়ে বেড়াচ্ছে।

—কিন্তু গৈরী শস্তুরাল যাবেক নাই কোনে?

সভিপ্রসাদের অমোঘ প্রশ্ন। গৈরীকেই ডাকা হলো তার জবাব দিতে।

গৈরী মাথা নীচু করে বলল—আস্তে ইয়া জ্যেঠাবাবু—

সভিপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আরে একি হুনিয়া মেয়ের সন্ধান নাকি? এত সহবৎ শিখলো কোথায়? ইয়া—ইয়া কালির আখর আছে পেটে। মা সরস্বতীর মাহাত্ম্য আছে বৈকী!

উনিও কোমল সুরে বললেন—ইয়ারে বিটি! শস্তুরাল কেনে যাবি নাই?

—আমি এই বিয়া মানি না।

উনি অবাক। ওর দিকে তাকালেন। হাতে চুড়ি নেই, মাথায় সিঁদুর নেই, বিধবা না কুমারী তাই বোঝা দায়।

বললেন—এইটি কি কথা হলরে। তবে যে গোটা সমাজটাই উলটে যাবেক।

—উলটাবার জন্তই ত প্রতিজ্ঞা করেছি। সেই পাঁচ বছর বয়সে বিয়া দিঞেছে। কি বুঝতম বিয়ার মৰ্ম? দশ বছর ধরে চুড়ি আর সিঁদুরের বোঝা বঞ্চেছি। তাই শেষ করে দিঞেছি।

—লেখাপড়া শিখে এই বুদ্ধি হলো ? ও তুর মা বাপ কুটুমজনে যে বিয়া দিলেক সেটি কিছই নয় ?

—বলছি তো। অমন বিয়া দিঞেছিল কোনে ? লেখাপড়া শিখালেক কোনে ? এখন বলছে একটা ভাং মুখার ঘর করগা তা পারব কোনে ?

সভিপ্রসাদ ভীষণ বিরক্ত। তাঁর মুখের সামনে একটা ছুনিয়া মেয়ে এত বড় বড় কথা বলতে পারে এটা তিনি কখনো ভাবেননি। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন—ঠিক আছে। আমি সব বুঝে নিয়েছি।

সওয়াল জবাব শেষ। জাজ্জমেন্টটাই বাকী। সভিপ্রসাদ বিচারক। ঠাঁর কোনো জুরি নেই। প্রয়োজনও নেই। তখনকার দিনে শ্রমিকদের কাছে ঠাঁর একটা কথার মূল্যই কোর্টের হার্কিমের মতো।

উনি বললেন—আমি বুঝে দেখলাম গৈরীর খন্তর ঘর না যাওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। গুলু তার বিয়াইয়ের কাছে টাকা-পয়সা নিয়েও বিটি পাঠায় নাই। ঈ বহুত ইমানের খিলাপ। উয়ার দোষ বোলো আনা। সেইজগু গুলুকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবেক। গৈরীকে খন্তর ঘর যেতে হবেক।

গুলু ঠাঁর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—হজুর ! দেওতা ! মাফ করুন।

—তিনদিনের মধ্যে দেনাপাওনা ফারখৎ করে গৈরীর পাওনা করাতে হবেক। উনি চলে গেলেন। রায় ঘোষণার পর বিচারক এজলাসে থাকেন না।

আটাশ

অনন্ত এসে পড়ল সেইদিন রাত্রেই। কমলেন্দু কোচিং ক্যাম্পে গিয়ে সব খবর দিয়েছে। সেখান থেকে এসে স্মিত্তবাবুকে বলল—দাদা ! গৈরীকে বাঁচান।

ততক্ষণে সভিপ্রসাদের বিচার প্রহসনের খবরও ঠাঁদের কাছে এসে গেছে।

উনি বললেন—গোমস্তার সঙ্গে ডি. সি.-র যোগসাজসেই এই বিচারের প্রহসন। এর মোকাবিলা করতে হলে গণ-আন্দোলন চাই। আর আগামীকাল দকালেই থানায় নিয়ে গিয়ে ওর খন্তরগুটির নামে ডায়েরী করাতে হবে। মারধোর, নির্ধান্তন এবং ধর্ষণের অভিযোগ দিতে হবে।

—ধর্ষণ তো হয়নি। তা কি টিকবে ?

—ওরে থানা পুলিশ কোর্ট কাছারীতে কিছুটা বাড়াবাড়ির প্রয়োজন আছে। আর যাইহোক আইনের চোখে গৈরী এখনো নাবালিকা।

—এখন আমাদের লড়াইয়ের একটা স্ট্রাটেজি তৈরি করতে হবে। গোমস্তা চাপরাসীদের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে হবে। একটা জোর আঘাত দিতেই হবে। তাহলে শ্রমিকদের মনোবল বাড়বে। কিন্তু অনন্ত তুই আমাদের একটা কথা স্মিত্ত করে বল গৈরীর সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক ?

—খুব আপন সম্পর্ক দাদা। এই জগতে প্রেম ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড় অপরাধ। সেটাই করে ফেলেছি।

—ভুল করেছিল।

—শুধু ভুল নয়—অপরাধ। ছুনিয়ার বেবাক কবি, শিল্পী, লেখক প্রেমের জয়গান করেন। কিন্তু সত্যই যদি কেউ করে ফেলে তবে সে হয় অপরাধী। তাহলেও আমরা হারবো না। দেখছেন তো গৈরীর মনের জোর।

—এ খবর আর কে জানে ?

—কমলেন্দু জানে। আর গৈরীর তরফে কেউ জানে কিনা তা জানি না।

—অলরাইট। ব্যাপারটা গোপন থাক। তুই যা অ্যাকশন কমিটির মেম্বার দিকে ডেকে নিয়ে আয়। এখুনি মিটিং করবো।

সেই রাতেই ইউনিয়নের অ্যাকশন কমিটির মিটিং হলো। দীর্ঘ পরামর্শের পর স্থির হলো—শ্রমিকদিকে অভ্যচার করার যে আদিমতম প্রথা তা হচ্ছে সরদারী ও গোমস্তা গিরির মাধ্যমে জুলুম বাজী, বিচারের প্রহসন ও শোষণের ফাঁক ফোকর তৈরি করা, এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। স্বদের রাজ খতম করে মুক্তির আলো দেখাতে হবে।

আজ তো কয়লা শিল্পে শ্রমিকের কোনো অভাব নেই তাহলে গোমস্তার কি প্রয়োজন ? ওই পদটা আছে বলেই নিত্য নতুন শ্রমিক আমদানি হচ্ছে ও পুরানোদিকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। অতএব মালিকের কাছে দাবি রাখা হোক গোমস্তার পদ তুলে দেবার জন্ত।

এসব খসড়ার ভাষা রচনা করে একটি স্মারকলিপি তৈরি হলো। স্মৃতিত চ্যাটার্জী সেক্রেটারী। অন্নাগ্নেরা সদস্য। সকলেই সহি করে শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ছত্রিশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকপত্র তার পরদিন বড় সাহেব থেকে গুরু করে কোম্পানির ডাইরেকটার পর্ষন্ত সর্বত্র পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে সব বাসায় ফিরলেন।

পরদিন সকালে গৈরী তখনো মুখ ধোয়নি। অজস্র বাক্যবানে বিদ্ধ আপন মর্ম যন্ত্রণায় ব্যথিত একটা রাত কাঁদতে কাঁদতেই কেটেছে। চোখ মুখ ফুলে গেছে। গালের কালশিটে দাগটা ছাপ মেরে বশে আছে। স্তন দুটি টন টন ব্যথায় ফেটে পড়ছে। এমনিতেই তো এই সময়ে মেয়েদের স্তনে একটা মিষ্টি মধুর ঠনঠনে ব্যথা থাকে। তার উপর পাশবিক অভ্যচারে প্রবৃত্ত রবিলালের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য আক্রমণের একটা বৃহৎ অংশ তার উপরেই পড়েছে। কালকার দিনটা ঘোর উদ্বেজনায় মধ্যে কেটেছে বলে অতটা বৃকতে পারেনি। আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

নর্দমার সামনে উবু হয়ে বসে দাঁতে দাঁতন ঘষছিল। হঠাৎ এতগুলি লোক

দেখে ঘাবড়ে গেল। অনন্তকে দেখে আরো চমকে উঠল। হাঁ করে তাকিয়ে রইল। হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, যমুনা যাদব, কালু মশহর, রামদেও পাশমন আর অনন্ত তাদের উঠোনে দাঁড়িয়ে।

অনন্ত বলল, তোর বাপু কোথায় রে গৈরী ?

—আছে কুথাও।

—ডাক ওকে। মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। থানায় যেতে হবে। জলদি কর। আমরা বাইরে চবুতরায় বসছি।

গৈরীর সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। অনন্তকে দেখার পর থেকেই ভিতরে ভূমিকম্প স্রুজ হয়ে গেছে। কিছুতেই সামাল দিতে পারছে না। অযথাই চোখ ফেটে জল আসছে।

ওরা সব চবুতরায় দাঁড়িয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। চরিতার একটা খাটিয়া এনে বসতে দিলো। ওরাও আধঘণ্টা কথা বলে ওদেরকে উত্তেজিত করে ফেলল। গোমস্তা বাবু যে ভগবান নয়, চাপরাশীরা যে যমদূতের মতো ক্ষমতা ধরে না, ডি. সি. সাহেবের চাল চহরম ষড়যন্ত্র যে ফাঁস করে দিতে পারে, শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যে এসব অশুভ শক্তিকে ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে তার ব্যাখ্যায় শাসন ও শোষণের ভিন্ন ভিন্ন পন্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ওদের মগজে ঠুঁসে দিলো।

ওরা একবাক্যে মায় দিলো গুলু ও গৈরীকে তোমরা থানায় নিয়ে যাও।

মুখ ধুয়ে সাক্ষতরো শাড়ি ব্লাউজ পরে গুলুর পিছনে পিছনে গৈরী যখন এসে চবুতরায় দাঁড়াল তখন ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। বরাবরের জম-জমাট সাজ পোশাক, রঙ বাহার শাড়ি, তার ঘোমটা মাথার তালু পর্যন্ত সিঁচুর, হাতভর্তি চুড়ির রনক ঝনক বাদ দিয়ে সাদা সাপটা ড্রেসে আলাদা রকম মনে হচ্ছিল।

তবু তার চোখের পাতা দুটি ভারী। কাজল পরেনি। তাই একটু ফাঁকা। মুখটি জলে ধোওয়া কচি পুঁই পাতার মতো ঝক্ ঝক্ করছে। ঠোঁটের আগায় একটু হাসিও লেগে আছে।

অনন্ত ভাবল—আহা। বেচারীর উপর কত না ঝড় বয়ে গেছে।

হাঁটতে হাঁটতে চলল ওরা। মেসের কাছে স্থমিতবাবু সঙ্গ নিলেন। অস্ত্রেরা নিজের কাছে চলে গেল। সবাই মিলে হৈ-হাল্লা করতে ঘাবার কি দরকার ? তার চেয়ে ধাওড়ায়, ধাওড়ায়, খাদের অঙ্ককারে গোলাহায়ে শ্রমিকদের সঙ্গে ছোট ছোট মিটিং করলে বেশী কাজ হবে।

স্থমিতবাবু ডাক্তারবাবুর কাছে গৈরীর উপর অত্যাচারের একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট নিলেন। উনি না বলেননি। তবে চেকআপ করেছেন।

স্মিতবাবুকে একান্তে ডেকে বলে দিলেন—গৈরী প্রোগ্রামাট! এটা কি করে হলো?

—হতে পারে। আমি খবর নিচ্ছি।

হস্বনিয়া মোড়ে বাস ধরে থানায় পৌঁছতে বেলা দশটা বেজে গেল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছিলেন। গুদরকে বসতে হলো।

থানা চস্বরের মধ্যেই একটি বটগাছ। তার নীচে গুরা দাঁড়িয়ে।

স্মিতবাবু বললেন—ডায়েরীতে কি কি লেখাতে হবে তা গৈরীকে বুঝিয়ে দে। আমি তোদের জন্ম দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। গৈরীকে খেতে বলবি। গুর খালি পেটে থাকা ঠিক নয়। এসো গুলু।

গুলুকে নিয়ে চলে গেলেন। অর্থাৎ গুদের দুজনকে একান্তে মনের কথা খুলে বলবার অবকাশ দিলেন। এই না হলে গার্জেন। অনন্ত গুর প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ করল।

গৈরী একটা শিকড়ে বসে আছে। পায়ের নীচে ভিজ্জে মাটি। সব্জ্জ ঘাস। এক গুচ্ছি ঘাস ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কাটছে। মাথাটা নীচু। অনন্তের দিকে তাকাতে পারছে না। ভিতরটা কেমন গুড় গুড় করছে ভয়ে লজ্জায়।

অনন্ত বলল—মুখটা তোল। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলি যে।

গৈরী হাঁটুর উপর খুতনি রেখে গুর দিকে এক পলক চাইল। কথা বলল না।

অনন্ত বলল—হ্যারে! তোর খুব কষ্ট হয়েছে।

—সে কি বলে বোঝাতে পারব?

—যাক। খুব লড়েছিস।

—আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম—তা রেখেছি।

—খুব ভালো করেছিস। এই তো চাই। মেয়েদের মধ্যে এমন লড়াই-হিস্যৎ।

—কিন্তু তোমরা না এলে আজ আমি জীবনটা ঘুচিয়ে দিতাম।

—সে কি রে?

—হ্যা তো! কত আর পারবো?

—পারতে হবে গৈরী। জীবনের এখন অনেক বাকী।

—আর কি আমার লেখাপড়া হবে?

—কেন হবে না?

—শরীরের এই অবস্থা নিয়ে কি করে ছুঁলে যাবো?

—সিঁথিতে সিঁদ্ধর নিয়ে।

—সিঁদ্ধর মুছে দিয়েছি। এখন আমি না লম্বা না কুমারী। আবার মিথবাও নই। এক পরিত্যক্তা নারী। এই আমার বর্তমানের পরিচয়। অথচ গর্ভে-জন্মান।

গৈরী এখন যে বিন্দুতে অবস্থান করছে তার নির্ণয় সে করে ফেলেছে। অনন্ত নিজেও এতটা ভাবেনি। সত্যি তো! বৃকের মধ্যে কত সাহস থাকলে কোনো মেয়ে এমন অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

গৈরী আবার বলল—তোমার উপর বিশ্বাস রেখেই আমি এত কাণ্ড করেছি। এবার তুমি যা ভালো বোঝ তাই কর। আমি আর ভাবতে পারছি না।

অনন্তর মনে হলো এই মুহূর্তে ওকে বৃকে চেপে ধরে বলে—তুই আর আমি অভিন্ন।

বলল—তুই কিছু ভাবিসনে গৈরী, আমি তোকে সিঁহুর দেবো।

গৈরী ওর দিকে তাকাল। চোখের তারা ছুটি টলটল করছে। পাতা ছুটি ভিজে গেছে। বলল—সিঁহুর দেবে? তার মানে বোঝ তো?

—কি?

—আমি তোমার ধর্মপত্নী হয়ে যাবো।

—তাই তো। তুই-ই তো আমার ধর্মপত্নী। আমি কি ছেলেখেলা করছি নাকি?

—তারপর? তোমার জাতকুটুমে আমাকে নেবে?

—না। তা নেবে না।

—তবে?

—তবে আর কি? জাতকুটুম ছেড়ে দেবো। তুই আর আমি আলাদা সংসার পাতবো। গৈরী চূপ করে রইল। অনন্তর কথাগুলো কিরকম যেন স্বপ্নের মতো মনে হলো। স্বপ্নের কোরকে মোড়া রইল ভীষণ আশঙ্কা।

ডায়েরী লিখিয়ে ফিরতে অনন্ত ও গৈরীর চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। দুজনের কানে বাজল দামোদরের ডাক। তারপর সে চলে গেল বাপের সঙ্গে। অনন্ত এল মেসে। স্মৃতিবাবুর ঘরেই ঢুকল। উনি তখন খাটে বসে জুতো খুলছেন। মুখটাও থম্‌থম্‌ করছে।

বললেন—গৈরী প্রেগন্ট। তা জানিস?

—হ্যাঁ।

—এতটা বাড়াবাড়ি করা উচিত হয়েছে তোর?

—সে জ্ঞান ছিল না দাদা। প্রথম দর্শন থেকেই দুর্নিবার আকর্ষণে পরস্পরের দিকে এগিয়ে গেছি। তারপর যা হয়েছে সবই প্রকৃতির ব্যাপার।

—কিন্তু এরপর কি করবি?

—ওকে নিয়ে সংসার করবো?

ওরে এ আবেগ থাকবে না। বাস্তবের আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

—তার মোকাবিলা করবো দাদা। আজ আর শরৎচন্দ্রের সমাজ নেই। শিল্প-সভ্যতার যুগে বাস করছি। কি মূল্য জাত সমাজের?

—তোর মা একথা গুনলে সহ করতে পারবেন?

—তা হয়তো পারবেন না। কিন্তু আমার বাবার আত্মা শান্তি পাবেন। তিনি সারাজীবন অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। আমি আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলাম। ছোটলোকের মেয়েকে ভোগ করলে জাত যায় না দাদা বিয়ে করলেই জাত যায়। এ ভণ্ডামি আমি সহ্য করবো না।

—তোমার কথা শুনে ভালো লাগল। যা নান করগে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

শ্রাবণের ভরা দামোদর উন্নত উদ্দাম। প্রচণ্ড বেগে বয়ে চলেছে।

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্—অবিরত এক শব্দ তরঙ্গ যেন লক্ষ ডম্বরুর আবহ সঙ্গীত। মেঘ ঝুলে পড়েছে পাহাড়ের কোলে। দামোদরের গুপারে বিলীয়মান দিক চক্রবাল। ঘোর অন্ধকারে উন্নত দামোদরের গেরুয়া জলরাশিতে উথাল-পাথাল চেউ মাঝে মাঝে আকাশ চেরা বিদ্যুৎ প্রভা। সেই বিপুল কোলাহলময় জল কল্লোল, ঘোর রজনীর তামস ভ্রুকুটির সামনে দাঁড়ালে ভয়ে বৃকের রক্ত হিম হয়ে যায়। অথচ প্রেমিক মনের কি আশ্চর্য লগণ ঘটন—তারই প্রেক্ষাপটে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত গৈরী।

তাদের পিছনে লক্ষ জোনাকী জ্বালা শিমুল গাছ। সম্মুখে দামোদর। রাত ভয়ঙ্কর।

অনন্ত সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে মেটে সিঁহুরের খান, রূপোর টাকা, ফুলের মালা, লোহা, শাঁখা একগোছা চুড়ি। সেগুলি একে একে পরিয়ে দিলো গৈরীকে বলল—গৈরী! তুই আমার ধর্মপত্নী। তোমার মাথায় সিঁহুর পরিয়ে দিলাম। তার সাক্ষী রইল—অনার্থ দামোদর, ঘোর অন্ধকার রাত, বিদ্যুতের বলক। বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যেই না মহতের সৃষ্টি। তুই আমার আধার মানিকরে। আয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

দামোদরের দিকে মুখ করে হাঁটুতে ভর দিয়ে পাশাপাশি বসে প্রার্থনা করল—
হে জ্যোতির্ময় ঈশ্বর আমাদের প্রেমকে সার্থক কর।

ঝর ঝর বৃষ্টিপাতে ঝরে পড়ল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। প্রেম শাস্ত সত্যের প্রভায় রচনা করল স্থায়ী মুহূর্ত।

উনত্রিশ

গৈরী স্বপ্ন দেখছে। চাঁদের মতো ছেলে হয়েছে ওর। দামাল শিশু। হামা টেনে বেড়ায়। খলবল করে হাসে। সত্ত্ব ওঠা ছুটি দাঁত ঝিক ঝিক করে।

তাকে বৃকে নিয়ে স্টেশনের বেঞ্চে বসে আছে। অনন্ত হৃথের ক্লান্ত ঝুলেছে। একদিকে বাকসো বেডিং। ট্রেনটা ছইসল দিয়ে প্লাটফরমে ঢুকল।

কোথায় যাবে ওরা?

ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখল ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আলো ঘরে ঢুকছে। ছোট বোন দুটি ঘুমে নেতিয়ে আছে। ভাই দুটি নতন চালাতে শুয়ে। বিটির দ্বিরাগমনের প্রস্তুতি পর্বে যা বানিয়েছিল তা কাজে লেগে যাচ্ছে। এখন গৈরীর হাত পা ছড়িয়ে শোবার অনেক জায়গা। যদি কোনোদিন অনন্ত এসে পড়ে। আঃ। কতই না ভালো হয়।

ধ্যোৎ ! কি যা তা ভাবছে ? সে কি কুলিকাবাড়ি নাকি যে হুনিয়া ধাওড়াতে আসবে ? সে সাহেব হবে।

হাসি পাচ্ছে ওর। পেটটা চিক্ চিক্ করছে। নাভির নীচে এক সারি চামড়া ফাটার দাগ উঠেছে। এই নাকি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণ।

উঠে পড়ল। দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুর দেবতার ছবিকে প্রণাম করল। আয়নাতে মুখ দেখল। বৃকের উপর ফুটে থাকা জোড়া কদমের ফুল দেখল। বোটা দুটো কলো হয়েছে। টিপে দেখল রস বেরুচ্ছে।

এঃ মা ! হুধ জমে গেছে।

মাতৃত্বের পরম গৌরব। রমণী জননী না হলে এই ভাবের উদ্দীপণ হয় না। পয়োধর পয়ঃস্বিনী হয় না। আর তার সৌন্দর্যও এমন রমণীয় হয় না। পরমা প্রকৃতির প্রসন্ন বিভায় তার মুখ ঝলমল করে উঠল।

আস্থক না ঝড়-ঝাপটা। হিম্মৎসে মোকাবিলা করবে।

গোমস্তাবাবুর বুক জোড়া আক্রোশ। রাগে অষ্টাঙ্গ জ্বলছে। তিনদিন পার হয়ে গেল তবু তার হুকুম তামিল হলো না। খাদের লোকজন বিধি ব্যবস্থা করে বেলা সাড়ে নটা নাগাদ একদিককার উরু অনাবৃত করা ধূতির কোঁচা ধরে নাগরা জুতোর মচ মচ শব্দ তুলে বাসায় ফিরছিলেন।

তখন চব্বতরায় বসেছিল প্রেতাশ্বার মতো দুটি মাল মনিলাল ও বাঁকেলাল। কক্ষ, কর্কশ। চোখ মুখ বসে গেছে। সারা মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথার উপর রুক্ষ চুলের বোঝা। দমভরে গাঁজা টেনেছে তাই চোখ লাল। সেই থেকে এখানে পড়ে আছে স্নানও নেই ঘুমও নেই। মাথার তিতর অযুত পিপীলিকার বিষ-দংশন অমন সূন্দর বউ বে-হাত হয়ে গেল।

কি করে তাকে নিয়ে যাবো ? না হয় বদলা নেবো। কত কী ভেবেছে। কোনো ভাবনাতেই কুলে এসে তরী ভেড়েনি। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া—
উঃ শালা গুলু—তুই এত বেইমান ! তুর বিটি এমন রাগী !

গোমস্তাবাবু কাছে আসতেই জোড় হাত করে দাঁড়াল—গোড়লাগি বাবা !

উনি রাগে ফেটে পড়লেন—আ গয়া শালা চুহাড়কা বাচ্চা !

—মোর ক্যা কসুর বাবুজী ? মনিলাল হাত জোড় করে কাঁপছে।

—তোর বহু হরদম রাস্তা পর ঘুরে ফিরে। যাও—খিঁচকে লে-যাও। যাও।

অত সাহস ওদের নেই। রাস্তা থেকে মেয়ে লোপাট করতে যেসব আয়োজন, উপকরণ ও অর্থবলের প্রয়োজন তা ওরা কোথায় পাবে? ওরাও তো মেহনতী শ্রমিক। ঘর গুপ্তি কয়লা গাদায় পড়ে থেকে কাজ করে বলেই খেতে পায়। ন্যূনতম সাধ আহ্লাদ ছেলের বিয়ে দিয়েছে। এবার দ্বিরাগমনে বউ আনবে। তার জন্ম নায্য টাকা দিয়েছে। তবু যদি বউ বলে—যাব নাই তবে সেটা কি কম দাগা হলো?

ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

গোমস্তাবাবু একজন লোক পাঠালেন গুলুকে ডাকতে। সে লোকটা ফিরে এসে বলল—উ এল নাই বাবু।

—এল নাই? এত সাহস। ফির যাও। ছটু লটুকে লিয়ে যাও। না আসে তো বেঙ্কে লে আও।

ছটু লটু নাম করা পালোয়ান। ইয়া লাহাঙ্গা জোয়ান। টাঙ্গির মতো গোঁফ। একবার চোখ ঘোরালে বৃকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সন্তিপ্রসাদের ডান হাত বাঁ হাত। ওদেরকে দিয়ে কত যে লেবারের হাড় ভেঙে মূর্দা বানিয়ে দিয়েছেন তার সংখ্যা নেই। হাতির মতো মস্তিতে ওরা গেল আর পুঁটি মাছের মতো গুলুকে ধরে নিয়ে এল?

এগুলো হর হামেশার ঘটনা। নতুনত্ব কিছু নেই। রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। লোকজন দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে? ফ্যা ফ্যা করে হাসে।

কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল একটি ব্যতিক্রমী চিত্র।

গলাফাটা চিংকার ও গালি দিতে দিতে হাতা খুস্তি, বাঁটি, কাটারী নিয়ে একপাল নানা বয়সের মেয়ে ছুটে আসছে হুনিয়া ধাওড়া থেকে। তাদের পুরো ভাগে গৈরী।

সাইডিয়ে যে হুনিয়ারা ওয়াগন লোড করছিল তারা ছুটে এল কাঁটা বেলচা হাতে। তাদের সামনে জগদীশ, হরেরাম।

উপর ধাওড়া দিক থেকে ছুটে এল একদল লেবার। তাদের সামনে রামধনি। আর একদল পাঞ্জাবী, বিহারী, লেবার নিয়ে ছুটে এল গুলু নাম সিং। লোক বাড়তেই লাগল কাঁড়া ধাওড়, হুনিয়া বাউরী পাড়ার ছোকরারা, জামজুড়ির মাঝিরা। দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। সবারই মুখে উত্তেজনা।

জগদীশ ও হরেরাম ঝাঁপিয়ে পড়ল ছটু ও লটুর উপর। বিরাট লাশ নিয়ে ওরা যখন একবার পাশ ফেরে এদের হাতের কাঁটা বেলচা ততক্ষণে ওদের ঘাড় চোট বসিয়ে দেয়। দুজন দু'দিকে ছিটকে পড়ল। ছাড়া পেয়ে গুলুও সরে পড়ল।

লোকজন দেখে সন্তিপ্রসাদ ঘাবড়ে গেছেন। রাগে, অপমানে টকটকে পরিষ্কার মুখটা লাল হয়ে গেছে।

কি রকম জড়িত কর্তে বললেন—তু লোক কোনে এসেছিস?

জবাব দিলো গৈরী—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এই জুলুমের রাজ বন্ধ করবেন কি না ?

—আমি কি জুলুম করেছি ?

—জুলুম নয় ? কেন ধরে এনেছেন আমার বাপুকে ? উয়াকে ধোলাই করে আমাকে শস্তুর ঘর পাঠাবার কথা কবুল করতে ? কত বড় কোর্টের হাকিম আপনি যে বিচার করে রায় দিয়েছেন। আমি আপনার রায় মানি না। গরীব মুখা লেবার দিকে চুষে চুষে বহুত বাড় বেড়ে গেইছে।

কে একজন বলল—সুদ খেঞ্জে খেঞ্জে বেটা মোটা হঞ্জে গেইছে।

আরেকজন বলল—বেবাক চর্বি ধস্কাঞ্জে দাওহে।

একজন পাঞ্জাবী বলল—সাড়ে কো চুক্ হুঁ।

একজন বিহারী বলল—ইয়ে শালা উঁবড়ীবালা পাহালমান দোনোকে হাবিস কর দেও। খাদানমে গিরা দেও। তব ইন্কা গরম টুটেগা। আরেকজন ঠেকা দিলো—ইয়ে দো বেগানা কুস্তা বহ লেনে আয়া। দামুন্দরমে ভাসা দেও।

একজন বাঙালি ছোকরা বলল—মড়ার মতো ভাসতে ভাসতে চলে যাক। ওদের কলিয়ারীতে পৌঁছে যাবে।

নানা মুখে নানা ভাষায় নানা খিস্তি খেউড় সহ এমন সব বাক্য তাঁর উপর বর্ষিত হচ্ছে যে রাগ, দুঃখ, অপমানকে অতিক্রম করে এই বুঝি তাঁর প্রথম বোধোদয় হলো যে শ্রমিকদিকে এতদিন ধরে যত শোষণ করে এসেছেন তার প্রতিফল শুরু হলো।

বললেন—আমি তোমাদিকে দেশ থেকে নিয়ে এসে কলিয়ারীতে চাকরি দিয়েছি। আর আমাকেই বেইজ্জত করছো।

আবার গৈরীর উত্তর—চাকরি আপনি মেহেরবানী করে নাই দেন গোমস্তাবাবু।

লোক এনেছেন কমিশন পেঞ্জেছেন। সুদের দায়ে বন্ধক রেখেছেন। একজন ঠেকা দিলো—হু তরকা কমিশন। লেবারের কাছে, কুস্পানীর কাছে। আরেকজন বলল—বিশ টাকা উধার দিয়ে ঘরগুটিকে কিনে নিয়েছে ? সারা জীবন টাকা দিয়েও উত্তল হয় নাই। বাপের দেনা বেটাতে শোধ করছে। বাঙালি ছোকরা বলল—ফাটকবাজারে দোকান ফাঁদ এড়েছে। শালা উয়ার দোকানে মাল লিতেই হবেক। আর উ ডবল দাম লিবেক। তার উপরে সুদ জুডবেক। কি শালা ঘুঘুরে।

একজন যাত্রার আসরে অভিনয় করার ভঙ্গীতে বলল—লেবার দিকে চোর বেনাঞ্জেছো, মাতাল বেনাঞ্জেছো, বউ-বিটিকিকে রাগী কসবি করেছো। তবু শালা তোমার সাধ মিটে নাই ? গৈরীর দিকে নজর। কি মনে করছো—উয়াকে শস্তুরবাড়ীর নাম করে ব্যবসা করবে ? আমরা তা হতে দিব নাই।

গুরুনাম বলল—সাড়ে কো টেংরি উতাড় লুঁ ।

বহু চিৎকার, চেষ্টামেচি, শ্লেষ, বিদ্রূপ, কটুক্তির মধ্যে দু চারটি নমুনা । জনতার মুখ একবার খুলে গেলে সে একেবারে জোড়ের বানের মতো খরশ্রোতে বহিতে থাকবে । তোড় সামলানো দায় । কে কবে তার কাছে লাক্ষিত হয়েছে, কার টাকা কেড়ে নিয়েছেন, কার মেয়ে কেড়ে নিয়েছেন, কাকে জুতো পেটা, কাকে লাঠি পেটা, কাকে খাবার বন্ধ, কাকে জীবনেই শেষ করে দেবার হুকুম দিয়েছেন তার উল্লেখ করে আপন আপন গায়ের ঝাল ঝেড়ে দিচ্ছে । কেউ কেউ এমন গালও দিচ্ছে যার অর্থ তাঁর মা বোন ও মেয়েকে প্রকাশ্য ধর্ষণ বোঝায় ।

সভিপ্রসাদ একেবারে চুপ । একটা কথা বললে দশটা গাল ভেসে আসছে । কার মুখে হাত দেবেন ? সবাই ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ।

গুলু হুনিয়া এতবড় মরদ ! গৈরী এতবড় হিরোইন !

তাদের জ্ঞান এতবড় অপমান সহিতে হচ্ছে । মনটা বিধিয়ে গেল । মনিলালকে বললেন—তোমরা যাও । আর এদিকে এসো না ।

লেবাররা হৈ হৈ করে উঠল—ভাগাও শালা লোগকা ।

কিছু লোক ওদেরকে তেড়ে নিয়ে গেল । দু-চার ডাঙা মারও পড়ল । মংগু সরদার ওদেরকে রক্ষা করে নিয়ে গেল ।

পরব শেষ । লেবাররা সব প্লোগান দিতে দিতে গেল—

—জুলুমকা রাজ খতম করো ।

—হারাম খোরকো হালাল করো ।

ত্রিশ

হঠাৎ এজেন্ট বদল হয়ে গেলেন ।

এবার যিনি এলেন তাঁর নাম মিঃ ড্যানিয়েল 'শ । দো-আঁশলা মাল । মিঃ ব্যারাকলউয়ের বাস্টার্ড সান । গুঁর মা পানমোহরায় মিঃ ব্যারাকলউয়ের রক্ষিতা ছিলেন । ছেলেটি তখন রাঁচি মিশনারী স্কুলে পড়ত । পানমোহরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় গুঁর মাকে ভীষণ নির্ধাতন করা হয়েছিল । উনি দামোদরে ঝাঁপ দিয়ে মরেছিলেন ।

তাতে অবশ্য ছেলেটির লেখাপড়ার কোনো ক্ষতি হয়নি । পাত্রী সাহেবরা দেখতেন । তারপরে তো মিঃ ব্যারাকলউ এক লাখ টাকার একটা ফাণ্ড তৈরি করে একটা মিশনারী সম্প্রদায়কে ট্রাস্টি নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন । তাঁর আশ্রিতাদের একটি তালিকা দিয়ে এসব মেয়েদের ছেলেমেয়েরা যাতে যতদূর খুশী লেখাপড়া শিখতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন ।

তারই দৌলতে মিঃ 'শ ফার্স্ট ক্লাস কলিয়ারী ম্যানেজার । বুদ্ধিমান ছাত্র

ছিলেন। মাইনিং পড়েছেন গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে। বিয়ে করেছেন একজন আর্মেনিয়ান লেডীকে। ছেলেমেয়ে দুটি।

দামোদর কোল কোম্পানীতে দশ বছর যাবৎ চাকরী করছেন বড় বড় পোস্টে। আন্ডারচক কলিয়ারীতে এজেন্ট ছিলেন। কাজে-কর্মে তুখোড়। পুরো ইউরোপীয়ান স্টাইলে থাকেন।

দান্‌লিয়া কলিয়ারীতে এসে তাঁকে পড়তে হলো শ্রমিক অশান্তির মুখে। রেশন আন্দোলন নিয়ে রোজ কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। ধাওড়ায় ধাওড়ায় ইউনিয়নের লোক ঘুরছে। তারা পিকেটিং করছে। রেশন নিতে দিচ্ছে না। ইচ্ছা থাকলেও অনেকে আনতে পারছে না। দু-একটা মারপিট হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা চীফদের টেবিল পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে।

তখন কোম্পানীর চীফ পার্দোয়াল ম্যানেজার ছিলেন একজন জবরদস্ত মাহেব। ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। তিনি যখন পুলিশ সুপার ছিলেন একাধিকবার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মিছিলে গুলি চালাবার হুকুম দিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর সরকারি চাকরীতে অবসর নিয়ে ব্রিটিশ ফার্মে বৃহৎ শ্রম-বিভাগের মাথার মণি হয়ে বসেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা কে জানে কিন্তু তিনি চাইলেন এসব ঝামেলা যেন মিটিয়ে নেওয়া হয়। শ্রমিক অশান্তি যেন বাড়তে না পায়।

নীতিগত কারণেই তিনি ঝামেলা মিটিয়ে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমত এই বৎসরটা চলছে কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি। বছর শেষ হলে তিনিও চলে যাবেন অবসর নিয়ে? নিজের দেশে সাসেক্সে কটেজ কিনেছেন। লয়েড ব্যাঙ্ক টাকা জমিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা সেখানেই ব্যবসা ফেঁদেছেন। এবার মিসেসকে নিয়ে বাকী জীবনটা হোলী বাইবেল পাঠ করে আর অমৃতপুরুষ যীশু খৃস্টের ভজনা করে কাটাবেন। পাপের তো কম সঙ্কল্প হয়নি। তাঁর যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ যথা হত্যা, লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি তো মানবিক বিচারেও পাপ। তাই চার্চে কিছুদিন স্বীকারোক্তি দেবেন।

দ্বিতীয়ত : একদা কয়লা কুঠিতে কুলিকামিন অন্বেষণ করে এনে বহাল করতে হতো। সে কাজের কাজী ছিলেন গোমস্তা।

যুগের কি পরিবর্তন! আজ সেই শ্রমিক দিকে ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্ত। সে কাজেও গোমস্তা।

এটাও কোম্পানীর নীতি। ট্রেড ইউনিয়নের শাখা প্রশাখা সব কলিয়ারীতে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিক আন্দোলন রক্তক্ষয়ী হয়ে পড়লে তার হ্রাপা যে কত তাঁর অভিজ্ঞতা আছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে।

তাছাড়া পার্লামেন্ট থেকে খনি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত ট্রাইবুন্সাল বসাবার

হকুম বেরিয়েছে। নেহেরুজী নিজে বলেছেন আমাদের দেশে খনি শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ নেই। তার অবসান প্রয়োজন।

কাজেই দেশের সরকার যদি মদৎ করেন তাহলে মালিক, ম্যানেজাররা ক'দিন ঠেকিয়ে রাখবেন? জোয়ার আসছে। প্রথম ট্রাইবুণালের রায় ঘোষণার জগ্নই অপেক্ষা।

কয়লা কুঠির শ্রমিক আন্দোলনের এই তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাদের কোম্পানীর নীতি ছিল ধামা চাপা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে যতদিন চলে। তারপর এসপার ওসপার।

এই সময় ঘটে গেল আরো একটি ঘটনা।

গোরখপুরী শ্রমিকদের জগ্ন আলাদা ব্যবস্থা। তাদের রেশন নিয়মিত ভাবেই আসত! ওদের ক্যাম্পেই সাপ্লাই হতো। সাহেব স্ত্রী, বিশিষ্ট বাবু সম্প্রদায় ক্যাম্পের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ করত তাঁদের নিজেদের জগ্ন উৎকৃষ্ট মানের রেশন আনা করিয়ে নিতেন।

একদল শ্রমিক সেই রেশনের ট্রাক লুট করে দিলো। মাত্র জন দশ বারো ছোকরা রাস্তার উপর ট্রাকটাকে দাঁড় করিয়ে চাল, ডাল, গম শ্রমিকদিকে বিলি করে দিলো। অত যে বড় বড় পালোয়ান নিত্যদিন উজন উজন রুটি সঁটিছে আর ডন বৈঠক করছে তাদের হিম্মত কুলোল না মোকাবিলা করার।

ফলত আবার পুলিশ দারোগা। কিছু নির্দোষ শ্রমিক গ্রেপ্তার এবং অনন্তর ছোটোছোটো কোর্ট কাছারিতে হাজির জামিন করানোর জগ্ন। এই বিশেষ কাজটিতে ওর অভিজ্ঞতা বাড়ছে।

পর পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল। দু'বার পুলিশ কেস হলো। কম পক্ষে দশবার মিটিং মিছিল হলো। প্রত্যেকবার মিটিংয়ে লোকসংখ্যা বাড়ছে। রেশন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে অস্ত্রাস্ত্র কলিয়ারীতেও। কোথাও এক সপ্তাহ কোথাও দু' সপ্তাহ করে রেশন বন্ধ আছে।

ইউনিয়ন হুমকি দিয়েছে অবিলম্বে যদি এর ফয়সালা না হয় তাহলে ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হবে।

অতঃপর প্রত্যেক কলিয়ারীতে একটা করে ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তাব এল কোম্পানীর তরফ থেকে। ইউনিয়ন তা গ্রহণ করল।

মিটিং শুরু হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই স্ত্রীমিতবাবু ছত্রিশ দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি পেস করলেন যার কপি আগেই দেওয়া হয়েছে। যার প্রথম দফা রেশন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে অস্বরূপ পরিমাণের রেশনের যে বাজার মূল্য হয় তাই নগদ দিতে হবে।

হেড অফিস থেকে একজন সাহেব এসেছিলেন। তিনি নিজেকে শ্রমিকদের সমাজতন্ত্র ও মনস্তন্ত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনে করেন। বললেন—রেশন বাবস্থা তুলে দিলে আমাদের অনেক হাপা কমে যায়। এঞ্জল একটা পুরো এসটার্লিশমেন্ট চালু রাখতে হয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে শ্রমিকদের নূনতম খাণ্ড যদি রেশনে না দেওয়া হয় তাহলে ঐ টাকা দিয়ে তারা বাজারে খাণ্ডদ্রব্য প্রয়োজন মতো কিনবে না। মদ দোকানে চলে যাবে।

ইউনিয়নের একজন সদস্য বললেন—আপনারা যে চাল দেন তাও তো মদ দোকানে চলে যায়। দেখছেন না যেদিন থেকে রেশন বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে খেনো মদের দোকানগুলোর নাভিস্বাস উঠছে। ওরা এবার ঝাঁপ বন্ধ করলে বাঁচে।

স্বমিতবাবু বললেন—ওসব কথা ছাড়ুন। কনিয়ারী শ্রমিক যে পয়সা পেলেই মদ দোকানে দৌড়বে এ ধারণা আপনার কি করে হলো?

—আমার অভিজ্ঞতায়।

—অভিজ্ঞতাটা আরেকবার ঝালাই করুন। আসলে পরিবেশ মানুষকে ঐ রকম করে ফেলে। ভালো পরিবেশ ও ভালো বন্ধু-বান্ধব পেলে শ্রমিকদের ভাবী প্রজন্ম এসব নেশা ভাঙ, নোংরামি থেকে দূরে থাকবে তা হৃদয় করে বলতে পারি।

—আপনি একটা উদাহরণ আমার কাছে এনে দিন।

—একটি তো নিশ্চয় পাবেন। দশ বারোটি এমন ছেলেমেয়ে এনে দিতে পারি যারা একদা বিড়ি খেত, মদ খেত, নোংরামি করত তারা এখন সব ছেড়ে মন দিয়ে পড়াশুনা করছে।

মিঃ 'শ এজেন্ট বললেন—ওগুলো কোনো ইস্যু নয়। আজ যদি বাজারে কাটকাবাজী হয় তাহলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম চড়ে যাবে। কুলিকামিনরা খেতে পাবে না। কাজ করবে কি করে?

—ঐ পচাধসা চাল, গম, জোয়ার, বাজরা খেয়ে তো ওলাউঠায় মরে যাবে।

ডি. সি. সাহেব বললেন—কে বলে পচাধসা?

আমরা বলি নমুনা পরীক্ষা করতে পারেন। ওসব অখাণ্ড খেয়ে আমরা সবাই পেটের অস্থখে ভুগছি।

—তাহলে তোমরা কাজ কর না। একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির পাকস্থলী আগুনের মতো জ্বলে। খাবার পেটে গেলেই ভস্ম।

—আপনি এ ব্যাপারে একটা থিসিস লিখে ফেলুন।

—ঠাট্টা কোর না স্বমিত। এটা মিষ্টি।

—তাই আপনি শ্রমিকদিকে মাতাল বলছেন, প্রকারান্তরে ফাঁকিবাজ বলছেন।

ম্যানেজার বললেন—কথাটা মিথ্যা নয় স্মৃতিবাবু। আপনাকে ভেস্টিলেশন অফিসারের কাজ দেওয়া হয়েছে। আপনি তা না করে ট্রেনিদিগকে দিয়ে করিয়ে নেন। কাল থেকে খাদে ওভারম্যানের কাজ করবেন। দেখবো কত কাজের লোক।

—ঠিক আছে! তাই হবে। কিন্তু আমরা কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি যেজ্ঞ ডেকেছেন তার ফয়সালা করুন।

সেই নিয়ে বহু ধানাই-পানাই, টালবাহানা। হেড কোয়ার্টারে বারবার টেলিফোন। অবশেষে স্থির হলো রেশন ব্যবস্থা আপাতত চালু থাকবে। যাতে পচাধসা মাল না দেওয়া হয় তা দেখবার জ্ঞ একজন ইউনিয়নের সদস্য থাকতে পারে। পরবর্তী মিটিং হবে হেড কোয়ার্টারে মিঃ ভার্মা ডেপুটি পারসন্স ম্যানেজারের অফিসে। সেদিন স্থির হবে রেশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়া যাবে কি না? এখন শুধু স্টাটাস কো মেইনটেইন করা হোক।

মিটিংস তৈরি হলো। সহি সাবুদও হলো। ইহাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

মিঃ শ এজেন্ট হয়ে আসাতে সবচেয়ে খুশী হয়েছেন ডি. সি. ও ডি. ডি.। কারণ উনি বারমান সাহেবের ভাবশিষ্ট। অর্থকরী ব্যাপারে বিশেষ পটু। নারীঘটিত ব্যাপারেও এলেমদার আদমী।

তাঁর চার্জ নেবার দু'দিনের মধ্যে এই মিটিং। কলিয়ারীর সব কিছু হাল হকিকত এখনো তিনি পাননি। তবে ভূত বাংলোর খবর ঠিকই রাখেন। সেই সব মক্ষিরানীরা এখন কে কোথায় আছে তারও খবর সংগ্রহ করছেন।

লাঞ্চার পর মিটিং শুরু হয়েছিল চায়ের সময় পার হয়ে গেল। এখন শ্রাবণের আকাশে সন্ধ্যা নেমেছে। মিটিংয়ের পর নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা। তার পরই তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—চলুন। মিসেস ডি. ডি.-র সঙ্গে আলাপ করে আসি।

এই প্রস্তাবের পিছনে ডি. সি.-র একটু ফুস্ মস্তুর আছে। তিনিই তাঁকে ভূত বাংলা এবং বিউটির কথা বলেছেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন ডি. ডি. সাহেবের বাংলায়।

উনি সবেমাত্র কলিয়ারী থেকে ফিরেছেন। তখনো হাফ প্যান্ট ছাড়েননি। এজেন্টের গাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তবে তাঁর প্রভুভক্ত প্রাণ। বিনয় গদ গদভাবে আপায়ন করে নিয়ে এলেন। তাঁর মধ্যবিত্ত ড্রয়িংরুমের সবচেয়ে ভালো চেয়ারটিতে বসতে দিলেন। উনি বসতে বসতে বললেন, আপনারাও বসুন।

ওঁরা দু'জনে দুটি চেয়ারে বসার পর বললেন—আমাদের কোম্পানীতে ডি. ডি. ও ডি. সি.-র নাম একটা কিংবদন্তীর মতো। ম্যানেজার থেকে ডাইরেক্টর.

পর্যন্ত প্রত্যেকে আপনাদের প্রশংসা করেন। তাই আমার ইচ্ছা ডিউটিজ অ্যাণ্ড রেসপনসিবিলিটিজের শুকনো ফরম্যালিটিজের ওপরে একটু অন্তরঙ্গ ও ঘরোয়া সম্পর্ক গড়ে তুলি।

ডি. ডি., ডি. সি. দুজনে একবাক্যে বললেন—আপনি মহাহুভব।

ওঁকে দেখেই বিডিটির মনটা তিতো হয়ে গিয়েছিল। তথাপি একটু ড্রেস পেণ্ট করে আসতে হলো। হাসি মুখে নমস্কার করল।

ডি. সি. পরিচয় করিয়ে দিলেন—মাই ওয়াইফ!

—ভেরী গ্লাড টু মিট ইউ মিসেস ডি. ডি. ! উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন।

বিডিটি কিন্তু হ্যাণ্ড শেক করতে হাত বাড়াল না। পাশ কাটিয়ে গিয়ে—বলল, আমাদের কি সৌভাগ্য যে এত বড় একটা জাঁদরেল সাহেব এই গরীব খানায় এসেছেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য দেখুন আপনাকে যে বসতে দেবো তার মতো একটা ভালো চেয়ারও নেই।

—ওঃ নো নো। আপনি দয়া করে কিছু ফিল করবেন না। আমি খাদের মাল্লুখ এই ঠিক আছি।

বিডিটি মুচকি হেসে চলে গেল। খানিক পর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস ট্রেতে সাজিয়ে নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। তিনটি গ্লাসে ঢেলে দিলো।

মিঃ 'শ বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ মিসেস ডি. ডি.। এই জগুই মিঃ বারমান আপনার এত প্রশংসা করতেন। আমি জাটু ডি. কোলিয়ারীতে যখন ম্যানেজার ছিলাম উনি তখন এজেন্ট। জিনিয়াম মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার।

ডি. ডি., ডি. সি. দুজনেই তাঁর রূপাধু পুরুষ। এমনভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে বাউ করলেন যেন গডফাদার। বললেন, উনিই আমাদের নতুন জীবন দিয়ে গেছেন।

বারমান সাহেবের কথায় ওঁরা মশগুল হয়ে গেলেন। এই শ্রেণীর লোকদেরও শ্রদ্ধা ভক্তি করার লোক থাকে।

—ডি. সি. বললেন—তুমি এক গ্লাস নিলে না কেন বিউ ?

—না আমার ভালো লাগে না।

মিঃ 'শ বললেন নিন না—তাহলে আড্ডা জমবে ভালো।

প্লিজ ! আমাকে মাফ করুন।

কথায় কথায় ওঁদের আলোচনা অল্প দিকে মোড় নিলে।

মিঃ 'শ বললেন—কলিয়ারীতে এই শ্রমিক আন্দোলনের উৎস কোথায় ?

—উৎস ইউনিয়ন।

—ঠিক ! কিন্তু তাদের ব্রেন সাবস্টেন্সের ঠিকানা কি ? অর্থাৎ কোনো কিছু করার আগে পরিকল্পনা ও কৌশল ঠিক করা। সিদ্ধান্ত নেওয়া ও কাজ করার জগু তো বুদ্ধির দরকার। সেগুলো কোথা থেকে আসে ?

—অগ্রদূত মেস থেকে ।

—হতেই পারে । ইয়ং অ্যাণ্ড ইনটেলিজেন্ট ছোকরারা থাকে । তাদের নেতৃত্ব কে দেয় ?

ডি. সি. বললেন, স্মিত চ্যাটার্জীকে তো দেখলেন । সেই সেক্রেটারি । তাঁর পিছনে প্রায় সব ট্রেনিরাই আছে । তাদের মধ্যে আবার অনন্ত শর্মা ! ভেরী ডেন্জারাস বয় এবং ইনটেলিজেন্ট । পোয়েট বাই নেচার ।

—অ্যাণ্ড সো আইডিয়েলিস্টিক । হতেই পারে । ওকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলুন ।

অনন্ত'র প্রসঙ্গ উঠতেই বিউটি একটু চমকে উঠল । প্রসঙ্গ পান্টাবার জগ্ন বলল—আরেকটা নতুন বোতল খুলবো নাকি মিঃ 'শ ?

—নো থ্যাঙ্কস ! আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে । উঠতে হবে । পারম্পরিক বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশের পর উনি উঠলেন ।

বিউটি নিজেকেই প্রশ্ন করল—উনি কি জগ্ন এসেছিলেন ?

ভূত বাংলা গরম । চিকেন বিরিয়ানীর গন্ধে ভূর ভূর করছে । সেই সঙ্গে দামী হুইস্কির মধুগন্ধ ।

উর্দীপরা বেয়ারারা খুব ব্যস্ত । বড় হলঘরটায় রঙিন বাব জলছে । কি রকম মোহনীয় পরিবেশ । এক একটা টেবিল ঘিরে চারটি করে গদি আঁটা চেয়ার । অতিথিরা আরাম করে বসুন ।

দেশী, বিদেশী নানা ডিজাইনের সাহেব ও মেম সাহেব চেয়ার দখল করে বসে পড়েছেন । অর্কেস্ট্রায় মিহি সুর বাজছে ।

বিউটিকে আনবার জগ্ন মিঃ 'শ গাড়ি পাঠিয়েছিলেন । সেটা এসে গাড়ি বারান্দায় দাঁড়াতে যা দেরি । মিঃ 'শ ছুটে এলেন । নিজের হাতে খুলে হাতটা বাড়িয়ে বললেন—গুড ইভনিং মিসেস ডি. ডি. । ওয়েল কাম ।

—ধন্যবাদ ।

এসব কেতার সঙ্গে ও পরিচিত এবং পরিমিত হাসিতে অভ্যর্থনার জবাব দিতেও জানে ।

মুখের উপর হাসি প্রসাধন । চুলগুলোকে চূড়ো করে বেঁধেছে । পরনে ফিকে নীল রঙের শিক্কে শাড়ি । তাতেই সে মনোলোভা ।

একটা টেবিল আগে থেকেই সাজানো ছিল । সেখানে বসেছিলেন মিসেস 'শ ও তাঁর ছোট্ট মেয়েটি । মিঃ 'শ তাঁদের সঙ্গে বিউটির আলাপ করিয়ে দিলেন ।

মিসেস 'শ আর্মেনিয়ান লেডি । দয়া করে মিঃ 'শ'য়ের সংসার করেন । তাঁর নিজস্ব এন্টারপ্রাইজ আছে । বড় ব্যবসা চলছে আসানসোলে । এসব গুঁর বাপেই দিয়ে গেছেন ।

একজন ইয়ং হাণ্ডসাম বয়ফ্রেন্ড আছে । সপ্তাহে একদিন তাঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট-

মেন্ট থাকে। সেসব তথ্য মিঃ শ'য়ের অজ্ঞাত নয়। সংসার ধর্ম চালিয়ে যান পারম্পরিক বোঝাপড়ার উপরে। ছেলেমেয়েদের কাছে নিজেদেরকে ছোট করতে চান না বলেই।

বিউটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তাঁর প্রতি মিঃ শ'য়ের মনোযোগ দেখে তিনি যা মনে করলেন তার ইঙ্গিত কথাবার্তার মধ্যে ফুটে উঠল না। বরং বেশ সৌহার্দপূর্ণ বলা যেতে পারে।

বেয়ারা ড্রিঙ্কস্ নিয়ে এল। এ বস্তুটা যে অনিবার্যভাবেই এসে যাবে তা ও জানত। প্রত্যাখান করলে এমন পীড়াপীড়ি শুরু হবে যে সে এক আদিখ্যেতার দৃশ্য। কাজেই ও গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল—ধন্যবাদ।

মিঃ অ্যাণ্ড মিসেস 'শ তাঁদের মেয়ে সুইটি এবং বিউটি একটা টেবিলকে ঘিরে বসেছেন। মিসেস 'শ তাঁর মেয়েকে চামচে করে ছইস্কী দিচ্ছেন। আশ্বাদনটা এখন থেকেই জেনে রাখতে হবে তো। আর দু'বছর পর টিন এজ শুরু হবে। তারপর বয় ফ্রেণ্ড আসবে। তখন ?

নাচগানেরও ব্যবস্থা ছিল। একটা ক্যাবারে ড্যান্সার ভাড়া করে আনা হয়েছিল। চড়া সুরের অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সেও নেচে যাচ্ছিল। নির্দিষ্ট কোনো ড্যান্স ফ্লোর ছিল না। সেজগত হনসরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তার পরিক্রমা। অতিথিদের সঙ্গে করমর্দন। কেউ বা একটু বেশী সময় নিচ্ছিলেন। কেউ বা ওর অনাবৃত কোমরে হাত দিয়ে স্পর্শানুভূতি পাচ্ছিলেন।

বেশ যখন জমে উঠল। তখন সে বিবস্ত্র হতে শুরু করল। চেন দেওয়া শার্ট ও প্যান্ট। চর চর শব্দে খুলে ফেলল। চারিদিক থেকে হাততালি পড়ল।

অবশেষে কটিতে ঝালর দেওয়া একটি জাক্সিয়া ও স্তনের বোঁটাতুকু ঢাকা দেওয়া একটি ব্রেসিয়ার পরে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশী সঞ্চালন করতে করতে মুক্ত দেহের প্রদর্শনী খুলে দিলো।

সাহেবরা খুব খুশী। নেশাও জমে এসেছে। কেউ বা তাফে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। কেউ বা দেখেই আনন্দ পাচ্ছে।

সম্মে এসে বঁঝ পড়ল। নাচ শেষ।

মিঃ শ' ঘোষণা করলেন—এবার ডিনার পরিবেষণ হোক।

পাশের ঘরে ঢুকে ডিনার। অতিথিরা লাইন দিয়ে প্লেটে খাবার তুলে নিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে বসে খেতে শুরু করলেন।

বিউটি মিসেস শ'কে বলল—আপনাকে উঠতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি।

উনি ধন্যবাদ দিলেন।

একে একে তিনটি ডিশ এনে টেবিলে রাখল। খাওয়া শুরু হলো।

ডিনার পর্ব চোকার পর একে একে সব প্রস্থান করছেন। মিঃ শ' বিউটির

কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিসেস শ' ও তাঁর মেয়েকে আগে ডেসপ্যাচ করে দিলেন।
বিউটি একা। ডি. ডি. ও ডি. সি. অল্প চেয়ারে বসে মাল টানছেন। ওদের
ডিনারে তত রুচি নেই।

মিঃ শ' এসে ওর পাশে বসলেন। বললেন—মিসেস ডি. ডি. আপনি একটা
গ্লাস তো এখনো শেষ করেননি।

—মাই গড! আমি অনেক খেয়েছি না হয় আপনার মিসেসকে শুধাবেন।

—ওঃ। আমি সব দেখেছি। নিন আরেক গ্লাস।

—ডিনারের পরে?

—তাতে কি আছে? আমার অফারে এক গ্লাস খেতেই হবে।

অগত্যই নিতে হলো। তাতে যে ওর নেশা হবে না তা ও জানে। মিঃ শ'।
ওর পিঠের ওপর আলতোভাবে হাত রেখে বললেন, মিসেস ডি. ডি.! আপনি
সত্যিই বিউটিফুল।

—তাই বুঝি?

—সিওর। মিঃ বারমান আপনার কত যে প্রশংসা করতেন তা বলে শেষ
করা যাবে না।

—উনি আমাকে ভালোবাসতেন।

মিঃ শ' হুম্ব করে বলে বসলেন—আমি কি আপনাকে ভালোবাসতে পারি
না বিউটি?

বিউটি একটু থেমে কেটে কেটে বলল—ওটা খরচ হয়ে গেছে মিঃ শ'।
অল্পকে দিয়ে ফেলেছি।

—আই সী!

মিঃ শ' একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। তবে হতাশ হলেন না। এক চাক্সে
তো গোল হয় না। অনেক ড্রিবলিং, অনেক পাশ কাটিং করে ডিফেন্সে কাটল
ধরানোর পরই একটা শট নেওয়া হয় যা থেকে গোল পাওয়া যায়? মিঃ শ'য়ের
এই শটটা বেমক্লা হয়ে গেছে। বিউটির ভিতরে যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে
তাতে এখনো ফাটল ধরেনি।

বললেন—আশা করি আমরা বন্ধু হতে পারবো।

—ওঃ সিওর!

—থ্যান্ক ইউ বিউটি।

বিউটির ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল। বাক্সা :! কি আপদ।

কিন্তু এই এঁটোল চিমড় মাল কি অত সহজে রেহাই দেবে? সে যাইহোক
আজকার দিনটা তো বাঁচল।

একত্রিশ

গৈরীর এখন দিন কাটে তো রাত কাটে না। নিন্দা, বদনামের চূড়ান্ত হয়ে গেছে। বাইরে মুখ দেখানো দায়। যে সে টিটকিরী মারে। মায়ে কথা বলে না। বাপে ঘর বাস করে না। ছুঁবেলা খাবার সময় আসে। ডিউটি করে। বাকী সময় গাঁজায় দম দিয়ে পড়ে থাকে। বাপ মোহাগী বিটি বাপেরও আদর ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

ছোট ভাইদুটিও জেনে গেছে সব। তারাও বুঝতে শিখেছে। পাড়াপড়শীর মধ্যে বড় ভোজী বৈশাখী মাঝে মধ্যে আসে কথা বলে। ফাল্গুনী ওর সহেলী। তার বিয়লা পুরুষ আছে। তার গরবে ধর ধর। তবু যা হোক আসে। আর কার সঙ্গে বাক্যালাপ হয় না।

আগে সে গোটা পাড়া মাতিয়ে বেডাতো, সব ঘরেই অব্যাহত দ্বার ছিল, সবাই ওকে ভালোবাসত। সব যেন উন্টে গেছে।

অথচ ওরাই ওর জন্ম দাঙ্গা লড়েছিল, ভক্তিপ্রসাদের হাত থেকে গুলুকে ছাড়াবার জন্ম কাঁটা বেলচা নিয়ে হাজির হয়েছিল। আজ তারা কথা বলে না।

কেন ?

প্রশ্নটি তাকে পীড়া দেয়। এমন কি অপরাধ করেছে ? শুধু প্রেম ! তার জন্ম এত ?

দিনকয়েক ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও মানসিক যন্ত্রণায় কাটানোর পর সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠল একটা সংকল্প নিয়ে সে আবার স্কুলে যাবে। অনন্ত বলেছে— পড়াশোনা ছাড়িস না। ওর মতো জিনিস নেই। ওটা চালিয়ে যা !

হেনী সকালেই ভাত রাঁধত। গুলুর রাতপালি ডিউটি ছিল। বেলা আটটার পর ধাওড়ায় ফিরত। দেই রাঁধা ভাত হেনী খেয়ে ডিউটি যেত। গুলু এসে খেত। যেহেতু গৈরী ঘরেই থাকতো মেজন্ত দিনের রান্না, ভাইবোনদের খাওয়া-দাওয়া ও করাত।

সেদিন সকালে স্নান করে এসে বলল, মা। তুকে রাঁধতে হবেক নাই। আমি রেঁধে দিচ্ছি। আজকে থেকে ইস্কুলে যাব।

—আবার ইস্কুল ! যেন আকাশ থেকে পড়ল।

গৈরী বলল—অমন চোখ ডেমাডেমি দিচ্ছিস কেনে ?

হেনী ঝন্ ঝন্ করে বলল—ঐ ইস্কুল যেঞেই তো এত কাণ্ড করলি। না রাখলি সরম ভরম। না রাখলি জাতকূল। হাত আর্জী পাপ করে বসে আছিস। আবার ইস্কুলের নাম করিস না।

গৈরী বলল—তুর কথাতেই। আমার স্বামীতে বলেছে লেখাপড়া করতে। তুর কথাতে ছেড়ে দিব মনে করেছিল ?

—অঃ। বাডা তুর মৌয়ামী। যেমন কুটুম জনকে ভোজ দিঞে তাদের

কাছে চুড়ি, সিঁদুর দিঞ্জে বিয়া করেছে তেমনি কথা বলছিল। উসব ছাড়। ঠে ঘরে থাকতে হলে যেমন বলব তেমনি করতে হবেক।

—না হলে তেড়ে দিবি ন'কি? তাই দে। তুদের জাতকুল নিঞ্জে তুরা ধুঞ্জে থা। আমাকে তেড়ে দে।

দপ্ দপ্ করে ঘরে ঢুকে গেল।

হেনী একটুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্বগতোক্তির মতো বলল—শুনলে গা জলে যায়! বিয়ালা পুরুষের ঘর সংসার হলো নাই। বাপটিকে কুকুর বিড়ালের মতন অপমান করালোক তবু মন ভরল নাই। এখন আবার ভাতার দেখাছে। মর কেনে? মরে খালাস হ।

সকালের সেই তিক্ততার পর গৈরীর আর স্কুল যাওয়া হয়নি। ভাই দুটিকে স্কুল পাঠিয়ে দিয়েছে। বোন দুটি খেলা করেছে। ঘর ফাঁকা হাতেও কোনো কাজ নেই!

উবু হয়ে বসে অনন্তকে চিঠি লিখছে—

শ্রীচরণকমলেষু,

শতকোটি প্রণামের পর লিখি যে আমার বড় কষ্ট। ঘরে বাইরে গল্পনা আর তিরস্কার। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তুমিও তো আর একবারও এলে না। তোমাকে না দেখে মরে যাচ্ছি। এবার দেখা দাও। না হলে আমি তোমার মেসকেই চলে যাবো। ই্যা। তখন সামলাবে।

আশায় রইলাম। নিরাশ কোরো না। প্রণাম নিও।

ইতি

তোমার দাসী।

কি করে পাঠাবে এবার?

এই সমস্যা নিয়ে যখন ভাবছে তখন বাইরে পায়ের শব্দ পেয়ে চিঠিটি ব্লাউজের ভিতর ঢুকিয়ে দিলো।

ঘরে ঢুকলো গুর মা।

গৈরীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। এমন অসময়ে তার মা কেন?

বলল—কি হলো মা? ঘুরে এলি যে!

হেনী বলল—আজকে জিউটি যাই নাই বিটি।

—তবে কুথাকে গেইছিলি?

—বলছি তুকে। এক গিলাস জল দে। খাব।

গৈরী গুকে এক গ্লাস জল এনে দিলো। জলটা খেয়ে হেনী বলল, আমার কি একটি ভাবনা? তুর লেগে ভেবে ভেবে মরে গেলাম।

—আমি কি তুর এতই বুক্কের কাঁটা হলাম মা? বল কেনে? চলে যাব। কুছ দিন তুদের কাছে মুখ দেখাব নাই।

গৈরীর চোখে জল চিক্ চিক্ করছিল। গুর মা বলল—অমন বলিস না বিটি। রাগে তাপে কখন কি বলি তার ঠিক নাই। উসব কথা লিস্ না।

উঠে চলে গেল। কিসব শিকড় বাকড় শিল-নোড়া দিয়ে বাটল। একটি কানার গ্লাসে করে মিশিয়ে আধ গ্লাস করল।

গৈরী দেওয়াল ঠেস্ দিয়ে বসে ছিলো। গুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—রাগ করিস না বিটি। তুঁই আমাদের চখের মণি। কি বলব? এমন কাজ করে ফেললি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে লারছি। আমার কথাটি শুন বিটি। এই তাবিজটি বেঁধে লে আর এই গুয়ুধটি খা।

গৈরী ব্যাপারটা না বুঝেই বলল—ক্যোনে মা?

—ক্যোনে আবার? কত খুলে বলতে হবেক। অনেক কষ্টে তিন চারদিন যোগে এসে তবে এই গুয়ুধটি সূশী বাউরীর কাছে পেলাম।

সূশী মানে সূশীলা। বারমান সাহেবের ব্ল্যাক হিরোইন। তার দেওয়াল গুয়ুধ।

গৈরী বলল—কিস্তক কিসের লেগে?

—পেটটি সাক্ হঞে যাবেক বিটি। দায় থেকে খালাস পাবি।

—কি বললি?

—রাগিস না বিটি। পাপের ফল ফেলে দে।

—মা! তুঁই এমন কথা বলতে পারলি?

—সাধ করে কি বলছি? তুর ভালর লেগেই বলছি। এইটি যদি বিয়লা পুরুষের দিয়া ফল হতো তবে আজ কত সুখ। কিস্তক—

গৈরীর অন্তর বেদনা তীব্র ঘুণায় ফেটে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—মা! তুঁই যখন পয়লা পুয়াতি ছিলিস তখন আমিই ত তুর পেটে ছিলাম এই গুয়ুধটি তখন ক্যোনে খেঞে লিস নাই মা? তবে ত আমার জনম হতো নাই। তুরও ছাপা থাকত নাই।

হেনী রেগে গেল। বলল—ঐ পাপের ফলটি নিঞে কি করবি?

—পুষে রাখব। পাপ হোক, পুণ্য হোক—আমারই ত বটে। আমার স্বামীতে দিঞেছে ভালোবাসার ফল।

—উ কাকে বাপ বকবেক?

—আমার স্বামীকে।

—কে তুর সোয়ামী?

—আছে। সময় হলেই দেখতে পাবি। এখন থেকে ক্যোনে পট্ পটাছিস্।

উঠে চলে গেল।

হেনী বড়ই হতাশ। আজ খেলে কালকে ভাতের চাল নেই। আর এই সময়ে এই কেলেকারী। থিক্ খরে গেছে জীবনে।

স্বভাবসিদ্ধভাবে গজ গজ করতে লাগল—হঁ। আর তুর সোয়ামী আসছে। সে খালভরা তুর খাপরার পারা গতির পেঞ্চে দমে চুষে খেয়ে লিঞ্চেছে। আবার কিসের লেগে আসবেক? দায় লিতে? এমন মানুষ এই পিথিমীতে জনম লেয় না।

দুপুরেও খাবার রুচল না গৈরীর। আর কিসে রুচবে? জীবনটাতেই অরুচি ধরে গেছে। সকালে সেই তিক্ততার পর এক দফা রাগারাগিতে ভাত রুচেনি। দুপুরে শুরু হলো বুক ভাঙা কান্না।

শ্রাবণ দিনের গুমসানি গরম। ঘরে বাইরে একই রকম। আকাশে মেঘ বুলে আছে। যখন তখন ঝরে পড়ছে।

গুলুর ঘরে চাল ফুটো হয়ে জল পড়ে। খোলা খাপরা পেতে সে জল ধরে রাখে। মেঝেটা ভিজ়ে স্রাঁং স্রাঁং করছে। তারই ওপর খালি গায়ে শুয়ে আছে। রাশীকৃত চুল ছড়িয়ে আছে ঘর ময়। বৃকের উপর শাড়ির আঁচল। হাঁটুর উপরে শায়্যা। সারা পিঠ উদোম। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে লোমকূপে। গল্ গল্ করে ধারা বইছে, পিঠে, গলায়, বৃকে, বগলে, উরুসন্ধিতে। সারা গা গজ গজ করছে। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে মুখ মুছছে। গায়ে মাছি বসছে ভন্ ভন্ করে। ভীষণ বিরক্তিকর।

সারা দুপুর কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত। একটু ঘুম যদি বা এসেছিল, মাছির জ্বালায় হলো না। জাগল কিন্তু উঠল না। বারান্দায় পায়ের সাড়া পেয়ে গায়ের কাপড় শুধু শুছিয়ে নিলো।

ঘরে ঢুকল বৈশাখী। বলল—কই লো গৈরী ঘাটে ঘাবি নাই?

—না ভোজী! তুরা যা।

একটা দেওয়ালের ওপারেই বৈশাখী-জগদীশের ঘর। বার বার মা-বিটিতে ঝগড়া শুনেছে। তখন থেকেই মনটা কর কর করছিল গৈরীর জন্ত। আসতে পারেনি নানা কাজ কামের জন্তাই। এখন এসেছে খবর নিতে।

জিজ্ঞাসা করল—ফুফুর সঁধে তুর এত কিসের ঝগড়া গৈরী।

কি হবেক? উয়ার কথাবার্তা তো জানিস। স্রাঁং কল্জা ছিঁড়ে দেয়। বৈশাখী ওর কাছে বসল। বলল—উঠ। কাপড়-চুপড় পর। এমন করে পড়ে আছিস কেনে? আঁদ্ধার ঘরে কাখে রূপ দেখাছিস।

—এই রূপ আমার কাল হঞ্চেছে ভোজী। দিব একদিন দামুদরে ফেলে।

—আঃ। অমন বলিস না।

একরকম জোর করেই তুলল ওকে।

গৈরী একটা ব্লাউজ পরল। এলোথোঁপা করে চুল বাঁধল। বার কয়েক হাই তুলল। জল দিয়ে মুখ ধুল।

লে সিঁহুর পর। দিঞ্জে চল। আমার সাথে ঘাটে চল। হরদম ঘরে ঢুকে থাকলে কি মন ভালো থাকে ?

সেই সবই করল ও। মুখ মুছল, চুল বাঁধল, সিঁহুর পরল, মাথার ওপর এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে চারটি মেয়ে বৈশাখী, কুস্তী, ফাস্তনী ও গৈরী মিছিল করে দামোদরের দিকে হাঁটতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় একটু সহজ হলো। বৈশাখীও ঘরের কাজ সেবে ওর কাছে এসে বসেছিল। এমনি টুক্ টাক্ কথার মাঝেই বৈশাখী বলল।

—তুর যে কেমন ভালোবাসা বুন বুকে পাথর দিঞ্জেই জোয়ানী যাবেক।

—বলিস্ না। অমন শাপ শাপান্ত দিস্ না।

—হ্যারে গৈরী—তুর দাদা বলছিল তুঁই যদি উয়ার নামটি বলিস তাহলে ধরে এনে তুর সঁথে বিয়া দিঞ্জে দিবেক।

—বিয়া ত আমার হঞ্জেছে ভোজী।

—ঈ বাবা! কখন হলো? আমরা দেখলাম নাই, ভোজ খেলাম নাই।

জামাইকে লিঞ্জে নাচলম নাই। আর বিয়া হঞ্জে গেল। কে সাক্ষী আছে ?

—সাক্ষী আছে দামুদর, আকাশের বিজ্জলি, ধরতি মাঈয়ি!

ঈ-সব কাজের কথা লয় গৈরী। তুঁই নামটি বল। তুর দাদার অনেক লোকজন আছে। উ ছোকরাকে ধরে আনবেক।

গৈরী একটু হেসে বলল—না ভোজী। উ নিজেই আসবেক।

—তাই কি আসে রে ?

ওর মায়ের কথারই প্রতিক্রিয়া। দুনিয়াতে বিশ্বাস বলে কিছুই নাই।

—উ বলত ইমান্দার আদমী ভোজী।

—ইমান্দার আদমী হলে কি তুর পেটে বে-জন্মা ছোলা অজ্জাত।

—কি বললি? বে-জন্মা ছোলা!

—তা লয় ত কী? লোকে কি বলছে? গৈরী একটি বে-জন্মা ছোলা পেটে লিঞ্জে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করছে।

—ও: মাগো—শেষে তুরা এই বললি ভোজী?

এ দুঃখের সীমা নেই। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরছে। ঘন ঘন চাবুক পড়ছে পিঠে। মুখটা ফ্যাকাশে। এক মুহূর্ত স্থির থেকে বলল—তুরা মনে করছিল আমি এমন বেউড়া যে ঞাটা হঞ্জে নেচে বেড়াছি। যার তার সঁথে লটার পটর করছি। তবেই বে-জন্মা ছোলা এসেছে পেটে। ছিঃ ছিঃ।

শাঁ করে চলে গেল। ঘরে থিল্ দিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

বৈশাখী বার বার কপাট ঠুকে বলতে লাগল, গৈরী গৈরী! কপাট খুল বুন। আমার দুব হঞ্জেছে। আর বলব নাই। কপাট খুলে দাঁড়াল কেমন বিহ্বলভাবে।

বলল, তুর কোনে ছু হবক ভোজী ? ছু আমার । কিন্তুক তুদের পায়ে পড়ছি এমন করে আমাকে খটা দিস্ না । পাপ, পুণ্য, ভালোবাসা যাইহোক সব আমার—আমিই তার জালা পুয়াব । যেদিন না পারব সেদিন দামুদরে শরীরটি ফেলে দিব ।

বৈশাখী ঞকে সতিাই ভালোবাসত । অনেকক্ষণ ধরে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, ভুলিয়ে, ফুলিয়ে, কান্নাকাটির শ্রোতে বাঁধ দিয়ে নিজের ঘরে গেল ।

রাত কাটছে উপবাসে ।

বে-জন্মা ! বে-জন্মা !

একটি শব্দ লক্ষ লক্ষ হাতুড়ির মতো দম্ দম্ শব্দে পিটছে ওর মাথায় !

হে ভগবান ! আমার ভালোবাসার এই দাম ? একথা আমি কাকে বলব ? কে বুঝবে আমার কথা ? আমার পেটের ছোলা বে-জন্মা !

হা-হা হা—

বুক তোলপাড় করা কান্নায় ভেঙে যাচ্ছে ।

বিকৃত মুখ । অশ্রু ও ঘামে কদাকার । লক্ষ বাতির হলুদ শিখা থির থির করে কাঁপছে । উগরে দিচ্ছে কালোশীষ । কয়লাকুঠির কালো ঘবনিকায় অনার্ধ রমণীর হৃদয় বেদনা পাহাড়ী বর্ণার বেগবতী শ্রোতের মতো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে হতে ভয়ঙ্কর চাপের মুখে এসে পড়েছে ।

বত্রিশ

কোম্পানীর দীর্ঘস্থত্রতার কারণে প্রস্তাবিত মিটিংটা হতে আরো কিছুদিন লেগে গেল । শেরগড়ের হেড কোয়ার্টারে মিটিং । কোম্পানীর তরফে দু'তিনটি কলিয়ারীর ম্যানেজার, এজেন্ট, লেবার সাহেব, হেড কোয়ার্টারের শ্রমিক বিশেষজ্ঞ অফিসারটি এবং ডেপুটি চীফ পারসোন্সাল ম্যানেজার মিঃ ভার্মা ! ভিন্ন ভিন্ন ইউনিয়নের তরফে দেবেন সেন, সুধীর রুদ্র, জয়সন্ত পোদ্দার, সুমিত চ্যাটার্জী, অনন্ত শর্মা ও অন্ত্যান্ত কলিয়ারীর সেক্রেটারী, সভাপতিরা । হাউস ফুল । মিটিং খুব জোরদারভাবে চলছে ।

ইউনিয়নের দাবি ছিল শ্রমিকদের প্রতি যে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে । একটা কলিয়ারীতে দু'দিন ধর্মঘট হয়েছিল । তাতে বেশ কিছু বিশৃঙ্খলা, ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবনতি ও পুলিশের গুলীচালনার ঘটনা ঘটেছিল । শ্রমিকরা কুড়ি ঘণ্টা খাদে আটক ছিল ।

সেজ্ঞ সুই কলিয়ারীর সেক্রেটারী দাবি জানিয়েছিলেন—পুলিশের গুলি-চালনার নিন্দা করতে হবে । শ্রমিকদিগকে কুড়ি ঘণ্টা ধরে কেন খাদে আটক করা হয়েছিল ম্যানেজমেন্টকে তার কৈকিরং দিতে হবে ও ক্ষমা চাইতে হবে ।

যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে । যাদের নামে

পুলিশ কোঁজদারী দণ্ডবিধি অহুসারে মামলা দায়ের করেছে তা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে এক সপ্তাহের পয়সা কেটে নেওয়া হয়েছে কিন্তু রেশন দেওয়া হয়নি তার তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে হবে ও রেশন দিতে হবে।

শ্রমিক রিক্রুটমেন্টের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে গেছে তখন শ্রমিকদিকে শোষণের জন্ত গোমস্তার পদ রাখার কি প্রয়োজন? ও পদটা অবিলম্বে তুলে দেওয়া হোক।

রেশন ব্যবস্থা তুলে দিয়ে বর্তমান বাজার দর হিসেবে নগদ টাকা বেতনের সঙ্গেই দিতে হবে।

প্রত্যেকটি ইস্যু নিয়ে দীর্ঘ বাদ বিতণ্ডা।

মিঃ ভার্মাও সেই আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিচ্ছিলেন।

এক সময় বললেন—তাহলে বাকী রইল কি?

দেবেনবাবু বললেন—এখনো অনেক বাকী। আমরা তো বেতন কাঠামো পুনর্বিভাগ্যের জন্ত ট্রাইবুনালে মামলা এনেছি। ছত্রিশ দফা দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন চলছে। তার সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই।

এই ইস্যুগুলো এসেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জুলুমবাজীর প্রতিবাদে।

মিঃ শ' বললেন—জুলুমবাজী কেন বলছেন? শ্রমিকরাই তো রেশনের ট্রাক লুণ্ঠ করেছে।

অনন্ত বলল—আর আপনারা টাকা নিয়েও রেশন দেননি।

মিঃ ভার্মা বললেন—এটা কি হলো মিঃ শ'?

—আমি চার্জ নেবার আগে এমনি কি একটা হয়েছিল। তার ব্যবস্থা নেব।

—ধন্যবাদ। বাকি দাবিগুলো?

মিঃ ভার্মা বললেন—দেখুন ম্যানেজমেন্টকে ক্ষমা চাইতে হবে, পুলিশকে নিন্দা করতে হবে—এগুলো সব সেন্টিমেন্টাল ইস্যু। শ্রমিকদের তাতে কি লাভ? এসব সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে একটা খসড়া করুন। আমরা বিবেচনা করব। চীফের সঙ্গে কথা বলব।

দেবেনবাবু বললেন—ফিউচার টেম্পের আশ্বাসে কি ভরসা? কলিয়ারীতে গিয়েই তো আপনারদের সাহেবরা বাধ বনে যাবেন। একটা মিটিং করতে হলে দশদিন আন্দোলন করতে হবে। স্বভাবতই শ্রমিক অশান্তি বাড়বে বই কমবে না।

মিঃ ভার্মা বললেন—এই বছরটা আমাদের কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি চলছে। একে শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের পরূপাতী আমরা। আপনারাও উচ্চানিমূলক প্রচার ও প্ররোচনা বন্ধ করুন। আছেন আমরা একটা শান্তিচুক্তি করি।

ওহো। ব্যাপারটি বড়ই সুখদায়ক। ম্যানেজমেন্ট নিজেই শাস্তিচুক্তি চাইছেন। বেশ-বেশ। তাই হোক।

দেবেনবাবু বললেন—বেশ। আমরা ভেবে দেখছি।

—ও কে! লাঞ্ছের পরে আবার বসা যাবে। আমিও চীফদের সঙ্গে আলোচনা করে নিই।

পারস্পরিক আলোচনার সময় একমাত্র অনন্ত ও কমিউনিস্ট নেতারা ছাড়া কেউ বিপক্ষে গেলেন না।

অনন্তর বক্তব্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনে একটা গতি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রচার খুব ভালো হচ্ছে এবং আমরা শ্রমিকদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছাকাছি এসে পড়েছি। এ সময়ে আন্দোলন তুলে নিলে একটা ভাটার টান এসে যাবে। শ্রমিকরা আবার তাদের মদ, ভাং, জুয়া, রাঙি নিয়ে মেতে উঠবে। তার ফলে ম্যানেজমেন্ট নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা করার সুযোগ পাবে আর আমরা পিছু হটব।

অন্ত একজন নেতা বললেন, তা ঠিক। তবে আমাদের গোপন কার্যকলাপ চালু রাখতে হবে। আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করতে হবে এবং এই শাস্তিচুক্তির দরুণ শ্রমিকদের জন্ত যদি কিছু নগদ দক্ষিণা আদায় করে দিতে পারি তবে তাদের আস্থা বাড়বে। এটাকে শ্রমিকদের জয় বলে চালাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

অল্প স্বল্প বিতর্কের পর শাস্তিচুক্তির দিকেই ঝাঁকটা বেশী দেখা গেল। সুমিতবাবুও অনন্তকে বললেন, অতটা জঙ্গী মনোভাব নাই বা নিলি। এসব কুটনৈতিক ব্যাপার। একটু আশ্তে চলা ভালো।

অতঃপর লাঞ্ছের পরেই কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে শ্রমিকদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হলো এবং কোম্পানী শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে শাস্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন।

সর্তাবলী সম্বলিত একটি পাঁচ পাতার চুক্তি উভয় পক্ষের সহি-সাবুদ করে পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করলেন এবং পরস্পরের খ্রীতি ও সৌজন্তের স্মারক হিসেবে একটি ভোজসভায় পানাহার করলেন।

আহার পর্বে চীফ পারসোন্টাল ম্যানেজার ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার কয়েক-মিনিটের জন্ত এসে শুভ কামনা করে চলে গেলেন।

কিন্তু অনন্তর মন খুঁত খুঁত করছে। মনে হচ্ছে কমিউনিস্টরাই ঠিক বলছেন।
—শাস্তিচুক্তি এক ধোঁকার টাটি—

হঠাৎ মিঃ ভার্মা এসে অনন্তর পিঠে হাত রাখলেন।

অনন্ত চমকে গিয়েছিল। ঠুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

উনি বললেন—আই ওয়াশট ইউ ইয়াংম্যান। স্বমিতবাবুকে নিয়ে এসো, কথা আছে।

একপাশে সরে গিয়ে একটা সোফার উপর উনি বসলেন। স্বমিতবাবু ও অনন্ত তাঁর সামনে।

উনি বললেন—মিঃ শর্মা! আমি তোমাকে অনেক আগেই মার্ক করেছি। তুমি যে শ্রমিক ইউনিয়ন করছো তাও আগে থেকেই জানতাম। এক্ষেত্রে অত্যাচারিতা কাকারী যে পরামর্শ দেয় তা হচ্ছে এসব থেকে সরে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ার তৈরি করা। নয় কী?

—হ্যাঁ স্যার। সে উপদেশ অনেকের কাছে পেয়েছি।

—আমিও যদি সেই কথা বলি তবে তা হবে তোমার কাছে বোঝার মতো। নয় কী?

—অফ কোর্স!

—কিন্তু আমি সে উপদেশ দেবো না। তোমাদের উপরে আমার একটা দুর্বলতা এসে গেছে। তা কেন জানো—তোমরা কিছু সৃষ্টি করতে পারো। নিশ্চয়ই মনে করতে পারো আমি সারারাত জেগে তোমাদের প্রোগ্রাম দেখেছি। খুশী হয়েছি।

—হ্যাঁ স্যার।

—নাউ মিঃ চ্যাটার্জী! অনন্ত তো আছেই। তাছাড়া অগ্রদূত মেসে বেশ কয়েকটি চৌকশ ছোকরা আছে। তাদেরকে নিয়ে একটা অস্থান করুন। মৌলিক বিষয় নিয়ে। ওসব ভাড়াটিয়া শিল্পী দিয়ে গানবাজনা, নাচের আসর নয়। এমন করবেন যাতে প্রতিভার ছাপ থাকে। তা যে আছে এটাও আমি জানি। কোম্পানীর শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটা স্মারক পুস্তিকা বেরোবে তাতে সেই অস্থানের ছবি ছাপা হবে। খরচ-খরচা কোম্পানী দেবে। আপনারা কিছু করুন যাতে স্মনাম হয়।

স্বমিতবাবু বললেন—আচ্ছা! সে চেষ্টা করব।

—অনন্ত! তোমার উপরে আমার অনেক আশা আছে। তুমি কবি, লেখক। তোমাকে কিছু করতেই হবে। তবে দেরি নয়। পুজোর আগেই।

—আচ্ছা স্যার।

—ও কে? থ্যাঙ্ক ইউ!

হৃজনের সঙ্গেই করমর্দন করলেন।

ধাণ্ডায় ধাণ্ডার বেজে উঠল ঢোলক, মাদল, কঁাসি, বাশি, বাঁপি, করতাল। কতোদিন পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। কোম্পানীর সঙ্গে ইউনিয়নের শান্তিচুক্তি।

হয়েছে। যারা রবখাস্ত হয়েছিল তারা চাকরী পেয়েছে, যারা জেল হাজতে ছিল তারা ছাড়া পেয়েছে, যাদের নামে মামলা খুলছিল তারাও রেহাই পেয়েছে। এক সপ্তাহের রেশন ফ্রি। তারপর থেকে নগদ বিদায়।

স্মৃতির জোয়ার কি বাগ মানে ?

হাঁড়ি হাঁড়ি ধেনো মদ বোতল বোতল মছয়া।

হস্বনিয়া বাউরী পাড়ায় স্মশীলা পায়ে ঘুঙুর পরে নাচল। শঙ্খ বাউরী নতুন ভাঙু গান বাঁধল।

আয়লো ভাঙু, বসলো ভাঙু

আমার ভাঙা পীড়িতে

মনের মতোন সাজাঞ্চে দিব

ফরাস ভাঙা শাড়িতে

তেটে খেটে খিন। তেটে খেটে খিন। চাডুম। চাডুম।

বারমান সাহেবের ব্ল্যাক হিরোইন স্মশীলা তখনো রসের বিনোদিনী। বিপুল নিতম্ব দুলিয়ে স্তনযুগল স্পন্দিত করে এমন মনোহারী নাচ নাচল যে বাউরী পাড়া রসে কাঁদা।

ঝরঝর রসিক শিওপুঞ্জ সিং নাগরা জুতো মচ মচ করে গুর ঘরে আতিথ্য নিল। ঝনাৎ করে ফেলে দিলো রূপোর টাকা।

নরহরি, কালোহরি, স্মধীর বাউরী, কামালউদ্দীন দমে মদ খেয়ে আমোদ করল। শঙ্খ বাউরী চুলু চুলু চোখে স্মধী দিয়ে রসিক নাগর বনে গেল।

জামজুড়িতে মাদল নাগরা বাজছে। ফুলমণি, নীলমণি, কালোমণি, হীরা-মণিরা মাথার খোঁপায় ফুল গুঁজে সার দিয়ে দাঁড়াল। বড় মঙ্গলা মাঝি বাজনদার। তার কাঁধে মাদল। নাগরা বাজাচ্ছে রবি হাডাম। ময়ূর পাথা হাতে নিয়ে মাঝি ছোকরারা ঘোর নাচে মেতে গেছে।

কালো কালো কৃষ্ণকলির দল পরস্পরের হাতে ভাঁজ দিয়ে গান ধরেছে—

হেসাঃ আকাম হিপীড় হিপীড়

ইঞা মল মল শাড়ি লিপীড় লিপীড়

দেলাবেন দেলাবেন কয়লাকুঠিতে।

সেড়। সেড় !! সেড়। সেড় !!

ছিরিক। ছিরিক !!

যুৎ নৃত্যের তাল, লয় ও ঝঙ্কারে মছয়া বন মাতাল। আভাঙ্গা বর্ষাকালে ফাস্তন এসেছে এমন তাদের খুশীর জোয়ার। নাচতে নাচতে রাত বাড়ছে। গাছের ডালে লক্ষ্মবাতি তুলছে। কৃষ্ণকলিদের যোঁবনপুষ্ট দেহভঙ্গিমা আলো-আঁধারের রহস্যময়তা ভাবে গেছে।

ঢোলক বাজছে যমুনা যাদবের ধাণ্ডায়। চবুতরায় গোল হয়ে বসে ইয়া
লাহাঙ্গা জোয়ানের দল অপার আনন্দে রামধন গাইছে—জয় জানকী জীবন জয়
রাম।

এতোয়ারীর ধাণ্ডায় ভজন গান—কহে কবীর শুন ভাই সাধু—

গুরুনামের ধাণ্ডায় জোরদার হয়ে উঠেছে ভাঙা নাচ।

হুনিয়া ধাণ্ডায় দুই লোকশিল্পী—গোবিন ও গুলু।

ফাগুনে ফাগুয়া, চৈত্র মাসে চৈতা আর শ্রাবণের গান—কাজরী।

পিয়া বিন রাত কায়সে বিতায়ু...।

যেমন সুরলহরী তেমনি তালবাণু !

কাজরী গাথার বিরহ বেদনা যার বৃকে বাজবার তার ঠিকই লাগছে। বাপে
ঢোলক বাজাচ্ছে, বিটির বৃক টাটাচ্ছে। গোবিনের গলায় সুরের ঝর্ণা বইছে,
গৈরী চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

এত যে আনন্দ উল্লাস, গোটা ধাণ্ডা মেতে গেছে কিন্তু তার মনে স্থখ নেই।
সেই যে একটা দিনে তার মায়ে নিয়ে এসেছিল গর্তপাতের ঔষধ, বৈশাখী বলেছিল
বেজন্মা সম্ভান, সেইদিন থেকে ও কেমন যেন হয়ে গেছে।

বৃক ফেটে যাচ্ছে কিন্তু মন স্থির করতে পারছে না। ভীষণ রাগ হচ্ছে অনন্তের
ওপর। সে তো সব জানে। কি যে দুর্গতি ভোগ করছে তা বুঝতে কি ওর
বাকী আছে ?

তবু একবার কেন আসছে না ? তার কি মনে হয় না গৈরীর একটা খবর
নিই ? যত লাঙ্গনা আমিই সয়ে যাবো ? তাকে কিছুই করতে হয় না !

ভাবনার শ্রোতা তেমনি উন্টে মুখে বইতে শুরু হলো—অমনি বৃক তোলপাড়।

মুখ বিকৃত করে আপন মনেই বলল—না। আর পারবো না। পারবো
না। পারবো না।

ভেত্রিশ

রাত বয়ে যাচ্ছে। ফ্যানের একটানা গৌ গৌ শব্দ। স্টিম ইঞ্জিন চলছে হস্
ফস্ করে। সর সর করে চলছে ডুলি। হরদম লোল হারিস। বোঝাই টব
গাড়ি উঠছে। খালি টব গাড়ি নামছে। রেঞ্জিংয়ের কাঁটা বেড়ে যাচ্ছে
মিনিটে মিনিটে।

পিটপে বিজলি বাতির হলুদ আলোগুলো অসংখ্য পোকায় ছেয়ে গেছে।
উড়ে উড়ে পড়ছে টালোয়ান, ঘণ্টাগুলার মুখে।

অগ্রদূত মেস গভীর স্থপ্তিতে মগ্ন। ঘরে ঘরে নিবিড় ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের
শব্দ। অনন্ত বসে আছে হাতে কলম নিয়ে। সামনে পড়ে আছে ভায়েরীর
খোলাপাতা !

গুদিকের বিছানায় কমলেন্দু ঘুমোচ্ছে। ঘড় ঘড় শব্দে শ্বাস বইছে। অনন্তের মাথায় ঘুরছে একটা আইডিয়া। ভাব এবং ভাবের অল্পক্ষণে ঘুম পালিয়ে গেছে। সাদা কাগজে ফুটে উঠছে আখর।

মিঃ ভার্মার কাছে গ্যাস খেয়ে ও বেশ প্রেরণা বোধ করেছে। তার ওপরে সুমিতবাবু দিলেন উস্কানী—লিখে ফেল, অনন্ত।

—কি লিখব দাদা ?

—সেটা কি আমি বলে দেব ? ভাবের সঙ্গে কারবার হচ্ছে তোঁর। একটু ভাবনা-চিন্তা কর। ঠিক এসে যাবে। আরে লেগে পড়।

এই লেগে পড় কথাটাই গুরুতর। সেই থেকে ও ভাবছে কি নিয়ে লেগে পড়বে ? ঢাল তরোয়াল কই ? আইডিয়া কি মুখের কথা ? মগজটা কি ভাবের দোকান ? হট হাট চাইলেই মাল বেরিয়ে আসবে ? একটা কবিতা লিখতে একমাসও লাগে, এক ঘণ্টাও লাগে আবার নাও হতে পারে। হঠাৎ যদি এসে গেল তবে মারো ছক্কা। না হলে খাও ধাক্কা।

কয়লা তো একদিনে হয়নি। এর ইতিহাস আছে। ভূ-প্রকৃতির বিচিত্র ক্রিয়া প্রক্রিয়া আছে। নৈসর্গিক কারণে টাল-মাটাল যুগ সন্ধিক্ষণ আছে। তাকে কি একটা রূপকের মতো করে তুলে ধরা যায় না ?

অনন্ত ভাবনার একটা খেঁই খুঁজে পেল।

বিপুলা এই পৃথিবীর গর্ভাশয়ে কত অমূল্য রত্নরাজি। নৈসর্গিক কারণে তার উৎপত্তি। পিতামহ ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা। জড়, উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টির ক্রম বিবর্তনের উল্লেখ আছে পুরাণে। হতে পারে তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয়।

শান্ত সমাহিত ধরিত্রীর বৃকে তুমুল প্রলয় কল্লোল।

প্রকৃতি ও মানুষের সংগ্রাম। প্রলয় কল্লোল নিমজ্জিতা ধরিত্রীর ব্যাকুল আর্তনাদ, যন্ত্র সভ্যতার যুগে জননী ধরিত্রীর সর্বং সহ্য মাতৃমূর্তির রূপকল্প নির্মাণে সচল হয়ে উঠেছে অনন্তর লেখনী।

ঠক্ ঠক্ ! ঠক্ ঠক্ !

—কে ? চমকে উঠল অনন্ত।

—আমি।

একটা অশ্রুট ধ্বনি। অনন্ত লাফিয়ে উঠল। ব্যগ্রহাতে ছুয়ার খুলে দিলো। বিমূঢ় দৃষ্টিতে দেখল বেপথুমতী গৈরী চোঁকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বলল—এ কি রে ? তুই ?—এত রাতে ? কি হয়েছে ?

—আমি আর পারছি না।

বহু কষ্টে চেপে রাখা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল। ঝর ঝর ধারায় এমন ভাবে কাঁদতে শুরু করল যে অনন্তর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। ওর হাতটা ধরে টেনে এনে বলল—বোস।

বিছানাটার কাছে এনে দাঁড় করাল কিন্তু গৈরী মেঝেতে বসে খাটের বাজু ধরে মুখটা বিছানায় গুঁজে দিলো। তারপর শুধু কান্না আর কান্না। অনন্ত কিছুতেই থামাতে পারছে না। যত সে চাপা গলায় কাঁদতে বারণ করছে গৈরীর কান্না ততই বাঁধন হারা হয়ে মুখ বুক ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে।

কমলেন্দুর ঘুম ভেঙে গেল। সাড়া দিলো না। চুপচাপ তাকিয়ে রইল ওদের দিকে। অনন্ত পরম যত্নে গৈরীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করছে ওর চিবুক ধরে মুখটাকে তুলে রাখতে। ছটো শরীরে কোনো ব্যবধান নেই।

অনন্ত ওর মুখটা তুলে অশ্রুসিক্ত গালে চুমু খেয়ে বলল—এমন করে কাঁদিস না গৈরী। তোর কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর গৈরী বলল—আমি কি করব তুমি বলে দাও।

অনন্তর বৃকে মুখটা গুঁজে দিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

অতন্ত ওকে আরো নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে বলল—কি হয়েছে বলবি তো ?

—লোকে বলছে তোর পেটের ছোলা বে-জন্মা !

বে-জন্মা ! বে-জন্মা !

জাতকের ঘণ্য পরিচয়। জনক জননীর লজ্জা ও কলঙ্ক। অনন্তর মগজে তড়িং কম্পনের ঘূর্ণিবলয়। আঘাতটা সামলে নিয়ে বলল—না। সে আমাদের ভালোবাসার ফল। বল গৈরী—কি করতে হবে ? কি করলে এই কলঙ্ক মুছে দেওয়া যাবে ?

গৈরী ওর দিকে তাকাল সোজাসৃজিভাবে। নিবিড় কালো ছুটি চোখ। উপচে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। টল্ টল্ করছে তারা। ঠোঁট ছুটি কাঁপছে। সারামুখে ছোবড়া ল্যাঁবড়া সিঁহর কাজল। কান্না তার এই প্রথম নয়। হয়ত বহু যুগ থেকে কাঁদছে।

অনন্ত বলল—বল গৈরী। আমাকে কি করতে হবে ?

গৈরী বলল—কেউ তো বিশ্বাস করে না যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ। তোমার নামও বলিনি। বলবও না। তুমিই আমার আত্মীয় কুটুমদিকে বলবে—গৈরী আমার স্ত্রী। পারবে বলতে ? পারবে চুড়ি পরিয়ে দিতে ?

অনন্ত নীরব।

একি ভীষণ সমস্যা ! কুলিধাওড়ায় গিয়ে একথা কবুল করলেই তো হৈ হৈ পড়ে যাবে। আর কি অল্প উপায় নেই ?

গৈরী উঠে দাঁড়াল। চোখমুখ মুছে ওর দিকে পিছন করে শাড়িটা গুছিয়ে

পরল। বলল—আমার লজ্জা, ভয় কলঙ্ক—তুমিই মুছে দিতে পার। আর কেউ নয়। কথাটা ভেবে দেখবে। আমি চললাম।

দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছিল। অনন্ত ওর হাত ধরে বলল—দাঁড়া! আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

—না। একাই যেতে পারব।

হাত ছাড়িয়ে দরজা পার হয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার ফিরে এসে বলল—তোমাকে প্রণাম করে যাই। আর যদি কখনো দেখা না হয়।

অনন্তর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। গৈরী ওকে প্রণাম করল। সে ওর মাথায় হাত দিলো। গৈরী দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল তখনো সে দাঁড়িয়ে রইল। বুকচাপা ক্ষোভে স্বগতোক্তি করল—আমার গভিনী স্ত্রী লজ্জা, ভয় ও কলঙ্কের তাড়নায় রাজ্রির অঙ্ককারে পাগলিনীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি নিশ্চিত বসে আছি। কেন? সে অনার্বকণ্ঠ্য বলে। এত নীচ আমি? ছিঃ ছিঃ! ষিক আমার পৌরুষ!

কমলেন্দু বলল—গৈরীকে তুই একা ছেড়ে দিলি?

—তুই জেগে আছিস?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তো সব শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি করব বল তো?

—তোকে আর বলার কিছু নেই। জানতাম যে প্রেম করছিস কিন্তু সেকস পর্ষস্ত এগিয়ে গেলি কি করে? এইটুকু সংযম নেই তোর চরিত্রে। মেয়েটা প্রেগণ্ঠাট হয়ে গেল! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

অনন্ত মাথা হেঁট করে বসে আছে। প্রাণের বন্ধু ছাড়া কে বা এমন ভাষায় ভৎসনা করতে পারে? এরপর যে শুনবে সেই তাকে ষিকার দেবে। তার মা শুনলে মরমে মরে যাবেন। যে ছেলেকে নিয়ে এত গর্ব তার অধঃপতন তিনি কি করে সহ্য করবেন?

ওঃ। কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা! একটা ভুল কি নিষ্ঠুরভাবে বদলে দিতে পারে একটা মাহুষের জীবন।

কমলেন্দু বলল—গৈরীর শেষ কথাটার মানে বুঝতে পেরেছিস—যদি আর কখনো দেখা না হয়।

—হ্যাঁ!

—তোকে প্রণাম করে গেল। মানে এটা শেষ সাক্ষাৎ হতে পারে। শ্রালা! তবু তুই তাকে একা ছেড়ে দিলি। বুঝলি না—কি অসীম বেদনায় একটা যুবতী মেয়ে রাতের অঙ্ককারে এতদূর ছুটে এসেছে। ওর দিকটা ভেবেছিস?

ভাবছি। নিশ্চয় ভাবছি। ভাবতে ভাবতে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যাকালে ভাবনা ছিল ধরিত্রীর গর্ভাশয়ে পালনিক শিলাস্তরের ক্রমবিবর্তন।

আর এখন ভাবছি গৈরীর গর্ভাশয়ে একটি ভ্রূণ। এই জাতক কি পিতামাতার ভুলের ফসল? এ কি মাতার লজ্জা? পিতার পাপ? নারী নরকের দ্বার। সেই তাকে কামনার আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়ে নরকের দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

—কথা বলছিস না কেন? শালা মারব দু'চড় দু' সারি দাঁত ঝরে যাবে! কাওয়ার্ড! অমাতুঘ!

বিশ্ফোরণের মতো ফেটে পড়ল অনন্ত—মার। যত খুশী মার। শুধু চড় কেন লাঠিপেটা কর। আমি কিছু বলব না।

থর থর করে কাঁপছে ও। ভীষণ যন্ত্রণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছে। কমলেন্দু উঠে চলে গেল। একটু পর স্ববীরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

অনন্ত কাৎ হয়ে পড়ে আছে বিছানার উপর। চোখ কর কর করছে।

স্ববীর বলল—কি হয়েছে?

কমলেন্দু বলল—ওকেই জিজ্ঞাসা কর। শালা গৈরীর সর্বনাশ করে এখন শ্রাকা সাজছে।

অনন্ত বলল—না-না। আমাকে তোরা এত অমাতুঘ মনে করিস না। আমার ভালোবাসার ফাঁকি নেই। ধোঁকা নেই। লুকাচুরি হয়ত আছে তবে প্রতারণা নেই। শুধু একটু সময়—আমি ভালো করে ভেবে দেখি এর কি উপায় করা যায়?

স্ববীর বলল—অনন্ত! মনটাকে শক্ত কর। ভালো যদি বেসেছিস তবে আর ভাববার কি আছে রে? মজ্জুর মতো লড়ে যা।

—ঠাট্টা করছিস?

—নারে। তোকে সাহস যোগাচ্ছি। কিভাবে তোকে মদৎ করতে হবে তাই বল। আমরা তোর সঙ্গে আছি।

অনন্ত বলল—ব্যস। এই একটা কথাই যথেষ্ট! তোরা আমার সঙ্গে থাকবি?

সিগুর!

সকাল হতে যা দেরি। অনন্তর ঘরেই এই গুরুতর প্রস্রুটির মীমাংসা করতে দরজা বন্ধ করে আলোচনায় বসেছেন ওদের তিন বন্ধুর সঙ্গে স্মৃতিবাবু।

রাত্রে ঘটনা আত্মপূর্বিক শোনার পর উনি বললেন—আমি তো আগেই বলেছি অনন্ত—হয় তুই ডুববি না হলে একটা মেয়েকে ভোবাবি।

—আপনি জানতেন?

—হ্যাঁ। আমি ও ডাক্তারবাবু দুজনই জানি। কিন্তু এখন উপায় কী? তোরা কি ভেবেছিলি?

স্ববীর বলল—অনন্ত গৈরীকে বিয়ে করতে রাজী আছে। তাই ব্যবস্থা করে দিন।

—ব্যাপারটা কি অত সোজা? গৈরীর স্বামী আছে। আইনত ডিভোর্স হয়নি। তাছাড়া সবারই তো জাতপাত, রীত-নেয়ত আলাদা। ওদের মুরুব্বির ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে কে জানে?

কমলেন্দু বলল—যদি রাজী না হয় তাহলে একটা অন্তঃস্বস্তা মেয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। কারণ ও যাবার সময় অনন্তকে যা বলে গেল তার এই মানেটিই হয়।

অনন্ত বলল—তোরা ওদের সরদারের সঙ্গে কথা বল। আমার নামটা আপাতত গোপন রাখ। যদি রাজী হয় তো ভালো না হলে গৈরীকে নিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব। নামটা বলে দিলে তাতে অসুবিধে হবে।

স্বমিতবাবু বললেন—বেশ আমি সেই চেষ্টা করছি। যাবড়াস না। একটা কিছু করবই। ওরাও তো জাঁতাকলে পড়েছে। অন্তঃস্বস্তা মেয়েকে পাত্রস্থ করতে পারলে কোন বাপ না বেঁচে যাবে!

চৌত্রিশ

ডাক পড়ল চরিতর, কিষণ, গোবিন ও গুলুর।

স্বমিতবাবুর ঘরে এসে মেঝেতে হাঁটু পেতে বসল। অনন্তরাও চারজন। মেস তখন ফাঁকা। সবাই ডিউটি গেছে। ওরাই ডিউটি কামাই করে মেসে আছে। জীবন মরণের সমস্তা। আলগাভাবে ছেড়ে দিতে পারে না।

স্বমিতবাবু বললেন—তোমাদিকে ডেকেছি গৈরীর সম্পর্কে আলোচনা করতে। ব্যাপারটি গুরুতর। ভেবেচিন্তে কথা বলবে।

ওরা চূপচাপ। চারজনেই চোখ তুলে একবার স্বমিতবাবুকে দেখল তারপর আবার মাথা নিচু করল।

—গৈরীর বাচ্চা হবে। তা তোমরা জানো?

—হ্যাঁ বাবুজী।

—ওর সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছো?

—কি ভাঙনা করব বাবুজী? উ বিটিটি দিওয়ানা হঞ্চে গেইছে। আর আমাদের বুদ্ধিতে কুছু হবার লয়। যার সঙ্গে পীরিত করে এত কাণ্ড হঞ্চে গেল সে আদমী খোড়েই আসবেক। বিটিটির যা দশা তা কুহুদিন মরেই দিবেক। আমাদের একটি বিটি খরচ হঞ্চে গেল বাবুজী। কোনো যে লেখাপড়া শিখতে ইসকুলে পাঠাঞ্চেছিলম। ছোটলোকের ঘরে মা সরস্বতী আসবার লয়।

চরিতর আক্ষেপে প্রায় ভেঙে পড়ল। গুলু ফৌস ফৌস করে বার কয়েক নিঃশ্বাস ছাড়ল। অনন্ত ওর বন্ধুদের দিকে তাকাল।

স্বমিতবাবু বললেন—না হে অত হতাশ হচ্ছ কেন? আমি তো আছি। সেই আদমীর পাত্তা লাগিয়েছি। সে গৈরীর সব দায় লিবেক।

—দায় কি করে লিবেক বাবুজী? কি না কি জাত।

—ভদ্রলোকের জাত।

—সে বুঝেছি বাবুজী! উ বিটির কি ছুনিয়া মরদে মন উঠে? লেখাপড়া শিখে মাথাটি বিগড়ে গেইছে।

—কেন? তোমরা কি অল্প জাতে বিটি দিবে নাই?

কিষণ বলল—দিতে তো হয় না বাবুজী। নিজের জাত কুটুম ছেড়ে দূসরা জাতকে বিটি দিলে কুটুমে নিন্দা করবেক।

—নিন্দার কি বাকী আছে?

চরিতর বলল—হুঁ বাবুজী! কুলথাকী বিটি! সরমভরম লাজলজ্জা বেবাক দিঞে বসে আছে। ঘরেই বা রাখব কী করে?

গুলু বলল—গলায় ফাঁস লেগে গেইছে বাবুজী। কুহুরকমে বিটির মাথায় সিঁদুর চড়লেই বাঁচি।

অনন্ত বলল—সিঁদুর ত চড়েছে। ভগবান সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়েছে।

চরিতর বলল—ভগবান ত সব কুছুরই সাক্ষী বাবুজী। দরকারের সময় তো আসবেক নাই। কুটুম জন ঙ্গ-কথা মানবেক কোনে?

স্বমিত বলল—তবে তোমরা কি করতে বলছো?

মোক্ষম প্রশ্ন? ধানাইপানাই নয়। সিদ্ধান্ত দাও।

ওরা চারজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। গুলু বিড় বিড় করে নিজেদের ঠেঠ ভাষাতে কিছু বলল।

চরিতর বলল—আমাদের কুটুমজনের সামনে বিটিটির মাথায় সিঁদুর দিঞে চুড়ি পরাঞে স্নান্ধা করুক। জ্যাতে গুঠার ভোজ দেক।

স্ববীর ধমকে গেল। গলায় বাঁধ দিয়ে বলল—ঝাড়ু মারো তোমাদের জাতে। জাত বামূনের ছেলে তোমাদের ঘরের মেয়ে নিতে চাইছে। তাতে আবার বাহানা। যাও পুষে রাখ গা বিটিকে। সে যদি মরদ হয় তবে নিজের বউকে ঠিকই নিয়ে আসবে।

চরিতর মিন্ মিন্ করে বলল—রাগ করছেন কেন বাবুজী?

—রাগ করব না। স্নান্ধা করতে হবে, ভোজ দিতে হবে। জাতে উঠতে হবে। এসব কি কথা হে? বামূনের উপরে কি জাত আছে?

গোবিন জোড় হাত করে বলল—ব্রাহ্মণ! বাবা তাকে পেন্নাম করতে হয়।

কিষণ বলল—ব্রাহ্মণকে বিটি দিব কি করে? উয়ারা ঘরে ঢুকতে দিবেক
ক্যেনে? ছুঁয়া গেলে ডুব দিঞে চান করে। না-বাবুজী। ঈ-হবার লয়?

—কি?

—চুড়ি—সিঁদুর—শ্রাঙ্গা।

—কেন?

—ক্যেনে কি বলব? ঈ জীবনে বিটিটির আর ঘর-কন্না হবেক নাই। কে
উয়াকে ঘরে ঢুকতে দিবেক বাবুজী? থু থু করে বাহার করে দিবেক। সে
অপমানের লেগে বিটি দিব?

অনন্ত রাগে রাগে বলল—আর সে লোক যদি তোমাদের মেয়েকে নিয়ে চলে
যায় তাহলে মান কোথায় থাকবে? তোমরা জাত কুটুমের নাম করে ওর
সন্তানকে জারজ বানাতে চাইছো? তারপর ওকে বলবে বেশা—যে ওকে
ভালোবেসে সন্তান দিয়েছে সে এত কাপুরুষ মনে করেছ।

স্মিতবাবু বললেন—আঃ। রাগারাগি করছিস কেন।

—কি বলছেন দাদা। এই লোকগুলো ঘর গুষ্ঠি মিলে গৈরীর জীবনটাকে
অতীষ্ঠ করে দিয়েছে। মনে রাখবে তার স্বামী আছে।

চরিতর বলল—হঁ বাবু। আমরা তো তাকেই দেখতে চাইছি।

স্মিতবাবু বললেন—নিশ্চয়ই দেখতে পাবে। সে বেইমানও নয়, কাপুরুষও
নয়। কিন্তু তোমাদের রেওয়াজ তার পক্ষে মানা শক্ত। যতই হোক সে একটা
ভ্রলোকের ছেলে। তার পক্ষে হুনিয়া ধাওড়াতে গিয়ে শ্রাঙ্গা করা সম্ভব
নয়।

চরিতর বলল—তাহলে সে কি করবেক বাবু? একেই তো মান-সম্মান সব
গেইছে। তারপর যদি শ্রাঙ্গাও করব নাই বলে তবে হলো কী? এক তো বে-
জাতে আমাদের বিটি দিতে নাই। জাত কুটুমে পতিত করবেক। তারপরে
এই কথা!

স্মিতবাবু বললেন—দেখ শ্রাঙ্গা শব্দটার মধ্যেই ছোটলোকী সংস্কার। আমরা
দ্বিতীয়বার বিবাহকেও বিবাহ বলি। ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানসাগর বিধবার বিয়ে
দিয়েছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ এবং স্বামীপরিত্যক্তা নারীর বিবাহ আকছার
হচ্ছে। তারও আচার অনুষ্ঠান একই।

—কিন্তু আমাদের চুড়ি পরাঞে সিঁদুর দিলেই শ্রাঙ্গা।

—এইখানেই আমাদের আপত্তি। তোমাদিকে একটা পরামর্শ দিচ্ছি।
মনে নাও।

—বলুন।

—মা কল্যাণেশ্বরীকে তো তৌমরা মানো?

—হঁ। ক্যেনে মানব নাই?

—চল। আমরা সবাই ঐ দেবী স্থানেই যাই। সেখানেই বৈদিক মতে আমরা বিয়ে দেব। যাগযজ্ঞ, সিঁদুর দান, মালাবদল সবই হবে।

গুলু বলল—কিন্তু বাবু ব্রাহ্মনকে বিটি দিব কী? তার পায়ের ধূলা নিঞ্জে জল খেতে হয়। ঈ-ত কঠিন কথা বলছেন।

স্বমিতবাবু বললেন—তোমার বিটি তো কঠিন কাজই করেছে।

চরিতর বলল—কিন্তু বাবু ব্রাহ্মনের ছোলাতে ছুটুলোকের বিটি নিঞ্জে ঘর করতে পারবেক?

—হঁ। পারবেক।

—তাকে জেতে পতিত করবেক নাই?

—করবেক। তার ঘরগুটি তাকে পতিত করবেক। তোমরাও তোমাদের বিটিকে পতিত করবে। দুই পতিত পতিতপাবন হরির নামে সংসার করবে। হিম্মৎ আছে বলেই তো।

গুলু বলল—শেষতক আমাকেই পতিত হতে হবেক। যতই হোক বিটিকে তো ছাড়তে পারব।

চরিতর বলল—আঠি যখন গলাতে লেগেই গেইছে তখন আর গতি কি?

গুলু বলল—যা হয় হবেক। কপালের ফের কে ঘুচাতে পারে? কুলথাকী বিটির মাথায় সিঁদুরটি তো চডুক। তার একটি ভাতার হোক। পেটে যেটি এসেছে তার একটি বাপ হোক। ঈ-বারে ছোলাটিকে দেখান বাবু।

স্বমিতবাবু একবার অনন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—এর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে।

চারটি হুনিয়া মুক্‌বির একসঙ্গে বিষয়ে কেটে পড়ল—অনন্তবাবু!

বিয়েটা কল্যাণেশ্বরীতেই হলো। আর্ধ ও অনার্ধের বৈধ মিলনের সামাজিক লাইসেন্স। বধূবেশিনী গৈরীর পরনে লাল শাড়ি। সিঁথিতে ডগডগে সিঁদুর।

কাঁসি, বাঁশি, ঢোল, হারমোনিয়াম নিয়ে হুনিয়া মুক্‌বিদের সঙ্গে জনকয়েক বোঁ বিটি এবং ছেলেছোকরা ট্রাক ভাড়া করে এসেছিল। বিয়ে শব্দের মধ্যেই যাত্ন। সে বনে, বাদাড়ে, পাহাড়ে, পর্বতে দেবস্থানে বা লোকালয়েই হোক মাতন একটা থাকবেই। মেয়েগুলি গান জুড়ে দিয়েছিল।

মালাবদল, সপ্তদান, সিঁদুর দান, হোম যজ্ঞ, সপ্তপদী বৈদিক নিয়মেই হলো। বর ও বধু মা কল্যাণেশ্বরীকে প্রণাম করে বাইরে এল।

রাস্তা পার হয়ে ফাঁকা ডাঙা। গোটা কয়েক পলাশ গাছ। তারই নিচে লুচি হাঁকা হচ্ছে। বর ও বধুকে একটি তালাই পেতে গাছতলাতে বসতে দিলো। হাতে হাতে বিলি হতে লাগল লুচি বঁদে।

ওদিকে তখন চারটি হুনিয়া মুকুবির সঙ্গে সুমিতবাবু ও সুবীরের আলোচনা। তারিও পাথরের উপর বসেছে এবং বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে।

কিষণ বলল—গৈরীকে কি করবেন বাবুজী? জামাই কি উয়াকে সাঁথে করে নিঞ্চে যাবেক?

সুমিতবাবু বললেন—কোথায় নিয়ে যাবে বল? ও-তো মেসে থাকে। তার একটা ঘরও না হয় আমরা খালি করিয়ে দেব। কিন্তু অতগুলি বেটাছেলের সঙ্গে একটা জুয়ান বিটি ছোলা কি করে থাকবেক?

—সে তো বটেই। তাহলে উপায়?

—বাপ মায়ের কাছেই যাক এখন। পরে অল্প ব্যবস্থা করা হবে। গুলু বলল—আমি জানতম বাবু—ঈ-বিটির ঘর-সংসার হবেক নাই। তবু ভালো যে মান রইল। পেটের ছোলাটিকে কেউ বেজম্মা বলতে লারবেক। একটি বিটির দায় আমিই বইব।

কিষণ বলল—বিটি-জামাইকে এক সাঁথে যেতে হয়। জামাই যাবেক তো?

এ প্রশ্নের উত্তর অনন্তই দিতে পারে! তাই ওকে ডাকল।

গাঁটছড়া সহ বিয়ের চাদরটি গৈরীর হাতে দিয়ে ও এল।

সুমিতবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—খেয়েছিস অনন্ত?

—হ্যাঁ দাদা।

—গৈরী খেয়েছে?

—হ্যাঁ। খাচ্ছে।

—ওরা বলছে বর-কনে জোড়ে খশুরবাড়ি যেতে হয়।

অনন্ত একটু গুম হয়ে থেকে বলল—অল্প সময় যাব দাদা। আজ গৈরীকেই নিয়ে যেতে বলুন।

—কেন রে?

—আমার ভীষণ লজ্জা করছে। কি করে যে মুখ দেখাব তাই ভেবে উঠতে পারছি না। আমাকে সামলে নেবার জন্ত একটু সময় দিতে বলুন।

দীর্ঘদিন বাংলা মূলুকে থেকে বাংলা ভাষা ওরা ভালোই বোঝে। ঘাড় নেড়ে বলল—ঠিক আছে বাবু। তাই হবে। যে ইমান আর ধরমের কাজ আপনি করলেন তাতেই আমরা বেঁচে গেছি। না হলে কি গতি হতো আমাদের বিটিটির?

মালপত্র, লোকজন ট্রাকে চড়ার পর বৈশাখী গৈরীর হাত ধরে টানল। তখনো ওর হাতে ধরা আছে বিয়ের গাঁট ছড়াটি। অনন্ত কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ও ওদের সঙ্গে যাবে না। শুনে-থেকেই বুকে মোচড় দিয়ে কান্না আসছে। পা যেন আগে পড়ছে না। পুনঃ পুনঃ টানাটানিতে ও চলল। অনন্তর দিকে এমন

করণ, এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যা সন্দের সীমা ছাড়িয়ে দেয়। কাজল আঁকা চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল।

ট্রাক চলে গেল। অনন্তের জন্তু অপেক্ষা করেছিল নিন্দা ষিঙ্কার, প্রশংসা ও অভিনন্দন। বিয়ে স্মৃষ্ণা তো হামেশাই হচ্ছে। প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে নর-নারীর বিরহ মিলনের কত না ঘটনা। কিন্তু একটি মিলন নিয়ে সারা কলিয়ারীতে এমন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো যে অনন্ত ভেবে পায় না এরপর কি হবে? এমন কি মেসের দেওয়াল পত্রিকাটিও ব্যঙ্গ, বিজ্ঞপ, প্রশংসা ও অভিনন্দনের চাপান উতোরে স্নায়ু উত্তেজক রচনার ভারে চিত্রিত হয়ে উঠল।

ইহ বাহু! মাকে আমি কি কৈফিয়ৎ দেবো?

যে স্নেহময়ী জননীর একটু খানি হাতের স্পর্শে রোগ যন্ত্রণা মেরে যায় তার বুকে কত বড় আঘাত দিলাম। এই কি জ্যোষ্ঠ পুত্রের কর্তব্য। কেন আমি এমন করে ডুবে গেলাম? ফার্স্ট এড কম্পিটিশনের দিনগুলোতে কেন আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি? কেন তখনই আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি?

কলিয়ারীতে সিক রিপোর্ট দিয়ে মেসের ঘরেই পড়ে রইল। গৈরীর নাম পর্যন্ত মুখে আনল না। রুনিয়া ধাওড়ার দিকে পা বাড়াল না।

যখন ওদের মিলন ছিল অবৈধ তখন কত না ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গেছে। আর আজ যে সে তার বিবাহিতা স্ত্রী তবু একবার চোখের দেখাও দেখছে না।

মন পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। ওর বন্ধুরা কত রকমে বোঝাচ্ছে কিন্তু সব বুঝেও প্রচণ্ড আত্মগ্লানিতে নিজস্ব হয়ে পড়েছে।

একদিন সকালে কমলেন্দু গেল বিউটির কাছে। বলল, দিদি! অনন্তকে আপনি বোঝান। অশুশোচনায় পুড়ে মরে যাচ্ছে। একবার মেসে চলুন।

বিউটি বলল—ভাইটি আমি মেসে গেলে অল্প রকম মানে হবে।

—যা হয় হোক দিদি। অনন্তের প্রাণের চেয়ে তো দামী কিছু নয়। অমন একটা সবল স্তম্ভের প্রাপবান ছোকরা কি হয়ে গেছে তাই দেখবেন।

ওর ব্যাকুলতা দেখে বিউটি হেসে ফেলল। তোমার বন্ধুটি কি সব সময়েই গাঢ় রসের কারবারী। যেমন প্রেম তেমনি বন্ধুত্ব। ফিকে হবার জো নেই।

—আপনি ঠাট্টা করছেন দিদি। জানেন না—ও ভীষণ সিরিয়াস।

—জানি—জানি। চল আমি যাচ্ছি।

এই অগ্রদূত মেসেই একদিন ওর চরম সর্বনাশ ঘটেছিল। তাই উৎসব অহুষ্ঠান ছাড়া এদিকে পা বাড়াতে না।

অনন্ত চিন্তাপাত দিয়ে গুয়েছিল। বিউটির ডাক শুনেই ধড় ফড় করে উঠল। ব্যস্ত হয়ে বলল—বোস দিদি।

খাটে বসে বিউটি বলল—কি হয়েছে তোমার ? এমন অসময়ে শুয়ে আছো কেন ?

—সবই তো জানো দিদি। তোমার বকুনিটা এখনো বাকী আছে। সেটা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও।

বিউটি মুখ টিপে হেসে বলল হাঁ। দুট্ট কম হওনি। বিয়ে করেছে কোথায় বো নিয়ে দিদির কাছে বেড়াতে আসবে তা নয়। আবার ঠেস দিয়ে কথা বলছে।

—যদি কোনোদিন বো নিয়ে আসি তবে তুমি ঘরে ঢুকতে দেবে ?

—কেন দেবো না ?

—সে যে ছোট জাতের মেয়ে।

তুমি তো বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। তাহলে তাকে জাতে তুলতে পারবে না কেন ?

অনন্ত হতাশ কণ্ঠে বলল—কি বলব দিদি ? ব্যঙ্গ, বিদ্রোপ ও তিরস্কার শুনে শুনে পাথর হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের ঘরের দুয়ার আমার জন্ম বন্ধ হয়ে গেছে।

একটু হুঃখিত স্বরে বিউটি বলল—তা জানি। গুনলাম বোয়ের নাকি বাচ্চা হবে ?

—হ্যাঁ। সেইটাই তো আরো লজ্জার।

—লজ্জা কি ? সন্তান ভালোবাসার ফল। মানুষের জড় শিকড়। ভালোই তো হয়েছে। জলজ ঞাণ্ডার মতো ভেসে বেড়ালে কি বন্ধন দূর হয় ?

—যাক তবু একটা আশার কথা গুনলাম।

—ওঠো ! এমন করে নিজেকে ক্ষয় করো না। যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে মন খারাপ করো না।

কমলেন্দু এল চা ও মিষ্টি নিয়ে।

বিউটি হেসে বলল—ও বাব্বা ! আতিথেয়তা শুরু করে দিলে।

—খান দিদি। আপনি তো কখনো আসেন না।

বিউটি নিজেই ডিশে সাজিয়ে নিল। খেতে খেতে বলল—তুমি যদি স্বাভাবিক না হও অনন্ত তাহলে তোমার এই বন্ধুটি পাগল হয়ে যাবে।

অনন্ত হাসল—আমাদের একজনের জর হলে তিনজনেরই বডি টেম্পারেচার বেড়ে যায়।

বিউটি ঘাড় নেড়ে বলল—তোমরাও বন্ধু। ডি. ডি., ডি. সি.-ও বন্ধু। কিন্তু কত ফারাক। দুটি জাহান্নমের মুশাফির আমার মাথায় যে কলঙ্কের পাহাড় চড়িয়ে দিয়েছে তার তুলনায় তোমাদের বন্ধুত্ব মানবিকতার জলন্ত উদাহরণ। ওঠ ডিউটি যাও।

অনন্ত বলল—আজ কখন যাব ? সময় চলে গেছে।

—সেকেণ্ড শিফটে যাবে। কাজ না করলে গতরে খিল ধরবে। মগজে জ্বং ধরবে। চিতপাত হয়ে পড়ে থেকে না।

বেশ অভিভাবকের স্বরে কথা বলে উঠে পড়ল। যাবার সময় বলল—বৌকে নিয়ে আসবে একদিন।

বিউটি ওর মনের ব্যাটারীটাকে ভালোই চার্জ করে গেল। চারটের সময় স্ববীর ও কমলেন্দু ওকে ধরে নিয়ে গেল ভিউটি করতে।

পঁয়ত্রিশ

যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায় অনন্ত। কটা দিন বাকী ছিল শনিবার আসতে তাই ও সেকেণ্ড শিফট ভিউটি করেই কাটিয়ে দিলো। খাদের গরমে সিদ্ধ হয়ে স্বৈদ ও অশ্রুর প্রবাহে বেশ কিছুটা ম্লানি ধুয়ে গেল। ক্রমশই ধাত ফিরে আসছে।

এখন সে গৈরীর জন্ম ভাবে। ৩০শে শ্রাবণ বিয়ে হয়েছে ওর। তারপরই তাত্র মাস পড়ে গেছে। এখন মাঠে মাঠে ধান, ভ্যাপসা গরম। প্রাণ ধারণে কষ্ট আছে। তার চেয়েও কষ্ট গৈরীর জন্ম। সে তো একটা মেয়ে। স্বামীকে তো কাছে পেতে চায়। কিন্তু কি করল ও? গাঁটছড়াটি ওর হাতে তুলে দিয়ে সেই যে দুজনে দুটি পথে এল। আর দেখা হলো না। না জানি কত কষ্টে আছে ও।

এবার নতুন করে জীবনের কথা ভাবতে হবে। গৈরীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে হবে। তিনবছর খাদের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। মাইনিং সরদারী পরীক্ষায় পাশ করে সার্টিফিকেটও পেয়ে গেছে। অল্প কোথাও চাকরি নিলেই হয়। কিন্তু পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে শ্রমিক আন্দোলন। আজ সেও শ্রমিকদের একজন। তাদের স্ব্থ দুঃখ তারও স্ব্থ দুঃখ।

রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেলা হয়ে গেল। এতক্ষণে মেসে গুলজার শুরু হয়ে গেছে। স্বমিতবাবুর গলাটা সবচেয়ে চড়া। অনন্তকে ডেকে বললেন—কাল মিঃ ভার্মা ফোন করেছিলেন। দুর্গাপুজার আগেই অস্থগঠান করতে হবে। পারবি ?

—আপনি কি বললেন ?

—বললাম অনন্ত একটা জব্বর আইডিয়া নিয়ে ভাসছে।

স্ববীর বলল—এ শালা দ্বিগুয়ানা হয়ে গেছে দাদা। ওর ঘারা কিছু হবে না। পারেন তো গৈরীকে নিয়ে এসে ফিট করে দেন, তারপর দেখবেন—কলম থেকে আগুন বেরুচ্ছে।

কমলেন্দু বলল—ওদিকে গৈরী হাপসে মরছে। আর এ শালা ভ্যানিটিতে তা দিচ্ছে। হুনিয়া খাণ্ডায় গেলে প্রেক্ষিত পাংচার হয়ে যাবে।

স্মিতবাবু বললেন—তাই নাকি রে? তা আগে বলতে হয়। আমি এখনি ওকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি। মেসের একটা ঘরও খালি করে দেবো। কি বলিস?

—দাদা! ওদের সঙ্গে আপনিও ঠাট্টা করছেন।

স্ববীর বলল—ঠাট্টা কিদের রে? যা সত্যি তা তোর বলতে কি হচ্ছে? মনের কথা খুলে বল বাপ।

অনন্ত বলল—ওদের কথা শুনবেন না দাদা। আমি আপনাকে দুদিনের মধ্যে লেখাটা পড়ে শুনিয়ে দেবো। তবে দুদিন ছুটি পেলে ভালো হতো।

স্ববীর বলল—ওটা কোনো ব্যাপার নয়। আর কি চাই তোর বল?

দু-দিস্তা শাদা কাগজ, এক দোয়াত কালি, একটি কলম, পাঁচ প্যাকেট চারমিনার সিগারেট, দুটো দেশলাই—আর—

কমলেন্দু বলল—আর গৈরী।

—মারবো শালা এক থান্ড। ঘুরে ঘুরে একটাই কথা।

দুদিনের দিন সন্ধ্যায় স্ববীর তার জলদগস্তীর কণ্ঠস্বরে পড়তে শুরু করল অনন্তর লেখা নৃত্যনাট্য—‘অগ্নি সংস্কার’। তিন বন্ধুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

অনন্তর লেখা যত ভাল, হাতের লেখা ততই টানা। স্বচ্ছন্দভাবে পড়া যায় না। সেজন্য কমলেন্দু পরিস্কারভাবে কপি করেছে। স্ববীর তারপর পড়েছে জিভ ও কণ্ঠস্বরের সায়ুজ্য রাখতে।

স্মিতবাবুর ডাকে সবাই এসেছে অসীম, অপূর্ব, দীপক, হেমব্রাম, সুনীল, সত্যেন, স্বপ্না, শুচি, কল্যাণী, ভারতী ও আরো আট দশটি ছেলেমেয়ে। ডাক্তারবাবু এসেছেন চীফ গেস্ট হয়ে। আর এসেছেন ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেব। ওরা তো হিজ মাস্টারস ভয়েস। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ পালনই তাদের ধর্ম।

দুটিই দৃশ্য। শুরু হচ্ছে—মঞ্চ অঙ্ককার। ঘোর দুর্ধোগ। ভয়ঙ্কর প্রলয় কল্লোল। বিদ্যুৎ বিদীর্ণ আকাশ। মিউজিকে মেঘ ভয়ঙ্কর। গুম গুম পাহাড় ভাঙার শব্দ। ভীষণ জলকল্লোল। শন শন করে বয়ে যাচ্ছে ঝড়। জীবজন্তুর বিকট আর্তনাদ।

প্রবেশ করলেন ধরিত্রী। আলুথালু বেশ। বাতাসের দাপটে উড়ে যাচ্ছে নীল শাড়ি। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আলো আধারের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমক। আতঙ্কে তাঁর চোখ দুটো ফুটে বেরিয়ে যাচ্ছে যেন।

‘হৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করলেন—

দ্বিতীয় দৃশ্য এল যন্ত্র সভ্যতার যুগ। মৃতের পাহাড় এখন ধরিত্রীর গর্ভাশয়ে। তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছে পাললিক শিলায়।

কালো কালো মাছুষ এল হাতে গাঁইতি, শাবল, ঝুড়ি নিয়ে। স্বরঙ্গ কাটল মাটির তলায়। এল গোরা সাহেব হাতে ছড়ি নিয়ে। হঠাৎ ভেঙে পড়ল ছাদ। সমাধিস্থ হলো শেইসব কুলিকামিন।

এল খুঁটা লাগাবার মিস্ত্রী মজুর। ছাদকে যোগান দিয়ে রাখল। কিন্তু ভেসে গেল জলশ্রোতে। তখন তারও উপর বাঁধ তৈরি হলো। কাজ থেমে নেই। নিত্য নতুন খাদ খুলছে। বিদীর্ণ হচ্ছে ধরিত্রীর গর্ভাশয়। এল যন্ত্রদানব। কাজ অরাস্থিত হলো। ফুটল বারুদ।

আবার একদিন বিস্ফোরণ হলো খনিতে। মিথেন গ্যাস, কয়লা গুড়ো ও আগুনের নিবিড় যোগসাজসে।

বসল নিরাপত্তা কমিটি। ব্যবস্থা গ্রহণের ফিরিস্তি লাগু হলো ছাদ, জল, আগুন, গ্যাস, বিস্ফোরণ, যান্ত্রিক দুর্ঘটনার মোকাবিলা করতে। লড়াই চলল, মাছুষ ও প্রকৃতিতে।

বন্দী হলো দুঃস্থ দামোদর। বিভিন্ন ড্যাম দিয়ে বাঁধা হলো তাকে। উৎপন্ন হলো জল বিদ্যুৎ। তাপ বিদ্যুৎ।

দাউ দাউ করে জ্বলছে ব্লাস্ট ফার্নেস। নিয়ন লাইটের আলোতে মাতা ধরিত্রীর লাশকাটা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে। তখনো তিনি আর্ন্ত ও পীড়িত। অবসন্ন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

পড়া শেষ হলো হাততালি শুরু হলো।

—দারুণ।

—মার্ভেলাস!

—লা—জবাব।

স্মৃতিবাবু বললেন—একেবারে তাক লাগানো ব্যাপার! খুব খাটতে হবে। তোমরা সব পারবে তো?

—নিশ্চয়।

চরিত্র অনেকগুলি। ব্রহ্মা, ধরিত্রী, ঝড়, জল, বিদ্যুৎ, গাছপালা, বনস্পতি, জীবজন্তু, সরীসৃপ, ডাইনোসর, দামোদর, অজয়, গঙ্গা, গোদাবরী, মালিক, ম্যানেজার, মালকাটা, শ্রমিক, যন্ত্রদানব, ছাদ, গ্যাস, বিস্ফোরণ কয়লা কণা, আগুন, বাতাস, বারুদ, জল-প্লাবন, বিদ্যুৎশক্তি, বাষ্পশক্তি, ড্যাম, ব্লাস্ট ফার্নেস, নিয়ন লাইট, সভ্য মাছুষ।

সবই চরিত্র। তাদের সঙ্গে একজন সূত্রধর। যিনি তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে খেই ধরিয়ে দেবেন; ওটা স্মৃতির করবে। অনন্ত দামোদর। স্বপ্না ধরিত্রী।

এইভাবেই ভাগ হয়ে গেল এক একজনের রোল। কমলেন্দু কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল পাঠ লিখতে।

স্বমিতবাবু একজন নাচগানের মাস্টার ঠিক করলেন। মঞ্চসজ্জা ও সাজপোশাকের ভার তিনি নিজে নিলেন।

লেখাটি শেষ হতে যা দেরি। তারপর দিন আবার খাদের ডিউটি। ডি. ডি. সাহেব বললেন—স্রাও স্টোয়িং পাইপে জ্যাম ছাড়াতে হবে। পারবে অনন্ত ?

—হ্যাঁ স্তার।

—অলরাইট। লোকজন নিয়ে চলে যাও।

একজন ফিটার, একজন হেলপার, দুটি টেণ্ডেল মজদুর নিয়ে ও খাদে নেমে গেল। এটা ওর হামেশার কাজ। সব হৃদিস জানে। পাইপ যেখানে ফেটেছে তাও খুঁজে বের করতে সময় লাগল না। লোকজনকে কাজে লাগিয়ে একটা বালির টিপিতে বসে পড়ল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। ঘামের গায়ে খুব মিষ্টি লাগছে। বেশিক্ষণ থাকলে ঘুমিয়েই পড়বে এমন একটা আলস্য সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা কবিতা লিখলে হয়। অনেকদিন পর কবিতা লেখার কথা মনে পড়ল। পরিবেশটি ভালো। চারিদিক নিস্তব্ধ। দু'একটা আরশুলা উড়ছে ফর ফর করে। মাঝে মাঝে মিস্ত্রীদের হাতুড়ী ঠোকার শব্দ ভেসে আসছে। অনেকদূরে ওদের বাতিগুলো কয়েকটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

পকেট থেকে কাগজ কলম বের করে লিখল—

এবার ফিরে যাব আমার ছোট্ট ঘরে।

নিকানো উঠোন, মাটির দেওয়াল,

খড়ের চাল।

হাতা, খুস্তি, কলসী নিয়ে আমার

দেহাতী বউ

আনাড়ী হাতে সংসার পেতেছে।

উদ্যম আতুল ছেলের গায়ে পরিয়ে

দিয়েছে

লাল জামা, কালো টুপি এবং

উলের মোজা।

সে যদি আমাকে হঠাৎ দেখতে পায়

তবে নাকের নোলক ছলিয়ে হাসবে।

পায়ে মল বাজবে ঝুম্ ঝুম্ শব্দে।

ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে—কতদিন পর এলে!

খেৎ! এটা কবিতা হচ্ছে নাকি? এতো আপন মনের মাধুরী মেশানো স্বপ্ন সাধ। এই নিয়ে কি কবিতা হয়? কবিতার জগত গভীর ভাব চাই।

চিন্তাস্বত্র হঠাৎই ছিন্ন হয়ে গেল। একটা খাদের কুলি এসে ওর হাতে একটা চিঠি দিল। চিঠিটি সুবীরের। কাম শার্প। আরজেন্ট!

লে বাবা! হঠাৎ কি হয়ে গেল? কোনো বিপদ-আপদ? একসিডেন্ট? নাকি গৈরীর কিছু হয়েছে?

অসীম উৎকণ্ঠা নিয়ে খাদ থেকে উঠল।

প্রাক দ্বিপ্রহরের কলিয়ারী। চারিদিক থা থা করছে। যান্ত্রিক শব্দ ও টালোয়ানদের ছুটোছুটি করে টব গাড়ি ঠেলা চলছে দ্রুত গতিতে। এই তো কাজের সময়।

বাতিঘরে বাতি জমা দিয়ে দ্রুত পায়ে মেসের দিকে ছুটল। মেসটাও ফাকা। যেন কেউ কোথাও নেই। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই থ।

—মা!

বাংলা অভিধানের মিষ্টতম শব্দ মা। শরীরের অণু পরমাণুতে আনন্দের স্রোতস্থিনী ধারা। জীবন প্রভাতের মৃতিমতী উষা। পরম কল্যাণদায়িনী মাতা। যা উচ্চারণে সপ্তস্বরী বীণার ঝঙ্কার। যা শ্রবণে হৃদয়ের পরতে পরতে হর্ষ ও গর্বের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস!

অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে দুয়ারে। ওর খাটে বসে আছেন পিসিমা ও পিসেমশাই। মা বসেছেন খাটের পাশেই একটা কাঠের বারুদ বাকসে।

—মা!

মাতৃমূর্তির এক প্রতিচ্ছবি অনন্তর বুকে গাঁথা আছে। ঈষৎ ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার উপর নিবিড় কালো চুলের বোঝা। ছোট্ট কপাল। খর্ব ও কৃশকায়। হুঁচোখের দৃষ্টিতে অপার স্নেহের আলোকরশ্মি! সাদা থান পরে তুলসীতলায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে মন্ড্যাপ্রদীপ।

—মা।

অনন্ত পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

কিছুক্ষণের নীরবতা। অনন্তর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সুবীর ও কমলেন্দু।

ওর পিসেমশাই বললেন—তাকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব অহঙ্কার সব ধুলিসাং করে দিলি অনন্ত। তোর মায়ের কথা মনে পড়লো না?

অনন্তর বুকেটা দুমড়ে উঠল। এই সেই অনিবার্ধ প্রশ্ন একদিন না একদিন যার মুখোমুখি হতেই হতো। কি কৈক্লিগৎ দেবে তার হাজার মুসাবিদা মনে মনে ফেঁদে রাখলেও ঠিক এই মুহূর্তে কোনো উত্তর যোগালো না। সুবীরের মুখের দিকে তাকাল। এত যে স্মার্ট ছোকরা তারও মুখে কথা নেই। কমলেন্দুর দিকে তাকাল। অত যে বুদ্ধিমান ছাত্র সেও বাক্যহারা।

মায়ের সেই স্নেহ কোথায়? ধিকি ধিকি জ্বলছে আগুনের ফুলকি! সুবীরের দিকে তাকিয়ে বললেন—তোমরা বোল বাবা!

—হ্যাঁ মাসিমা ।

ওরা তিন বন্ধু একটা খাটেই বসল ।

উনি বললেন—আজ আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে আমার ছেলে ইন্ডিয়ের দাস । একটা মেয়ের রূপ দেখে ভূতভবিষ্যৎ জাহান্নমে পাঠিয়ে দিলো । একবার মনে পড়ল না মায়ের হৃদয় বেদনা । কুল গৌরব, বংশ মর্যাদা । অমন কঠোর আদর্শবাদী বাপের এত অসংযমী ছেলে ।

একে আমি গর্ভে ধরেছি এ লজ্জা রাখি কোথায় ?

সবাই চুপ । অনেকক্ষণ পর স্ত্রীর বলল ভুল তো মানুষ মাত্রেই হয় ।

—এটা কি একদিনের ভুল ? একটা ছেলের একটা মেয়ের মনের মধ্যে ঢুকে পড়া কি অত সহজ ? তার হৃদয় কি কেউ পাবে না ? তোমরা ওর নিকট বন্ধু । কোনো পূর্বাভাস পাওনি ? মায়ের কাছে সত্য কথা বল ।

কমলেন্দু বলল—তা অবশ্য পেয়েছি মাসিমা ।

—তাহলে রাশ টানোনি কেন ?

মা যে এমন কথা বলতে পারেন, এভাবে জেরা করতে পারেন সে ধারণা অনন্তের ছিল না । ও ভাবত মা আমার সরল, কোমল সহজিয়া মনের মা । শ্রেফ মা ।

—বল বাবা, চুপ করে আছো কেন ? তোমরা কি ফেরাতে পারতে না ?

—কি জানি ?

—এটা কি সং বন্ধুর কাজ হলো ?

স্ত্রীর ও কমলেন্দু মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । ঘাড় হেঁট করে আছে । বেচারীরা মাথা তুলতে পারছে না ।

অনন্ত বলল—ওদেরকে কেন দায়ী করছো মা ?

দায়ী কাউকেই করিনি বাবা !—এই আমার বিধিলিপি । তোমার বন্ধুরা নিজের মাথের কোলে নোনার টাঁদ ছেলে হয়ে রইলো । কপাল পুড়লো আমার ।

অনন্তর অন্তকরণে গভীর রক্তক্ষরণ । গল্ গল্ করে পড়ছে । তীব্র বেদনায় সারা অন্তর টন্ টন্ করছে । চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেছে । কেমন বিকৃত কণ্ঠে বলল—মা । সব কিছুর জন্ম আমিই দায়ী । আমার বন্ধুরা নয় । বহু ভাগ্যে মানুষ এমন বন্ধু পায় । তাদেরকে কিছু বলো না মা । তোমার পায়ে পড়ি শাস্তি যা দেবার আমাকে দাও ।

মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল । ওর মায়ের পা দুটো ধরে কাঁদছে । শক্ত সবল পেশীবহুল একটা শরীর অকলীলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে । স্বাস্থ্যবৎ বসে আছেন মা । দুটো চোখ জলে টলটল করছে । অথচ তারা দুটিতে আগুনের ফুলিঙ্গ ।

স্ত্রীর বলল—অনন্তকে ক্ষমা করুন মাসিমা ।

পিসেমশাই বললেন—অনন্ত কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। ওর দিকে তাকাও বোদি।

পিনিমা বললেন—ছোটবেলায় যে অনন্ত কাঁদলে তুমি খেতে ভুলে যেতে সে আজ কেঁদে মরে যাচ্ছে তবু তুমি পাষণের মতো বসে আছো বোদি।

কি করবো ? যেন কোনো ঈশ্বরবাহিত কণ্ঠস্বরের প্রতিক্রিয়া।

—ওর মাথায় হাতটা রাখো। মনে শান্তি পাক্।

ধীরে ধীরে দুটি হাত অনন্তর মাথার উপর নেমে এল। একরাশ কৌকড়া চুলের মধ্যে দশটি আঙুল ডুবে গেল। বেদনার সমুদ্র থেকে উঁথিত হলো। একটি শব্দ—অনন্ত।

অনন্তর নাভিমূলে সাদা ত্রি-বলয়াকৃতি সর্পিনী সৃষ্টি ভঙ্গের যন্ত্রণায় সহসা গর্জন করে উঠল। তারই সঙ্গে সঙ্গে অনার্থ দামোদরের সম্বন কম্পিত সর্ব অবয়ব সহসা কেটে পড়ল বুককাটা আর্তনাদে।

মা!

ভেঙে পড়লেন জাহ্নবী দেবী। তুষার মৌলি হিমাত্রি ভেদ করে বেগবতী স্রোতস্বিনী সব অহংবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল। মাতৃস্নেহের হুকুলপ্রাবী অশ্রুধারার কি আশ্চর্য মহিমা কারো চোখ শুক রইল না।

অনেকগণ পর আবেগমণ্ডিত হৃদয়বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হলো। অনন্ত উঠে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মেঝেতেই বসে রইল। ওর মা চোখ মুছে আবার স্থির হয়ে বসলেন।

স্ববীর বলল—অনন্তকে ক্ষমা করেছেন তো মাসিমা ?

—ছেলেকে ক্ষমা না করার মতো পাষণী মা তো আমি নই বাবা। কিন্তু যার বোঁ ঘরে এলে সানাই বাজতো, উলুধ্বনি হতো, মঙ্গল উৎসবের আনন্দে বধুবরণ হতো সে কিনা একটা নিচ জাতীয়া মেয়ে, তাই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রী যাকে গাঁয়ের বাউরীরা বলে স্মাঙ্গার কনে তাকে বিয়ে করল!

একে আমি কি করে বরণ করে নিয়ে যাবো ?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারল না। উনি আবার বললেন, সে তো একটা বিবাহিতা মেয়ে ছিল। দীমস্তিনী। তাহলে জেনে শুনে অনন্ত কেন পরের বৌয়ের প্রতি প্রলুব্ধ হলো ? তার দিকে তাকানোই উচিত হয়নি।

অনন্ত বলল—অত বোধবুদ্ধি ছিল না মা।

—কেন ছিল না ? তুমি তো মুখ্য নও। আর সেই মেয়েটিও মুখ্য নয়।

—জানি না মা। হয়তো ওই আমার ললাট লিপি! যেন কোনো অদৃশ শক্তি দুর্নিবার আকর্ষণে আমাদের দুটো জীবনকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করেছি। কিন্তু আমার বিবেকও আমাকে ঐ পথটাই দেখিয়ে দিল।

—ধিক তোমার বিবেককে। বিয়ের আগেই বউ অন্তঃসত্ত্বা! এই তোর বিবেক?

সুবীর বলল—এত খবর আপনি কোথায় পেলেন মাসিমা?

—কেউ অজ্ঞাত শত্রু নয় বাবা। আমাদের শত্রুরাই আমাদের উঁচু মাথা হেঁট করে দেবার জন্য শতকণ্ঠে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। কানে বিষ ঢালছে। যাক-গে আমরা এখুনি চলে যাবো। ওর বউকে দুটো কথা জিজ্ঞাসা করবো? ডেকে দাও।

ছত্রিশ

পিসিমা ও পিসেমশাই মেসেই খাওয়া দাওয়া করলেন। সুবীর নিয়ে এল ফল, মিষ্টি, দুধ। অনন্ত গেছে গৈরীকে ডাকতে।

একটা ডিশে ফল, মিষ্টি সাজিয়ে জাহ্নবীদেবীকে বলল—খান মাসিমা।

—ছেলেদিকে উপোসী রেখে মায়ের কি খাবার রোচে? এই তোমার বুদ্ধি?

—আমাদের যে দেরি হবে মা।

—হোক দেরি। ওসব ঢাকা দিয়ে রাখো। তোমাদের সঙ্গেই বসব।

সুবীর নাচার! এরপর কথা চলে না।

অনেকক্ষণ পর অনন্ত এল। পিছনে গৈরী। পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। কুঁচি দিয়ে ঘাঘরা করে পরা। আঁচলটা ঝাঁ দিকের নীবি থেকে পিঠের উপর দিয়ে সামনে দিকে বৃকের উপর মেলে দেওয়া। ঘোমটা দেওয়া মুখ। ডাঁটো পুরু দেহাতী বধুটি আলতাপরা খালি পায়ে মল ঝুম ঝুম করে এল।

ঘরে ঢুকে অনন্ত আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—মা, পিসিমা, পিসেমশাই। গৈরী দূর থেকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

জাহ্নবী দেবীর ভিতরে কি এক বিজাতীয় ঘৃণার স্রোত কিল বিল করে উঠল। মুখটা কিরিয়ে নিলেন। অনন্ত ওর মাকেই দেখছিল। মুখটা কিরিয়ে নিতেই ওর বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। হয়তো কিছু আশা জেগেছিল মনে।

সুবীর বলল—বোস গৈরী!

গৈরী মেঝেতেই বসে পড়ল মুখটা নীচু করে। কি যেন বিরাট গুরুতর পরীক্ষা দিতে হবে তেমনি হয়ে গেল ওর মুখটা। এই একটি ব্যাপারে অনন্ত ও গৈরী এক ছাঁচে ঢালা। ওদের মনের দুঃখ, বেদনা, আনন্দ মুখেই ফুটে ওঠে।

জাহ্নবীদেবী বললেন—তুমিই গৈরী?

—হ্যাঁ মা!

—গুনেছি তুমি অন্তঃসত্ত্বা। ক' মাস হলো?

—চার মাস চলছে।

এটা একটা নির্দিষ্ট সংবাদ। স্ববীর ও কমলেন্দু এত কাছে থেকেও জানত না।

জাহ্নবী দেবী বললেন—ছিঃ। তোমার লজ্জা করছে না।

যেন একটা চাবুক। ফট করে মুখেই পড়ল। তেমনি এক অব্যক্ত ব্যথার রেখা চিহ্ন ফুটে উঠল গৈরীর মুখে। একটু পর সামলে নিল। অনন্ত মাথা হেঁট করে বসেছিল খাটে! ওর দিকে তাকাল। সে নীরব। মুখটা মলিন।

গৈরী আস্তে আস্তে বলল—আমার লাজ-লজ্জা আপনার ছেলের পায়েই সমর্পণ করেছি। আর তিনি তা রেখেছেন।

—তাই বুঝি আমার ছেলের মুখ পুড়িয়ে কালো করে দিলে ?

—তিনি অগ্নির মতো বহিমান। তার মুখ পোড়াবার সাধ্য কারো নেই।

স্ববীর অনন্তর মুখের দিকে তাকাল। মনে মনে তারিফ করল এই উত্তরটির। পিসেমশাই ঘাড় দোলালেন। পিসিমা স্বগতোক্তি করলেন—বাঃ।

গৈরী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। কোমরের উপরে একটুখানি খোলা জামি ঝক ঝক করছে। ষাগরার কুঁচি আর চওড়া পাছাতে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। পায়ের পাতা দুটি অনাবৃত। বাঁ ও ডান পায়ের অনামিকা ঈষৎ ঝাঁক। পাঁচটি আঙুলেই রূপোর চুটকি। টকটকে আলতার উপর ধুলো বসেছে।

ঘোমটার ফাঁকে নাক ও চিবুক দেখা যাচ্ছে। নাকের উগায় এক বিন্দু ঘাম এবং নোলকটি ঝিলিক দিচ্ছে। ভিতরটা কল কল করে ঘামছে।

নিজেদের ঠেঁঠু কথ্য ভাষা যেমনই বলুক বাইরের কারো সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে হলে কোনো জড়তা আসে না।

জাহ্নবীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—আগে তোমার বিয়ে হয়েছিল ?

—হ্যাঁ মা।

—বিবাহিতা মেয়ে হয়ে অল্প পুরুষে মন মজালে কোন যুক্তিতে ?

—যুক্তি নয় মা। আবেগ বলতে পারেন।

—আবেগটাই বড় হলো ? নৈতিকতার কোনো মূল্য নেই ? এমন করে মজলে যে সতীত্বটাও বিলিয়ে দিতে বাধল না।

—রক্ত মাংস হৃদয় মন একাকার না হলে ভালোবাসার টান কোথা থেকে আসবে মা ?

স্ববীরের মনে হলো হাততালি দেয়। অনন্ত চমকে উঠল। ঠিক এইরকম একটি কথা ওকেও বলেছিল প্রথম মিলনের প্রাক্কালে। এই তাহলে ওর বিশ্বাস।

জাহ্নবীদেবী মুখ বিকৃত করে বললেন—ছিঃ ছিঃ। এত ঢ্যাঁটা মেয়ে তুমি ?

গৈরীর চোখদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঘাড়টা তুলে বলল—তাই বলে আমি অসতী নই মা। যাকে ভালোবেসেছি তাকেই দেহমন উজ্জার করে দিয়েছি। ফাঁকি দিতে চাইওনি, দিইওনি।

—সে যদি তোমাকে ফাঁকি দিত ?

—এই শরীরটা দামোদরের বানে ভাসিয়ে দিতাম। কিন্তু তেমন বিশ্বাসঘাতক সন্তান গর্ভে ধারণ করার লঙ্কা আপনি কোথায় রাখতেন মা ?

সবাই থ। অনন্ত ভাবতেই পারেনি গৈরী এমন জবাব দেবে।

ওর পিসিমা বললেন, বাব্বাঃ। পটাপট মুখের উপর জবাব।

জাহ্নবীদেবী বললেন—সে আঘাত আরো মর্মান্তিক হতো। কিন্তু তুমি কি বলে তোমার বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ ?

—তা কেন বলছেন মা ? বিয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর বয়সে। অভ্যাস বসেই সিঁদুর পরতাম। মনের মধ্যে তার ছায়াটিও ছিল না। জীবনের প্রথম যে পুরুষটির মূর্তি মনের ভিতর ছাপা হলো তিনি আপনার ছেলে।

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। অনন্তর পিসেমশাই বললেন—সবই নিয়তি।

জাহ্নবীদেবী বললেন—পারম্পরিক মেলামেশা হতেই পারে। তাইতে বিবাহকে অস্বীকার করা যায় না।

—অবোধ শিশুর বিয়ের জন্ম সে দায়ী নয়। ওতে আমার হাত ছিল না। আমার যত দায়িত্ব আমার ভালোবাসা নিয়ে। মেজ্জ বলতে পারেন আমি আপনার ছেলেকে প্রলুব্ধ করেছি। সন্ধ্যারাত্রে উনি দামোদরের কিনারে ডিউটি করতেন। আমি পাগলের মতো তাঁর কাছে ছুটে গেছি। আমি অনার্থ কণা তো মা। তাই ছিলাম দুর্বল। আপনার ছেলের কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার।

এতক্ষণে গৈরীর চোখে জল দেখা দিল। আবেগে আশ্রুত কণ্ঠে স্বীকারোক্তি দিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

সুবীর বলল—আবার কান্না জুড়ে দিলি কেন ?

—বেশ করছি কাঁদছি।

—তবে গলা ছেড়ে কাঁদ।

—কাঁদবই তো আমার মতো কে লালিত হয়েচে ? এত অপমান কে সয়েচে ? গাওনার নামে একটা মরদকে ঠেলে দিয়েছিল আমার ঘরে। ভগবান জ্ঞানেন কিভাবে নিজেকে রক্ষা করেছি। কি নির্ধাতন ভোগ করেছি। সব বলেছি আপনার বন্ধুকে।

সবাই চুপচাপ। গৈরীর অন্তর্বেদনার রাশ খুলে গেছে। সবটুকু উজ্জার না হওয়া পর্যন্ত থামবে না।

বলেই চলেছে—কত বলব তিরস্কার ও ভৎসনার কথা। কেউ ভালো করে কথা বলেনি। আমার মা ওষুধ নিয়ে এসেছিল পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করবার জন্ম। আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বামীয়ারা বলল—বেজন্মা ছেলে পেটে ধরেছিল। তবু হেরে যাইনি।

জাহ্নবী দেবীর কাছে এসব তথ্য জ্ঞাত, কিছু অজ্ঞাত। কিন্তু গৈরীর অশ্রুজলে ভেজা উক্তি এমন এক সরল সত্যের মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল যে তাঁরও ভিতরটা টন টন করে উঠল! তবু মন টলল না।

বললেন—আচ্ছা, অনন্তের যে আরো ভাইবোন আছে, বিধবা মা আছে তাদের কথা কি ভেবেছো? সমাজের কথা ভেবেছো?

—ভেবেছি মা। আমি তাঁর জীবনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছি।

—সব বুঝেও আমার ছেলেকে মায়ের কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে?

—তা কেন মা? আপনার মনের মতো মেয়ের সঙ্গে ছেলের আবার বিয়ে দেবেন। আমি কোনো দাবি নিয়ে যাবো না।

—তোমার সন্তান?

—যিনি জন্ম দিয়েছেন তিনিই পিতা। এই দায়িত্বটুকু তাঁর থাকবে। বাদবাকী আমার। আমি হুনিয়ার মেয়ে। মাথায় ঝোড়া বয়ে সন্তান পালন করব। বোঝা হব না।

জাহ্নবীদেবী বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললেন—আমি তো কোনো পাপ করিনি। তবে আমার সন্তান এমন হলো কেন? মাকে দাগা দিল কেন? সে কি জানে না সন্তান মায়ের কত বড় অবলম্বন? সে কি করে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিল? সবারই আত্মপক্ষ সমর্থনের বক্তব্য আছে। আমার কি আছে। মা হয়েছে কি কাঁদবার জন্ম?

জাহ্নবীদেবীর কান্না সপ্তসিন্দুর কল্লোলিত তরঙ্গের মতো সারা মন প্রাণ তোলাপাড় করে বয়ে যাচ্ছে। মুখটা গুঁজে দিয়েছেন দুই হাঁটুর মধ্যে। দমকে দমকে কাঁপছে অস্থিমার শরীর।

অনন্তর বৃকে পাহাড় ভাঙছে। দুম্ দুম্ শব্দে হুন্দুতি বাজছে।

গৈরী লুটিয়ে পড়েছে মেঝেতে। কেউ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে কাঁপছে। তার অনাগত ভবিষ্যৎ কাঁদছে।

অনেকক্ষণ পর উনি মাথা তুললেন। মুখ মুছে বললেন চল ঠাকুরঝি! আর দেরি হলে ওদিকের বাস পাবো না।

গুঁরা উঠে পড়লেন। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। সূর্য পাটে বসেছেন।

বারান্দায় বেরিয়ে অনন্ত বলল, রাগ করে চলে যাচ্ছো মা?

—কি মূল্য আমার রাগের? এই হতভাগী বিধবাকে তো তোর কাছেই হাত পেতে দাঁড়াতে হবে।

অনন্ত মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো। বুকচাপা বেদনার মুহূর্ত্ত!

ওর পিসোমশাই বললেন, পূজোতে বাড়ি যাবি তো অনন্ত?

হ্যাঁ!

ওর মা বললেন—কি জগ্ন ঘাবি ? লোক হাসাতে ? পাড়াপড়শীর টিটকিরি শুনতে ? যেতে হবে না তোকে । আমি বেঁচে থাকতে বাড়িতে ঢুকিস না ।

অনন্ত চুপ করে রইল । ১ মা আজ কত কঠোর ।

শ্বলিত পায়ে উঠে দাঁড়াল গৈরী । অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ে মোচড় খাচ্ছে । দুটি চোখ জলে টল্ টল্ করছে । শাশুড়ী তার মুখ দেখল না ।

গুঁরা চলতে শুরু করে দিলেন । অনন্তর পিসিমা ইচ্ছা করেই একটু পিছনে রয়ে গেলেন । অনন্তর সঙ্গে বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই । পিঠোপিঠি ভাই-বোনের মতো মানুষ হয়েছেন । পরস্পরের খুব টান ।

অনন্তকে কাছে ডেকে বললেন—বউয়ের তো কথা খুব । শিথিয়ে পড়িয়ে ভালিম দিয়েছিস বুঝি ?

—না পিসিমা । ও বরাবরের মুখরা । ভয় ডর নেই । লাজ লজ্জাও নেই ।

—দেখে শুনে বেশ বউ করেছিস তাহলে । বৌদির জেরার মুখে তোরা মিন্ মিন্ করলি কিন্তু ও কেমন ঝাড়া ঝাণ্টা জবাব দিয়ে দিলো । তবে ওর মনটা বড় সৎ রে । তুই যেন অনাদর করিস নে ।

চলতে চলতে মোরাম রাস্তায় পৌঁছে গেলেন ।

বললেন—হ্যাঁ রে ! তোর বউয়ের পা ছুটোই তো দেখলাম । মুখটা ভালো করে দেখতেই পেলাম না ।

—দেখবে পিসিমা ?

—হ্যাঁ ।

গৈরী তখন বারান্দা থেকে নামছে । অনন্ত ওকে কাছে ডেকে বলল, পিসিমা তোকে দেখতে চাইছেন । যা প্রণাম করগে । মুখটা খুলে দাঁড়াবি ।

গৈরী গুঁকে প্রণাম করে ঘোমটাটা সরিয়ে দিলো ।

উনি বললেন—আহা ! বেশ বউ ! ফোটা ফুলের মতো মুখ । মনে কষ্ট রেখো না মা । সব ঠিক হয়ে যাবে ।

—কি আর ঠিক হবে পিসিমা ? গৈরীর কণ্ঠস্বরে রাজ্যের নৈরাশ ।

—তোমরা একটা নতুন সমাজ গড়বে । সংস্কার মুক্ত নির্মল সমাজ ।

গলায় জোর দিয়ে কথাগুলো বলে চলতে লাগলেন ।

অনন্ত গৈরীকে বলল—তুই ফিরে যা গৈরী । আমি মাকে বাসে চড়িয়ে দিয়ে আসি ।

ও চলে গেল । গৈরী সেখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত ও হতাশ ভঙ্গীতে এক পা এক পা করে মোরাম রাস্তার উপর হাঁটতে লাগল ।

ভিতরটা বেদনায় ছিঁড়ে যাচ্ছিল । ছিঃ । তারই জগ্ন একটা সংসার ছার-খার হতে বসেছে । মা কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছেন । স্বামী মাথা তুলে দাঁড়াতে

পারছেন না। তিনি আজ সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এই তাঁর ভালোবাসার ফল।

রাস্তার উপরেই মাথা ঝুঁকতে মন হচ্ছিল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে সামলে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে দামোদরের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। গেরুয়া জলধারা ছল ছল করে বয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশটা লাল। তার প্রতিবিম্ব জলে। গৈরী দাঁড়িয়ে আছে উদাসী চোখ মেলে। প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না।

কানে বাজছে শাস্ত্রির ধিক্কার। তাঁর কান্না।

সেই যখন তার নিজের মায়ে কর্কশ কণ্ঠে ভৎসনা করতো, যখন তাকে কথায় কথায় বলতো—মর। মরে খালাস হ। এত লোক মরে তুই মরিস না কোনে? বুকের উপরে বসে আছিস। কুলখাকী, সাতভাতারী বেজন্মা ছেলার মা হতে লাজ লাগছে নাই।

তখন অহরহ মনে হতো আজই দামোদরে বাঁপিয়ে পড়ব।

পারেনি। গর্ভাশয় থেকে একটি ক্রণ প্রবলভাবে ঘোষণা করেছে আমি আসছি।

সেই তাকে এতদূরে নিয়ে এল।

আজ যদি নুতন করে মরণের ভাবনা ভাবতে হয় তবে কি সে বলবে না—মা! আমাকে তুর এত অবহেলা!

অনন্ত বলবে না—তুই আমাকে কেন দাগা দিলি? তাই যদি দিবি তবে ভালোবাসা করলি কেন?

উঃ ভাবতে পারে না। চারিদিকে বন্ধন। স্বামীর, সন্তানের, বেঁচে থাকার সাধের। অথচ কি যন্ত্রণা!

ক্রমে ক্রমে রাত হয়ে এল। চরাচর ছেয়ে গেল অন্ধকারে। গুরু পক্ষ চলছে। গুরু পক্ষের চাঁদ উঠেছে। সেই মলিন জ্যোৎস্নার মাঝে ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে আছে একাকিনী।

অবশেষে সে বসে পড়ল ঘাসের উপর। হাত পা ছড়িয়ে ব্যাকুল কান্নায় ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মনে হলো বহুদূর থেকে অনন্ত ডাক দিচ্ছে—গৈরী...

ধড়ফড় করে উঠে বসল। ওঃ এমনি করে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ক্লান্ত ও বিষণ্ণভঙ্গীতে চলতে চলতে ধাওড়ায় এল। স্বামী, সন্তান, সংসার সব যেন গাঢ় কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

অনন্ত একটু একটু করে নিজেকে সামলে নিয়েছিল কিন্তু ওর মা এসে আবার ওকে হতাশার অন্ধকারে ঠেলে দিলেন। এবার অবশ্য সিক্ রিপোর্ট দেয়নি।

নিয়মিতভাবে ডিউটি যাচ্ছে। কাজ করছে। সন্ধ্যায় এসে নাটকের রিহার্সাল দিচ্ছে কিন্তু বৃকে বিঁধে আছে এক স্চীতীক্ল শলাকা।

মাছুষের জীবন যন্ত্রণা প্রকাশের একটা মাধ্যম দরকার। কাগজের উপর কালির আখর টেনে ভাষায় মূর্ত করে তার যন্ত্রণাকে। নিজেকে উজ্জার করে দেয় ডায়েরীর পাতায়।

কমলেন্দু পড়ুয়া ছাত্র। প্রতিদিনই সে রাত জেগে পড়াশোনা করে। বইয়ের পাতায় অনন্তর মন নেই। সে তখন ডায়েরী লেখে।

“আমার জন্ম বাড়ির দরজা বন্ধ। আমি দুর্বল, অসংযমী, ইঞ্জিয় পরায়ণ। আমার গর্ভাধারিনী জননী এই ভাষায় আমাকে তিরস্কার করেছেন। গৈরীকে ডাকিয়ে এনে জেরায় জেরবার করে দিয়েছেন। প্রাকারান্তরে তাকে অপমানই করেছেন। মুখ দেখেননি। রাগে ঘুণায়। আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি। কি লজ্জা!

আমিও গৈরীকে মুখ দেখাতে পারিনি। তাকে ভৎসনা শুনে হবে জানলে ডেকে আনতাম না। সে নাকি যাবার সময় টলতে টলতে গেছে। কত দুঃখ বয়ে নিয়ে গেছে বৃকে।

কিন্তু এই যে দুঃখ যন্ত্রণা এর পিছনে তো কোনো মহৎ কল্পনা নেই। কোনো কার্যকারণের সম্পর্ক যাতে মাছুষের কল্যাণ হতে পারে তাও নেই। এটা নিছক আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অথচ আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল। খনি শ্রমিকদের নিত্যকার দুঃখ যন্ত্রণা ভারবাহী পশুর মতো জীবন যাপনের মানি, শোষণ ও নির্ধাতনের বলি হয়ে দিনগত পাপক্ষয় করার প্রয়াস বিস্ফোরণের মুখে উড়িয়ে দেবো। তাদেরকে অধিকার সচেতন করবো। স্বাধীন দেশের নাগরিক হবার যোগ্য করে তুলবো।

কিন্তু কি হলো? বড় বড় নেতার শাস্তি চুক্তির আড়ালে বসে শাসকের শাসন দণ্ড দৃঢ়তর করার সুযোগ করে দিলেন। যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা গণ আন্দোলনের রূপ নিতে পারতো। ভেঙে যেত সাহেব সুবোর কুঁট চক্রান্ত। এজেন্ট সাহেবের অহংকার। ঝড়ের মুখে কুঁটোর মতো উড়ে যেত সন্তিপ্রসাদের সাধের গোলদারী। শালা সুদখোর।”

মঞ্চস্থ হলো অগ্নিসংস্কার। অভাবনীয় সাফল্য। হাততালি ও অভিনন্দনে ধন্য হলো শিল্পী ও কলা কুশলীরা।

বৈশাখী, কুস্তী ফান্তনী ও গৈরী এসেছিল সে অহুষ্ঠান দেখতে। গৈরীর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। সে কি গর্ব ওর।

শো শেষ হবার পর কমলেন্দু অনন্তকে ডেকে আনল। তারপর সবাই মিলে মেসে গেল। খাওয়া দাওয়া হৈ-হন্না হলো। বৈশাখী ও কুস্তী অনেক ঠাট্টা

তামাশা করে যাবার সময় বলল—গৈরী আজ রেতে তুমার কাছে থাক জামাই । না হলে তুমিও ঘুমাতে লারবে । গৈরী তো কেঁদেই মরবে ।

কমলেন্দু বলল—বলেছিলাম এই শয্যায় যেন তোমাদের ফুলশয্যা হয় । হলো তো ! চিয়ার ইউ ।

সেই একটা রাত এল ওদের জীবনে স্বপ্নের রাত ।

তারপরই পুজো শুরু হলো । বিশাল মেস বাড়ির একটা ঘরে দুজনের কুঞ্জন গুঞ্জন । দুটো দিন কেটে গেল ভালোবাসার আবেশে । দশমীর দিন ওদের নিমন্ত্রণ হলো বিউটির বাংলোতে ।

গৈরীর ভিতরে লজ্জা ও ভয়ের গুর গুরানি । কথায় কথায় বিউটি ওর আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে বলল—এবার তুমি যথার্থই অনন্তর বউ হও গৈরী ।

চোখ ডাগর করে ও বলল—সে কি দিদি ? আমি কি ওর বউ নই ?

—তুমি ওর সাতপাকে বাঁধা বউ । কিন্তু দুজনের হুরকম মডেল চলবে কেন ? দেহাতিনী বধুর রূপসজ্জায় তুমি যে নিজেকে ছাপামারা করে রেখেছো । এই খোলস ছাড়ে । হাঁচ বদলাও ।

হুঁহাতে গোছা গোছা কাঁচের চুড়ি, রূপোর গয়না, লাল ফলের মালা, নাকের নোলক, পায়ের মল, আঙুলের চুটকি, ঘাঘড়ার মতো কুঁচি দিয়ে পরা শাড়ি, কতুয়ার মতো ব্লাউজ খোলা করিয়ে সাবানের ফেনায় সারা গা ধোলাই করলো । তেল চুকচুকে চুলের বাহারী খোঁপা ভেঙে শ্যাম্পু দিল । এক সেট নতুন শায়া শাড়ি ব্রেসিয়ার ব্লাউজ পরিয়ে হাল্কা প্রসাধন করল । হাতে লোহা শাঁখা, একজোড়া করে সোনার চুড়ি, গলায় শুভ এবং কানে রিং পরিয়ে অলংকরণের কাজ শেষ করলো । বিরাট চুলের বোঝা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করল চালচিত্র । সিঁথিতে গুঁড়ো সিঁহুর ও কপালে টিপ পরিয়ে দাঁড় করালো অয়নার সামনে ।

অনন্তকে ডেকে বলল—তোমার বউকে চিনতে পারো ?

ও অবাক হয়ে দেখল । বলল—উঃ দিদি ! কি করেছে ?

—আমি কুমোরের মেয়ে । কেমন একটা প্রতিমা সাজলাম বল তো ?

—দারুণ ।

—রূপ থাকলেই রূপসী সাজানো যায় । গৈরী তো রূপবহি ।

—কিন্তু ওর বস্ত্র যৌন্দর্ঘটা—

—রূপান্তরের প্রয়োজন আছে । জীবনের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সাজ পোশাকের পরিবর্তন প্রয়োজন । তোমাদিকে ভিন্ন দেখাতো । এবার সমান সমান দেখাবে । সপ্তস্বরের তরঙ্গ রাশিতে কোন সুরটি যে কখন মর্মস্পর্শী হয়ে উঠবে তা কে বলতে পারে ? না হলে ভ্রষ্টা নারীর অন্তরে এতো স্নেহের প্রশ্রবন কোথায় লুকিয়েছিল ? নিশ্চয়ই তার জীবন রন্ধে । সারা কলিয়ারীতে দিবি

বলে ডাকবার মানুষ এই একটাই, বাকী লোকে যে তাকে কি বলে তা তার অজানা নয়। তাহলে সে অনন্ত-গৈরীকে ভালোবাসবে না তো কি ?

ওরা সেই ভাবনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। হঠাৎ গৈরী ওর জামা ধরে টানল। অনন্ত মুখ ফিরিয়ে বলল—কি ?

ফিস্ ফিস্ করে ও বলল—চল না—দামোদরে প্রতিমা ভাসান হচ্ছে দেখি গিয়ে।

অনন্ত মুখ টিপে হাসল এবং অ্যাভার্ট টার্ন-করে ফরওয়ার্ড মার্চ শুরু করে দিলো। জ্যোৎস্নায় প্রাণিত দামোদরের বালুকাবেলা। দু'পাশে তটভূমিতে ঝাপসা অন্ধকারে ঢাকা গাছ গাছালীগুলোকে মনে হচ্ছে অপার রহস্যময়।

ঢাক বাজছে। প্রতিমা নিরঙ্গনের শোভাযাত্রা হচ্ছে। হাউইবাজী উড়ছে। তারাফুল জ্বলছে। রঙে রঙে ছেয়ে গেছে আকাশ। লাল নীল আলোর বহা বইয়ে দিচ্ছে বারুদের ফুলঝুরি।

নীল আলোর ঝলকানি দিচ্ছে ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং মেশিন। জরুরী কাজ চলছে তিন ও চার নম্বর চানক ও সাইডিংয়ে। ঢাকের বাত্ব ছাপিয়ে উঠছে ঠাই ঠাই হাতুড়ী পেটার যান্ত্রিক শব্দ।

ঢাকে বাজছে বিসর্জনের বাত্ব। যন্ত্রে বাজছে শিল্প বিপ্লবের বাত্ব। সেও এক বিসর্জনের বাজনা। পুরানো যুগের বিসর্জন।

চারদিন অনবরত কাজ করে পট পরিবর্তন হয়েছে কলিমারীর চালচিত্রে।

বিজ্ঞান ও কারিগরী কৌশলই তো যুগান্তরের বার্তা নিয়ে আসে। যে বার্তা—শ্রমিক ছাঁটাই ও মালিকের মুনাফা কামাবার বার্তা। ওয়েল্ডিং মেশিনের নীল আলোতে সে বার্তা পৌঁছে গেছে সমঝদারের কাছে।

কাল থেকে শুরু হবে নতুন যুগ। তারপর ?

নিসর্গের রূপ-রস-গন্ধ ও শব্দে আবেগ জড়ানো অনন্তর চোখ দুটি প্রথর হয়ে উঠল সেই যান্ত্রিক শব্দ ও দৃশ্যের মর্ম বুঝতে পেরে। গৈরীর হাত ধরে দাঁড়াল সেই যুগ সঙ্ক্ষিপ্তে।

ডাক দিচ্ছে অনাগত ভবিষ্যৎ।

কাল বয়ে যাচ্ছে নিরয়ণ কালচক্রের অমোঘ নিয়মে।

এ তো সরকারী কয়লাখুটির সাত ভাতারের বেছদা কারবার নয়, মালিক জমানার অ্যাকশন প্রোগ্রাম। যেমন তাদের কারিগরী কৌশল তেমনি তোড়জোড়। চারদিন ছুটির মধ্যেই বদলে দিল তিন ও চার নম্বর পিটটপের ভূগোল। আর কয়লার টব গাড়ি উন্টে বেলচা কোদাল দিয়ে ঝাড়াই করার ব্যাপার নেই। মাথায় ঝুড়ি বয়ে ওয়াগন বোঝাইয়েরও কাজ নেই।

নতুন প্রক্রিয়ায় ডুলি থেকে বোঝাই টব গাড়ি বের করে ঠেলে দেওয়া হলো।

টিপলারে। ইলেকট্রিক মোটর চালিত টিপলার এক পাক ঘুরে সব কয়লা উগরে দিল নীচের চলমান বেল্ট কনভেয়ারে। সেখান থেকে বাস্কার। তারপর ক্রিনিং প্র্যাণ্ট। স্ল্যাক, রাবল ও স্টিম তিনরকম সাইজে কয়লা ভাগ হলো চালনা দিয়ে। তারপর পড়ল গিয়ে সোজা ওয়াগনে।

ফুলি কামিনরা হায় হায় করে উঠলো। একি সর্বনাশ। মেশিনে যদি ওয়াগন বোঝাই হয় তাহলে ওরা কি করবে ?

হপ্তা হাজরি শূন্য। চারশো জন ওয়াগন লোডার বেকার। এতদিন যারা গাড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে রেঘারেঘি ও ঝগড়া বিবাদ করত তারা এক জায়গায় জুটল। অনেক শলা পরামর্শ করল। কোথায় গেল জাতপাতের ক্ষুদ্র স্বার্থ। নিজের রুজি রুটির তাগিদে চরিতরও কিষণকে ধরল। যারা একদিন মংগু সরদারের ধাওড়ায় গিয়ে গুলুকে জ্বাতে পতিত করার দল ভারী করেছিল তারাও বুঝল শিরে সংক্রান্তি কাকে বলে।

মংগু সরদার কোম্পানীর পেয়ারের লোক। চরিতরের যেমন ছেলেমেয়ে, ভাই ভাইপো নিয়ে একটা বড় গোষ্ঠী আছে ওরও তাই আছে। যদিও অতবড় নয়।

ডি. সি. সাহেব তাদেরকে অগ্রান্ত কাজ দিয়ে খুশী করে দিয়েছেন। মংগুকে করেছেন মুনশী। চরিতরের উপর টেকা দিতে আরও যা দরকার করবেন।

কিন্তু তার গোষ্ঠী বহির্ভূত শ্রমিকরা তো বেকার হলো। তারা কেন আসবে না ইউনিয়নের টিকিট কাটতে ?

অতঃপর অনন্তকে এসে বসতে হলো ওদের চবুতরায়। মংগু বাদে সব সরদার হাজির।

উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা। কথার পিঠে কথা। খবরের পর খবর। অনন্ত গোটা ব্যাপারটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বুঝে নিল।

কথায় কথায় রাত বাড়ছে। এখানে সেখানে পুঞ্জ পুঞ্জভাবে বসে গাঁজার কঙ্কেও চালাচ্ছে। মদ খাবার পয়সা নেই। না হলে দশ বিশ বোতল এসে যেত।

অনন্ত বলল—কথা তো অনেক হলো। এবার লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়। এতগুলো মানুষের পেটের ভাতের সমস্যা। জান কবুল করেই লড়তে হবে।

—তা তো বটেই। সবাই সমর্থন করল।

—আর বোঝা কমাও বুড়ো বুড়ি, বাচ্চা-কাচ্চা, বে-কামের জানানো দেশে পাঠিয়ে দাও। লড়তে হলে পিছু টান রাখা ঠিক নয়।

শকুন্তলা বলল—কি করতে হবেক তাই বল ভাইটি। যা বলবে তাই করব। ইয়ার মধ্যে দুই দুই নাই। সাহেব খালভরার আমাদের লহ চুশে খেয়েছে।

জোয়ান কালে মজা লুটেছে। এখন পেট উপোস দিঞে মরি। আমরাও ইয়ার বদলা লিব।

চরিতর যদি বা কিছু সমঝোতার সুযোগ হলে মানতে রাজী হবে। ওরা তা নয়। তিতরে ভিতরে যে তুষের আগুন জ্বলছিল তাই এখন লকলকে শিখা বিস্তার করছে। শুধু একটা পথ বাংলা দেওয়া। নেতৃত্ব দিলেই জান কবুল করে লড়ে যাবে।

অনন্ত বলল—সুমিতদা তোমাদের ব্যাপারে আলোচনা করতে গেছেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের সঙ্গে। তোমরা কাল আটটার সময় মিছিল করে অফিসে এসো। এজেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। মিটিং করবো। স্মারক পত্র দেব। দরকার হলে পুলিশাকা বন্ধ করবো। তামাম কলিয়ারী বন্ধ। সাইজিংয়ে ওয়াগন বন্ধ। ঠিক হায়?

—জরুর। অনেকগুলো কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হলো।

রাত তখন দশটা বেজে গেছে। লোকজন চলে যাচ্ছে। অনন্তও যাবার জন্ত তৈরি। চরিতরকে বলল—সরদার। আর পিছে হঠার জো নেই। কাল সকালে বেবাক কুলিকামিন নিয়ে অফিসে এসো। আমি চলি।

গৈরী কোন অন্ধকারে বসেছিল কে জানে? হসু করে হাজির হলো।

বেশ লুকুটি করেই বলল—যাবে কি রকম? খেয়ে যাও।

অনন্ত ওদের জামাই। চবুতরাতে বসে ইউনিয়নের মিটিং করে চলে যাবে এটা হতে পারে না। হাত ধরে টেনে নিয়ে এল। গুলুর বারান্দাতেই বসতে দিল। শুরু হলো প্রণাম। কত যে ছেলে মেয়ে ওকে প্রণাম করে গেল তার সংখ্যা নেই। তারপর গান। অনন্তর কি সাধ্য তার অর্থ বোঝে।

মস্ত বড় কাঁসার খালায় ফুর ফুরে ভাত। মুরগির মাংস। ভাল তরকারি। নানা রকম ভাজাভুজি। ওকে চারিদিক থেকে ঘিরে বসেছে কতগুলো বোঁ-ঝি। বয়সে যুবতী। গা-ভর্তি রূপোর গহনা। মাজা ঘষা রঙ। কে বলবে এই মেয়েগুলি কয়লার মুড়ি মাথায় নিয়ে ওয়াগন বোঝাই করে। যদি চাকরি থাকতো তাহলে আরো কত না আমোদ স্তুতি করতো।

কথা অনেক হলো। হাসি ঠাট্টাও কম নয়। অনন্ত খেয়ে দেয়ে হাত ধুলো। ওদের বড় ভোজী বৈশাখী এক প্যাকেট সিগারেট ও একটি দেশলাই এগিয়ে দিলো।

অনন্ত বলল—ও বাব্বা। আয়োজনের কিছু ক্রটি নেই ভোজী।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে বলল এবার তাহলে ছুটি দাঁও। আমি চলি।

বৈশাখী বলল—যাবে কেন জামাই? হনিয়া ঘরে ভাত খেয়েছো, হনিয়ার

বিটি নিয়েছে। আর কি তোমার জ্ঞাত আছে? রাতটা হুনিয়া ঘরে থাকলে নতুন কি ক্ষতি হবে? বরং কিছু পাওনা হবে।

ইঙ্গিত পূর্ণ ভঙ্গীতে গৈরীর দিকে তাকাল। অনন্তের বৃকের ভিতরটা ছাড়া করে উঠল। বড় কোমল জায়গায় ঠোকা দিয়েছে ভোজী। হুনিয়া খাণ্ডায় জামাই হবার যেটুকু বাকী ছিল তাও সেদিন পুরো হয়ে গেল।

স্মিতবাবু সাসপেও হয়ে গেলেন। সেদিন যে মিছিল সমাবেশ হলো তাতে উনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাই কর্তব্যে অবহেলা, বে-আইনী জন সমাবেশ, কোম্পানীর বিরুদ্ধে উস্কানি মূলক ভাষণ ও জনতাকে ক্ষিপ্ত করে কর্মাধ্যক্ষের পিছনে লেলিয়ে দিয়ে তাঁদেরকে অপমান করা ও দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবার চেষ্টা— ইত্যাদি অভিযোগ ছিল চার্জশিটে।

তার চেয়েও বেশি দুশ্চিন্তার কারণ ঘটল স্বপ্নার বাড়িতে। গুর বাবা যা-তা অপমান করলেন গুদের দুজনকেই। স্বপ্নার তা সহ্য হলো না। রাতটা ফুরোতে যা দেরি। সকালেই সে স্ট্রেকেস হাতে মেসেই চলে এল।

বাস। আবার কি? বেজে গেল বিয়ের বাজনা। অনন্ত গৈরীর মতো গুদেরও বিয়ে হলো কল্যাণেশ্বরীতে।

সেই একটা সময়। খনি শ্রমিকদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ। ছোট বড় সব কোল কোম্পানীর মালিক, ম্যানেজার, ডাইরেক্টর ও চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারদের চোখের ঘুম চলে গেছে। তামাম খনি অঞ্চল জুড়ে শ্রমিক আন্দোলন।

তার মোকাবিলার জন্য নিতানূতন দমনমূলক ব্যবস্থা। শ্রমিক ঐক্য ভেঙে চুরমার করার নানাবিধ কৌশল। ষড়যন্ত্র। ইতঃসত্ত মারদাঙ্গা, খুন খারাবী, নারীধর্ষণ চলছে। চাকরীতে জবাব তো মামুলি ব্যাপার। ইউনিয়নের কর্মীদের জীবন হাতে নিয়ে কাজ করতে হতো। মালিকের ভাড়াটিয়া গুণ্ডা কখন যে ছোবল মারবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এই বিভীষিকার মধ্যে কাজ করে যায় স্মিত, স্বপ্না, অনন্ত, গৈরী, গুরুনাম সিং, রূপাল সিং, রামধনি, এতোয়ারী, হরিহর গান্ধী, তিলক সিং, রাম স্বরূপ, জগদীশ, চরিতর, শম্ভু, শকুন্তলা, ফুলমণিয় দল।

আন্দোলনের ঢেউ লোকসভাকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। বাম দক্ষিণ সব দলীয় নেতারা খনি শ্রমিকদের প্রতি দমন নীতির কথা পুনঃ পুনঃ লোকসভায় আলোচনার মধ্যে টেনে এনেছিলেন। বহুবিধ প্রস্তোত্তর হয়ে গেছে ও হচ্ছে! শ্রম মন্ত্রক স্থবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন।

স্বয়ং নেহেরুজী বলেছেন খনি শ্রমিকদের আন্দোলন শ্রাস্তসঙ্গত। তাদের উপর দমন পীড়ন চলছে। সরকার তা সমর্থন করে না।

টাইবুয়াল বলেছে। নানা দাবি দাওয়ার সঙ্গে চাকরীর স্বায়িত্বের জন্য শ্রমিক

নেতারা জোর দাবি তুলেছেন। সুনানী চলছে। প্রায় শেষ পর্বে এসে গেছে। জাজমেন্টের জ্ঞান সবাই অপেক্ষা করছেন।

আবার শ্রমিকদের একটা অংশের মরহুমী স্বভাব ধর্মও ছিল। তারা সব ক্যাজুয়াল লেবার। চাষবাস ধানকাটার সময় দেশে চলে যেত। ফাস্টন ও বৈশাখে বিয়ের লগন। পৌষমাসে বীদনা পরব। নিত্য নূতন শ্রমিকের দল আসত ও চলে যেত।

ইউনিয়ন নূতন শ্রমিক ঢোকান পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সন্তিপ্রসাদের মতো গোমস্তা তার দালাল, আড়কাঠি, সরদাররা হাজার চেষ্ঠাতেও তা পেয়ে উঠছিল না। ফলত শ্রমিকের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এই ঘটনাটি পূরণ করতে না পারলে প্রোডাকশন বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই প্রায় সব কলিয়ারীতেই প্রোডাকশন নিম্নমুখী ছিল। অশান্তি গুরু হলে তার জের মিটতে চায় না। আর তার প্রথম ধাক্কাটা প্রোডাকশনেই পড়ে।

গুণাগন লোভারদের বিনা নোটিশে ছাঁটাই নিয়ে পর পর কয়েকটা মিটিংয়ে কোনো ফল হয়নি। সর্বশেষ মিটিংয়ে সি এম এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন পুরুষদিকে খাদ্যে কয়লা লোভারদের কাজ দেওয়া যেতে পারে। মেয়েদিকে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়।

নীতিগত কারণেই ইউনিয়ন সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। কারণ তাতে মালিকের স্বার্থটাই পূরণ হবে। শ্রমিকদের লাভ নেই। পুরুষরা তো যে কোনো কাজ করতে পারে। কোম্পানীরও খাদ্যে লোভারের দরকার। মেয়েদের কি হবে ?

তাছাড়া এমন মেয়ের সংখ্যা অনেক যাদের পুরুষ নেই। মেয়েরা নিজের রোজগারে ছেলেপুলে মাহুষ করছে।

শকুন্তলা ফুলমণিরই সেই দশা। কোন যৌবনকালে তারা স্বামী পরিত্যক্তা হয়েছে। অথচ স্বামীর দেওয়া সন্তানগুলি তাদের ঘাড়ে চড়ে আছে। তাদেরকে তো তাড়িয়ে দিতে পারে না। বাপে তো ছেড়ে দিয়ে পার পেয়ে গেছে। মায়ে কি ছাড়তে পারে ?

তাছাড়া সব সন্তান যে একই স্বামীর প্যায়দা তাও নয়। বিয়ের পর স্ত্রী তারপর আবার স্ত্রী। এক পুরুষ ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস-এসব তো আছেই। সেজ্ঞান দায়ী হতে পারে স্বভাব ধর্ম অথবা দায়ে পড়ে। যৌবন কালে তাদের যৌবন লুটবার রসিক তো কম ছিল না। এসব সামাজিক সমস্যা। অজ্ঞান ও অবিচারের শিকার।

ইউনিয়ন তাদেরকে ফেলে দিতে পারে না। নাকের বদলে নরুণ নিয়ে আন্দোলনের ধারণা কমিয়ে দিতে পারে না। যত বেকার হবে ততই তো তাদের দল পুষ্ট হবে। শুধু পুরুষদের চাকরীটা মেনে নিলে যারা চাকরী ফিরে পাবে

তাদের দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করার পর পেটে ভাত পড়লেই টিলে হয়ে যাবে। আর কি তাদের লড়াইয়ের জোর থাকবে ?

কাজেই ইউনিয়ন সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।

এজেন্ট সাহেব প্রচার সুরু করে দিলেন শ্রমিক নেতাদের অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অনন্ত খুব দুঃখিত। হুনিয়া ধাওড়ায় তার নিত্য যাতায়াত। সেখানকার দারিদ্র্য সে নিজের চোখে দেখছে।

অন্তের কথা কি বলবে ? চরিতরের বউ বিটিদের গা থেকে গয়না খসে পড়ছে। যে বৈশাখী, কুস্তীর গায়ে সেরের ওজনে রূপোর গয়না হুলত তাদের গলা কোমর ফাঁকা হয়ে গেছে। টম্ টমে মুখগুলো শুকিয়ে আমশি। ফাস্তনী গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়।

এই মেয়েগুলির প্রতি অনন্তর একটা দুর্বলতা গড়ে উঠেছে। হওয়াই স্বাভাবিক। ফাস্তনী গৈরীর সহেলী। ওরা দুজন বোদি। বৈশাখীর ছুটি ছেলে। স্বভাবটি সরল কোমল। গৈরীকে স্নেহ করে। সেই কারণে অনন্তর প্রতিও একটা টান পড়ে গেছে। আর এই অন্তরের সম্পর্কটি এমন মধুর এত আকর্ষণীয় যে তা এক তরফা হয় না। ওদের যদি অনন্তর প্রতি টান থাকে তবে অনন্তর কেন থাকবে না ?

সে ভাবে ওদের যদি আবার চাকরী হয় তবে কত না খুশী হবে। আবার ওদের মুখে কোমল লাভণ্যের ছোঁয়া লাগবে। সোহাগে আদরে স্বামীর অন্তর ভরিয়ে দেবে।

এই সব মেয়ের জাতই আলাদা। এদের আন্তরিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

শীতের ভোর। ধোঁয়া ও কুয়াশায় ঢাকা রাত্রির অন্ধকার সবে মাত্র ফিকে হয়ে আসছে। রেলের পাইলট ইঞ্জিন পঁচিশটি খালি ওয়াগন নিয়ে কলিয়ারী ঢুকবার মুখে ফাটকবাজারের কাছে এসে থেমে গেল। ঘন ঘন সিটি মারতে লাগল।

রেল লাইনের উপর বড় বড় কাঠ ও পাথর দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে প্রায় দু'তিনশো পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক লাইনের উপর বসে আছে। দু'তিনটি ভাটার মতো আগুন জ্বলছে। রেল লাইনের আড়াআড়ি এক সারি পতাকা উড়ছে। শ্রমিকরা শ্লোগান দিচ্ছে—পাইলট ইঞ্জিন ফিরে যাও।

দূর থেকে এসব দেখেই ইঞ্জিনের চালক দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

জগদীশ, হরেরাম, রামধনি, গুরুনাম সিংয়ের দল টপাটপ ইঞ্জিনে উঠে ইঞ্জিন ড্রাইভার ও খালানীকে টেনে নামিয়ে দিল। শুধু বাউরীর দল গার্ড সাহেবকেও নামিয়ে দিয়েছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে গেল। লোকজনের ছুটোছুটি। ম্যানেজার এজেন্টের ঘন ঘন টেলিফোন। পুলিশ, রেলগুয়ে সবদিকে খবর টেলিফোন বাজছে হালো হালো—

অনন্ত মেসে ঘুমোচ্ছিল। একজন গুয়াগন লোডার তাকে খবর দিয়ে গেল। সে আবার স্থমিতবাবুকে উঠিয়ে ভোরের গুয়াগন অবরোধের সংবাদ দিয়ে বলল—দাদা। এরা তো বেশ মুন্সিল করে ফেলেছে।

উনি বললেন—মুন্সিলের কি আছে? শ্রমিকরা যখন নিজেই অগ্রণী হয়ে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে তখন আমাদের কর্তব্য তাদের সামনে দাঁড়ানো। তুই স্পটে চলে যা। আমি যাচ্ছি।

অনন্ত ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে দেখল হুনিয়া ধাণ্ডার সব কুলিকামিন সেখানে মজুত। তাছাড়াও অগ্নাশ্র ধাণ্ডার কুলিকামিনরাও এসে জুটেছে এবং আরো আসছে।

গৈরীর হাতে একটা পতাকা। সে রীতিমতো উত্তেজিত।

এক হাত কোমরে। ডান পা-টা সামনে বাড়ানো। মুখটা টক টক করছে। ঠোঁট দুটো ফুলছে। যেন চিৎকার করে কিছু বলতে চাইছে এমনি ভঙ্গী।

অনন্তকে দেখে থমকে গেল। মুখটা ঘুরিয়ে নিল ওর দিক থেকে। স্বভাববশত কোমর থেকে হাতটা তুলে মাথার ঘোমটা সরাল। ওর মুখে না ফুটল আপ্যায়নের হাসি—না একটা কথা।

অনন্তর কি রকম নতুন নতুন লাগল ওকে। নাম ধরে ডাকল—গৈরী!

মুখ ঘুরিয়ে বলল—কি?

ওর কণ্ঠস্বরের রুপ্ততায় অনন্ত আর একবার চমকাল।

বলল—এ তোরা কি করেছিস রে?

—কি আবার? দেখতে পাচ্ছে না?

—এতসব করবার আগে আমাকে তো বলতে হতো!

—বলবো আবার কি?

—বলবি না?

—না। তোমরা হচ্ছে গান্ধীবাবার শিষ্য। শান্তিপ্ৰিয় মানুষ। আমরা আর শান্তি শান্তি করে উপোস দিতে পারবো না।

—কিন্তু এর পরিণাম জানিস?

—জানি তোমার যদি ভয় লাগছে তবে এই নাও চুড়ি পরে মেলে বসে কবিতা লিখো গে। বড় বড় বিক্ষোভক কবিতা।

হাত থেকে একটা চুড়ি খুলে নাচাল। ওর পাশে দিদি-বোদি শ্রেণীর কয়েকটি মেয়ে মুখ টিপে হাসল। অনন্তর মাথায় রাগ চড়ে গেল। গৈরীর হাত-

থেকে জোর করে পতাকাটা নিয়ে তুলে ধরে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ।

শ্লোগানের ধ্বনিতে উখাল পাখাল জন সমাবেশ।

স্বমিতবাবু, তিলক সিং, হরিহর গান্ধী প্রমুখ নেতারাও এসে হাজির হলেন। কোথা থেকে মাইক নিয়ে এল একজন। শুরু হলো ভাষণ।

বাস। হটযোগে হট আন্দোলন লাগু হয়ে গেল।

গোবিন গান ধরল—

মেরে মাঙ্ পুরা করো !

না হয় মেহেরবাগী

না হয় জুলুমজারী

হকিকৎ হয় হামারী।

স্বরটা গরম। বোল তার চেয়েও। গোবিন যেন চারণ কবি। এই গোবিনকেও নতুন করে চিনল গুরা।

ওয়ান অবরোধ আন্দোলনের শুরুটা গা-জোয়ারী হলেও পরে নেতারা এসে সেটাকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের রূপ দিয়েছিল। রেল লাইনের উপর বসে ভাষণ-শ্লোগান, গণ জাগরণের গান ইত্যাদিতে হিংসার ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল।

তখন এল পুলিশ। পর পর দু'তান। দুজন অফিসার ও জনদশেক পুলিশ সোজা সেখানে এসেই নেতাদিকে গ্রেপ্তার শুরু করে দিলেন। স্বমিতবাবু তেমন কিছু বাধা দেননি। কিন্তু অনন্ত রুখে দাঁড়াল। সরাসরি অফিসারকে চ্যালেঞ্জ করে বলল—কোন আইনে আপনি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন ?

উনি বললেন—খানায় চলুন। আইনটা বুঝিয়ে দেবো।

—না। যাবো না।

অন্ত অফিসারটি বলল—তোমার বাপ যাবে।

অনন্তর ব্রহ্মতালু জলে গেল। সপাটে একটি চড় বসাল অফিসারের গালে। বলল—খবরদার। বাপ তুলে কথা বলবে না।

ওর কথা শেষ হলো না। একজন পুলিশ মাথায় লাঠি মারল। দুজন ওকে চ্যাঙদোলা করে তুলে ভ্যানে চড়িয়ে দিলো।

গোবিন চিংকার করে উঠল—মারো শ্রালে পুলিশকে।

শুরু হয়ে গেল হাতাহাতি লড়াই। লাঠি চার্জ।

গৈরী অনন্তকে ধরে নিয়ে যেতে দেখে ভ্যানের দিকে ছুটে যাচ্ছিল। জগদীশ ওর রাস্তা আটকে বলল—মৎ যা। জলদি হিঁদ্রাসে ভাগ। সব জানানা হঠো।

ভারপরই সে হুকার দিলো—সারে জানানা ভাগ যাও।

গৈরী ওর কথাটা এক পলকেই বুঝে নিল। তৎক্ষণাৎ পিছন ফিরে দৌড়াল।

অস্ত্রাশ্র মেয়েরাও এদিক ওদিক ছুটে পালিয়ে গেল। কেউ কেউ লাইন ধারে দাঁড়িয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে টিল ছুঁড়তে লাগল।

সে এক ভীষণ বিশৃঙ্খল অবস্থা। মারদাঙ্গা, টিল ছোঁড়াছুঁড়ি। উভয় পক্ষের জখমী জ্ঞান মাটিতে পড়ছে। রক্ত বইছে। তালেগোলে সতিপ্রসাদের লোকজন দাঙ্গা লড়তে নেমে পড়েছে। ছটু সিং, লটু সিং ফরি খেলে বেড়াচ্ছে।

টিল পড়ছে অবিরল ধারায়। রেল লাইন বরাবর শ্রমিকদের দখলদারী। টিল তো হাতের কাছেই। জনকয়েক পুলিশ ঘায়েল হয়ে গেল।

কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের মাথায় যখন টিল লাগল তখন তিনি ফায়ারিং অর্ডার দিলেন।

এক রাউণ্ড, দু রাউণ্ড, তিন রাউণ্ড।

গুলি চলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরা যে যেদিকে পারল দৌড় শুরু করল। পড়ি কি মরি দৌড়ে কতলোক হৌচট খেয়ে পড়ল। কতক গুলি খেয়ে পড়ল।

ফাটকবাজার ছত্রখান। আহত শ্রমিকদের রক্তে ভেসে পথের ধুলো ভিজে গেল।

আর বৃকে বুলেট নিয়ে পড়ল গোবিন। চরিতর সরদারের ভাই। এক মহৎ সঙ্গীত শিল্পী। যার রামধুন শুনলে শ্রোতারা রোমাঞ্চিত হতো।

এদিক সেদিক আহত ও গুরুতর আহত মাহুষের আর্ত চিৎকার ও রক্তপাতে বোঝা যাচ্ছিল না কে মরল বা কে বাঁচল। তারই মধ্যে পড়ে গোবিন আর্তনাদ করে বলল দুনিয়ার শ্রমিক জিন্দাবাদ।

আসামী বোঝাই করা পুলিশের ভ্যানটা তখন রাস্তার উপর ছুটে যাচ্ছিল। তারা শুধু গুলির শব্দই শুনল আর কিছু বুঝতে পারল না। ভাবলো ফাঁকা আওয়াজ।

কিন্তু অনন্তের মনে কু ডেকে উঠলো। তার গর্ভিণী স্ত্রীকে ঝাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছে।

মাত্র তিন চার মিনিটের মধ্যে এত ঘটনা ঘটে গেল। গালমন্দ, উত্তেজনা তো চলছিলই। সেসব গা-সহা হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিকরা বোধ হয় ভেবেছিল রগড়টা এইভাবেই চলবে।

রেল লাইনের পাথর তুলে টিল মারা শুরু হলে ওরা ভাবল বৃষ্টি বা পুলিশকে আটকে দিতে পারবে। কিন্তু পরিণামে যে গুলি চলবে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি।

যাদের চোট ঘাট ছোট খাটো তারা তো নিজেদিকে টেনে হিঁচড়ে ধাওয়ায় চুকে গেছে। যারা উঠতে পারেনি-তাদেরকে পুলিশ উঠিয়ে গাড়িতে চড়াচ্ছে।

গোবিনের তখনো প্রাণ আছে। রেল লাইনের পাশে মূখ খুবড়ে পড়ে হাত

দিয়ে এমন মাটি আঁচড়েছে যে সেখানে গর্ত হয়ে গেছে। জন দুই পুলিশ গুকে ওঠাবার জ্ঞত সেখানে গিয়ে ওর ইন্তেকাল দেখে থমকে গেছে।

তখনই অসম সাহসে ভর করে গৈরী ও ফান্টনী ছুটে এসে গোবিনের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

গৈরী বন্ বন্ করে বলল—কায়্যা দেখতা হায়। গোনী মে কলিজা ফোড় দেকর আরেস্ট করনে আয়া।

গৈরীকে আগে আমতে দেখে আরো দশটি হুনিয়া মেয়ে আগে পিছে ছুটে এল। দেখতে দেখতে আরো।

পুলিশ দুজন সেখান থেকে সরে গিয়ে তাদের অফিসারকে খবর দিলো। ওঁরা গা করলেন না। যে কজনকে ভ্যানে তোলা হয়েছে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো, রেল লাইনের অবরোধ সরিয়ে তা চালু করা, খালি ওয়াগন নিয়ে পাইলট ইঞ্জিনকে সাইডিংয়ে পাঠানো ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত।

ঘটনার বিবরণ, মারমুখী শ্রমিকের হাতে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আঘাতের বিবরণ এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জ্ঞত গুলি চালানোর ব্যাপারটাকে লাগসই করে রিপোর্ট লেখা ইত্যাদির জ্ঞত অনেক মাথা খাটাবার, বুদ্ধি খরচ করবার প্রয়োজন তাই হতভাগ্য গোবিনের মুম্বু অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর নেই।

হুনিয়া মেয়েরাই গুকে খাটে চড়িয়ে ধাওড়ায় নিয়ে গেল তখন সেটা একটা লাশ। গুলি খেয়ে পড়বার সময়ও জিন্দবাদ ধ্বনি দিয়েছিল। তারপর নিখর।

আরো দুর্দৈব গোবিনের লাশ সংকারের জ্ঞত হুনিয়া ধাওড়ায় একটাও পুরুষ মাহুষ নেই। পুলিশ ধাওড়ায় ঢুকে গেছে এবং যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে ভ্যানে তুলছে। সেজ্ঞত সবাই ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

গৈরী পটর পটর করে ছুটে কথা বলেছিল বলে একজন অফিসার ওর গালে চড় বসিয়ে কাঁচা খিস্তি করে বললেন, আর বেশী বাৎ করবি তো আখাখা মরদ লেলিয়ে দেবো তোকে রেপ করতে। এমন লাখি মারবো যে পেট খসে বাচ্চা বেরাবে। তোর লীডার ভাতারকে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

সে সব শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। গৈরীর ভাই দুটি বড় হয়েছে। ওরাই গৈরীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলো। জানে যে তাদের দিদি কারো কথা হজম করে থাকবার মেয়ে নয়। পাঁটা জবাব দেবেই। তখন আবার কি হবে কে জানে ?

গৈরীও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। চড় খেয়েই আঙ্কেল গুডুম। একটাও পুরুষ মাহুষ নেই। এক পাল মেয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে। এক গাদা বাচ্চা কাচ্চা ভয়ে পালাচ্ছে। হামা টানা বাচ্চা নর্দমায় পড়ে কাঁদছে।

নেহাত সুরেশ ও মহেশ মায়ের পেটের ভাই তাই ওকে ছেড়ে যায়নি। কিন্তু ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। এ অবস্থায় প্রতিবাদের কণ্ঠ চূপসে যেতে বাধ্য।

আর একদল পুলিশ রামধনির ধাওড়ায় ঢুকে বাসমতীকে বেইজ্ঞত শুরু করে দিয়েছে।

এতোয়ারী সরদারের বড় ধাওড়ার পাশে একটু তফাতে ওর এক কামরার মাটির ঘর। যে দুজন পুলিশ রামধনির তালাশ করতে ওখানে ঢুকেছিল তারা একা বাসমতীকে দেখে লোভে পাগল হয়ে গেল।

সে বেচারী আটমাস পোয়াতী। নিজের শরীর নিয়ে সশব্যস্ত। তারপর এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, পুলিশ, লাঠি, গুলি, রক্ত দেখে ভয়ে কাঠ। হঠাৎ ছ'ছটো মরদ তাকে ধরে যেরকম লপটা লপটি, কাপড় টানাটানি শুরু করল যে প্রথমটায় একেবারে হকচকিয়ে গেল। নারীর সহজাত প্রতিরোধ প্রবণতায় নিজেকে ছাড়াবার ও কাপড় চোপড়ের আবরণ যাতে খুলতে না পারে সেজন্ত মরণ পণ লড়াই করছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল যে মারধাক্কা দিয়ে তাকে শায়েন্টা করার চেয়ে তাকে ধর্ষণ করার জন্তই ওরা তৎপর তখন সে এমন মরীয়া হয়ে উঠল যে কাপড় চোপড়, লজ্জা শরম সব ত্যাগ করে বাইরে লাফিয়ে পড়ল।

ওর ছেঁড়া খোঁড়া শাড়ি রইল পুলিশের হাতে আর ও দিগম্বরী হয়ে দোঁড়াল পথে। পুলিশও তৎক্ষণাৎ পিছু ধাওয়া করল আর সন্তিপ্রসাদের মিলিটারী জেনারেল ছটু সিং ওকে প্রায় ধরেই ফেলল।

কিন্তু কোথা থেকে কিভাবে যে একটা বল্লম এসে ছটু সিংয়ের পেটে গের্গে গেল তা কেউ বুঝতেই পারল না। দুজন হতভম্ব হয়ে দেখল দিগম্বরী বাসমতী ছুটে গিয়ে একটা ধাওড়ায় ঢুকে পড়ল আর পেটে গাঁথা বল্লম নিয়ে ছটু সিং দুটো পাক খেয়ে জ্যান্তব আর্তনাদে সারা ধাওড়া কাঁপিয়ে পড়ে গেল।

এদিক ওদিক গলিযুঁজি, চালে চালে ঠেসাঠেসি ঘন বসতির ধাওড়ায় কোথায় যে কে ঘাপটি মেরে বসেছিল কে জানে? পুলিশ অফিসাররা ছুটে এসে সারা ধাওড়া ঘেরাও করার হুকুম দিলেন। ধাওড়ায় তখন তুমুল শোরগোল। পূর্ণগর্ভা বাসমতীর উদ্যম হয়ে ছুটে পালাবার দৃশ্টাই নারীপুরুষ নির্বিশেষে সবারই রক্ত গরম করে দিয়েছিল।

পুলিশের গুপ্তির শ্রদ্ধ করে গালি দিতে দিতে কাতারে কাতারে বেরিয়ে এল সব। ধাওড়া ঘেরাও করে আর কি করবেন? এদের সামনে দাঁড়ানোই দায়। তাহলে আবার গুলি চালাতে হয়। মৃতদেহের পাহাড় বানিয়ে দিতে হয়। অত ক্ষমতা ওদের নেই। পুলিশকে ধাওড়া ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে হলো।

গোবিনের লাশ আনবার জন্ত তবুতো একদল মেয়ে ছিল। নিজের বউ, বিটিয়া ছিল। অক্ষনদীর বস্থা বয়েছিল। এখনো চলছে কান্নার চেউ। কিন্তু ছটু সিংয়ের লাশ ওঠাবার একটা লোকও নেই।

আর্তনাদ করতে করতে এক সময় সে মারা গেল। সেখানকার মাটি রক্তে, জলে, মল মূত্রে ভরে গেল। অবশেষে তার নিখর দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেল।

মাহুঘের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলত এইভাবেই তার জীবনের সমাপ্তি ঘটল। এও বুদ্ধি প্রকৃতির প্রতিশোধ।

বিকেল নাগাদ কলিয়ারীর অফিস পুলিশ অফিসার, কোল কোম্পানীর অফিসার ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতায় ভরে গেল। সারা কলিয়ারীতে তখন ১৪৪ ধারা জারি হয়ে গেছে। তারই মধ্যে গৈরী ও বাসবতী এসে নিজেদের প্রতি অত্যাচারগুলির মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে গেছে।

গোবিনের মৃতদেহ তখনো পোড়ানো হয়নি। নেতারা এসে মালা দিয়েছেন। শোকসভা করেছেন। গোবিনের মতো একজন সঙ্গীত সাধকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শ্রমিকদিগকে শপথ নিতে বলেছেন—যে সংগ্রামের জন্য গোবিন আজ শহীদ হলো তার আত্মার শাস্তির জন্য সংগ্রামের দীপশিখা যেন অনির্বাণ থাকে—এমনি সব বড় বড় কথা।

গোবিনকে ভালোবাসে না এমন মাহুঘ কচিং, এমন কি মিঃ ভার্মার মতো অতবড় অফিসারও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ছেলেমেয়েরা তো গোবিন চাচা বলতে অজ্ঞান। বড়রাও তার শোকে বিহ্বল। দূর থেকে লোক আসছে ওকে শেষবারের মতো দেখতে। ওর গানের গুণগ্রাহী তো কম ছিল না।

নেতারা এসে যাবার পর পুলিশ অফিসাররাও আশ্বাস দিয়েছেন যে যারা দাঙ্গা হাঙ্গামার সঙ্গে জড়িত নয় তাদেরকে ধরপাকর করা হবে না।

তারপর থেকে হুনিয়া পাড়ার মুকুন্দিরা একে একে ফিরতে শুরু করেছে। চরিতর ও কিষণ গোবিনের খাটের বাজু ধরে বসে আছে। প্রাণের ভাই আজ চলে গেল তাদেরকে ছেড়ে। শোক দুঃখের কথা কি বলতে আছে? বোবা হয়ে গেছে।

বেশী বয়সে বিয়ে করেছিল বলে গোবিনের বউয়ের বয়সটা কম। ফাস্তনী ওর বড় মেয়ে। গৈরীর চেয়ে বছর খানেকের বড়। আরো চারটি অপোগণ্ড আছে। একটি ছোট মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সে জামাইটি স্বরেশের মতো। মৃত শব্দের ধারে পাশে ঘুর ঘুর করছে। বড় জামাই আসতে পারেনি কারণ সেও ঢিল ছোড়ার দলে ছিল এবং গুলিতে চোটও খেয়েছে। জগদীশ ওকে লুকিয়ে রেখেছে। ফাস্তনী কেঁদে কেঁদে হাপসে গেছে।

ঘরে হাঁড়ি চড়েনি। কারো পেটে দানাপানি পড়েনি। এমন কি বাচ্চা কাচ্চাদের মুখেও এক বাটি ফেন ভাত গুঠেনি। কি যে দুঃসময় তার বুদ্ধি পরিমাপ হয় না।

এমনি করেই সন্ধ্যা নামল।

পুলিশও ধাওড়া ঘেরাও করার প্রহরা তুলে নিয়ে শুধু রেললাইন বরাবর মোতায়ন আছে। পাইলট ইঞ্জিন খালি ওয়াগন সাইডিয়ে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বোকাই হয়নি। কারণ গুলী চলার পর থেকেই খাদ বন্ধ। চারবাজা পালিতেও কোনো শ্রমিক খাদে নামেনি। এও একরকমের অঘোষিত ধর্মঘট। তা ভাঙবার জন্ত কোম্পানীর তরফ থেকে এখনো কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কারণ পর পর ছুটি হত্যাকাণ্ড, কমপক্ষে পনেরোজনের গুরুতর আঘাত এবং স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তার সামাল দেওয়াই দায় হয়ে পড়েছে।

নেতারা তো কেউ বসে নেই। তাঁরা চীফ মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার, লেবার মিনিস্টার এমন কি প্রাইম মিনিস্টারকেও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। টেলিফোন তো হচ্ছেই। সন্ধ্যার খবরে রেডিওতে এ খবর প্রচারিত হয়েছে। কাজেই গুরুত্ব কম নেই।

রাত বারোটার পর গোবিনের লাশ পোড়াতে নিয়ে গেল। এত দেরি হবার কারণ ছুনিয়া ছেলেদের জন্ত প্রতীক্ষা। বিশেষ করে জগদীশ ও হরেরামের। সবদিক যখন সুনশান হলো, পুলিশের বুটের শব্দ স্তিমিত হয়ে এল তখন ওরা আত্মপ্রকাশ করল।

এ জগতে নিরপরাধ মানুষগুলিরই শাস্তি হয়। গোবিন তার সঙ্গীত সাধনা নিয়ে এতই মগ্ন থাকতো যে এসব আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। তবু সে মানুষ। নিজের জ্ঞাতি কুটুম্বের দিনের পর দিন অনাহার অর্ধাহারে ব্যথিত হয়েছিল বৈকী। না হলে যাবে কেন ?

তাই সে শহীদ হলো।

—তার আত্মা শান্তিলাভ করুক।

ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিহিংসার চাপান উত্তোর চলছে শ্রমিক, মালিক ও নেতাদের মধ্যে। বিশেষ করে পুলিশের হাজতে যে পঁচিশ ত্রিশজন শ্রমিক ও নেতা পচে মরছে তাদের উপরে আক্রোশ পড়েছে বেশী।

একটা গোয়াল ঘরের মতোন নোংরা কাদা প্যাচ প্যাচে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। খেতে তো দেয়নি। পেছাপ পায়খানা করারও জায়গা নেই। স্মৃতিবাবু প্রতিবাদ করতে গিয়ে রুলের গুতো খেয়েছেন।

তারপর বিকেল বেলায় অনন্তকে আলাদা করে ডেকে নিল। কারণ তার বউয়েরই গলা বড়। সেই ইনিয়ে বিনিয়ুে পুলিশের অত্যাচারের কাহিনী বলেছে। আর সে পুলিশ অফিসারকে চড় মেরেছে।

আবার যে ছুনিয়াদের কাছ থেকে ওয়াগন অবরোধ শুরু হয়েছে তাদেরই জামাই অনন্ত। কাজেই সেই যেন সব কিছু হোতা, উদ্গাতা এবং নাস্তীকার এমনি একটা ধারণা জন্মে গেছে থানার বড় বাবুর। অনন্ত গৈরীর নারী নক্ষত্র

ওর জানা। কোম্পানীর সঙ্গে বহুত দহরম মহরম। কত ধে মাল খেয়েছে কে জানে অনস্তকে নিজের হাতে পেটাতে লাগল।

আঙ্কিক নিয়মের হিসেব করা মার। শরীরের গাঁঠে গাঁঠে হাড়ে মজ্জায় অসহ্য যন্ত্রণা। মার খেতে খেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তখন একটা যুপটি ধরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিলো।

সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি খনি শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তাঁর কাছে আবেদন রেখেছিলেন খনি শ্রমিকদের উপর যে নিত্যানতুন অত্যাচার ও নিৰ্বািতনের মাত্রা বেড়েই যাচ্ছে তার সুরাহা করার জন্ত।

আই. এন. টি. ইউ. সি., এ. আই. টি. ইউ. সি., পি. এস. পি., খনি মজ্জুর ইউনিয়ন প্রভৃতি ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বিধানসভা ও লোকসভাতেও কয়লা অঞ্চলে অত্যাচারের কথা তুলে ধরতেন।

দামুলিয়া কলিয়ারীতে পুলিশের গুলিচালনা, তা থেকে উদ্ধৃত ঘটনাবলী মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোয় তিনি পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অহেতুক কাউকে জেল হাজতে যেন আটকে রাখা না হয়। খনি শ্রমিকদের আন্দোলন ত্রায়সক্ত। যতক্ষণ না হিংসার আকার নেয় ততক্ষণ যেন পুলিশী জুলুম না হয়।

হাজতবাসী শ্রমিক নেতারা ওতেই ছাড়া পেয়ে গেল। কোর্ট ওদেরকে জামিন দিয়ে দিলেন। অবশ্য এর আগেও আদালতে জামিনের আবেদন মঞ্জুর হতো। সদাশয় বিচারকদের সহানুভূতি শ্রমিকদের উপর ছিল।

ইউনিয়নের কর্মীরা সেদিন ট্রাক ভাড়া করে ওদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে কলিয়ারীতে ফিরে এল।

অনন্ত এত মার খেয়েছে যে তখনো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। মেন রাস্তা থেকেই কুলিকামিনের ভিড়। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে ফুল নিয়ে। ট্রাকটা আস্তে চলছে। তাতে ওরা ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ট্রাকটা মেসের কাছে এসে দাঁড়াল। সবাই নামল। অনস্তকে ধরে ধরে নামাল। গৈরী কোর্টে গিয়েছিল তখন থেকেই সে অনস্তর কাছছাড়া হয়নি। অথচ তার নিজেরই শরীরের এমন অবস্থা যে ধকল সয় না।

মেসের বারান্দা, লন এবং সামনের রাস্তা লোকে গিজ গিজ করছে মাইকও এসে গেল। সুমিত্রবাবু জালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। অনস্তকে দেখিয়ে পুলিশের অত্যাচারের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বললেন। তারপর স্বেষণ করলেন আমাদের আন্দোলন খেমে থাকবে না। হুনিয়ার শ্রমিক এক হও।

হে-হল্লা, উত্তেজনা কেটে ধাবার পর ধাওয়া দাঁড়ান। সেরে ওতে রাত বারোটা

বেজে গেল। অনন্ত ও গৈরীকে, স্মৃতিবাবু ও স্বপ্নার জন্ত একটি করে ঘর ছেড়ে দিয়ে বাকী ঘরগুলিতে ফ্রেনিরা জায়গা করে নিল।

অনন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিল। অনেকদিন পর ঘুম নেমেছে চোখে। কি যে ঝড় বয়ে গেছে ওর উপরে তা মনেও আনতে পারছে না। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সারা সন্ধ্যা জুড়ে মেসে যে হল্লা, হাসি-মহুরা, প্রতিবাদ, প্রতিশ্রুতির বান বয়ে গেছে অল্প সময় হলে অনন্তই তার পুরোভাগে থাকতো। তার গলাই গুনতে পাওয়া যেত ডি. সি. সাহেবের বাংলা পর্বন্ত। কিন্তু সেই নীরব।

মেঝেতে বিছানা করেছিল। গৈরী ওর কাছেই বসে আছে। অনন্তকে যত দেখছে তত ওর ভিতরটা যত্নায় মোচড় দিচ্ছে। এক সময় চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ল অনন্তর মুখে।

অনন্তর ঘুমটা ফিকে হতে জেগে উঠল। ওর দিকে তাকিয়ে বলল—
কাঁদছিস কেন? আমি তো এসেছি।

গৈরীর ভিতরটা ডুকরে উঠল। মুখ বিকৃত করে বলল—আমার জন্তই এত কাণ্ড হয়ে গেল।

অনন্ত ড়াব ড়াব করে তাকাল।

গৈরী বলল—সেদিন আমিই সবাইকে উত্তেজিত করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম চুড়ি পরে ঘরে বসে থাকলে ফয়সালা হবেক নাই। লড়তে হলে জান কবুল করতে হবেক। জান গেল তবে আমার নয় গোবিন মামার। আজ আমি ফান্সনীর কাছে মুখ দেখাতে লারছি। মেরে তুমার হাড়মাস সিজাঞ্জে দিলেক তাই আমি দেখছি। ইয়ার চেঞ্জে আমার মরণ হলো নাই কেনে?

অনন্ত ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল লড়াইয়ের ময়দানে নেমে আর আক্ষেপ চলে না গৈরী। আমার জন্ত কষ্ট পাস না। ছুঁচারদিনেই ঠিক হয়ে যাবো। যত দুঃখ গোবিন মামার জন্ত।

শহীদ গোবিন্দ ছুনিয়ার জন্ত ওরা দুজনে অনেক অশ্রুপাত করল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে এল। সারাদিন কাজেকর্মে কাটত। বিকেলের দিকে কোথাও না কোথাও মিটিং থাকতো। আজকাল তো একটা কলিয়ারী নিয়ে আবদ্ধ না। পাশাপাশি কলিয়ারীতেও যেত। শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের মতাদর্শ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করে বোঝাত। ওর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। সহজ ভাষায় স্পন্দর করে বলতে পারতো। হান্সকোর্টকোর মধ্যে গ্লেন মিশিয়ে মগজের ভিতর ঠেসে দিত। সেজন্ত শ্রমিকরা ওকে পছন্দ করত। বড় বড় মিটিংয়ে ভাষণ দিতে ডাক পড়ত।

এই সময়ে স্মৃতি চ্যাটার্জীর নামে চাকরি জবাবের চিঠি এসে গেল। কর্তব্যে অবহেলা ও শৈথিল্যের অভিযোগে তাঁকে যে চার্জশীট দিয়ে সাপেও করা হয়েছিল, তারই একটা লোক দেখানো তদন্ত করে জবাবী পরোয়ানা ধরিয়ে দিল।

শান্তি অনন্তেরও হলো। তবে ওর চাকরি জবাব নয়। ওর স্বস্তর শান্তি গুলু ও হেনীর চাকরির জবাব। আর ওর উপরে ফরমান এল—চারবাজা পালিতে খুঁটা কুলির কাজ করার।

কাজে সে কুণ্ঠিত নয়। কালো বাউরী, খুঁটা মিস্ত্রীর সঙ্গে পুরা পালি সমান সমান কাজ করে। কিন্তু সছ হয় না হেনীর কান্না। মাথা চাপড়ে, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে। লাগাতার অভিশাপ বর্ষণ হচ্ছে—কুন খাল ভরা এমন করলেক গো? সে যেমন নিব্বংশ হয়। আটকুড়া হয়। খাল ভরাদের লাশ শিয়াল গুপ্তনীতে খায়।

অনন্ত বড়ই বিব্রত। গৈরীকে বলল—তুর মাকে থামতে বল। এমন তো হবেকই। তার জন্ম কেঁদেকেটে লোক হাসি করতে হবে? এই কি লড়াকু হিম্মৎ?

গৈরী বলল—সে কথা আমরা বুঝি। মা কি বুঝবেক?

—অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। ইউনিয়ন থেকে কিছু খোঁরাকীর ব্যবস্থা হবে। আমি তো দিনে এক টাকা সাড়ে সাত আনা হাজরি পাই। সবাই এক জায়গায় জুটে মাড় ভাতের যোগাড় হবে।

সেই দুঃখ কষ্টের দিনে গৈরীর ছেলে হলো। আধার মানিক। পুরো পরিবার এই একটি শিশুকে কেন্দ্র করে নূতন ভাবে বাঁচার আশ্বাস পেল।

কমলেন্দু সেকেণ্ড ক্লাস পাস করেছে। এই খবরটি আসার পর থেকেই অগ্রদূত মেসে উৎসবের হাওয়া লেগেছে। অনন্তরও উৎসবের হাওয়া লেগেছে। অনন্ত ও স্ববীরের প্রাণের বন্ধু। তেমনি প্রাণের রস নিংড়ে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো প্রচণ্ড চুষনে।

কমলেন্দু বলল—তোরা কিরে? এখনো ছেলেমাছুবি গেল না।

—তুই একটা গাও। জ্বালা তোর বউ আছে—তার কাছে যা।

স্ববীর বলল—তুই একটা বিয়ে কর। তোর বিয়েতে আমি ভাংড়া নাচ নাচবো। আবার কিরে? ছোট সাহেব তো হলি।

—তোরা কি করলি? একসঙ্গে তিন-জনে যদি পাশ করতাম তবে কি খুশীটা হতো বল দিকি।

অনন্ত বলল—জ্ঞান দিস না কমল। সবাই যদি পরীক্ষায় পাস করে সাহেব হবে তবে কে দেখবে হতভাগ্য কয়লা শ্রমিকদের দুঃখ দরদ? আমার পথ আলাদা হয়ে গেছে। স্ববীর আসছে বছর পাস করবে। প্রমিশ কর স্ববীর।

স্ববীর বলল—প্রমিশ!

—হাই। পার্টি হয়ে যাক।

সেই হৈ হুল্লোড়ের পর অনন্ত ও কমলেন্দু নিজের ঘন্থে বসেছে।

কমলেন্দু বলল—অনন্ত ! আমি তোর ছেলেকে এখনো দেখিনি ।

—আপশোস ! রহত আপশোস ! এমন চাঁদপানা বেটাকে দেখিসনি রে ?

—মজা করিস না । তোর উচিত ছিল একদিন আমাকে আর সূবীরকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া ।

অনন্তর পরিহাস তরল কণ্ঠস্বর হঠাৎই গম্ভীর হয়ে গেল । দূর আকাশে মেঘ হুন্দুভির মতো বলল—তোদেরকে যে বাচ্চা দেখানোর জন্তু নিয়ে যেতে পারিনি সে দুঃখ আমার চেয়ে কার বেশী আছে বল । আসলে কি জানিস ঐ ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে তোদেরকে নিয়ে যেতে চাইনি । গৈরীও আর আগের গৈরী নেই । বড় কষ্টে আছে ।

—আমি জানি । দু’তিনদিন আগেই দেখা হয়েছিল । এখন আরো বেশী স্মার্ট হয়েছে । তুই আর দারিদ্র্যের অজুহাত দিস না । কবে ট্রান্সফার হয়ে যাবো—তার ঠিক আছে কি ?

পরদিন সকালেই তিন বন্ধু একসঙ্গে বেরুল । লোকে বলে থি মাসকেটিয়ার্স ! চার বছর যাবৎ অগ্রদূত মেসকে জমিয়ে রেখেছিল ওরা । এবার খসে পড়ার বেলা এল । কমলেন্দুকে কোম্পানী আণ্ডার ম্যানেজার করে অল্প কলিয়ারীতে দেবে । এটাই ওদের নিয়ম । সূবীর চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে । কেন না সেকেণ্ড ক্লাশ পাশ করতে হলে যে পড়াশুনার প্রয়োজন তার সময় করে উঠতে পারছে না । কারণ ছল্লোরবাজ ছেলে । প্রচুর বন্ধুবান্ধব ! মেসটিকে তো অনন্ত ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টার বানিয়ে দিয়েছে । তার সঙ্গে তারও নাড়ীর যোগ আছে । কাজেই এত ভিড়ের মধ্যে ওর পক্ষে প্রস্তুত হওয়ার অস্ববিধা আছে ।

অনেকদিন পর ফাটকবাজারের লোকজন ওদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে ভাবল—বুঝি বা কোনো নতুন কর্মসূচী আছে । যার যেমন ভাবনা ।

চবুতরাটা পার হয়ে ওরা সোজা গুলুর উঠানে গিয়ে দাঁড়াল । হেনী বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে উত্তনে আঁচ দিচ্ছিল । গৈরী খালি গায়ে শাড়িটা পেঁচিয়ে ঘর ঝাড়ু দিচ্ছিল ।

হঠাৎ ওদেরকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে উঠল । গৈরী তাড়াতাড়ি কোমরে বাঁধা শাড়ির আঁচল খুলে মাথায় ষোমটা দিল ।

তার সেই বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে অনন্ত হেসে ফেলল ।

সূবীর বলল—খাশ খাশ গৈরী তোকে অন্ত ব্যস্ত হতে হবে না । আমরা তোর ভাণ্ডার নই ।

গৈরী একটা দড়ির খাটিয়ার উপর বিছানার চাদর পেতে দিলে বলল—বলুন দাদা । কি ভাগ্য! আমার যে স্তিনমূর্তি একসঙ্গে হাজির হলেন ।

সুবীর মিষ্টির হাঁড়িটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—কমলেন্দু সেকেও ক্লাশ পাশ করেছে। নে মিষ্টি খা।

—ওমা! তাই নাকি!

কল্ কল্ করে হেসে উঠল। এতক্ষণে ওকে স্বাভাবিক মনে হলো।

অনন্ত বলল—কমলকে তুই ছেলে দেখাসনি?

গৈরী জিভ কাটল। অনন্ত বলল—ওর টানেই ওরা এসেছে। যা নিয়ে আয়।

গৈরী মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তিনটি বাটিতে করে মিষ্টি এনে ওদেরকে দিয়ে বলল—খান দাদা। আমি বাচ্চুকে নিয়ে আসছি।

একটু পর সে নিজেও কাপড়-চোপড় বদল করে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দাঁড়াল। মূর্তিমতী জননী। ছ'চোখে অপার স্নেহ। মুখটি উজ্জ্বল। অসীম গর্ব তার ঠোঁটের হাসিতে। অনন্ত নিজেই অবাক হয়ে গেল। এক রমণীর এত রূপ।

হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিল।

গৈরী অভিযোগ করল—বাচ্চুর বাপ-কাকারা বিত্তা বুদ্ধিতে কম যায় না। তবু ওর একটা নাম হলো না।

কাজল টানা ছুটি চোখ। এক মাথা চুল। হাঁসা পাথরের মতো গায়ের রঙ। যেন গ্রানাইট পাথর খোদাই করে তৈরি হয়েছে একটি শিশুর মূর্তি। বাপের কোলে খলবল করছে।

কমলেন্দু ওর গালটিপে আদর করে বলল—কি রে? নাম দিসনি কেন?

—দেব—দেব। সময় তো চলে যাইনি। অন্নপ্রাশনে নামকরণ করতে হয়।

একটু অভিমানের স্বরে গৈরী বলল—ওর পেটে অন্ন পড়তে কি বাকী আছে?

সুবীর বলল—ধ্যেৎ! কি উল্টো কথা বলছিস? ক'মাস বয়স হলো।

অনন্ত বলল—মাস তিনেক। সেটা কথা নয়। গৈরী ওকে গৌদলে করে ভাতের ফ্যান হুন দিয়ে থাওয়ায়। তাই ওর অভিমান।

গৈরী ফুক কণ্ঠে বলল—এসব কথা বলে তুমি কি স্থখ পাও বলো তো?

কেমন সহজ সরল আলাপচারিতার মধ্যে দুঃখ দৈন্তের এমন একটা নির্মম চিত্র ভেসে উঠল যে সবাই অস্বস্তিতে পড়ল।

সুবীর তা সামাল দিতে অনন্তকে বলল—তুই কি রে অনন্ত? এমন খুঁচিয়ে যা করার কি দরকার? কমল—নামটা তুই দে। যেন তার একটা মানে হয়।

—সিওর। কয়লা কুঠির ষোর দুর্বোণের সময় ওর জন্ম। বাপের স্বপ্ন শ্রমিক বিপ্লবের। তাই ওর নাম হোক—বিপ্লব। পছন্দ তো?

—হ্যাঁ!

গৈরী খুব খুশি।

স্ববীর ও কমলেন্দু দুজনে দুটি রূপোর টাকা বাচ্চাটার হাতে দিলো।

গৈরী বলল—দাদা আজ আপনি আমার ছেলের নাম রাখলেন—এ কথা কখনো ভুলব না।

—বেশ। ভুলিস না। এবার উঠি। নাহলে ডিউটি কামাই হয়ে যাবে।

—আচ্ছা! গৈরী ঘাড় নাড়ল।

ওরা চলে যাবার পর গৈরী গুর ছেলের উপর হামলে পড়ল।

—তুমি বিপ্লব! কয়লাকুটির ঘোর দুর্ভোগের সময় তোমার বাপের স্বপ্নের প্রতীক? বটেই তো! তুমি যদি আমার পেটে না আসতে তবে কি তোমার বাপে কয়লাকুলিদের জন্ত মাথা ঠুঁকে বেড়াত? নাকি আমিই তাকে পেতাম? সে তো সাহেব হয়ে যেত।

এমন কত কথা। চুমো খেতে খেতে আবেগে অশ্রুতে ওর ফুলো ফুলো গালদুটো ভরে দিলো।

এমনি সোহাগে আদরে দুঃখ দারিদ্র্যকে ভ্রুকুটি দেখিয়ে ওদের জীবন আবর্তিত হচ্ছে একটি শিশুকে কেন্দ্র করে। শিশুর হাসি কান্না ওদেরও হাসি কান্না। দাম্পত্য প্রেম ঘনীভূত। প্রেম দিয়েই জয় করেছে দুঃখ দরদের দিনরাত্রি।

সাতচল্লিশ

জ্যেষ্ঠ মাসের প্রাণফাটা গরম। মাথার উপর খোলার চাল। বন্ধ ঘরে একটি জানালা, সারাদিন হা হা করে লু বয়। সে যেন আগুনের ছাঁকা। রাত্রিকালে নিঃশ্বাস। গরম খোলা ঠাণ্ডা হাতে ভোর হয়ে যায়।

তারই মধ্যে পচে যাচ্ছে অনন্ত ও গৈরী। বিপ্লব পাখাল করে গুয়ে আছে। গৈরী অনবরত হাতপাখা টানছে। বাতাস একটু বন্ধ হলেই বিপ্লব ইচ্ছা বিচ্ছিন্ন করছে। মাথা শিতানে হারিকেন জ্বলছে। গামছায় ঘাম মুছতে মুছতে অনন্ত ডায়েরী লিখে—অবশেষে মজুমদার'স ট্রাইবুনাল এওয়ার্ড বের হলো। ২৬শে মে, ১৯৫৬ দিনটি কয়লাকুটির ইতিহাসে লাল অক্ষরে লেখা থাকবে। অনেক উদ্বেগ, অশান্তি, ঘাম, রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে এই একটি এওয়ার্ড।

১৯৪৭ সালে ভারত সরকার মি: দেশপাণ্ডের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বাংলা ও বিহারের কয়লাখনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের বেতন, ভাতা, কাজের সময়সীমা ইত্যাদির তথ্যসংগ্রহ ও কনস্ট্রাক্শন গ্রহণের সুপারিশ করার জন্ত বোর্ড অফ কনসিলিয়েশনস বা আপস মীমাংসা পর্বে নিযুক্ত করেছিলেন।

ব্যাপক ভদ্র ও সেই মোতাবেক সুপারিশে দিন হাজরী শ্রমিকের দৈনিক

নূনতম বেতন ধার্ষ হয়েছিল একটাকা দশ আনা। অর্থাৎ একটাকা বাষট্টি পয়সা। কিন্তু কোনো কোম্পানী সে বেতন দিত না। বড়জোর একটাকা পঁচিশ পয়সা দিত। শেরগর কোল কোম্পানী দিত একটাকা সাড়ে সাত আনা অর্থাৎ একটাকা সাতচল্লিশ পয়সা। এটাই তখনকার বাজারে চালু ছিল।

চাকরির স্থায়িত্বই যদি থাকবে তাহলে গৈরীর মা-বাপের চাকরি জবাব হবে কেন? চারশো জন ওয়াগন লোডার বিনা নোটিশে বসে যাবে কেন? স্বপ্নাদি ও স্মৃতিদার চাকরিই বা যাবে কেন?

শাস্তি দেওয়া তো চলছেই। গোবিনের বৃকে বুলেট লাগল। আমাকে খুঁটা কুলির কাজ করাচ্ছে। এমন কতজনকে কতভাবে যে হয়রান ও লাঞ্চিত করা হচ্ছে তার সংখ্যা নেই।

এবার দেখা যাক মজুমদার'স ট্রাইবুন্সাল এগুয়ার্ডে খনি শ্রমিকরা কি পেল?

সমকালীন বাজার দর অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য অর্থাৎ রোটি কপড়া আউর মকানের সঙ্গে আলো, বাতাস, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির খরচ ধরে দিন হাজারী শ্রমিকের মাসিক মজুরী ধার্ষ হয়েছে—

খাদ্যদ্রব্য—৫০.০০ পঞ্চাশ টাকা।

কাপড়-বৎসরে জনপ্রতি ১৫ গজ তের আনা বা একাশী পয়সা দরে—

৪.০৬ চার টাকা ছয় পয়সা

বাড়িভাড়া বাবদ—২.০০ দু'টাকা

শিক্ষা বাবদ—১.৫০ একটাকা পঞ্চাশ পয়সা

চিকিৎসা—১.৫০ একটাকা পঞ্চাশ পয়সা

অগ্নাশ্র (আলোবাতি সহ)—১০.০০

মোট—৬২.০৬ উনসত্তর টাকা ছয় পয়সা।

একটি শ্রমিক পরিবারে তিনজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির হিসেবে ঐ খরচ। কিন্তু সত্যি কি তাই? স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান ছাড়াও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী থাকে। তাদের জন্ম কোনো ব্যবস্থা নেই।

আগে যে কথাওত ছিল—ওয়াটার, কোয়ার্টার, ওয়েল, ফুয়েল ফ্রি। তাই বা কোথায়?

ধন্য দেশ! ধন্য আইন!

পরদিন স্মৃতিবাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে সুধীর রুদ্র ও পাণ্ডা। তিন জনেই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ওঁদের নামেই কয়লাকুঠির শ্রমিকরা মাথা নোয়ায়।

একজিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডাকা হলো। বিয়াল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে চল্লিশ জন উপস্থিত। দুজন সেকেণ্ড শিফট জিউটিতে গেছেন।

সেদিন আলোচনা হলো মজুমদার'স ট্রাইবুন্সাল এগুয়ার্ড নিয়ে। ওঁদের মতে এ যেন নাকের বদলে নরুন। এই এগুয়ার্ড আমরা মানবো না। প্রস্তুত হতে

হবে বৃহত্তর গণসংগ্রামের জন্ত। প্রয়োজন হলে লাগাতার ধর্মঘট করবো। বাংলা ও বিহারেও আশি শতাংশ শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য, বাম দক্ষিণ সব দল একসঙ্গে জোট বাঁধতে রাজী। আই. এন. টি. ইউ. সি, এইচ. এম. এস., এ আই. টি. ইউ. সি., খনি মজদুর ইউনিয়ন সব একযোগে এক প্রাটফর্মে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করবে। দেবেন সেন, কল্যাণ রায়, কেশব নারায়ণ এক প্রাটফর্মে দাঁড়াবেন।

আগামী রবিবার তিনটেয় ডিসেরগড়ে মিটিং। মিছিল নিয়ে যাবে। এই মিটিংয়ে অনেক কিছু বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হবে।

ইতিমধ্যে তোমরা শ্রমিক কর্মচারীদের বোঝাও তামাম কোলফিল্ডে বিশ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। প্রায় দু'হাজার ইউনিয়ন কর্মীর উপর মালিকরা একতরফা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। দাঙ্গা হয়েছে পনেরোটি। আহত দুশো জন। নিহত পাঁচ জন। কারো জন্ত কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেয়নি।

শ্রমিকদের যে হারে বেতন বাড়ানোর দাবি ছিল তা পাওয়া যায়নি। স্ট্রাকদের তো নামমাত্র বেড়েছে। ছাঁটাই কর্মীদের অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে মালিক পক্ষ নারাজ। ইউনিয়ন কর্মীদের উপর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করেনি। তাহলে আমরা পেলাম কি ?

১২৪৭-এর বোর্ড অফ কনসালিয়েশনের সুপারিশ এখনো কোম্পানীর মেনে নেয়নি। এরপর ট্রাইবুন্সাল এওয়ার্ড যদি না মানে ?

খবর পেলাম অনেক কলিয়ারীতে ছ'নম্বরী পেমেণ্ট খাতা তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ একটা খাতায় এওয়ার্ড মোতাবেক হাজারির বিল তৈরি হচ্ছে। তার উপরে শ্রমিকদের টিপ ছাপ নেওয়া হবে আর অল্প খাতায় পেমেণ্ট হবে। মূল খাতাতে শ্রমিকদের নাম থাকবে কম সংখ্যায়। বাকী শ্রমিকদের ছ'নম্বরী খাতায় পেমেণ্ট হবে ও তাদের কাগজে কলমে কোনো অস্তিত্ব রাখা হবে না। তবে আর চাকরির স্থায়িত্ব কথাটার দাম কি ? আইনকে ফাঁকি দেবার কত না ছলনা কপটতা।

দেবেন সেন বলেছেন—আপীল করবেন। রবিবারের মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

ডিসেরগড়, বরাকচক, খেমোমেন, কাল্লা, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, বাঁক শিমুলিয়া, গিরিমিষ্ট, জামুড়িয়া, চরণপুর, চাঁদা উথরা, পাণ্ডবেখর, ইত্যাদি স্থানে মিটিং হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। প্রতিটি মিটিংয়ে খনি শ্রমিকদের মিছিলের পর মিছিলের ঢেউ স্লোগানে স্লোগানে শোরগোল তুলে হাজির হচ্ছে। দেবেন সেন কান্তি মেহতা, মি: যোশী, কল্যাণ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, সুধীর রুদ্র, জগদীশ পাণ্ডে, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত প্রমুখ প্রথম সারির ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কোলফিল্ডে থেকে একটা দুর্বীর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় দলমত নির্বিশেষে একই প্রাটফর্মে দাঁড়িয়েছেন।

এক কল্যাণ রায় তামাম কোলফিল্ড কাঁপিয়ে দিয়েছেন। কি তাঁর ভাষণ ; একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে। ম্যানেজার এক্সেক্টরা লক্ষ্য। চীফ মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা বলেন চড়া গলায়, কম্যাণ্ড করার ভঙ্গীতে। তাঁকে দেখলেই সাহেবরা ভয়ে লুকিয়ে পড়েন এমন অবস্থা।

প্রত্যেক কলিয়ারীতে অ্যাকশন কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। দামুলিয়ার জেনারেল সেক্রেটারী স্মৃতি চ্যাটার্জী। তিনি কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাবার পর অনন্তকে অস্থায়ী সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নতুন কমিটিতে অনন্ত পুরোপুরি জেনারেল সেক্রেটারী হলো। রাজকিশোর সিং সভাপতি। তিলক সিং কোষাধ্যক্ষ। দুজন জয়েন্ট সেক্রেটারী হরিহর গান্ধী ও যমুনা যাদব।

মোট ষাটজনের কমিটি। মেয়েদেরকে সামনে নিয়ে আসার জন্ত শকুন্তলা, ফুলমণির সঙ্গে গৈরীকেও নেওয়া হয়েছে।

সেদিন মিটিং হলো অফিসের সামনে শামিয়ানা খাটিয়ে। জবরদস্ত সাহেব মিঃ শ' বারণ করতে পারেননি। দেবেন সেন মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই ঘোষণা করলেন—বাংলা ও বিহারের সমস্ত কয়লা খনিতে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ থেকে লাগাতার ধর্মঘট হবে। এই ধর্মঘট ভাঙার জন্ত মালিকদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি খনি শ্রমিক যেন তার জন্ত তৈরি হয়ে থাকে মালিক, ম্যানেজার ও দালালদের ষড়যন্ত্র অত্যাচার, নির্ধাতন ও লাঞ্ছনার মোকাবিলা করতে হবে।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সে প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হলো।

ধর্মঘটের দিন ধার্য হয়ে যাবার পর কোলফিল্ডের হাওয়া বদলে গেল। যেখানে মিটিং সেখানেই জন সমাবেশ। সেখানেই পুলিশ প্রহরা। গণ-আন্দোলন বৃদ্ধি এমনভাবে জোয়ারের মতো আসে। সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। খনি শ্রমিকরা এক অদ্ভুত আবেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

দেড়মাস আগে সব কোম্পানীকে স্ট্রাইক নোটিশ দেওয়া হলো। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তার কপি গেল। কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করে ধর্মঘট তুলে নেবার কথা বললেন। মালিক পক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের দু একটা বৈঠক হলো কিন্তু ফলাফল শূন্য।

তৎকালীন সর্ববৃহৎ কোলকোম্পানী বেঙ্গল কোলের সি. এম. ঙ্গ. মিঃ রসার বললেন, আমাদের গিরমিষ্ট ও শীতলপুরে স্ট্রাইক করতে পারবেন না।

দেবেন সেন বললেন, ঐ ছুটি কলিয়ারীকেই হেড কোয়ার্টার করা হবে। স্ট্রাইক তো নিশ্চয় হবে।

সব আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সন্নীক্ষক রিপোর্ট দিলেন— স্ট্রাইক ইজ মাস্ট।

আটচল্লিশ

ভারতে শিল্পায়নের আদিশক্তি কয়লা। তার তাপ নিয়েই বাষ্প উৎপন্ন হয়। প্রাইম মূভার ঘোরে। তখন এত ডিজেল ইঞ্জিন ছিল না। রেলওয়েতেও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালু হয়নি। রেল কোম্পানী মস্তবড় কনক্রিটমার। কয়লা খনিতে স্ট্রাইক মানে রেল বন্ধ। জাহাজ বন্ধ। কল-কারখানা, তাপ বিদ্যুৎ, ব্লাস্ট ফার্নেস, কোক ওভেন সবই বন্ধ। ব্যাপারটা ভাবতেই বিভীষিকার মতো মনে হয়। খবরের কাগজের সমীক্ষকরা ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

কলিয়ারীতে প্রভাত ফেরী, গেট মিটিং, মিছিল। চারিদিক একটা ভুম্ ভুম্ শব্দ। রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচেষ্টা খনি চালু রাখার। সেজন্তু যেখানে যত প্রয়োজন পুলিশ মোতায়েন করার হুকুম জারি হয়ে গেছে।

ইতঃস্তত দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলার খবর আসছে। একটা ভীষণ অস্থিরতার সময়ে কে কাকে সামলে রাখে? সবাই রাগে ও আবেগে টগবগ করে ফুটছে। সুর বাঁধা হয়েছে পঞ্চমে। বড়ই অস্থির।

মলিকরাও বসে নেই। তারাও নখে দস্তে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। অতি গোপনে গুপ্তা, বদমাইশ আমদানি হচ্ছে। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, বোম, বারুদ, পিস্তল, বন্দুক। তাদেরও ঘন ঘন বৈঠক হচ্ছে।

তেমনি এক বৈঠক বসেছে ভূত বাংলাতে। সবকটি ভিলেন চরিত্র সেখানে হাজির। মিঃ শ সবাইকে একবার জরিপ করে নিয়ে বললেন—সভিপ্রসাদজী! আপনার অ্যাকশন প্রোগ্রাম বলুন। স্ট্রাইকের দিন কমপক্ষে এক হাজার শ্রমিককে খাদ্যে কাজ করার জন্তু নামাতে হবে। ইউনিয়ন ভেঙে দিতে হবে।

সভিপ্রসাদ বললেন—হুজুর বে-ফিকির থাকুন। ইউনিয়ন ভাঙবার আদমী তৈরি আছে। গোরখপুর কমাণ্ডার সুরঘ নারায়ণ সিং চারশো জন লোডার দেবে। মংগু চৌহান পাঁচ নম্বরের লোডিং সরদার দেবে দুশোজন। আর আখরী খেলা তো তিলক সিং-এর হাতে। কলিয়ারী বন্ধ হবে না।

—অলরাইট! সুরঘ নারায়ণবাবু আপনি তৈয়ার আছেন?

—জী হাঁ।

—মংগু চৌহান?

—আমার তো দিল জলিয়ে যাইছে হুজুর। ইয়ে দেখুন মনিলাল আসিয়েছে। শ্রালা অনন্ত উয়ার বেটার বহুকে লুটিয়ে লিয়েছে। ইয়ার বদলা জরুর লিব। আপনি হুকুম করুন।

—অলরাইট হুকুম দিলাম। —

—তিলক সিংকে আনলেন না কেন সভিপ্রসাদজী?

—বকত পর হোবে হুজুর।

একে একে সবাইকে কবুল করিয়ে নিয়ে মিঃ শ' ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। তারপর ভূত বাংলাতে রইল বিশেষ কয়কজন ডি. সি., ডি. ডি. ও সন্তিপ্রসাদ। বিউটি তো থাকবেই যতক্ষণ মিঃ শ' আছেন!

পরামর্শ আরো গোপন থেকে গোপনতর পর্যায়ে চলে গেল।

অনেক রাত্রে ডি. সি., ও বিউটিকে নামিয়ে দিয়ে মিঃ শ' চলে গেলেন। তখন তিনজনেই টপ ভূঙ্গঙ্গ। টল টল করছে পা। ডি. সি. সাহেব ইচ্ছে করেই বিউটির গায়ে পড়লেন এবং খামচে ধরলেন।

বিউটি বলল—ডি. সি.। আপনার এত নেশা হয়নি যে পেঁচি মাতালের মতো মেয়েমানুষের গায়ে পড়তে হবে।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—কেন শুকে টাচ করছিস ডি. সি. ?

ডি. সি. সাহেব জড়িত কর্তে বললেন—বারমান সাহেব দিয়েছিলেন একটা বারোয়ারী আওরং। কিন্তু তুই শালা একাই ভোগ করলি। নিজের আখের গুছোতে মিঃ শ'কে দিলি। আমি বড়ো আঙুল চুষলাম।

বিউটি তিক্ত বিষাক্ত কর্তে বলল—ব্লাডি কুস্তার বাচ্চা।

ডি. সি. বললেন—ভাদ্র আশ্বিনের কুস্তা ভীষণ ডেনজারাস হয়। কথাটি মনে রেখো। তোমার এই লি-মুরোদের মরদ রক্ষা করতে পারবে না। ফুঁসে উঠল বিউটি।

—হাঁ। এত মরদ। যাবো নাকি তোমার বাংলাতে? তোমার মাতলামি মিটিয়ে দেবো। তোমার বউ বিটিরও গরব চুকিয়ে দেবো।

ডি. সি. বললেন—কি? যত বড় মুখ নয় তত বড় বড় কথা।

প্রায় মারমুখী হয়ে উঠলেন উনি। ডি. ডি. মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন—আঃ।

কি হচ্ছে ডি. সি.? তুই কি বে-হেড হয়ে গেলি? যা তোর বউ জেগে বসে আছে।

—বাঃ বাঃ শালা। আমি মাতাল! কুস্তার বাচ্চা! শোধ কেমন করে নিতে হয় দেখিয়ে দেবো! স্ট্রাইকটা আগে শেষ হোক।

টলতে টলতে নিজের অংশের দিকে চলে গেলেন। বিউটিও মুখ ব্যাজার করে গেট খুলে ঢুকে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন একা ডি. ডি. সাহেব।

ভিতরটা হাহাকার করে উঠল। সত্যিই তো! যে নিজের নারীকে রক্ষা করতে না পারে তাকে তো অপমান সহ্যতেই হবে। সে আবার পুরুষ কি? মনটা এত ছোট হয়ে গেল যে বিউটির কাছে মুখ দেখাতেও লজ্জাবোধ হচ্ছে।

বিউটি বাথরুমে ঢুকল স্নান করতে। ডি. ডি. সাহেব চেয়ারে বসে টেবিলের উপর কপালটা ভর দিয়ে দিলেন। বিউটি স্নান করে ঝোলটা হিটারে গরম হতে দিয়ে টেবিলের উপর খাবার সাজাল। ডি. ডি.-কে ডাকল।

উনি সাড়া দিলেন না। বিউটি বলল গুঠ।

—না! খাবার রুচি নেই।

—আমারই কি আছে? কিন্তু রাত উপোস দিয়ে কাল ডিউটি করবে কি করে?

উনি বিউটির একটা হাত ধরে ফেললেন। বললেন—আমাকে ক্ষমা কর বিউ।

বিউটি কোঁতুক বোধ করল। বলল—হঠাৎ ক্ষমা চাওয়া কেন?

—আমি তোমার সঙ্গে পুনঃ পুনঃ অবিচার করেছি। সত্যিই যদি আমার পৌরুষ থাকতো তবে তোমাকে এমন করে লাঞ্ছনা অপমান সহিতে হতো না।

—ওসব আমার গা সওয়া হয়ে গেছে। এসো খেয়ে নাও।

খেতে খেতে কথা হলো না। দুটো রুটি খেয়ে ডি. ডি. সাহেব শুয়ে পড়লেন। মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে। কি রকম জ্যাম ধরে আছে। একটু পর বিউটি এসে শুয়ে পড়ল।

ওর শোয়ার ভঙ্গী বড়ই অশালীন। ডিপ ফ্রিজ থেকে তুলে আনা ইলিশ মাছের মতো শীতল এবং অনাবৃত। ডি. ডি. সাহেব ভাবেন তাদের জীবনে উষ্ণতা হারিয়ে গেছে। ঐ বরফ গলাবার সাধ্য তাঁর নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লেন! নীল আলোতে বিউটিকে দেখাচ্ছে জলপরীর মতো। বললেন—তুমি কত দূরে সরে গেছ বিউ। এত কাছে আছো কিন্তু যেন কতদূরে।

বিউটি একটু উৎসুক হয়ে ওর দিকে তাকাল। উনি বললেন—আমারই দোষ। আমিই তোমার মান সম্মান অক্ষত রাখতে পারিনি।

বিউটি কাৎ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল—আজ এসব কথা বলছ কেন? আমার মন ভেজাতে?

—তোমার মন কে ভেজাতে পারে? সেটা এত শক্ত যে আমার সাধ্য নেই তার কাছে যাবার।

বিউটি হেসে বলল—বুঝেছি। তা অত ধানাই পানাইয়ের কি আছে? খেতে পরতে দিচ্ছে। তার দক্ষন পাওনা গণ্ডা বুঝে নাও।

—না বিউ! আমার কথা তুমি বুঝলে না। আমি বলতে চাইছি আমাদের তো কিছু স্বপ্ন ছিল। আমরা তো চেয়েছিলাম দুজনের সংসারে একটি শিশু আসবে। ভালোবাসার শিকড়। এভাবে ভেসে বেড়ানোর দিন শেষ করে থিতু হব। তুমি বোধহয় ভুলে গেছো।

বিউটি একটু চুপ করে থেকে বলল—কিছুই ভুলিনি ডি. ডি.। স্বপ্ন আমারও ছিল। সব ফুরিয়ে গেল।

—তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না বিউ? পারো না স্বপ্নের জগতে পারি দিতে?

—তুমি কি নেশার ঘোরে কথা বলছো ডি. ডি. ?

—না বিউ ! মনের ভিতর থেকে বলছি ।

—তোমার সে হিম্মৎ আছে ? পারবে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে ?

—বল কি করতে হবে ?

—তোমার এই চাকরি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে ?

—পারব । কিন্তু সে তো দারিদ্র্যের জীবন । এতবড় চাকরি, বাংলা, লোকজন কোথায় পাব ?

—দিন গুজরানের মতো একটা চাকরি পাবে না ?

—পাব । বড়জোর ওভারম্যানের চাকরি ।

—ওতেই হবে । কি প্রয়োজন টাকা-কড়ি, বিলাস ও প্রমোদের ? যদি ভালোবাসা পাই তবে হু'পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারি হু'পাচটা এজেন্ট, লেবার সাহেব ।

—বেশ । আমি কালকেই রিজাইন করব ।

—এখন না । কিছু কাজ বাকী আছে । শপথ কর ডি. ডি. আমি যা করব তাতে তুমি মদৎ দেবে ?

—শপথ করছি । ডি. ডি. সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিলেন । বিউটি প্রবল আবেগে সেই লোমশ হাতটা নিজের বুক চেপে ধরল । মুহূর্ত মধ্যে হু'চোখ ভরে জ্বল এল । অশ্রু গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বলল—ডি. ডি. । আমিও শপথ করে বলছি—শুধু তোমাকেই ভালোবাসব । তোমার ভালোবাসার জড় শিকড় ধারণ করব নিজের অঙ্গে ।

ডি. ডি. সাহেব অবাক । উনি কখনো বিউটির চোখে জ্বল দেখেননি । কত নির্ধাতন বয়ে গেছে ওর উপরে কখনো কাঁদেনি । কেমন শীতল চাউনি ছিল ওর । কত কখনো দেখতে পেত হু'একটা আগুনের ফুলকি । বরফ গলে প্রশবিনী ধারা যে বইতে পারে তা ছিল ধারণার অতীত । আজ সেই চোখে জ্বল গড়াতে দেখে ওর ভিতরটা ডুকরে উঠল ।

অনন্তর যে কোন পালি ডিউটি তা বিউটির খেয়াল ছিল না । ডি. ডি. সাহেবকেই বলল—অনন্তকে অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করার খবর দিতে ।

সকাল দশটায় কলিয়ারীর বাংলা, কোয়ার্টার সব ফাঁকা । কেমন গুন্শান্ । সবাই আপন আপন ডিউটিতে আছে । যাদের চারবাজা, রাতপালি তারা ঘুমের ঘোরেই আছে । তখন অনন্ত এসে ডাক দিল—দ্বিদি !

—এসো ভাই ! তোমার ডিউটি কখন ?

—রাত পালি ।

—স্নান খাওয়া হয়েছে ?

ন্নান হয়েছে। খাওয়া হয়নি।

—দিদির বাড়িতে থাকে ?

—না দিদি। আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

বড় লীডার হয়েছে। তাই দিদির বাড়িতে খাবার অবসর নেই।

—এই তো! তোমাদের অভিমানগুলো একটু কম করতে পার না দিদি ?

বিউটি হাসল, বলল—তা কেন করব ? মেয়েদের এটা একটা হাতিয়ার। কিন্তু তোমার উপরে আমার সত্যিই অভিমান হয়েছে। ছেলেটিকে একবারও দেখালে না।

অনন্ত লজ্জিত। বলল—এই যাঃ। ভুল হয়ে গেছে। আসলে কি দিদি—আমি আর আমাতে নেই। যাকগে আজ বিকেলেই গৈরীকে পাঠিয়ে দেব।

—ধন্যবাদ !

বিউটি উঠে গেল। একটু পর ডিশে খাবার এনে বলল—খাও।

—ধন্যবাদ !

—ফিরতি ধন্যবাদ দিলে। দুই কোথাকার !

অনন্ত হাসতে হাসতে খাওয়া শুরু করল।

বিউটি বলল—তোমাকে কয়েকটা গোপন খবর দেবার জগ্ন ডেকেছি। তুমি শপথ কর যে আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়। তাহলে তোমারও খবর পাবার পথ বন্ধ হবে। আমিও বিপদে পড়ব।

অনন্ত বলল—শপথ করছি দিদি। তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি।

বিউটি বেশ গুছিয়ে ভূত বাবলোতে গোপন পরামর্শের সবটুকু বলে দিল।

অনন্ত শুনে অবাক। এঁটো হাতে বসে আছে। অনেকক্ষণ পর বলল—মাই গড। ষড়যন্ত্রের জাল এত গভীরে পৌঁছে গেছে।

—হ্যাঁ। উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না নিতে পারো তবে স্ট্রাইক সাকসেসফুল হবে না। তোমারও জীবন বিপন্ন হবে।

—তা বুঝতে পারছি। এ জাল আমি ছিঁড়বই। কিন্তু দিদি—তুমি আমাকে একটা কথা স্পষ্ট করে বল—এ খবর আমাকে বললে কেন ?

বিউটি একটু গভীর হয়ে বলল—তোমার সঙ্গে আমার যে মেহ ও প্রীতির সম্পর্ক সেজন্য বলিনি।

—তাহলে ?

—কয়লা কুঠির কুলি কামিনরা আমার ভাইবোন। তাদের আন্দোলন সার্থক হোক। এটাই আমি চাই।

—তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে দিদি।

—যাও। খুব সাবধানে থাকবে।

—হ্যাঁ দিদি।

অনন্ত চলে গেল

উনপঞ্চাশ

অনন্তর চারিদিকে সমস্তা থিক্ থিক্ করছে। এক তো এতবড় সংগঠনে ঐক্য বজায় রাখাই দায়। তারপর যদি অন্তর্ঘাত হয়? ভেবে কুলকিনারা পায় না সে কি করবে?

সে নিজে এখন দারিদ্র্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে। এক টাকা সাড়ে সাত আনা হাজরী পায় আর দিনে আঠারোটি পাতা পড়ে। সবাই খানেওলা। গৈরীর দু'ভাই দু'বোন বয়সে ছোট হলে কি হবে? খাওয়াতে সমান সমান। ইউনিয়নের খোরাকি যৎসামান্য। কি করে কুলোবে?

মেসের খাবার বন্ধ করে দিয়েছে। সে এখন পুরোপুরি কুলি ধাওড়ার কুলি। তিন পালিতে ঘুরে ঘুরে ডিউটি করে। ডিউটি যাবার আগে গোটা আঠেক হাতে গড়া রুটি ডাল দিয়ে খায়। হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জী পরে কোমরে বেল্ট, মাথায় টুপি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। জুতো ছিঁড়ে গেছে। তাই চলছে।

ডিউটিতে সে ফাঁকি দেয় না। কালো বাউরী মিস্ত্রী তাকে কাজ করতে দিতে চায় না। পরিষ্কার বলে—না। সারাদিন ছুটোছুটি করে ইউনিয়নের কাজ করেন। রাত্রে এত খাটতে হবে না। আমরা কাজ করে নেবো।

অনন্ত বলে—শরীর যতক্ষণ বইবে ততক্ষণ বসে থাকবো কেন? এটা আমার আদর্শ। না হলে কমলেন্দু যেমন পাশ করে ছোট সাহেব হায়ছে আমিও তা পারতাম।

—তা পারতেন বাবু। আপনার যা বুদ্ধি তাতে ছোট সাহেব কি আপনি বড় সাহেবও হতে পারবেন।

—তবু আমি খুঁটা কুলি। মাইনিং সরদারী পাস করেছি কিন্তু সে কাজ দিল না। দেবেও না। স্ট্রাইক শেষ হলে অল্পটুকু চলে যাব। আমার বউ ছেলে মা ভাই বোন আছে। তাদেরকে তো উপোস দিয়ে মারতে পারি না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমনি সব সুখ দুঃখের কথা হয়। কালো তাকে সাস্থনা দেয়—বাবু আপনি তো পুরাণের পণ্ডিত। জানেন তো মহারাজা যুধিষ্ঠিরকেও ভাই বউ নিজে বনবাসে যেতে হয়েছিল। রামচন্দ্রকেও বনবাসে কাটাতে হয়েছিল।

এসব কি শুনে কালো বাউরীর কাছে শিখতে হবে? সে দশ বছর বয়স থেকে রামায়ণ মহাভারত পড়ছে। সে রসে একধার ডুবলে অনেক যন্ত্রণার লাভ হয়।

তখন ভোর চারটে। পালি গুরুর ব্যস্ততা চুকিয়ে স্বড়ঙ্গের মধ্যে বালিগাছার উপর লম্বা হয়ে পড়ল। গোটা গা ঘামে গজ্ গজ্ করছে। চাঙনী আয়তনে বারুদ আওয়াজ হবে এখন। সেটা হলে আবার যেতে হবে খুঁটো লাগাতে। এখন ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিতে পারে।

মাথায় একটা কাঠের পাটা দিয়ে গুয়ে আছে। মনে হচ্ছে চোখে ঘুম নেই। কত রাজ্যের চিন্তা। ভাবনগুলো এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো ফক্ ফক্ করে পার হয়ে যাচ্ছে। ছায়াছবির মতো কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে পড়ছে।

একটি হামাটানা শিশু। ছুটি কচি কচি দাঁত বেরিয়েছে। চুলগুলি কালো কৌকড়া। জোড়া ভুরু। টানা টানা চোখ। কোমরে ঘুনসি কড়ি, ভাল ফল, ধনেশ পাখীর হাড়, কবচ, মাহুলি, তকতি এবং ছুটি রূপোর টাকা ছেঁদা করে পরানো। গলায় পুঁতির মালা। হুঁ পায়ে ও হাতে লোহার বাল। ভারী সুন্দর দেখতে। উদোম আত্মল হয়ে উঠানে হামা টানে। খুঁশিতে খলবল করে হাসে। দেখলে হুঁচোখ জুড়িয়ে যায়। এ যে শিশু অনন্তের প্রতিক্রম। পুত্র বুদ্ধি পিতারই আদল পায়।

সেই ছবিটার পর একটি ভয়ঙ্কর ছবি ফুটে উঠল। একটি মেয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জলছে লক্ লক্ আগুনের শিখা।

গুডুম শব্দে সমস্ত স্বরঙ্গ পথ কেঁপে উঠল। সেই কাঁপনের রেশ রইল অনেকক্ষণ ঘাবৎ। স্বপ্ন ও বাস্তবের যুগপৎ সংঘর্ষে অনন্তের বুকটা ছ্যাং করে উঠল। উঠে বসল। ওঃ কি ভীষণ স্বপ্ন! কিন্তু মেয়েটি কে? ওকে তো চিনতে পারলো না?

যাক্ গে বারুদ আওয়াজ হয়ে গেছে। এবার কাজে যেতে হবে।

সেদিন ও সারাদিন ঘুরেছে। বিউটির কাছ থেকে ফিরে ভাত খেয়েই ছুটেছিল স্মিতবাবুর কাছে। এমন একটা খবর ওঁকে না দিলে পথ বাংলাবে কে? সংগঠনে গলদ। বক্ত পর বেইমানি হবে। অন্তর্ঘাতের প্রস্তুতি চলছে খুব গোপনে, খুব তৎপরতার সঙ্গে। সেজন্য বেচারী সারাদিন রাতে ঘুমোতে পারেনি। খাদে যদি বা একটু স্বেযোগ পেল তো এক বিভীষিকাময় স্বপ্ন এসে তাও বরবাদ করে দিল।

বক্ত পর বেইমানি। স্বেযোগ পেলেই পিছন থেকে ছুরিকাঘাত। তার দাঙগাই কি?

স্মিতবাবু বিশ্বাস করতে চান না। বলেন—না না না। ওকে আমি জানি প্রথম থেকেই ও ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী। এ খবরটা যাচাই করা দরকার। আমাদেরকে ভুল বোঝাবার চক্রান্ত হতে পারে। সংবাদ স্তরের বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

এইটাই তো বেশী ভাবনার। স্মিতবাবু যদি বিশ্বাস না করেন তবে এই

চক্রাঙ্কের মোকাবিলা করবে কি করে? শেষে ভরাডুবি হবে না তো! খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

বাতিটা নিভিয়ে দিল চোখে আলো লাগছে বলে। কিন্তু কি ঘন জমাট অন্ধকার। নিজেকেও দেখা যায় না। ভয় পেয়ে গেল। বাতি জ্বালিয়ে উঠে পড়ল।

পরের দিন সন্ধ্যায় ফাটকবাজারে দাঙ্গা লাগলো। যাদব ভারসাম সিং। যমুনা যাদব লোডার সরদার। ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য। রাম অবতার সিং খোদ এজেন্ট সাহেবের চাপরাশী। লোকে বলে বাবু সাব। বিহারের রাজপুত। সারা কলিয়ারী জুড়ে স্বদের কারবার। সভিপ্রসাদের ডানহাত। গরীব দুঃখীদের রক্ত খেয়ে শরীর মন টং হয়ে আছে। ইউনিয়নের কারবার তাদের পছন্দ নয়।

ইহ বাহ। দাঙ্গার অজুহাতে পুলিশ এল এবং অনন্তকে অ্যারেস্ট করার জ্ঞ তৈরি হলো।

পর পর তিনরাত্রি পার হয়ে গেল। অনন্ত একদিনও বাসায় এল না। অথচ সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে তারও কোনো সংবাদ নেই। তাহলে হলো কী? সেই মিটিং থেকে গা-ঢাকা দেওয়ার জ্ঞ যে গেল তারপর কোনো খবর নেই। এমন তো কখনো হয় না।

বেশ দুর্ভাবনার মধ্যে খোঁজ খবর নিচ্ছে। কিন্তু কেউ সঠিক খবর দিতে পারছে না। এমন তো হবার নয়। যেখানেই যাক গৈরীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

খবরটা লোক মারফৎ সুমিতবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবছে। তখন শৈলেন পাল নামে একটা সেকেণ্ড ইয়ার ট্রেনি এল অনন্তর ভাই প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে।

শৈলেন বলল, বৌদি! অনন্তদার ভাই। ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

গৈরী একটা কাঠের বাকসো বের করে দিয়ে বলল, বোসো ভাই।

প্রশান্ত বসল। শ্রামল স্তম্ভর এক তরুণ। গৌফের রেশ দিচ্ছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। অপ্রসন্ন মুখে বসে আছে। ওর সামনে বিপ্লব হামা টেনে বেড়াচ্ছে। উদ্যোগ আত্মল কবচ মাতুলি ঘুমলি কড়ি পরা বাচ্চা।

শৈলেন ওকে সটান বৃকে তুলে নিয়ে বলল—বৌদি! তোমার বাচ্চাটা অনন্তদার মিনি মডেল।

গৈরী মুখ টিপে বলল—হ্যাঁ। লোকে ভাই বলে। কিন্তু তোমার যে জামাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে। ওকে নামিয়ে দাও।

শৈলেন ওকে গৈরীর কোলে তুলে দিয়ে বলল—আমি চলি বৌদি।

—আচ্ছা যাও।

প্রশান্তর জন্ম চায়ের জল বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা করবে বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু ভাই ও তো পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ চতুর্থ দিন আমিও কোনো খবর পাইনি। সেজ্ঞ ভাবনায় আছি। কি দরকার আমাকে বলবে।

প্রশান্ত কেমন উদাসীন কণ্ঠে বলল—তোমাকে বলে আর কি হবে ?

ওর বলার ভঙ্গীটা গৈরীর ভালো লাগল না তবুও নিজের মনের ভাব চেপে বলল—হবে এই যে যখনই তোমার দাদার সঙ্গে যোগাযোগ হবে তখনই সংবাদটা তাকে দিতে পারবো।

—তাহলে বলে দিও মা মৃত্যুশয্যায়। দাদাকে একবার দেখতে চাইছেন।

গৈরী চমকে উঠল। বলল—অস্বথটা কি ?

—কি জানি ?

চিকিৎসা কি হচ্ছে ?

—হচ্ছে গ্রামের ডাক্তার দিয়ে।

—কোনো হাসপাতালে দাওনি ?

—না।

—কেন ?

—কে দেবে ? যার বড় ছেলে মায়ের খবর নেয় না তার চিকিৎসা কে করবে ?

—তাই বুঝি মরণ কালে খবর দিতে এসেছো ? কি বলবো তোমাদিকে ? যত ঘৃণা তো আমার উপরেই। তার জন্ম মা মরে যাক ক্ষতি নেই। এই তোমাদের বাসনা। একবার ভেবেও দেখলে না তোমার দাদা কি সংগ্রাম করছে ?

গৈরীর কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ ছিল। প্রশান্ত উচ্চভাবে বলল—আমি এসব শুনতে আসিনি।

—তা জানি। তোমার দাদা আমাকে বিয়ে করে আজ সমাজ সংসার থেকে বিচ্যুত। তোমার মা নিজে তাকে বাড়ি যেতে বারণ করেছে। তাই খবর নিতে পারেনি। না হলে অত সৎ এবং কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি মায়ের খবর নেবে না এটা হতেই পারে না। সেজ্ঞ তার যে কত কষ্ট তা আমি জানি। যাক গে ওসব কথা। তোমরা মানো আর না মানো তোমার মা আমারও মা তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন সে দুঃখ রাখার জায়গা আমার নেই।

প্রশান্ত একটুকু চুপচাপ থেকে বলল—কি করবো ? আমাদের সাধ্য অতি সামান্য। তবু মাকে বলেছিলাম একবিঘে জমি বিক্রি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা

করছি। মা রাজী হচ্ছে না। বলছে নীতির বিয়েতে জমি বিক্রী করতে হবে। না হলে বাপের দেনা শুধবি কিসে!

গৈরী ওর কাছে মাটিতেই বসে পড়ল। বলল—তাই! খরচ খরচা কিছু লাগবে না মায়ের চিকিৎসার ভারটা আমাকে দাও। তোমার দাদার স্ত্রী আমি। একেবারে পর নই। হয়তো সমাজে ঠাই নেই। মনে তো আছে। একটা দায়িত্ব পালন করতে দাও। না হলে তোমার দাদার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

প্রশান্ত এতক্ষণে সরাসরি গৈরীর দিকে তাকাল। বলল—কি করবে?

—মাকে নিয়ে এসে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করে দেবো। তোমার দাদা থাকলে সেও ঠিক এই কাজটিই করতো। বলা—ব্যবস্থা করবো?

—বেশ। তাই কর।

গৈরী শাড়িটা বদল করে ওকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

বলল—দাদা! এইটি আমার দেওর। শান্তি ড়ির ভীষণ অসুখ। ওকে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিন।

ডাক্তারবাবু প্রশান্তর নাম, লেখাপড়া, রোগিনীর বিবরণ ইত্যাদি জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় ফরম পূরণ করে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিলেন। ফরমে ম্যানেজারের সহির দরকার ছিল। সেটা কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ মিঃ চৌধুরী ম্যানেজার। তিনি অনন্ত গৈরী দুজনকেই চেনেন। অফিসেই ছিলেন। গৈরী ওকে ফরমটা দিতেই সহি করে দিলেন।

হরিলাল বাউরী এম্বুলেন্স ড্রাইভার। তাকে গিয়ে বলল, হরিদাদা আমার দেওরকে নিয়ে যাও। শান্তি ড়ি মাকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করে দিও।

প্রশান্ত বলল—তুমি যাবে না?

গৈরী চুপ করে রইল। প্রশান্ত আবার বলল—তুমি গেলে ভালো হতো। আমি হাসপাতালের কিছু জানি না।

গৈরী বলল, যেতে তো মন চায়। কিন্তু কি করবো? উনি আমাকে সহ করতে পারবেন না। তখন যদি বলে বসেন হাসপাতাল যাবো না। তাহলে কি হবে?

প্রশান্ত একটু ভেবে বলল—তুমি যদি পরিচয় না দাও তাহলে মা জানবেন কি করে?

—আমার পরিচয় গোপন রাখতে পারবে? বলে দেবে না?

—না। আমি বলবো না।

হরিলাল সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওর জানতে কিছুই বাকী নেই। বস্তুত গৈরী ও অনন্ত কলিয়ারীর মধ্যে এত আলোচিত চরিত্র যে প্রায় সবাই জানে।

সে বলল—তোমার অত কথা বলবার কি আছে দিদি? বলবে আমি ডিসপেনসারীর আয়া বটি।

গৈরী বলল—এই আমার ভাগ্য! নিজের শান্তির কাছেও সত্য পরিচয় নিয়ে দাঁড়াবার জো নেই। যাক গে—তোমরা যাও। আমি বাচ্চাটাকে খাইয়ে দাইয়ে হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা ততক্ষণে নিয়ে এসো।

গৈরী একা। খুব অশ্রমনস্ত। এক তো অনন্তর ভাবনায় চোখে ঘুম নেই। আজ আবার তার মায়ের এই খবর। কর্তব্যকর্ম তার বুদ্ধিতে যতটুকু কুলিয়েছে করেছে। এবার অনন্তর খোঁজে কলিয়ারী তোলপাড় করতে হবে। এই আসছে—এই আসছে করে প্রহর গুণে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ফিরতি পথে গুদের কর্মীদের ঘরে ঘরে খোঁজ নিল। যেসব লুকিয়ে থাকার জায়গা আছে তার অন্বেষণ করল। তারপর হতাশ হয়ে ফিরল। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছেলেটি কেঁদে কেঁদে স্নাতা হয়ে গেছে। যাবামাত্র গুর মায়ের বকুনি খেল।

ও প্রথমে কিছু বলল না। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে বসল। কিন্তু গুর মায়ের বকুনি খামছেই না তখন ধমক দিল—কোনে চৈচাছিস? ছোলা কাঁদল ত কি হলো? ঘরে তুরা এতগুলো মোয়ালোক রইছিস। চুপ করাতে লেরেছিস। আমার এখন এমনি হবেক। ছোলা তুরা সকলে রাখবি।

গুর মায়ের মুখ বন্ধ হলো। ছেলেকে খাইয়ে, দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে গেল বৈশাখীর কাছে। বলল—ভোজী! ছোলাটিকে তুই রাখিস। আমার এখন ভাবনার শেষ নাই। উয়ার বাপের খবর পেলম নাই। ঈদিকে শান্তি নাকি মরছে। উয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করতে যাব।

বৈশাখী ওকে ভরসা দিল। তখন ও স্নানাহার করে রামজীকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে গেল। যেতে আসতে দু-আনা করে চার আনা ভাড়া। সেইটুকু পয়সা বাঁচাতে একঘণ্টা পদযাত্রা।

কাগজপত্র সব ঠিকঠাক ছিল। পরিচিত লোকজনও ছিল। ভর্তি করতে সন্তুবিধা হলো না। ডাক্তারবাবু পেসেন্ট দেখে বললেন—আজ আর কিছু করার নেই। কাল সকালে ব্লাড, ইউরিন, স্টুল পরীক্ষা হবে। এক্ষরে হবে।

গৈরী জিজ্ঞেস করল—উনি ভালো হবেন তো?

—আশা করি।

ডাক্তারবাবু হাঁটতে শুরু করে দিলেন। গুর পিছনে পিছনে ওরা করিডরে এল। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল।

প্রশান্ত বলল—কি হবে কেঁদে?

এই প্রথম প্রশান্ত ওকে বৌদি বলে সম্বোধন করল। দুজনকে দেখাচ্ছিল।

ভাই-বোনের মতো। গৈরী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল—ভাবছো কেন ? কাল ডাক্তার সেনকে নিয়ে আসবো। আমার অনেক পরিচিত লোক আছে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। চল মায়ের কাছেই যাই।

ওরা দুজনে জাহ্নবীদেবীর কাছে এসে দাঁড়ল।

প্রশান্ত বলল—মা! তুমি ভালো হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন।

—তোমার দাদা এল না ?

—আসবে। তুমি অত ব্যস্ত হয়ে না। দাদার এখন অনেক কাজ।

গৈরী ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। উনি বললেন—তুমি কে মা ?

—আমি আয়ী !

ওরা অনেকক্ষণ বসে থেকে ফিরে এল।

বাইরে বেরিয়ে প্রশান্ত বলল—রাত হয়ে গেল বৌদি। বাড়ি ফিরবো কি করে ?

—তার কি দরকার ? কলিয়ারীতে থেকে যাবে।

—কলিয়ারীতে কোথায় থাকবো ?

—আমরা যেখানে আছি। তুমি আমার লক্ষণ দেওর। ভাত রেঁধে খাওয়ানো। ছুনিয়া ঘরে খেলে জাত যাবে না তো—

গৈরী মুখ টিপে হাসল। প্রশান্ত বলল—ঠাট্টা করো না বৌদি। আগে তোমাকে যাই মনে করি এখন কিন্তু সত্যিকারের বৌদি বলে মনে করছি। তোমার রাঁধা ভাত খেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ ধাওড়া ঘরে থাকা—ওরে বাপ !

গৈরী খিল খিল করে হাসল। এতক্ষণে ওর স্বভাবচপল কৌতুকপ্রিয় ভঙ্গীটি ফুটে উঠল। চলতে চলতে প্রশান্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—আহা ! সাধের দেওর আমার। তোমার কোনো ক্রটি রাখবে না।

—হাসছো বৌদি ! এত কষ্টেও তোমার হাসি বেরোয় ?

—হাসতে পারলে দুঃখ-কষ্ট তোমার মন থেকে পালাবে ? ভেবো না—আমি তোমার পাকা ব্যবস্থা করবো। থাকবার খাবার ভালো জায়গা।

—সেটা কোথায় ?

—অগ্রদূত মেসে। তোমার দাদার সিটটা তো আছে। ঐ ঘরে শৈলেন থাকে, তার কাছেই জিন্মা করে দিচ্ছি গে। চলো।

তারপর সহজ ও স্বচ্ছন্দভাবে কথা বলতে বলতে ওরা এক ঘন্টার পথ হেঁটে এসে অগ্রদূত মেসে প্রশান্তর জায়গা করে দিল। সবাই ওকে বৌদি বৌদি করে। তাই বসে আড্ডা মেসে, চা খেয়ে বেকল। রামজীকে বলল—দাদা ! আমি একবার স্টি. ভি. সাহেবের বায়লোতে যাচ্ছি। বিউটীদিকে বলে আসি।

একাল

কখনো কি ভোর হবে না? এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতটা কখনো কি ফুরোবে না! এক ফোঁটা আলোর মুখ দেখতে পাবো না? গৈরী, বিপ্লব আমার ভালোবাসা এবং ভালোবাসার ফল কি কোনোদিন আমার সামনে এসে দাঁড়াবে না? আমি কি আমার গর্ভধারিনী জননীর ক্ষমা না পেয়েই মরব? আমার অপরাধী আত্মার কি সদগতি হবে?

একটির পর একটি জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে জেগে উঠছে। মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে অন্ধকার রাজ্যে পড়ে আছে। এবার বুঝি ফসিল হয়ে যাবে।

আজ কদিন হলো?

কে জানে!

এখানে তো সূর্যোদয় হয় না। নিরয়ণ কালচক্র গতিহীন, শব্দহীন অন্ধকারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কি ভীষণ অন্ধকার। কি বিকট নৈঃশব্দ। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই। কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। সে যে বেঁচে আছে এই বোধটাই ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

স্মৃতিটা এখনো আছে। পর পর সব কিছু ভেবে নিতে পারে সে।

হ্যাঁ! সে তো ভাবতেই হবে। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ প্রাণ ধারণের চেষ্টা করতে হবে। এমনভাবে ইঁহুর বিড়ালের মতো ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারাতে পারে না। এই একটা প্রাণের অনেক দাম। তার উপর নির্ভর করে আছে সংসারের অনেকগুলি প্রাণী।

সেদিন মিটিংয়ের পর রঘুবীর ভুঁইয়ার ধাওড়াতে আত্মগোপন করেছিল। সরল বিশ্বাসে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে একটি খাটিয়াতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভয় ছিল পুলিশকে। কিন্তু বিরাট কুলি ধাওড়ার অসংখ্য গলি ঘুঁজি লোকজনের মধ্যে কোথায় অনন্ত আছে তা তাদের পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। যদি বিশ্বাসঘাতকতা না হয়।

সেই বিশ্বাসঘাতকতা হলো। তবে পুলিশের হাতে না দিয়ে তিলক সিংয়ের হাতে ওকে তুলে দিল। তিলক সিং মানেই সন্তিপ্রসাদ মানেই মিঃ শ'। সরল অন্ধ। বিউটি তাকে সরলভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। বুদ্ধিমান ছাত্র হিসেবে তার যত বড়াই ভেঙে দিল অর্ধশিক্ষিত মাইনিং সরদার।

মাত্র চারজন লোক তাকে খাট স্তম্ভ বেঁধে ফেলল। মুখে কাপড় গুজে দিল। কাপড় ঢাকা দিয়ে শব্দেহ বহনের মতো করে নিয়ে গেল। হরিধ্বনিটা দিলেই ভালো করত।

আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল কিন্তু প্রতিরোধের উপায় ছিল না। চোখ বাঁধা ছিল বলে দেখতেও পায়নি। শুধু অচুতবে বুঝতে পেরেছে কোনো একটা চানক দিয়ে নীচে নামিয়ে তাকে খাদের ভিতর বন্দী করা। খাদটা

নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়া নেই। বাতাস খুবই সামান্য।
বিষাক্ত গ্যাস বোধ হয় নেই। তাহলে ও বেঁচে থাকতো না।

মাঝে মধ্যে তিলক সিং নিজেই আসে। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে।
ওর সঙ্গে একজন আসে হাতে হাতিয়ার নিয়ে ওর বডিগার্ড হয়ে। তাকে সে
চেনে না।

প্রথমদিন তিলক সিং খাবার নিয়ে এসে বলল, নমস্কার অনন্তবাবু।

আগে খাইয়ে নেন তারপর কথা হবে।

সেই প্রথম দর্শনেই ষড়যন্ত্রের পুরো ছকটা ও বুঝে ফেলল। কোনো উদ্বেজন
না দেখিয়ে ধনুবাদ দিয়ে খেয়ে নিল। কারণ শরীর ধারণের জগু খাবার বিশেষ
প্রয়োজন। একমুঠো ভাত মানে একদিন বাঁচার আশ্বাস।

ভালো তরকারি দিয়ে ভাতগুলো খেয়ে ঘটি ভর্তি জলটা খেল।

তিলক সিং বলল, আমার অপরাধ নেবেন না বাবুজী! অনেক দিক ভেবে
চিন্তে আপনাকে আটক করতে বাধ্য হয়েছি।

অনন্ত বলল—আপনি এজেন্ট সাহেবের বংশবদ ভৃত্য। তার গুহুম তামিল
করেছেন। এতে আমার কি বলবার আছে?

—বাবুজী। আমার একটা কথা আছে। যদি মানেন তবে এখন
আপনাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো।

অনন্ত নিরাসক্ত ভঙ্গীতে বলল—বলুন।

—আপনার আমার লড়াই কোম্পানীর বিরুদ্ধেই। আমি আপনারও দুঃমন
নই। লেবারেরও দুঃমন নই। সেজগু আপনার আমার মধ্যে একটা সমঝোতা
হলে পুরো কলিয়ারীর চেহারা বদলে যাবে।

অনন্ত ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। -ক্যাপল্যাম্পের আলোতে ওর মুখের
রেখা পড়বার চেষ্টা করল। ওর সঙ্গীটিকেও দেখল। হাতে ভোজালি নিয়ে
একটু তফাতে দাঁড়িয়ে।

বলল—আমার কতটুকু ক্ষমতা?

—লেবাররা আপনার কথা মানে, বিশ্বাস করে। তারা স্ট্রাইক করবে।

—তা কেন বলছেন? আমি তো কর্মীমাত্র। স্ট্রাইক কল করেছেন
ফ্রেড ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি।

—ওরা অনেক দূরের মানুষ। লেবাররা চেনে না। তারা আপনাকে
আমাকে চেনে। তাই বলছি আপনি একটা পয়েন্টে রাজী হয়ে যান।

—কি পয়েন্ট?

—স্ট্রাইক সমর্থন করবেন না।

—তাহলে কি হবে?

—দেখুন স্ট্রাইক করলে লেবারদের দুর্গতির শেষ থাকবে না। এমনিভেই

তো ওরা খেতে পায় না। তারপরে স্ট্রাইক হলে না খেয়ে মরবে। এত লোককে কি খাওয়াবেন? তখন তো ওরা আমাদেরই রক্ত খাবে। আমরাই তো ওদের স্ট্রাইক করার প্ররোচনা দিচ্ছি।

—কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। লড়াই করতে হলে ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্ণ। সে পরিণতির কথা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা তা মেনে নিয়েছে। এখন আমরা দুজন মত বদল করলেই যে সবাই মেনে নেবে তা কেন ভাবছেন? তখন অল্প কেউ নেতৃত্ব দেবে। আমরা হব বিশ্বাসঘাতক।

তিলক সিং একটু ভেবে বলল—না। দেবেন সেন ছাড়া কি নেতা নেই? আমরা অল্প ইউনিয়ন গড়বো। কোম্পানীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবে। তারা আমাদের দাবি মেনে নেবেন। স্ট্রাইকের আগেই যদি আমাদের দাবি স্বীকৃত হয় তবে তো জিৎ আমাদের।

অনন্ত হেসে ফেলল। কোম্পানী অনেক বড় বড় ঘুঘু অফিসার পুষে রেখেছেন আমাদের মগজ ধোলাই করতে। তারা আপনাকে ভালোই মস্ত দিয়েছেন। কিন্তু তিলকবাবু দাবিই যদি মেনে নেবেন তবে লড়াইয়ের ময়দানে তেলে দেবেন কেন?

—সেটা ওদের নীতিগত ব্যাপার।

অনন্ত আবার মনে মনে হাসল। মিঃ শ' এ লোকটির মগজ ভালোই ধোলাই করেছেন। আমি রাজী হলেই একটি বিশ্বাসঘাতকের গ্রুপ তৈরি হয়ে যাবে। তখন কণ্টকে নৈব কণ্টকম্।

জিজ্ঞাসা করল, আমাকে তো আটকে রেখেছেন। আমার স্ত্রীকে কি করেছেন?

একহাত জিত কেটে তিলক সিং বলল—ছিঃ ছিঃ। কি ভাবছেন আপনি? গৈরী আমাদের বোন। তার কিছু ক্ষতি করতে পারি কি? সে ঠিক আছে।

ধন্ববাদ তিলকবাবু।

—বলুন অনন্তবাবু। আমার প্রস্তাবে আপনার কিসের আপত্তি?

কিসের যে আপত্তি তা ওকে বোঝালেই কি বুঝবে? ও তো গুরুমস্ত পেয়ে গেছে। এখন তারই ধ্যান করছে। সামনে বড় রকমের প্রলোভন অবশ্যই আছে। কিন্তু দলবদল করে, ঝাণ্ডা বদল করে ফায়দা লুটবার মনোবৃত্তি সে অর্জন করতে পারেনি। যে নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে সে শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছে তাকে ঝেড়ে ফেলবে কি করে? তা কি অত সহজ?

কিছু আদর্শই যদি না থাকত তবে সে আজ ছোট সাহেব হয়ে যেত। কুলি খাওয়ার নোংরা ঘেমাগ বাসি করতো না। তার ছেলেকেও ভাতের ফেন খাওয়াতে হতো না। গৈরীকেও দারিদ্র্যের বিজ্ঞাপন মার্কা বগল ছেঁড়া ব্লাউজ পরে ছেঁড়া শাড়ি টেনে বেড়াতে হতো না।

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি আমি তো শ্রমিক নেতা ছিলাম না। তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি। কাজ যা করেছি তার প্রচার হয়েছে বহুগুণ। তাই আপনারাই আমাকে সেক্রেটারি করেছেন। স্নুখে-দুঃখে কাজ করেছি। কতটুকু শ্রমিক ঐক্য গড়তে পেরেছি জানি না। কিন্তু আমি তো সব তাগ করেছি। আমার নিজস্ব জীবন আছে। স্ত্রী পুত্র মা ভাইবোন আছে। তাদের প্রতি কর্তব্য আছে। আমার পথও খোলা আছে। অনায়াসেই সেকেন্ড ক্লাস পাস করতে পারি। তখন আমার জীবনের ধারাটাই বদলে যাবে। কিন্তু শ্রমিকদের জগৎ যে কাজ শুরু করেছি তা থেকে পিছু হটতে পারি না। বিশ্বাসঘাতকতা তো নয়ই। তাতে যদি এই খাদেই আমার সমাধি রচিত হয় তবুও।

তিলক সিং কিছুক্ষণ ভাবার পর বলল—তাহলে আপনাকে স্ট্রাইক শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তাছাড়া আমার উপায় নেই।

—এখন আমার জীবনটাই আপনার হাতে। যা ভালো বুঝবেন করবেন।

—আচ্ছা। নমস্কার।

তিলক সিং চলে গেল। তারপর আবার নিবিড় অন্ধকার। কয়লার মেঝেতে শুয়ে থাকে। আকাশ পাতাল ভাবে। সবচেয়ে বেশী ভাবনা গৈরীর জগৎ। তার উপর কোনো অত্যাচার হচ্ছে না তো? তিলক সিং মুখে যে কথা বলে গেল তা কি বিশ্বাস করা যায়?

না জানি আরো কত মূল্য দিতে হবে?

তা হোক। যে কোনো মূল্য দিতে সে রাজী। আদর্শের জগৎ সর্বস্ব তাগ করার প্রস্তুতি তার আছে।

কিন্তু তার পরেও কি আন্দোলন সফল হবে? ষড়যন্ত্রের শিকড় যত গভীরে প্রসারিত হয়েছে তাতে কি বিশ্বাসঘাতকের দলকে সিকড় শুদ্ধ তুলে দামোদরে ভাসিয়ে দিতে পারবে? আরো কত তিলক সিং তৈরি হয়েছে কে জানে? সব কলিয়ারীতেই ওরা ছড়িয়ে আছে। ষড়যন্ত্র করছে। স্ট্রাইক যদি বানচাল করতে পারে তবেই তো শ্রমিকের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল। আবার কবে কতদিন পরে তাদের মেরুদণ্ড সোজা হবে কে বলতে পারে?

হবে না—এই পোড়া দেশে মাহুঘের মান ইচ্ছত থাকবে না। একদিন বেইমান মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বণিক রাজা হলো। সেই মীরজাফরের দল বার বার ফিরে আসছে। নূতন রূপে। মাহুঘের ইমান না থাকলে মান কোথা থেকে আসবে?

এমন ভাবনা অনেক ভাবা হয়ে গেছে কত দুর্ভাবনা জর্জরিত হয়েছে। কিন্তু এই ড্যাম্প লাগা খাদের বাতাস, ঠাণ্ডা স্ত্রী স্ত্রী কয়লার মেঝে, নিবিড় কালো অন্ধকার, প্রাণহীন পাতালপুরীর গভীর নৈশব্যস্ততার চিন্তা জগতের উপরে আস্তে

আস্তে ভারী শিলাস্তর চড়িয়ে দিচ্ছে। সে ভাবতেও পারছে না। ক্রমাগত অর্ধাহারে শরীরও অবসন্ন। চোখ বুজে পরে আছে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত।

হঠাৎ মনে হলো অনেক দূরে এক বিন্দু আলো। চোখ দুটো ড্যাব ড্যাব করে তাকাল হ্যাঁ। সত্যিই তো! আসছে—একটা আলো আসছে। একটা নয় দুটো! ওরা কারা? উঠে বসল।

দুটো আলো কাছে এল। ওর কাছে এসে দাঁড়ালেন ডি. ডি. সাহেব এবং মিঃ শ'।

অনন্ত কথা বললো না। কয়লার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নির্জীব ভঙ্গীতে শুয়ে রইল। বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরলো। একদিন এই ডি. ডি. সাহেবের জ্ঞান ও জ্ঞান কবুল করেছিল। খাদের তিতর বিষাক্ত গ্যাস থেকে টেনে তুলেছিল। তাই বৃষ্টি সর্বনাশের পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—অনন্ত! কেমন আছে।

—ভালো আছি।

মিঃ শ' বললেন—মাইগড! এখানে তুমি ভালো আছ?

—হ্যাঁ স্যার। মাতা ধরিত্রীর গর্ভে বাস করছি—আলোহীন, শব্দহীন, আশাহীন হয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতোই। এতদিন কিছু ভাবনা, চিন্তা, অহুভূতি বেঁচেছিল তাও ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে।

—কিন্তু তুমি বাঁচলে—দারুণভাবে বাঁচতে পারো।

মিঃ শ'য়ের কথাটা প্রায় লুফে নিয়ে অনন্ত বলল—হ্যাঁ স্যার। তিলক সিং সে প্রস্তাব দিয়েছিল।

উনি উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন—তা নিয়ে ভেবেছো কি?

—ভাবনার কোষগুলো জ্যাম হয়ে গেছে স্যার। ভাববো কি?

—তোমার ওয়াইফের জ্ঞান ভাবনা হয় না?

—কিসের ভাবনা? আমি মরে গেলে মাথায় ঝোড়া বয়ে থাকবে। প্রথম প্রেমের ভাবালুতা দারিদ্র্যের আঘাতে কেটে যাবে।

—হাউ ফানি!

মিঃ শ'য়ের বিশ্বয়শূচক ধ্বনি অনন্তের কানে ব্যঙ্গের মতো শোনাল। ক্যাপল্যান্সের আলোটা চোখে লাগছিল। তাকাতে পারছিল না। অল্পদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

মিঃ শ' বললেন—কিন্তু ওকে যদি ভূত বাংলোতে তোলা হয়?

—সেটাই স্বাভাবিক। আপনার মতো মানুষ এর চেয়ে কোনো মহৎ চিন্তা করিতে পারে না। আফটার অল ওর তো একটা বস্তু সৌন্দর্য আছে। তাতে আপনি প্রলুব্ধ হবেন—এ তো জানা কথা।

—অনন্ত !

—কিন্তু স্মার ভূত ভোজন মরা মানুষের মাংস দিয়েই হয়। আপনার পরিকল্পনা গুণ্ডা বদমাইশ দিয়ে যদি সার্থক করতে যান তবে গৈরীর মূর্দা লাশটা পাবেন। তা দিয়ে ভালো রোস্ট হবে। ছুন লক্ষা দিয়ে খেতে পারেন।

—ননসেন্স !

ডি. ডি. সাহেব বললেন—আঃ অনন্ত ! কি আজ্ঞে বাজে বকছো ? তোমার মা ভীষণ অসুস্থ। একেবারে মৃত্যুশয্যায়। সেটা নিয়ে ভাবো !

অনন্ত তার উত্তর দিল না। তার হৃদয়ে একটা নতুন শেল বিদ্ধ হবার জ্বালা অনুভব করল।

মিঃ শ' বললেন—তোমার মাকে দেখতে চাও না ?

—জননী-গর্ভধারিণী। তাকে কে না দেখতে চায় ?

—তাহলে তিলক সিংয়ের প্রস্তাব গ্রহণ কর।

—আপনি হয়ত জানেন না—আমি মায়ের পরিত্যক্ত সন্তান। তাকে চোখে দেখাই হবে কিন্তু কোনো উপকারে লাগব না ! তাহলে আর শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে বেইমানি করব কেন ?

—তুমি তোমার মাকে নিয়ে কলকাতা যেতে পার। মেডিকেল কলেজে ভর্তি কর। নিজের স্ত্রীপুত্র নিয়ে হোটেলে থাক। কোম্পানী সব খরচ দেবে।

—তারপর ?

—তারপর স্ট্রাইকের শেষে ফিরে আসবে। তোমার জন্ম একটা বাংলা এবং প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্টের পোস্ট দেব। তোমার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়ে যাবে।

অবসন্ন কর্ণে অনন্ত বলল—বড় চমৎকার প্রলোভন। কিন্তু স্মার—আমি নিজের ক্ষমতাতেই ফার্স্ট ক্লাস পাশ করে ম্যানেজার এজেন্ট হতে পারি। তার জন্ম আপনার মেহেরবানির দরকার নেই।

—কিন্তু তোমার স্ত্রীকে যদি রবিলালের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সে কি রকম বদলা নেবে বুঝতে পারছ ?

অনন্ত ব্যঙ্গাত্মক কর্ণে বলল—আপনি কি আমার ভূত ভোজনের ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারেননি স্মার ? যে তার জীবনেরই পরোয়া করে না তাকে আর কিভাবে শাসানি দিতে পারেন ? সতীত্ব লুণ্ঠনের ? সে ভয় গৈরীর নেই। লুণ্ঠনকারীকে বল্লম দিয়ে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করতে পারে সে।

—ও কে ! তাই দেখা যাবে। বিষ কেমন ঝাড়তে হয় জানি।

ওঁরা চলে গেলেন।

তবু ওরা ছিল তো মানুষের কর্তৃত্বর গুনতে পাচ্ছিল। ওদের কাছে বাতিও ছিল। এখন আবার নীরব নিস্তব্ধ পাতালপুরীতে সে যেন ফাঁসির আসামী। হ্যাঁ। আসামীই তো ! খনি শ্রমিকদের আন্দোলন মালিক পক্ষের কাছে বিরাট

অপরাধ। অনন্ত সেই অরবাধে অপরাধী। এখন চলছে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার। এরপর সত্যিসত্যিই তা কাজে লাগানো হবে। গৈরীকে ধরে নিয়ে গিয়ে একপাল ক্ষাপা কুকুরের সামনে কেলে দেবে। তাকেও তিলে তিলে হত্যা করবে।

যা পারে করুক। তবু সে বেইমানী করবে না।

গৈরী পারে তো নিজের ইজ্ঞং বাঁচাক না হলে মরে যাক। কয়লাকুটির কালো যবনিকায় কোরবানি হোক দুটি জীবনের।

বাহান্ন

বন্ধ চানক। ব্রিটিশ আমলের এক নম্বর দামুলিয়া পিট। মাঝে দূরত্ব বেখে দুটি চানক। এক ও দু'নম্বর। প্রায় দুশো ফুট গর্ত। একদা এই খাদ থেকে প্রচুর কয়লা তোলা হয়েছে। তখন ফাঁকা জায়গায় বালি ভরাটের ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য খোলা চাউনি করে কয়লা কাটা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে শিলাস্তরে ধস নেমেছে।

চানক দুটি আছে এবং এক থেকে দু'নম্বরে যাবার পথটাও আছে। প্রাকৃতিক কারণে বায়ু চলাচল হয়। এই পথটারই এক জায়গায় অনন্তকে রাখা হয়েছে। কাকপক্ষীরও টের পাবার জো নেই। এখানে আসা যাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়। উপরে ইঞ্জিন বয়লার কিছু নেই হেড গীয়ারের পাল্লায় পুলিচাকা ফিট করে ফ্রেনের তলায় বালতি লাগানো হয়েছে। হাতে ছাওঁল ঘুরিয়ে ফ্রেন চালাতে হয়। চারজন লোক লাগে।

বালতিটা বড়। তাহলেও দুজন লোক কোনোরকমে উঠতে পারে। মিঃ শ'য়ের সঙ্গে ডি. ডি. সাহেব। দুজনেই মরদ। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে চড়েছে। বালতি উঠছে ধীরে ধীরে। এদিক ওদিক তুলছে।

মিঃ শ' বললেন—ডি. ডি. ! অনন্ত যখন রাজী হলো না তখন ওকে আটকে রেখে কি হবে? শেষ করে দিলেই হয়।

ডি ডি বললেন—সেটা কোনো ব্যাপার নয় স্মার। খাবার না পাঠালে আপসে মারা যাবে। দিন কয়েক পরে যখন উপবাসে প্রাণ যাই যাই অবস্থা হবে তখন আরেকবার তিলক সিংকে পাঠিয়ে খবর নিলেই হবে। রাজী হলে ভালো না হলে এখানেই সমাধি।

উনি একটু ভেবে বললেন—গ্যাটস রাইট।

অন্তক ওদের বাতির আবছা ছটা অল্পসরণ করে হামাগুড়ি দিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল। মিঃ শ'য়ের কঁধাতে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তাতে তাকে হত্যা-কল্পণে হুতে পারে। তাই একটু আলোর সন্ধান করতেই হবে।

ডি. ডি. সাহেবরা একটা ধাক্কা ঘুরে যাবার পরই চারিদিকে জমাট অন্ধকার।

বাতির ছটার ছায়া উপছায়াও নেই। তবু খাদে কাজ করার অভিজ্ঞতাতেই পায়ের শব্দ অল্পসরণ করে এগিয়ে সঠিক ঝাঁকটি খুঁজে পেল। আর কি আশ্চর্য।

একবিন্দু আলো। উপর থেকে ঠিকরে পড়ছে নিচে। ও হামাগুড়ি দিয়ে যত এগোচ্ছে আলোর বৃত্তটি ততো পরিধিতে বাড়ছে। ধীরে ধীরে সে এসে পড়ল আলোর বৃত্তটির মধ্যে। দেখতে পেল একটি চানক। উপরের সূর্যরশ্মি নিচে এসে পড়েছে। উপরে হেডগীয়ার ও সেই বালতিটি দেখা যাচ্ছে। ওহো! এই তাহলে রহস্য।

কিন্তু এখানে উঠবে কি করে? কোনো উপায় কি বের করা সম্ভব?

চানক দিয়ে টুপ টাপ জল পড়ছিল। ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল। সূর্যের আলো এবং কিছু শব্দ ছিল। এইসব নৈসর্গিক বস্তুপঞ্জের মধ্যে কিছু শক্তিও নিহিত আছে। তারই প্রভাবে অনন্তর মনের অবসাদ কেটে যাচ্ছিল। অঞ্জলি পেতে জল নিল। খেল এবং মুখে চোখে দিল। পুরানো দিনের কাঠে ছাতু ফুটেছিল। কিরকম লতানে গাছের মতো শিকড় বাকড় ছড়িয়ে পড়েছিল। অনন্ত ভাবলো এগুলো কি খাওয়া যায় না?

খাবার থাক বা না থাক জল, বাতাস এবং আলো তো পেয়েছে। এই ঢের। এতেই সে উপরে উঠবার উপায় বের করবে।

গৈরী হন্তে হস্তে বেড়াচ্ছে। মাথা খুঁড়ে মরছে। এত যে খোঁজাখুঁজি সব ব্যর্থ। কোথাও একটা সূত্র বের করতে পারছে না। ডি. ডি. সাহেব বলেছিলেন—খবর পেলেই জানাব। তা জানাননি। হয়ত জানাবেন না। বিউটিদির সঙ্গে দেখা করা যাচ্ছে না। দিনমানে ঘাবার ভরসা নেই। হাজার লোকের নজর তার উপরে। রাত্রে বাঘের ভয়।

সেই উদভ্রান্ত অবস্থাতেও ও হাসপাতালে গেছে শান্তিড়ির খবর নিতে। রোজই যায়। চিকিৎসা চলছে। এক্স রে হয়েছে। ডাঃ সেন বলেছেন পেটে টিউমার। অপারেশন করতে হবে। দিনকয়েক দেখে নিই। তুই ঘাবড়াস না গৈরী। তোর শান্তিড়িকে ভালো করে দেব।

জাহ্নবীদেবী সেদিন একটু সুস্থ ছিলেন। গৈরীকে দেখে চোখ দুটি উজ্জল হলো। গৈরী বলল—আজ কেমন আছেন মা?

—ভালো আছি।

—ডাক্তারবাবু আপনাকে ভালো করে দেব বলেছেন।

—তোমারই কৃতিত্ব মা। প্রশান্ত আমাকে সব বলেছে।

গৈরীর বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। তবে কি প্রশান্ত ওর পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছে? কপটতা ও মিথ্যাচারের সঙ্গে অস্তিনয়ও এসে পড়ে। তাই সে মনের আশঙ্কা চেপে রেখে মুখে হাসি টেনে বলল—কি যে বলেন মা? আমি কি করেছি?

—বাঃ রে। তুমিই তো আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছ। প্রশান্ত বলেছে—দাদার সঙ্গে দেখা না হলে কি হবে? তুমি বলেছ—অনন্তবাবু পাঁচ হাজার শ্রমিকের নেতা। তাঁর মা যদি বিনা চিকিৎসায় মরেন তবে আমরা কি জন্তু আছি? আমি দেখাশুনা করব।

গৈরী মনে মনে হাসল।

জাহ্নবীদেবী জিজ্ঞাসা করলেন—অনন্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?

—হ্যাঁ মা। ঠাঁর সঙ্গে কার না পরিচয় আছে?

—তোমার সঙ্গে গুর দেখা হয় না?

—এখন কদিন হয়নি। বোধ হয় পার্টির কাজে বাইরে গেছে।

ওঃ। তাই বুঝি আসেনি।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইলেন। গৈরী ঠাঁর বিছানাটা ঝাড়াঝাড়ি করে টুলটার উপর বসে পায়ে হাত বুসিয়ে দিচ্ছিল। জাহ্নবীদেবী বললেন, তোমার ছেলেমেয়ে কটি?

—একটি ছেলে।

—স্বামী কি করে?

—কলিয়ারীতে কাজ করে।

—লেখাপড়া জানো?

—হ্যাঁ মা। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছি।

—ইস্। আর এক বছর পড়লেই ম্যাট্রিক পাশ করে যেতে।

—বিয়ে হয়ে গেল মা। তবু হতো। বাচ্চাটা পেটে এসে গেল।

এমনিই হয়। মেয়েদের জীবনে কত যে বাধা বিপত্তি। তবে তোমার স্বামী সন্তান আছে। তাদেরকে নিয়েই জীবন পূর্ণ হবে।

—সেই আশীর্বাদ করুন মা।

—হ্যাঁ মা। তোমাকে আমি হিয়া খোলসা করে আশীর্বাদ করছি।

গৈরী ঠাঁর পায়ে মাথা ঠেঁকাল। ভিতরটা দুঃ দুঃ করছিল।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মা অনন্তর বউকে তুমি চেনো?

একটু ধতমত খেয়ে গৈরী বলল, হ্যাঁ মা।

—সে কেমন মেয়ে?

—এমনি আমার মতোই।

—তুমি তো সোনার মেয়ে।

গৈরী হাসল। আনন্দে হলো। অনন্তর দিল না।

উনি বললেন—অনন্তর বউ কি করে?

—স্বামীর সঙ্গে ইউনিয়ন কল্লে।

—ঐ ইউনিয়ন করতে গিয়েই বুঝি ওদের ভাব ভালোবাসা?

এ প্রশ্নের উত্তর গৈরী ছাড়া আর কে জানে ? কিন্তু নিজের ভালোবাসার কথা কি শাউড়ির কাছে বলা যায় ?

বলল—তাব ভালোবাসা কখন যে কিভাবে হয় তা কে বলতে পারে মা ? তবে আমি জানি গুঁদের খুব সাচ্চা ইমানের ভালোবাসা এবং তার জ্বোরেই লড়ে যাচ্ছে ! খুব ভালো মেয়ে মা ।

নিজেকেই নিজে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল । কারণ মায়ের মন ভেজাতে হলে এমনি কথাই বলতে হয় । ও এখন কথা বলতে শিখে গেছে ।

উনি বললেন—কি ভালো মেয়ে ? বিবাহিতা মেয়ে । তার স্বামী ছিল ।

সে তো ছ'বছর বয়সের কথা । বিয়ের মর্মই বুঝতো না । বাপ মায়ের এমন করে বিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি । কত সমস্যা দেখুন । ভালোবাসা রাখে না স্বামী রাখে ? ওর সাহস আছে তাই ভালোবাসা রেখেছে । এতে অন্ডায় কি মা ?

—কি জানি মা ? আমাদের গৌড়া হিন্দুয়ানী স্বামী ছাড়া অন্ড পুরুষকে ভালোবাসা সমর্থন করে না । আমিও করি না ।

গৈরীর মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেল । ভীষণ দুঃখ বোধে ভিতরটা টন টন করছে । তাদের ভালোবাসায় মায়ের সমর্থন নেই । মা সেকথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছেন । এই জন্মই বৃষ্টি অনন্ত ওকে বলেছিল আমি না বললে মায়ের কাছে মুখ দেখিও না ।

তবু ওকে মুখ দেখাতে হলো । পরিস্থিতি সেরকম হয়ে উঠল বলেই । ভাগ্যিস মা তার পরিচয় জানেন না । কিন্তু কেউ যদি বলে দেয় তাহলে মুখ দেখাবে কি করে ?

জাহ্নবীদেবী বললেন, কত সাধ আহ্লাদ ছিল ছেলে পাশ করে ম্যানেজার হবে । সংকুলে বিয়ে দিয়ে বউ আনবো । সব পুড়ে ছাই -হয়ে গেল । অমন বুদ্ধিমান ছেলে কি করল ? একটা ছোটলোকের মেয়েকে বিয়ে করে মুখে চুনকালি দিল । দ্বিতীয় পক্ষের কনে । আমাদের গায়ের বাউরীরা যাকে শ্রাঙ্গ বলে তাই করলো বিদ্বান বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের ছেলে । সংসারের কথা ভাবল না । মায়ের বাখা বুঝল না ।

গৈরীর মনে হচ্ছিল একটা গরম ছুরি মাংস কেটে কেটে বৃকের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে । এবার বৃষ্টি কলিজাটাকে কেটে বের করবে । মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল । ঘোমটা আরো খানিকটা টেনে বেডের উপর ভর দিয়ে বিকৃত মুখে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ।

উনি বললেন—শুনেছি বাচ্চা হয়েছে । অনন্তর ছেলে । আমাদের রংশ প্রদীপ । কে না নাতির মুখ দেখতে চায় ? আমিই এক পাবাগী মা । ছেলে বউ নাতিকে পর করে দিলাম । তাই তো অনন্ত আসছে না ।

উনি কাঁদছিলেন। আর গৈরীর সর্বসত্তা থর থর করে কাঁপছিল। বলতে যাচ্ছিল না মা। সেজ্ঞ নয়। আপনার ছেলের কোনো খোঁজ নেই। কিন্তু বলতে পারল না। কি যেন গলায় আটকে গেল। দলা পাকানো কফ অথবা নিখাদ অশ্রু প্রবাহ।

বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নিজেকে একটু সামলে নিল। বসে আছে। হঠাৎ খট্ খট্ শব্দে চমকে উঠল।

মুখ তুলে দেখলো অতি উগ্র ড্রেস পেণ্ট করে বিউটি তার খুব কাছে এসে গেছে। ধড় ফড় করে দাঁড়িয়ে বলল—দিদি।

—বাইরে আয়।

বলেই ও হিল তোলা জুতো খট্ খট্ করে বেরিয়ে গেল।

গৈরী বলল—ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসি মা।

—উনি কে মা ?

—আমাদের ছোট সাহেবের মেমসাহেব।

দুপাশে সারি সারি রোগিনী। মাঝে পথ। আট দশটা বেডের পর দরজা। বিউটি কড়িভর দিয়ে বারান্দার ও প্রান্তে চলে গেছে। গৈরী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ দেখাচ্ছিল দুজনকে মেমসাহেব ও তার আয়ার মতো।

বিউটি বলল, কিরে ? কাঁদছিলি কেন।

—আপনি দেখে ফেলেছেন বুঝি ?

—হ্যাঁ উনি তো শাস্তি।

—হ্যাঁ।

—শাস্তি বউয়ে ভাব হলো তাহলে।

—না দিদি। ওঁকে আমার পরিচয় দিইনি। উনি তো আমাদিকে সমর্থন করেন না।

—ওঃ। যাক্ গে এসব কথা। শোন তোর জন্মই আসা। অনন্তর খবর আছে।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ। ভালো করে বুঝে নে। তিলক সিং ওকে দু'নখর খাদের ভিত্তর ঢুকিয়ে রেখেছে।

গৈরী আশ্চর্য হয়ে বলল—সেখানে ডুলি, ইঞ্জিন কিছুই নেই। নামল কি করে ?

—সে ওরা ক্রেনের সঙ্গে রসা বালতি ফিট করে নামা ওঠার ব্যবস্থা করেছে।

উপরে পাহারা দেবার লোক আছে।

—তাহলে উদ্ধারের উপায় ?

—সে ভাবনা তোদের। আমার নাম যেন গোপন থাকে। তাড়াতাড়ি করবি। ওর জন্তু খাবার বন্ধ করে দিয়েছে।

—আচ্ছা দিদি।

বিউটি খট্ খট্ করে চলে গেল।

একটি খবর। কিন্তু যেন বিদ্যুৎ প্রভ। গৈরীর মাথা ঘুরে গেল।

ওঃ বেইমান তিলক সিং।

না। আর একমুহূর্তও সময় নেই। জাহ্নবীদেবীর কাছে গিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি মা। খুব জরুরি কাজ আছে।

রাত নিঃসুম। বাচ্চা কাচ্চারা খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। হুনিয়াধাওড়া শুশুনা। চবুতরা ফাঁকা। ফাটকবাজার বন্ধ। কলিয়ারীর টাউস প্রপেলার ক্যানটা চলছে গোঁ গোঁ শব্দে। জিনিং প্ল্যাণ্টের ঘট্যাং ঘট শব্দ উঠছে। দামোদরে সেদিন ভীষণ বান এসেছিল। তারও ক্রুদ্ধ গর্জন যান্ত্রিক শব্দপুঞ্জের ওপর গুড় গুড় শব্দের এক নূতন মাত্রা যোগ করেছে।

তখন গৈরীর সেই ঘরটিতে গুম হয়ে বসে আছে গৈরী, গুলু, জগদীশ, হরেরাম, রামজী। গৈরী খবরটা দিয়ে ওদের দিকে তাকাল।

হরেরাম বলল, আজ সকালে এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে ডি. ডি. সাহেব ওই খাদে গেইছিল। তখন বুঝতে লেরেছি ঈবারে বুঝছি কোনে উখাদে নেমেছিল।

জগদীশ বলল, মনে হচ্ছে খবর পাকা। কারণ বেশ কিছুদিন থেকে লোক পাহারা আছে। তা আমি দেখেছি।

গৈরী বলল, খবর একদম পাকা। এখন উদ্ধারের উপায় বল।

গুলু বলল, কাল ভোরেই স্মিতবাবুর কাছে যেতে হবেক ?

হরেরাম বলল—তাতে কি হবেক ?

—লোকজন নিয়ে দু'নম্বর চানক ঘেরাও করে উঠতে হবেক।

জগদীশ বলল, এজেন্ট সাহেব সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এনে ডাঙা মেরে সবাইকে ভাগায়ে দিবেক। ক্রেন, রসা, বালতি খুলে দিবেক। অনন্ত খাদের ভিতর শুকাঞ্চে মরুক।

গৈরী কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, তাহলে কি উপায় হবেক ? উয়ারা তো খাবারও বন্ধ করে দিঞ্চেছে।

জগদীশ বলল—উপায় আমি করব—ঘায়সাকে তায়সা দাওরাই দিঞ্চে আমি উয়ারাকে নিঞ্চে আসব। আজকার রাতটি যেতে দে। এক দিন উপস দিলে মাছুষ মরে না। কাল রেতে জরুর বাঘের খেল দেখাঞ্চে দিব। ঠালা তিলক সিং ! দেখবো কত মরুৎ বাটশ জুই।

ভিগান

দুইশত চানকের ভাঙা ইঞ্জিন ঘরের মেঝেতে চার পাঁচজন পাহারাদার মদে মাতাল হয়ে ঘুমোচ্ছে। তাদের কাছে দুটো বন্দুকও আছে। জেনের কাছে দুজন এবং চানকে দুজন পাহারাদার মোতায়ন আছে।

তখন রাত একটা। চারবাজা পালির লোকজন আপন আপন বাসায় ফিরে এসেছে। রাতপালির লোকেরা খাদে নেমে গেছে। এখন ফাঁকা অবসর। এমন ক্লাস্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন প্রহর তো সারাদিন রাতের মধ্যে নেই। রাত একটা থেকে ভোর চারটে। তার মধ্যেই কাজ হাঁসিল করতে হবে।

জগদীশের এসব কাজে অভিজ্ঞতা খুব পাকা। হাতও পাকা। ভালো গুরুর কাছে কাজ শিখেছে। বাল্যকাল থেকেই দুর্ধর্ষ চরিত্র। দালা হালামা ওর রক্তে। হাতে নাতে কখনো ধরা পড়েনি। পুলিশ সম্বন্ধ করেই ওকে হাজতে দিয়েছে, মামলা করেছে।

গত রাতে বৈশাখীর সোহাগে মন ভরে গিয়েছিল। ভোর থেকেই দল ঠিক করেছে। নানাভাবে খবরা খবর নিয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই ওত পেতে বসে আছে। কখন সেই লম্বটি আসে।

ঈশারামাত্র ওর লোকজন বাঁপিয়ে পড়ল একসঙ্গে তিন জায়গায়। জগদীশ নিজে ঢুকল ইঞ্জিন ঘরে। চারজন পিস্তল হাতে মুখে কাপড় বাঁধা লোক বিদ্রোহ বেগে ওদের বন্দুকগুলো দখল করে নিল। চটপট বাঁধা ছাঁদা করে একদিকে ডাঁই করে ফেলল।

জেনের পাহারাদার দুজন লাঠি খেয়ে পড়ে গেছে। চানকের লোকটিকেও ধরে এক জায়গায় ঢুকিয়ে জগদীশ পাহারা বসিয়ে দিলো।

ততক্ষণে জেন চালু হয়ে গেছে। জান মহম্মদ মিস্ত্রী চারজন লোক নিয়ে ছাওল ঘোরান্ছে। কালো বাউরী বালতিতে চড়ে নীচে লোল যাচ্ছে। গুলু ঘণ্টাওলা চানক মুখে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার উত্তরে ঘণ্টা দিয়ে সিগন্যালিংয়ের কাজ করছে। খাড়া পাহারার মোতায়ন আছে গুরুনাম সিং।

পাঁচ মিনিটেই বালতি লোল হয়ে গেল।

চানকের কাছেই বসেছিল। দুইদিন খেতে পায়নি। অনাহারে শরীর শিথিল হয়ে গেছে। তবুও সে পেয়েছে বাতাস। সূর্যের আলো তুফার জল। ওড়েই ওর দ্বায়ত্ত্ব সজাগ আছে। ক্ষিদেতে পেট কন্ কন্ করছে তবু মাথায় ঘুরছে উঠবার পরিকল্পনা। সেজন্য রাত একটাতেও ঘুম নেই। কান পেতে শুনেছে উপরে দ্বটা মারার শব্দ। একটা বাতি নেমে আসছে বালতিতে জ্বল করে। চোখে লাগছে সেই আলো। মনটাও শক্ত হয়ে যাচ্ছে। ভাবছে যে লোকটা আসছে সে তো স্বভাব হতে পারে। না হলে দ্বায়ত্ত্ব নাহার কি দরকার ?

তাকে উদ্ধার করার জন্য যে কেউ আসতে পারে এটা ভাবতেই পারছে না। কিভাবে যুক্তাদুতের মোকাবিলা করবে সেই ভাবনাটাই বড় হয়ে উঠেছে। দিনের বেলাতে সূর্য কিরণের আভাষ যে কয়েকটা কাঠের টুকরো ও একটা লোহার প্লেট সংগ্রহ করে রেখেছিল হাতিয়ার করার জন্য তারই একটা কুড়িয়ে নিয়ে অঙ্ককারে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়াল। যে আসছে সে নিশ্চয় তার পুরানো জায়গাটিতে যাবে। তখন পিছন দিক থেকে আঘাত করবে।

কিন্তু শুনতে পেল খুব পরিচিত কণ্ঠস্বরে কেউ যেন ডাকছে—অনন্তবাবু।

চমকে উঠল। তারপরেই ভাবল সবাই তো পরিচিত। কে যে হুশমন তা চিনবে কি করে? শব্দ হয়ে দাঁড়াল।

কালো বাউরী চর্চ জ্বলে চারিদিক দেখল। ওকে তো এখান থেকেই অন্বেষণ শুরু করতে হবে। তাই আবার ডাক দিল। অনন্তবাবু!

বালতি থেকে নামল। এদিক ওদিক দেখতে এগিয়ে চলল।

অনন্ত ওকে চিনত পারল। মনে হলো কালো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে পৃথিবীতে বিশ্বাস বলে কোনো বস্তু নেই।

সাড়া দিলো কে?

—আমি বাবু! চিনতে পারছে না? আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

—আর কে আছে?

—উপরে জগদীশ, হরেরাম, গুলু, গৈরী সবাই আছে। হু'নস্বর চানক আমরা দখল করেছি। জলদি চল।

—সত্যি তো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—অনন্ত আশ্চর্যপ্রকাশ করল। কালো ওকে ধরে বলল—চল বাবু। কোনো ভয় নাই।

বালতিতে চড়বারও ক্ষমতা নেই ওর। কালো ওকে পিছন থেকে ঠেলে তুলে দিলো। নিজেও চড়ল। ঘণ্টা মারল।

গুলু তৈরিই ছিল। জেন চালু করার সিগন্যাল দিলো। জেন চালু হতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র কিন্তু উঠতে পনেরো মিনিট লাগল। এই পনেরো মিনিট গৈরীর জীবনে যেন পনেরো বছর। অসীম উৎকর্ষার ঠক ঠক করে কাঁপছে। কি দেখবে সে? জ্যান্ত অনন্ত না তার মৃতদেহ, বৃকে ধাই ধাই করে হাতুড়ির বা পড়ছে।

ওদিকে ধন ধন বোম বারুদ ফুটেছে! অনন্ত বালতিতে উঠতে উঠতেই সে শব্দ শুনতে পেল। বলল কোথায় বোম ফুটেছে?

কালো বলল—ফুটেছেই পারে। লড়াই তো লাগু হয়ে গেছে। ওর জন্য ভয় নেই। জগদীশের লোক আছে তারা মোকাবিলা করবে।

বালতিটা চানক মুখ তক্ আসার সঙ্গে সঙ্গে গুলু তা ধামিয়ে আশ্তে করে যোগান লাগাল। হাত বাড়িয়ে অনন্তকে ধরল দুজন মিলে। টেনে তুলে নিল। অনন্তর তখন মাথা ঘুরছে। কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। গৈরী ওর হাতটা চেপে ধরল। কিন্তু ওর পায়েরও বশ নেই। গৈরী বলল দাঁড়াতে পারছো না ?

—না রে।

—আচ্ছা এই খাটে শুয়ে পড়।

ওকে ধরে ধরে খাটে শুইয়ে দিলো। শোয়ামাত্র অচৈতন্য হয়ে গেল ও। গৈরী ব্যাকুলভাবে ওকে ঠেলা দিলো ওগো—ওগো ঠাকুর শুনছো—

গুলু বলল—ঈ-খান থেকে চল বিটি। উয়ার ফিট লেগে গেইছে।

—তাহলে কি হবেক বাবু ?

—সে এলাইজ আছে। তুই ঘাবড়াস না।

চারজন লোকে খাট তুলে নিল। দ্রুত পায়ে চলছে ওরা। পিছনে গুলু ও গৈরী এবং আরো জনকয়েক। গার্ড করে নিয়ে গেল।

তিলক সিংয়ের কোয়ার্টার ও তার পাশে যমুনা যাদবের ধাওড়ায় তখন রীতিমতো কাজিয়া চলছে। চানক মুখে দুজনের ডিউটি ছিল একজন কোনো ক্রমে পালিয়ে গিয়ে তিলক সিংকে খবর দিলো।

তিলক সিং ও সন্তোষসাদ তৎক্ষণাৎ তাদের ইমার্জেন্সী স্কোয়াডকে দুনঘর চানক পুনরায় দখল করার জ্ঞপ্তি হুকুম দিলো। ওরা ছুটে আসতে গিয়ে বাধা পেল সামনেই বোম বাজিতে। আগুনের হররা। সেই সঙ্গে ধুলো ও ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল জায়গাটা। একদল অস্ত্র পথ ধরল কিন্তু সেখানেও বাধা। ওরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। তাতে কি হবে ? জগদীশের একসপার্ট লোকজন ঠিক জায়গাতে ঠিক মতো মোতামেন আছে।

তিলক সিং তথা এজেন্ট সাহেবের বন্দুকওলা পার্টি এক পা আগে যেতে পারল না। যেদিক থেকে বেরুতে চেষ্টা করে সেই দিকেই বাধা। তিলক সিং নিজেও বিভ্রান্ত। বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে দাঁড়িয়ে। এ তো খুব জবরদস্ত অ্যাকশন।

খবর চলে গেছে ডি. ডি., ডি. সি., এজেন্ট সাহেবের কাছে। সেখান থেকে টেলিফোনে পুলিশের কাছে। সব দিকে ছুটোছুটি। গাড়ি হোঁড়ছে শী শী করে।

কিন্তু দু'নঘর চানকের কাছে যখন পৌঁছাল তখন পাখী উড়ে গেছে। জেগে উঠেছে কলিয়ারী ধাওড়ার কুলিকামিন বাবু কারিগর। তারা শয়ে শয়ে বেরিয়ে এসে ঐ রাকিডেই রাস্তা অবরোধ করে যোগান দিচ্ছে অনন্তবাবুর হত্যাকারী এজেন্ট সাহেবকো-খতম করে।

খাদ থেকে লোক উঠে আসছে। ধাওড়াতে যেন মেলা পড়ে গেছে।

দলে দলে লোক দৌড়াচ্ছে হুনিয়া ধাওড়ার দিকে। চরিতর কিষণ লোকজন নিয়ে চব্বতরাতেই ছিল। তারা বলল—অনন্তবাবুর খবর আমরা জানি না। তাকে আজ সাত দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমরা এখন আপন আপন ঘরে যাও। কাল সকালে নেতাদিকে নিয়ে আসব।

ভাঙা ইঞ্জিন ঘরে হাত পা বাঁধা পাহারাদারবা তখন জেরায় জেরবার হয়ে গেছে। ওরা বলল বহুত লোক এসেছিল সাহেব। সবাইই মুখ বাঁধা। কাঁকে চিনতে লেডেছি।

এজেন্ট সাহেব বললেন—ওয়ার্থলেশ।

ডি. ডি. সাহেব বললেন—এত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল।

ডি. সি. সাহেব বললেন—কিন্তু কে অ্যাকশন করল? কি করে খবর পেল।

পুলিশ দাবোঙ্গা এল। কিন্তু মিছিল, প্লোগান, লোকজনের জমায়েত দেখে কোনো অ্যাকশানে যেতে রাজী হলো না। এজেন্ট সাহেব পুনঃ পুনঃ বললেন, হুনিয়া ধাওড়া মার্চ করলেই পাওয়া যাবে কোন দুর্বৃত্ত তিলক সিংকে হত্যা করতে বোমবাজী করে গেল।

দারোগাবাবু বললে—চোর ডাকাতির পাড়া মশায়। কোন গুলি ঘুঁজি থেকে গুলি করবে তা কে জানে? আমরা কি জান দিতে যাবো? গাড়িতে যেতে যেতে ডি. সি. সাহেব বললেন—নিশ্চয় কেউ বিশ্বাস যাতকতা করেছে। না হলে জগদীশ জানবে কি করে?

এজেন্ট সাহেব বললেন—কে সে?

—এখনি বলা সম্ভব নয়। তবে খবর আমি বের করে নেবো।

—তাই করুন। না হলে আমরা বার বার বোকা বনে যাব।

হুনিয়া ধাওড়ায় যে তুলকালাম কাণ্ড হবে তা ওদের জানা ছিল। বার বার পুলিশী হানার কারণে ওদের মনে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা জমেছিল এর পর পুলিশ আসবে, সেজন্য এক কারাগার থেকে উদ্ধার পেয়ে অন্য কারাগারে যাতে যেতে না হয় সে সাবধানতা অবলম্বন করতেই ওরা অনন্তকে ফুলমনির ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করেছিল।

চূড়ান্ত

পরদিন রাজিকালে হুনিয়া ধাওড়া জমজমাট। সারাদিন হৈ-হল্লা-টেনশন-মিষ্টিয়ের পরেও ওদের ক্লাস্তি নেই। আজ পুলিশ আসবে না। সেটাই ওদের বড় স্বস্তি। অনন্তকে নিয়ে এসেছে। ও ভালো আছে। ছুপুরে গৈরীকে তুলে নিয়ে যাবার পর ওমটা জেঙে গিয়েছিল। তাই আর 'বুম' হয়নি। ফুলমনি ভাত

থাইয়েছে। সন্ধ্যার পর জগদীশ ও হরেরাম সঙ্গে করে এনেছে। চলতে ফিরতে পারছে। শরীরে ধকল কেটে গেছে।

গুলুর ঘরের দাওয়াতে তালাই পেতে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। বৈশাখী, কুস্তী, ফাস্তনী ও গৈরীর সঙ্গে আরো কিছু বোর্ড-বিটি জুটেছে। সামনেই উঠোন দু'তিনখানা খাট পেতে, জগদীশ ও হরেরামের সঙ্গে ছুনিয়া ছোকরারা আছে। বীরেশ্বর ব্যাখ্যান করতে মশগুল। একটু গুলাবী নেশাও আছে। কারণ তা না হলে খুশীর খোয়াব জমে না।

অনন্ত ও গৈরীকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে। গৈরীকে ক্ষেপাতে ওদের খুব মজা লাগে। আর ও অল্পে ক্ষেপেও যায়।

বৈশাখী বলল—দেখলে জামাই! আমাদের গৈরী তোমাব চেয়ে বড় লীড়ার বনে গেল।

অনন্ত বলল—আমি ওকে সকাল সন্ধ্যা সেলাম করব।

সবাই হেসে উঠল। গৈরীও ফুঁসে উঠল—ছাথ, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

বৈশাখী বলল—কায়্যা ভাষণ! মাইক ফাটাঞ্চে দিলেক জামাই!

কুস্তী বলল—মিটিনে চেয়ারে বসেছিল। সাহেবদের সঁথে ফটাফট এংরেজী ঝাড়ছিল।

—তুর মাথা। গৈরীকে কাঠি দিতে পেলে আর কিছু চাই না তুদের।

সবাই থি থি করে হাসছে। গৈরীর গা জ্বলছে। রাগে মুখটা ফুলে গেছে।

অনন্ত বলল—আহা! তুই রাগছিস কেন?

—তুমিই তো। তুমিই সবাইকে উসকাঞ্চে দিয়ে মজা দেখছ।

জগদীশ বলল—বাস বাস! শান্তি শান্তি। চল খেতে দেগা।

খাবার ছিল ভাল রুটি, কাঁচা পিঁয়াজ, লঙ্কা। তাই কত আনন্দে খাচ্ছে। গৈরী ও বৈশাখী পরিবেষণ করছে। সবাইকে এক পংক্তিতে বসিয়ে দিয়েছে। জগদীশের পাশেই অনন্ত বসেছিল।

জগদীশ বলল—ছাথ জামাই! তোমার মতো ভালো মাহুখী করে লীড়ারি চলে না। শালা বেইমানের ঝাড় শান্তি বুঝে না। জনকতককে খতম করে দিই।

অনন্ত আঁৎকে উঠল—আরে না না। অমন কাজও কর না।

—কি যে বল জামাই? সড়িপ্রসাদ, তিলক সিং, ডি. ডি., ডি. সি. আর একেট সাহেবকে খতম করে দিলেই সব ঠাণ্ডা হঞ্চে যাবেক। শিরিক হুকুম দাও।

কাক কোনো জিন্দাদারি থাকবে না। যা করার আমিই করব। আমার হিন্দু তো দেখলে।

অনন্ত হাত ঝোড় করে বলল—হেই দাদা অমন কাজ করো না।

—কেন করব না?

—ভোজীর জন্ত করবে না। বাল বাচ্চাদের জন্ত করবে না। দেখ আমি নীড়ার হয়ে বলছি না। তুমি গৈরীর দাদা—আমারও দাদা। তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ভোজীর দিকে তাকাও—কত কষ্ট করে দিন কাটায়। তুমি ফেরার হয়ে থাক। কতু কখনো ঘরে আস। ওই টুকুতেই কত সুখ ওর। সেসব ভেঙে দেবে ?

বৈশাখী সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

বলল—উয়াকে বুঝাও জামাই। খুনের নেশা মাথাতে চেপেই আছে।

জগদীশ বলল—কেন থাকবে না? যেদিন থেকে চাকরি গেইছে সেইদিন থেকে বনে বাদাড়ে পুরানো খাদে লুকাঞ্চে লুকাঞ্চে দিনরাত কাটছে। যাদের জন্তে আমার এই দশা তাদিকে শেষ করে জন্মের মতন ফেরার হঞ্চে যাব।

বৈশাখী বলল—শুন জামাই। কথা শুন।

অনন্ত বলল—স্ট্রাইকের পর হারজিৎ যা হবার হবে। যদি টিকে থাকতে পারি তবে তোমার সব মামলা আমরা চালাব। কোর্টে হাজির জামিন করিয়ে প্রকাশে বসবাসের ব্যবস্থা করব। কি বল ভোজী?

বৈশাখী বলল—ই তো। জামাই ঠিক কথা বলছে।

জগদীশ বলল—অত সুখ তুর সহিবেক?

—ভগবানের দয়া হলে সব সহিবেক।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই আপন আপন ঘরে চলে গেল। অনেকদিন পর একটা সুখের রাত এসেছে। আবার কাল কি হবে কে জানে? যে যার বউকে নিয়ে একটা মিলন রজনী সোহাগে আদরে ভরে রাখবে।

হারিকেনের আলোতে অনন্ত ডায়েরী লিখছে—কয়লাখনি ধর্মঘটের দিন ধার্ম হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সাল। রাজি বারোটার। অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারে দিন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে। তার নোটিশ দেওয়া হয়েছে দেড় মাস আগে ১লা আগস্ট। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে অত্যাচার ও প্রতিরোধের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। একদিকে বেঙ্গল কোল, ইকুইটেবল, বার্ড এণ্ড হিলজার্প, শেরগড় কোল কোং, দামোদর কোল কোং, বরাকর কোল কোং, বীরভূম কোল কোং প্রভৃতি বড় বড় কোল কোম্পানীর মালিক, ম্যানেজার, এজেন্ট, সি. এম. ই., বাধা বাধা পারসোন্সাল অফিসার অন্তর্দিকে কয়লা কুটির জমিক সংগঠন। মার দাঙ্গা, গুলি হত্যা, বে-আইনী আটক, নারী ধর্ষণ, লুট, অগ্নি সংযোগ, অন্তর্দিকে মিষ্টি, মিছিল, শ্লোগান, প্রতিরোধ।

সে যেন এক ঝড়। ছামাম কোলকিন্ডের উপর শা শা করে বয়ে যাচ্ছে। সবাইকেই কোনো না কোনোভাবে তার ঝাপটা সহিতে হচ্ছে। হারকথানে পুলিশ মড়া লুটছে। প্রত্যেকটি জেল হাজতে ভরে গেছে ক্রৈত ইউনিয়ন কর্মীতে।

পঞ্চায়

গৈরীকে সেদিন বেশ হাসিখুশী দেখাচ্ছিল। কালী প্রতিমার মতো মুখ লাভে
টন্ টন্ করছে। দেড়থানা রাত স্বামী সহবাসেই ভোল পার্টে গেছে।

হাতে কাগজের প্যাকেট, কাঁধে ক্লাক্স নিয়ে হাসপাতালে জাহ্নবীদেবীর বেডেব
কাছে পৌঁছাল। ঠাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হলো। বললেন—এসো মা।

—কেমন আছেন মা ?

—ভালো।

একটু খেমে বললেন—আজ ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে মা তোমাকে।

গৈরী একটু লজ্জা পেল। ঘোমটা টেনে হাসল।

উনি বললেন—আজ দু'দিন কেন আসোনি মা ? আমি যে তোমারই পথ
চাইতাম। মুখ নীচু করে ও বলল—অনেক কাজ ছিল মা।

—আমার নিজের ছেলে পর হয়ে গেছে। তাই তুমি না এলে আমি একাই
পড়ে থাকি। বড় কষ্ট হয় মনে। ভাবি আমার ছেলে মেয়ে বউ-নাতি সব আছে
তবু কত একা। তুমি এলে সব ভরাট মনে হয়। তোমার সেবা যত্ন—হাসি সবই
সুন্দর লাগে। ঠাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। গৈরীর ভিতরটা মোচড় খাচ্ছিল।
মনে হচ্ছিল বলে—আমি তো আপনারই ছেলের বউ। নাতিকে দেখবেন ?
কাল নিয়ে আসবো।

কিন্তু বলতে পারল না। কারণ সে জানে এই পরিচয় দেওয়ার পর তাঁব কি
প্রতিক্রিয়া হবে ? সব সৌন্দর্য এক মুহূর্তেই মলিন।

বলল—দুধটা খেয়ে নিন মা।

টুকটুক কথাবার্তার মধ্যে দুধ খাওয়াচ্ছে তখন এল অনন্ত। স্বভাববশত
ঘোমটা টেনে গৈরী বলল—আপনার ছেলে এসেছে মা।

অনন্ত ঠাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। উনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। অনন্তর মাথায়
হাত দিয়ে কান্নার স্বরে বললেন—এতদিন কোথায় ছিলি বাবা ? কত কি হয়ে
গেল ? কি করে ছিলাম তোকে না দেখে ?

ঠাঁর কান্না বেগবতী হয়ে উঠল। বহু কষ্টে ঠাঁর কান্না থামিয়ে চোখের জল
মুছিয়ে কৈফিয়ৎ দিল—পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আজ কোর্টে
জামিন পেয়েছি। এবার রোজ তোমার কাছে আসবো। তাছাড়া এই
আয়াটা তো আছে। ওকে যা বলবে—তাই করবে। সেবাযত্নের ক্রটি
রাখবে না।

—করছে বাবা। খুব করছে। সোনার মেয়ে।

গৈরী তাকালো অনন্তর দিকে। দুজনের চোখে চোখে কথা হলো।

অনন্ত বলল—ভাঃ সেনের সঙ্গে দেখা করে আসি মা। তুই তো সব জানিস।
আর ডাক্তারবাবুকে বলবি গিয়ে।

ডাঃ সেনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর ওরা হুজ্জন করিডরে এসে মুখো-মুখি দাঁড়াল। হুজ্জনের প্রশ্ন অতঃপর ?

অনন্ত বলল—মা, তোকে ভীলো চোখেই দেখেছে মনে হয়।

—হ্যাঁ।

—আমি ভাবছি আমার জীবন একটা স্ততোয় খুলছে। কবে যে কি হবে কে বলতে পারে ? মায়েরও এত বড় অপারেশন। কি যে হবে ভগবান জানেন। আর কি লুকোচুরির মানে হয় ?

—ভেবে দেখো।

—তোর কি মত ?

—মায়ের মনটা যাচাই করে নাও।

হুজ্জনে পাশাপাশি হাঁটছে অন্তরঙ্গভাবে। হাসপাতালের পেসেন্টরা কয়লা শ্রমিক। তারা অনেকেই অনন্তকে চেনে। কেউ কেউ গৈরীকেও। আজ হুজ্জনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে কুশল প্রশ্নাদির বিনিময় হচ্ছে। জাহ্নবীদেবী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওদেরকে লক্ষ্য করছিলেন। ওঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে যখন ওরা চোখে চোখে কথা বলছিল তখনই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজছেন স্মৃতির পাতা। কোথায় দেখেছেন এই মেয়েটিকে। কখনো চেনা মনে হয় আবার অচেনা হয়ে যায়। কিন্তু অনন্তর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা ?

অনন্ত ওঁর কাছে এসে বলল—পরশু অপারেশনের তারিখ। পারবে মা ?

বিবাদ জড়িত কর্তে উনি বললেন—পারতেই হবে।

—তুমি ভালো হয়ে যাবে মা। ডাক্তার বলেছেন।

—মা হয় হবে। আর ভাবতে পারি না। যদি মরে যাই তবে নীতু শ্রীতুর বিয়ে দিস। প্রশান্তকে মালুস করিস।

—ওদেরকে দেখবে মা ? কাল আনা করাবো ?

—হ্যাঁ বাবা। মরার আগে সবাইকে দেখে যাই। তোর পিসিকেও আনিস।

—আচ্ছা মা। আর কাউকে দেখবে ?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—মন তো হয়। বুকটা পুড়ে থাক হয়ে যায়। কি করলি অনন্ত ? একটা ছোটলোকের মেয়ের জন্ম ঘর সংসার জাত কুটুম—সব জলাঞ্জলি দিলি।

মুখটা বিকৃত করে কেঁদে উঠলেন।

গৈরী স্তব্ধ। অনন্ত থ' হয়ে দাঁড়িয়ে। কি রকম দয়ফাটা মুহূর্ত !

কিছুক্ষণ পর অনন্ত বলল—ছোটলোকের মেয়ে বলে এত বেমা ! কিন্তু বাবা কোনোটিনি মালুসকে স্বপ্না করতেন না।

—ভিনি ভাগ্যধান। ভাই তেমন দিন আদ্যার আগেই চলে গেছেন।

গৈরীর অষ্টাঙ্গ কাঁপছিল। দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়েছিল।
 ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ হলে দুজনেই বেরিয়ে এল।
 অনন্ত বলল—চল। কাল আবার আসতে হবে।
 অভিমান ফুরুর কণ্ঠস্বরে গৈরী বলল—আমি আর কিজ্ঞান আসবো? পরিচয়
 না দিয়ে ভালোই হয়েছে। না হলে মায়ের মনে আমার সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে
 তাও ভেঙে যেতো।

আজ পুলিশের ভয় নেই। বহুদিন পর একটা নিশ্চিত নিরুদ্বেগ রাত্রি। কিন্তু
 ঘুম কই? গৈরী ডুবে আছে কান্নার সাগরে। অনন্ত'র পুনঃপুনঃ আকর্ষণে
 ফ্যাস কোসে গলায় বলল—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—কেন রে? কিসের কষ্ট?

—তুমি আমাকে প্রাণভরে ভালোবাসা দিলে। কিন্তু আমি তোমাকে কি
 দিলাম? তোমার সমাজ সংসার। আত্মীয় স্বজন এমন কি গর্ভধারিনী জননীর
 কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে এই আন্তার্কুণ্ডে টেনে নামালাম।

অনন্ত চমকে উঠল। এ তো বড় কঠিন জিজ্ঞাসা। বলল—এইসব ভাবছিস?

—আগে তো ভাবতাম না। নিজের কথাই ভেবেছি কি করে তোমার
 ভালোবাসা পাবো। একবারও ভাবিনি তোমার জীবনটা কি হতে পারতো।
 এতোদিনে ম্যানেজার হয়ে স্বজাতি ফুটব্বের স্থল্লরী শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করে
 গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে সুখের ঘরকন্না পাততে।

গৈরী থামল। ভিতরে গুমরে মরা কান্না প্রবল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হলো।
 প্রায় ভাঙা গলায় বলল—তাতে হলো না। ঝড়ে যেমন নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দেয়
 তেমনি তোমারও জীবনের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিলাম। তাই তো এত যন্ত্রণা।
 একথা যখন ভাবছি তখন কি যে কষ্ট হচ্ছে?

অনন্ত ওকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে বলল—তুই কাঁদ গৈরী—খুব কাঁদ।

তারপর জীবন যন্ত্রণার পাকচক্রে আবর্তিত দুটি মানব-মানবী কান্নার হাতে
 বেসাতি করল—এক গভীর উপলব্ধি।

ছাপান

সেদিন হাসপাতালে জাহ্নবীদেবীর চারটি ছেলেমেয়েই হাজির হয়েছে।
 তাদের সঙ্গে অনন্তের পিসিমা ও পিসেমশাই এসেছেন। তাতে খুশী হয়েছেন।
 টুকটাক কথা বলছেন। মেয়েদের গানে হাত দিয়ে একবার কাঁদলেন।

নীতি বড় হয়েছে। অনন্ত ও প্রশান্তের মাঝে ও। চটপটে স্মার্ট এবং
 স্থল্লরী ভঙ্গী। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। গুর মায়ের অস্থখটার লজ্জাই দিনটা

পেছিয়ে গেছে। প্রীতি ছোট। টিন এজ শুরু হয়েছে। ফ্রক পরে। একটু ভাবালু গোছের চোখ দুটোতে স্বপ্ন আছে। সে তো ওদের সব ভাই বোনেরই মন স্বপ্নে ভরপুর।

গৈরী আসেনি কারণ সে এখনো নিজেকে সামলে উঠতে পারেনি। জাহ্নবীদেবী তার খবর নিলেন। অনন্ত টালবাহানা করে পাশ কাটিয়ে গেল। তখন উনি চলে গেলেন নীতির বিয়ের কথায়। ছেলেটি ভালো। বাপের বিষয় সম্পত্তি আছে। ছেলে চাকরী করে ইত্যাদি।

নীতি বলল, মা, তুমি এত কথা বলছো কেন? ওতে পরিশ্রম হয় না?

—হয় তো! কিন্তু আজ এতদিন পর এসেছিস। কথা না বলে যে থাকতে পারছি না। আজকের দিনটা বলে নিই। কাল যদি মরে যাই।

নীতি বলল—ওই কথাটি বোল না মা। তাহলে আমাদের কি হবে?

অনন্ত আছে তো। সে তোদের ফেলে দেবে না।

অনন্ত বলল, মা।

—কি রে?

—এবার চুপ কর মা।

উনি হাসলেন। খুব মলিন। মুখটা তো শুকিয়ে গেছে। চোখ দুটাই ঘা জ্বল জ্বল করছে। অনন্তর পিসিমা বললেন, হ্যাঁ বোঁদি। চুপ কর।

উনি চুপ করলেন। খানিকপর অনন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, আয়াটি এল না কেন?

—ওর অনেক কাজ পড়ে গেছে মা।

—ওঃ বাব্বা। কি অত কাজ রে?

অনন্ত হাসল। বলল, ওকে তুমি যেমন দেখেছো তেমন মেয়ে ও নয় মা।

ইউনিয়নের মহিলা শাখার সক্রিয় কর্মী। সামনে স্ট্রাইক। কত কাজ এখন।

—আজ এলে নীতু প্রীতুর সঙ্গে আলাপ হতো।

—তা হতো।

অনন্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিল। ওর পিসেমশাইয়ের কলিয়ারীতেও স্ট্রাইক হবে। একই তো কোম্পানী। অনন্তকে ইউনিয়ন থেকে বিচ্যুতি করার জন্য ওর উপরেও চাপ এসেছিল। প্রথমে অহরোধ উপরোধ তারপরে শালানি। তিনি জানতেন অনন্তকে খাদে আটক করে রাখার ও তাকে উদ্ধার করার খবর।

জিজ্ঞাসা করলেন—তোকে খাদে চুকিয়ে রেখেছিল তা তোর বউ কি করে খবর পেলে?

অনন্ত বলল—সে অনেক কথা। পরে বলবে পিসেমশাই।

—বহুত হিন্দু আছে মেয়েটার। বন্ধু রাইকেলের মুখ থেকে ছিলিয়ে নিল।

খবরটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। হ্যাঁ একটা খেল দেখিয়েছে।

অনন্ত হেসে বললো—আসলে ওর দাদারা দুর্ধর্ষ মানুষ। আর ওকে তো জানেনই।

ভয় ডর বলে কিছু নেই।

ওর পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন—কার কথা বলছো গো ?

—অনন্তর বউয়ের। কোম্পানীর বন্দুক ওলাদের কাছ থেকে দাঙ্গা কাজিয়া লড়ে অনন্তকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। সে রীতিমতো লড়াই হিম্মৎ।

জাহ্নবীদেবীর কানে সব কথাই যাচ্ছিল। কি রকম বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল ওঁর মুখটা। বললেন, আমাকে তোরা সব কথা লুকিয়ে ঘাস অনন্ত।

—ওর কথা কি তোমার ভালো লাগবে মা ? ছাড়ো ওর কথা।

অনন্তর পিসেমশাই বললেন, কি বলব বৌদি। সে একটা আগুন। যদি ও না থাকত তবে আজ অনন্ত তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারতো না।

—এত কথা কেউ আমাকে বলেনি।

অনন্ত বলল—এসব কথার চর্চা করে কি হবে মা।

—এটাই তো আমার দুঃখ বাবা। তোরা যে কে কি করিস তা কিছুই জানতে পারি না। একটা আয়া কত সেবা যত্ন করল। কত হাসি খুশীতে এসেছিল। যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে গেল। তুই এলি আর ওর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে গেল। তাই বুঝি ও আসেনি। কেন ? কি কারণে ?

অনন্ত একটু চুপ করে থেকে বলল—কান্না কি এমনি আসে মা ? তার মনে কোনো ব্যথা লেগেছিল।

—কে তাকে ব্যথা দিয়েছে ? আমি না তুই ?

—মা !

—মাকে মিথ্যা কথা বলা যায় অনন্ত কিন্তু মায়ের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

তোর সঙ্গে ওর যেমন অন্তরঙ্গতা দেখলাম তা তো অন্তরের টান না হলে হয় না।

অনন্ত একটু উষ্ণ হয়েছিল। বলল—অন্তরের টান তো নিশ্চয়ই আছে। না হলে আমার মায়ের জন্ম তার কিসের মাথা ব্যথা ?

উনিও উষ্ণভাবে বললেন—ও কাঁদছে। তুই ওকে হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল এই দৃশ্যটি যদি ওর স্বামী দেখতে পায় তবে তার কি অর্থ হবে বুঝতে পারছিল ? ওর স্বামী পুত্র আছে। তোরও স্ত্রী পুত্র আছে। আবার কি ঘর ভাঙাবি ?

অনন্ত আর্তস্বরে বলল—মা !

—একবার একটা মেয়েকে তার স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল।

তারপরে আবার একটা বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে এমন অন্তরের সম্পর্ক কি করে পাতালি? তাদের চরিত্রে কি ছায় নীতি বলে কোনো বস্তু নেই? ছিঃ।

নিজের ভাইবোনের কাছে, পিসিমা ও পিসেমশাইয়ের কাছে অনন্ত'র চরিত্রে ছায় ও নীতিবোধের অভাব নিয়ে তার মা যে আক্রমণ করলেন তাতে সে মরমে মরে যাচ্ছিল। একটা মিথ্যা পরিচয় সত্যকে কেমনভাবে কলুষিত করছে। ঈশ্বর না করুন—মায়ের যদি অপারেশনের পরে জ্ঞান না ফেরে তবে সে জন্মের মতো দোষী হয়ে থাকবে। ভুল ভাঙাবার সময় পাবে না।

বিপন্ন ভঙ্গীতে প্রশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

সে বলল—দাদা! তুমি সত্যি কথাটা মাকে বলে দাও। অনন্ত বলল—মা। তুমি রাগে ও ঘেঁলায় ওর মুখ দর্শন করতে চাওনি বলে প্রশান্ত ওর মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। ও আয়া নয় মা। গৈরী। আমি অস্ত্রের বউয়ের ঘর ভাঙতে যাইনি। সে আমারই বউ। তুমি ওকে ছোটলোকের মেয়ে বলেছিলে বলেই কাঁদছিল। এখনো তার কান্না শেষ হয়নি। আমাকে বলেছে—তুমি আমাকে ত্যাগ করে মায়ের কোলে চলে যাও। বল মা—কি করব?

অনন্ত প্রায় ভেঙে পড়ল।

ওর পিসিমা বললেন—বৌদি! তুমি বরাবর অনন্তকে ভুল বুঝেছো। বার বার ওকে আঘাত দিচ্ছ। আর কষ্ট দিও না। ওঁর ছেলে বউকে ডাকিয়ে এনে আশীর্বাদ কর।

জাহ্নবীদেবী চুপ করে রইলেন। ওঁর হুঁচোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েরা কেউ সে জল মুছে দিলো না। মা কাঁদুন। মায়ের চোখের জল পড়ুক অবিরল ধারায়।

অনেকক্ষণ পর প্রশান্ত বলল—বৌদিকে তুমি ঘেঁলা কোর না মা।

অনন্ত বাইরে লনটার ধারে দাঁড়িয়েছিল। চোখছুটো শুকনো। বৃকের ভিতরটা হু হু করছে। মায়ের বিশ্বাস এমনভাবে ভেঙে গেছে? কত অনায়াসে সন্দেহ করতে পারেন তার চরিত্র সম্পর্কে। গৈরী তার স্ত্রী বলেই একটা জবাব দিতে পারল। কিন্তু যদি তা না হতো। অল্প কোনো মেয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলত। এমন তো হামেশাই হয়। বৈশাখী ওর গাল টিপে দেয়। ফান্সনী টুপি খুলে জামা ধরে টানাটানি করে। শুচি তো মার ধাক্কা দিত। শকুন্তলা কাঁচা খিস্তি দিয়ে রসিকতা করে। তা দেখলেও তো মা সন্দেহ করবেন। কট কট করে বলবেন—একজনের ঘর ভেঙেছিল আবার একজনের ঘর ভাঙতে উদ্বৃত্ত হয়েছিল।

গৈরী মেয়ে বলেই হয়ত তাড়াতাড়ি মায়ের মন বুঝতে পেরেছিল। তাই তার এত কান্না। হৃদয় ভেঙে গেছে ওর।

গুর-পিসেমশাই কাছে এসে বললেন—দুঃখ করিসনে অনন্ত । একদিন তোর মায়ের ভুল ভেঙে যাবে ।

অনন্ত তার উত্তর দিলো না ।

ভিজিটি আওয়ারের শেষে গুরা বাইরে বেরুচ্ছে । অনন্ত ও নীতি পিঠোপিঠি ভাইবোন । পরম্পরের যত ভাব ততো খুনসুটি । প্রীতি আছুরি । দুজনেই আবদার করল—বৌদিকে দেখব দাদা ।

—ছোটলোকের মেয়েটাকে দেখে কি হবে ?

গুর পিসিমা কড়া গলায় বললেন—অনন্ত !

অনন্ত চমকে উঠল । স্নেহ কোমল মিষ্ট ভাষিণী পিসিমা যে এমন কড়া গলায় ডাকতে পারেন তা ও আগে দেখেনি ।

উনি বললেন—যাকে বিয়ে করে বউ বলে মেনেছিস তাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে হেনস্থা করতে তোর লজ্জা হলো না । ওদের আবদার করার অধিকার আছে । তুই যদি না দেখাতে চাস ভালো করে বল ।

অনন্ত সত্যিই লজ্জিত হলো । বলল—আমার ঘাট হয়েছে । আর ব'কনা পিসি ।

উনি বললেন—ওদেরকে নিয়ে যা, সাধ করছে—একবার আলাপ করিয়ে দে ।

—তাহলে আজ ফিরতে পারবে না । ওখানে থাকবারও জায়গা নেই । এ সব ঝামেলা চুকে যাক । তারপর প্রশান্ত একদিন নীতু প্রীতুকে নিয়ে আসবি । ততদিনে গুর কান্নাটাও থামুক । কি যে কান্না পিসি—যে তোমাকে কি বলব ? মা তো ওকে আয়া বলে অনেক আশীর্বাদ করেছেন একবার অনন্তর বউ বলে আশীর্বাদ করলে কি দোষ হবে ?

—আচ্ছা । আমি বৌদিকে বোঝাবার চেষ্টা করব ।

পরদিন অপারেশন । তাই সকাল আটটাতেই হাসপাতালে হাজির হলো অনন্ত । গুর মা তখন অনেক শান্ত । বললেন একাই এলি ?

—হ্যাঁ মা ।

—মায়ের মুখের কথাটাই বড় হল । মন বলে কিছু নেই ।

অনন্তর বুকটা মূঁড়ে উঠল ।

উনি বললেন—যত সব কুসংস্কারে মগজ ঠাসা হয়ে আছে । তাকে অতিক্রম করতে পারলাম কই ? মায়ের এই কষ্টটা বুঝিস অনন্ত । আমি আর থাকব না ।

—মা ! তুমি এমন করে কথা বল না । আমার ভীষণ কষ্ট হয় । একেই তো বুককাটা ব্যাখায় গুমনে মরছি—তারপরে ও কথা বল না মা ।

—পাগল ছেলে ! স্নেহে হাত রাখলেন গুর মাথায় ।

অনন্ত টুলে বসে গুর দিকে তাকিয়ে আছে । উনি বলছেন—আয়া সেজে

কত সেবায়ত্ত করল। কত তার দায়িত্বজ্ঞান। মা বলে ভাকত। আমার মনটা ভরে যেত। সেই যে গৈরী একথা কেউ আমাকে বলে দেয়নি। আজ যদি ওকে নিয়ে আসতিস তবে কি আমি অপমান করতাম? তুই এত বুদ্ধিমান হয়ে ওই কথাটা বুঝলি না অনন্ত। এই জন্মে বোধহয় আমার নাতির মুখ দেখা হলো না।

অনন্তর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ব্যাথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে।

বলল—তা কেন বলছো মা? তুমি ভালো হয়ে ওঠো তোমার নাতিকে এনে পায়ে ফেলে দেবো।

—আজ মরতে বসেছি বলে যা মনে হচ্ছে কাল ভালো হয়ে উঠলে কি তাই থাকবে? পুরানো সংস্কারগুলো তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।

—যাক মা। গৈরী নামটা তোমার মনের খাতা থেকে মুছে দাও।

ওর পিসেমশাই এসে পড়লেন। সঙ্গে প্রশাস্ত। জাহ্নবীদেবীর মুখটা মলিন ও বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। অনন্ত তা দেখে বড় কষ্ট পাচ্ছিল।

ওর পিসেমশাই ভরসা দিয়ে বললেন, কেন তোরা ভেঙে পড়ছিল? আমি বলছি, বৌদি ভালো হয়ে যাবেন।

একটু পর একটা টুলিতে চড়িয়ে গুঁকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে গেল। একটা দমকাটা মুহূর্ত। অনন্ত নিজেকে শক্ত রাখার প্রতিক্ষণিত্তি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল। পারল না। হাসপাতালের বাইরে এসে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

প্রশাস্ত তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে। ডাকল দাদা!

—কাঁদিসনে। মা ভালো হয়ে যাবেন।

ওর পিসেমশাই বললেন আবার কান্নাকাটি করছিল। আয় চা-টা খেয়েনে।

প্রশাস্ত বলল—মায়ের যদি জ্ঞান না ফেরে পিসেমশাই।

—আবার সেই কথা। বুড়ো ধাড়ি হয়েছিল। বল বৃকে নেই?

উনি না থাকলে হয়তো দুই ভাইয়ে গলা জড়াজড়ি করে কাঁদতে শুরু করে দিত। তা থেকে ওদেরকে বাঁচালেন। চা-টা খেয়ে শান্ত হবার পর অনন্তকে বললেন, হ্যাঁরে! ভোর মনটা এত নরম তা তো জানতাম না। মনে করতাম অনন্ত একটা লড়াই হিম্মৎ। দুনিয়াদারীর হরেক হুকুমের মোকাবিলা করার ক্ষমতা তার আছে।

অনন্ত হাসল। বলল, মাহুঘের সবটাই তো শক্ত হয় না পিসেমশাই। কোথাও ভেঙে যেতেই হয়।

সান্তান

সময় বড় বলবান। অনন্তর লয়চক্রে কোনো গ্রহের প্রভাব কত মারাত্মক তা জ্যোতির্বিদরাই জানেন। কিন্তু সে যেন কোনো দুঃস্বপ্ন ঘূর্ণির আবর্তে পাক খেতে খেতে চলে যাচ্ছে নিজের গণ্ডী অতিক্রম করে। সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে। হতে

চেয়েছিল ম্যানেজার হয়ে গেল লীডার। পাততে পারত স্বথের সংসার হয়ে গেল যন্ত্রণার আগার

কবিরা প্রেমের জয়গান করেন। পদকর্তারা তাকে মহিমান্বিত করে তোলেন। জাতপাত, অস্পৃশ্যতা নিয়ে কত লেখনী সোচ্চার। মানবাধিকার নিয়ে কত মাথা ব্যথা তাদের।

কিন্তু অনন্তর মতো তাদের স্বপ্নকে কেউ যদি বাস্তবায়িত করে ফেলে তবে তার জন্ম জ্বোটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ধিক্কার। তাও সে সয়ে যাচ্ছে।

দিন বদলে যাচ্ছে। জীবনের ইহু্যও বদলে যাচ্ছে। এখন সংগ্রাম। বন্ধু খাদের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত যে শত্রু কত যে মিত্র তার হিসেব ও নিজেই জানে না। শ্রমিকরা টগবগ করে ফুটছে। যে কোনো সময়ে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার অজান্তেও হতে পারে। কিন্তু দায়িত্ব তারই। স্বমিত চ্যাটার্জি তার ললাটে একি ছাপ মেরে দিলেন। যদি ওর চাকরি থাকতো, উনি এখানেই থাকতেন তাহলে তাঁর সহকারী হয়ে কাজ করে যেত। সেটা সম্ভব ছিল। কিন্তু এ যে বিরাট দায়িত্ব।

একদা সংগঠনের প্রথম দিকে মনে হতো ফ্রিজ থেকে তুলে আনা বাসি মাছ তরকারির মতো ঠাণ্ডা তারাই এখন জলন্ত ফার্নেস হয়ে গেছে। সংগঠিত শ্রমিক-শ্রেণী এক দুর্বার শক্তি। ওদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের নিশান, সমবেত কণ্ঠের শ্লোগান কায়েমী স্বার্থের দালালদের হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত নড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাকে চালনা করা যে কত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝছে।

ধর্মঘটের আর দু'দিন বাকী। আপস মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত মালিকরা দু'মুখো নীতি অনুসরণ করছিলেন। একদিকে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা অণ্ডদিকে শ্রমিক সংগঠন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার চক্রান্ত।

তারই একটি উদাহরণ তিলক সিং। এমন কত তিলক সিং তামাম কয়লা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। তাদের পিছনে মদত যোগাতে সন্তুপ্রসাদরা আছে। মাথার উপর মালিক ম্যানেজার এজেন্ট। ওরা সমাজের শত্রু। শ্রমিকের শত্রু দেশের শত্রু।

ধর্মঘটের আগের দিন চাঁদা মোড়ে মিটিং। জি. টি. রোডে ট্রাফিক জ্যাম। সে এক বিপুল জনস্রোত। ট্রাকে ট্রাকে শ্রমিকরা আসছেন। পতাকা ব্যানার ও ফেস্টনে ছয়লাপ। শ্লোগান উস্তাল।

দেবেন সেন, কল্যাণ রায়, ইন্ড্রজিৎ গুপ্ত, জগদীশ পাণ্ডে, সুধীর রুদ্র প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণ রায়ের আলাময়ী বক্তৃতায় শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে গেল। পারলে মালিক, ম্যানেজার ও এজেন্টদের গাড়ি, বাড়ি ডিনামাইটের মুখে উড়িয়ে দেবে এমনি আকোশ।

অনন্ত ট্রাক ভাড়া করে শ্রমিক নিয়ে গিয়েছিল। মহিলা শ্রমিকও ছিল। প্রত্যেকটি ট্রাকে ইউনিয়নের বাণী তো ছিলই ওদের কলিয়ারীর নাম লেখা ব্যানারও ছিল। প্রত্যেককে বলে দেওয়া হয়েছিল কেউ দলছুট হবে না। হলে এদিক ওদিক না ঘুরে ট্রাকের কাছে চলে আসবে। তাছাড়া প্রত্যেকটি ট্রাকের জিন্মায় আটজন করে স্বেচ্ছাসেবী ছিল যাদের ডিউটিই ছিল আপন আপন লোককে ঠিক ঠিক নিয়ে যাওয়া ও দেখভাল করা। এত লোক নিয়ে ওরা হিমসিম খাচ্ছিল। গৈরীর তো আরো মুন্সিল। যত সব ল্যাকা বোকা আদেথলে মেয়ে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পডছে, হাঁ করে লোক দেখছে। কেউ বা হারিয়ে যাচ্ছে। তাকে খুঁজে আনাই দায়। এই অভিজ্ঞতাটা ওদের কাছে হাসি, মঙ্করা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও রসিকতার খোরাক হয়ে ছিল। গৈরী, বৈশাখী, কুঙ্কী ও ফাস্কনী গায়ে গায়ে লেগেছিল। বাব্বাঃ। হারিয়ে যাবার বড ভয়।

দেবেন সেন বক্তৃতা দিলেন। প্রত্যেক কলিয়ারীতে অ্যাকশন কমিটি আছে। কর্মীরা তিন সারিতে বিভক্ত। প্রথম সারির কর্মীরা যে কাজের দায়িত্ব নেবেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কর্মীরা তার পূর্ণ সহায়তা করবে।

যদি প্রথম সারির কেউ গ্রেপ্তার হন বা অন্ত কারণে অস্থপস্থিত হন দ্বিতীয় সারির কর্মী তৎক্ষণাত্ তা পূরণ করবেন। কোনো কারণেই যেন কোনো কাজ ব্যাহত না হয়। দৃঢ় সঙ্কল্প, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রাণপন লড়াই ছাড়া এই বিরাট ঐতিহাসিক ধর্মঘট সফল করা সম্ভব নয়।

আরো বলে রাখছি আমাদের যে নেতাদিগকে মঞ্চে দেখছেন তাঁরা যে কোনো সময় গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন। কারণ আমার কাছে খবর আছে যে পুলিশ আমাদের জন্ম অপেক্ষা করছে।

তাই ধর্মঘট করা এবং তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। এ লড়াই আপনাদের ঘাম ও ইচ্ছাতের লড়াই। জীবন ও জীবিকার লড়াই। হেরে যাবেন না। আত্মসমর্পণ করবেন না। গুজবে কান দেবেন না। উত্থানিতে বিভ্রান্ত হবেন না। প্রলোভনের শিকার হবেন না।

চারিদিক থেকে প্লোগান উঠল—পুলিচাকা বন্ধ কর।

প্লোগানে প্লোগানে আকাশ বাতাস কম্পমান। সন্ধ্যা নাগাদ মিটিং শেষ হলো। তারপর যা দেবেন সেনের আশঙ্কা ছিল তাই সত্যি হলো। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম শ্রেণীর নেতারা তিনভাগে ভাগ হয়ে ঢাকা গাড়িতে জি. টি. রোডের পূর্ব, পশ্চিম এবং নিংগা ক্রীপুরের রাস্তা দিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুলিশ ব্যারিকেডে ধরা পড়লেন।

হয়তো ধরা পড়া তাঁদের ইচ্ছাও ছিল। না হলে ট্রাকে চড়ে অগণিত কয়লা কুলির সঙ্গে বিশেষ যেতে পারতেন।

ঘুম নেই তিলক সিংয়ের চোখে। গোপন বড়বড় কান হয়ে যাবার পর

শ্রমিকদের কাছে সে দালাল ও বেইমান বলে পরিচিত হয়েছে। এখন তার বসবাস করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাকে একটা কিছু করতে হবে।

সভিপ্রসাদের সঙ্গে যে বিরোধ ছিল তা যড়যন্ত্রের কারণেই মিটে গেছে। এখন ওরা বন্ধু। বেশ কয়েকটি চরিজ্ঞ সভিপ্রসাদের বাসায় গভীর যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বাকেলাল ও রবিলাল তো ওর কাছেই আত্মগোপন করে আছে।

বাকেলাল বলছে—বাবুজী। আপনা ঘরকা বহু হুসরা আদমী লুট লিয়া। কিৎনা ইজ্জত কা খিলাপ হয়। হামলোগ ডাণ্টা খা কে ঘর ভাগা। লেকিন ইয়ে ডাণ্টা কিৎনা বদনাম চোট দিয়া উসসে বহুত গেহরা চোট দিল মে লাগা। উসি বকত আগর আপকা পুরা মদৎ মিলতা তো গুলুয়াকো মারকে গৈরীকো লে-যাত। আর উ বাচ্চাওয়ালী কসবি লীভার বন গইল। তাগড়া মরদ মিল গইল। আপ জানতে নেহী হয় বাবুজী ইয়ে ছোকড়ীকে লিয়ে হামরা খানদানমে কিৎনা লোকসান পৌছায়।

সভিপ্রসাদ বললেন, জানি হে জানি। কিন্তু তখন যে তিলক সিং অনন্তবাবুর জিগরী দোস্ত ছিল। এক সঙ্গে ইউনিয়ন করেছে। পেয়ার কমতি ছিল মনে করছো।

তিলক সিং বলল, ইউনিয়ন না করলে তিলক সিংকে কে পুঁছতো গোমস্তা-বাবু? মনে মনে বলল, এখন আমি মাইনিং সরদার থেকে ওভারম্যান হয়েছি। স্ট্রাইকের সময় কলিয়ারী চালু রাখতে পারলে ডি. ডি. সাহেবের মতো সাহেব হয়ে যাবো। তার জন্ম তো কিছু মূল্য দিতে হবে। বেইমানিও করতে হবে। ডি. ডি. সাহেব কমতি দায় দিয়েছে? নিজের খুবস্বরং আওরংকেই দিয়ে দিয়েছে।

সভিপ্রসাদ বললেন—দেখ বাকেলাল। অনন্তবাবুকে সাফ মার্ডার করনে হোগা। ইয়ে কাম কর শেকে গা?

—হাঁ বাবুজী। ইয়ে তো হামারা দিল কী বাং। বদলা তো জরুর লেনে হোগা।

লেকিন গৈরীকো ক্যা হোগা।

—তুম লোক লুট লেও।

—ঠিক হয়। লেকিন খরচ খরচা?

—হম দেগা।

ওরা সেলাম করে চলে গেল।

সভিপ্রসাদ বলল—দেখবে তিলক সিং ওরা একটা কিছু করবেই।

—হাঁ। বহুত চোট খেয়েছে। রবিলাল গৈরীর স্বরং আর জোয়ানীর খল্পরেও পড়ে গেছে।

—কেন হবে না বল? বিক্রে করা বউ যদি পনের ঘরে চলে যায় তবে কার মুক্ না আওন জলে? খ্যায়ের বো ডি হোগা স্ভাসাদের কাজ হলেই-হলে।

১৬ই সেপ্টেম্বর সকাল। নেতাদের অবস্থা বার্ষিক পরীক্ষার আগে ছাত্র ছাত্রীদের মতো। সবারই বুক দুর্ক দুর্ক করছে। মিটিং মিছিল হলে বহুলোকের মধ্যে থেকে বৃক্কে বল আসে। কিন্তু সারা কলিমারীতে একশো চূষাল্লিশ ধারা বলবৎ আছে। মিটিং মিছিলের জো নেই। নেতারা দলে দলে ভাগ হয়ে ধাওড়ায় ধাওড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সারির নেতারা জেলে। দ্বিতীয় সারির নেতারা দায়িত্ব নিয়েছেন। সর্বত্রই কনট্রোল রুম চালু হয়েছে। দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্তু রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ববাকর, সাঁকতোড়িয়া ডিসেরগড়, বাঁক সিমুলিয়া, জামুড়িয়া, ঝরিয়া, ধানবাদ, নিয়মা, মোগমা প্রভৃতি স্থানে টেলিফোন ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া জীপ, ট্যাক্সি ভাড়া করেছে দ্রুত যাতায়াতের জন্তু। আর আছে সাইকেল করে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা। স্বেচ্ছাসেবীরা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। রাত বারোটায় স্ট্রাইক। সকাল থেকেই সাজো সাজো রব।

অনন্তর মন তার মাকে দেখার জন্তু উচাটন। অপারেশনের পর জ্ঞান ফেরার সংবাদ দিয়ে প্রশান্ত বাড়ি গেছে। অনন্ত এক রাত যেতে পারেনি। তাই দুপুরে খেতে এসে গৈরীকে বলল—একবার মাকে দেখে আসি। তুই যাবি ?

—আমি গিয়ে কি করবো ?

—বিপ্লবকে নিয়ে চল না।

—না গো।

—সেদিন আমি যখন তোর পরিচয় দিলাম তখন মা খুব কাঁদছিলেন। তারপর অপারেশনের দিন তো তোকে দেখার জন্তু আশা করেছিলেন। নাতির মুখ দেখতে পেলাম না বলে আক্ষেপ করলেন। মায়ের ভিতরে একটা ভাঙা-গড়া চলছে। এমনভেই তো তোকে স্নেহ করেন।

—শুধু তোমার বউ বলেই ঘেঁষা করেন।

—আহা। সেটা গুর আজন্ম সংস্কার। একদিনে তো যাবার নয়।

গৈরী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—আমি কখনো তোমার কথার অবাধ্যতা করি না। মাকে দেখার জন্তু আমার মন কম ব্যাকুল নয়। কিন্তু তুমি বুঝে দেখো আমাকে দেখলেই মায়ের উজ্জ্বলনা হবে। প্রেসার বাড়বে। তাতে তো কাঁচা সেলাইয়ের ক্ষতি হতে পারে।

—তা বটে! ফাস্ট এন্ড কম্পিটিশন করে কিছু শিখেছিল।

—ঠাট্টা কোর না। এত দুঃখেও তোমার ঠাট্টা করার স্বভাব গেল না।

অনন্ত হাসল। বলল—ঠাট্টা যে করছি এতে কি মনে হচ্ছে না যে আমার প্রাণে এখনো সন্দেহ আছে ?

ধাওড়া-ধাওড়া করেই সাইকেল চড়ে ব্যস্তিরে গেল।

একজন সিল্টার গুকে ডাঃ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বললেন। অনন্ত গুঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল—স্মার। আমি আপনার কাছে বরাবরই কৃতজ্ঞ আছি! আরো একটা শক্ত বেড়ি পড়িয়ে দিলেন।

উনি বললেন, অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে বলে আমি আনন্দিত। প্রায় এক পাউণ্ড ওজনের টিউমার ছিল। যাক বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু অল্প দিক থেকে একটা আপদ এসেছে। নাও তোমাদের এজেন্টের চিঠি।

একটা চিঠি তুলে দিলেন গুঁর হাতে। অনন্ত পড়ে দেখল সেটা গুঁর বরখাশ্বেব চিঠি ডাঃ সেনকে কপি দিয়ে তার পেসেটকে চিকিৎসা না করার জন্ম লিখেছেন।

অনন্ত বলল—মাই গড! তাহলে উপায়?

তুমি ভেবো না। আমি উত্তরে লিখে দিচ্ছি—অনন্তর মায়ের সিরিয়াস কেস। মানবিকতার কারণে এখুনি হাসপাতাল থেকে রিলিজ করা যাবে না। সরাবার মতো অবস্থা হলেই ডিসচার্জ করা হবে।

—থ্যাক ইউ স্মার।

—কিন্তু লোকটা কি মীন। কত নোংরা মন। ছিঃ ছিঃ।

অনন্ত খুব দুঃখিত স্বরে বলল—আমারই দুর্ভাগ্য স্মার।

—বাই দি বাই। তুমি অফ ট্র্যাক হয়ে গেলে কি করে? আশ করেছিলাম ফার্ট ক্লাশ ম্যানেজার হবে।

অনন্ত হেসে বলল—তাহলে তো মিঃ শ'য়ের মতো হতে হবে।

—না! তা কেন হবে? ম্যানেজার মানে তো শোষণের পুরোহিত নয়। সেবারও দান হতে পারে। দেশকে সেবা করার আরো বৃহৎ পটভূমি পেতে পারে। এটা স্বাধীন দেশ। ব্রিটিশ জমানার তলানি ভক্ষণ করে যারা এখন বিগ বস তারা চিরকাল থাকবে না। নতুন প্রজন্ম আসবে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ হবে। ম্যানেজারের প্রফেশনকে গ্রহণ করবে মাহুশের কল্যাণের জন্ম। ডু ইউ এগ্রি?

—হ্যাঁ স্মার। কিন্তু আমি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছি।

—জানি। তবু বলবো—এই স্ট্রাইকের পর একটা পরিবর্তন আসবে। তখন তুমি বাইরে আসার চেষ্টা করো।

—ধন্যবাদ স্মার।

অনন্ত গুঁকে নমস্কার করে চলে গেল।

আটোল

রাজি বারোটা। কয়লা শিল্পের একশো বিরাশি বছরের ইতিহাসে এমন রাজি বারোটা এসেছে ছাপান্ন হাজার পাঁচশো পঁচাত্তি বার। কিন্তু ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-এর মতো প্রমিত সংগ্রামের এমন গৌরবময় ইতিহাস হবার ছাড়া নিজে

কেউ আসতে পারেনি। তামাম কয়লা অঞ্চলের পুলিচাকা বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক যেন মহাষ্টমীর ক্ষণ। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পঞ্জিকা মিলিয়ে সঠিক ক্ষণটিতে সেই অভূতপূর্ব ঘটনাটিই সেদিন ঘটে গেল।

অনন্ত দাঁড়িয়ে ছিল বাতিঘরের কাছে। চানক মুখে যাবার রাস্তায়। তার সঙ্গী ছিল কালো বাউরী, জগদীশ ও রাম মাঝি। একশো চুয়াল্লিশ ধারা তখনো বলবৎ। একত্রে জমায়েত হওয়া নিষিদ্ধ। তাই সারা কলিয়ারী জুড়ে পাঁচজন পাঁচজন সেচ্ছাসেবীর দাঁড়িয়ে ছিল। প্রত্যেকটি রাস্তার ধারে, প্রত্যেকটি ধাওড়ার মোড়ে, প্রত্যেকটি চানক মুখে, বাতিঘরে ও অফিসে।

চারবাজা পালির লোকজন রাত্রি নটা থেকেই উঠতে শুরু করেছিল। সাহেবদের চোখ রাঙানিকে তোয়াক্কা করেনি। ম্যানেজার হাজরি কাটার শাসানি দিয়েছিলেন, মিঃ শ' ডুলি বন্ধ করার জুম্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁদের আদেশ অমান্য করা হয়েছে।

যে মাইনিং সরদার ও ওভারম্যানরা লোকজনের খবরদারি করে তারাই তাদেরকে খাদের ভিতর থেকে তাড়িয়ে আনল চানকে। যে ঘটাগুলো নির্দিষ্ট সময় না হলে লোকজন উঠবার জন্ত ডুলি ছাড়ে না তারাই তাদেরকে ডুলিতে চড়িয়ে ওপরে পাঠিয়ে দিলো। যে টালোয়ানরা হরদম চানক মুখে বোঝাই টবগাড়ি জ্যাম করে রাখত তারাই হলেজ বন্ধ করে চানক লেভেল ফাঁকা করে দিলো।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতি। যার যতটুকু করার আছে তাই করল। এজেন্ট সাহেবের যাবতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

বিকেলে অনন্তর সঙ্গে একবার ঝামেলা হয়েছিল যখন ও খাদের শ্রমিকদের রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে উঠবার নির্দেশ দিয়েছিল।

মিঃ শ' বলেছিলেন—রাত বারোটো পৰ্বন্ত ওদের ভিউটি। তার আগে উঠে এলে আমি হাজরি দেব না।

অনন্ত বলেছিল—আপনার হাজরির চেয়ে অধিক মূল্যবান তাদের জীবন। রাত বারোটায় পুলিচাকা বন্ধ হবে। তখন কেউ খাদ থেকে উঠতে পারে না। আর একটি লোকও যদি খাদের ভিতর আটকে থাকে তবে তার দায়ী হবেন আপনি এবং তখন গণ-রোষের হাত থেকে কি করে নিজের গায়ের চামড়া রক্ষা করেন তাই দেখব। আমি অ্যাজ সেক্রেটারী অব ইউনিয়ন সাকুলার দিয়ে দ্বিচ্ছি রাত বারোটোর আগেই লোক ওঠানোর জন্ত।

ছোট সাহেবেরা বাতিঘরে বসে লিগারেট ফুঁকতে লাগলেন। একশো চুয়াল্লিশ ধারার কোথাও অমান্য নেই! কোথাও শাস্তিভঙ্গ নেই। নীরবে নিঃশব্দে রাত বারোটোর গভীর অন্ধকারে ঘটে গেল ঐতিহাসিক ঘটনা।

এজেন্ট, ম্যানেজার, ডি. সি., ডি. ডি. অফিসে ছিলেন। ঘন ঘন মাথা

খুঁড়ছেন। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। টেলিফোন বাজছে জিরিং শব্দে। হেতু অফিসের সঙ্গে কথা হচ্ছে হালো হালো—কোনো লোক কাজে আসেনি। নো অ্যাটেনডেন্স।

মি: শ' গর্জন করে উঠলেন—হোয়ার ইজ তিলক সিং? ব্লাডি বাস্টার্ড এখনো লোক নিয়ে আসছে না কেন? হোয়ার ইজ গোরখপুর কম্যাণ্ডার? অল ওয়ার্থলেস ম্যান! কথা দিয়েছিল—কাজের জন্ত লোক আনবে। আজ তারা কোথায়?

তারপর লেগে পড়লেন সন্তিপ্রসাদের উপর—ফাকিন্ গোমস্তা। তুম হামকো বুডবক বানানে চাহত? আন্ডি আদমী চাহিয়ে। পুলিচাকা চালু করে।

বাঘের মতো গর্জন করছেন মি: শ'। সবাই ধরহরি কম্পমান। কিন্তু কারো কিছু করার নেই। সদা ব্যস্ত, কর্মচঞ্চল কলিয়ারী নীরব, নিস্তব্ধ। কোথাও একটা মেসিন চলছে না। কোনো মালুষ কাজ করছে না।

অনেক ভাকাভাকির পর রাত তিনটের সময় গোরখপুর কম্যাণ্ডার এসে হাজির হলেন। মি: শ' তখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছেন।

বললেন—ইউ অ্যাণ্ড তিলক সিং জবান দিয়া থা। অব বাং পুরা করে। আন্ডি খাদান চালু মাংতা। ইসি বক্ত।

ও বলল—হজুর! ক্যাম্পের গেট থেকে কলিয়ারীর চানকতক ইউনিয়ন-গুলাদের আদমী তৈয়ার আছে। লেবাররা রাতে বাহার আসতে নারাজ। তারা ভয় করছে যদি বোম্বাজি করে।

—অল কাওয়ার্ড! বোম্বাজি করবে? কেন তোমাদেরও বোমা আছে। যাও চার্জ করে। রাস্তা সাফ করে।

—হজুর। সব ভরা হয় আদমী। কাল হুবহা জরুর লে আয়ে গা।

—তিলক সিং এ কথা বলল। সন্তিপ্রসাদ ঘনঘন বাধকম্ব ঘাচ্ছেন। ওর পুরানো অল্পশূলের ব্যথা চাগাড় দিয়ে উঠেছে।

লে এক ভীষণ অস্বস্তিকর অবস্থা। চামচা, মুংসুদি ও দালালরা নাজেহাল। ডি. ডি. ও ডি. সি.-র মুখে রা নেই।

মি: শ' তড়পাচ্ছেন—বেইমান! সব শালা বেইমান। এতদিন লেবারদের স্কক বেইমানি করেছে। আজ এখন লেবাররা এককাট্টা তখন শালারা কোম্পানীর সঙ্গে বেইমানি করেছে। কিন্তু আমি বলে রাখছি কাল যদি খাঁক চালু না হয় তবে সবাইকে হাবিল করে দেবো। আই শ্রাল শ্রাক ইউ অল।

গাড়ি হাঁকিয়া চলে গেলেন।

ওঁর আবেদনিকান শ্রী তখনও স্তব্ধরূপে রাত জেগে বসে আছেন। মি: শ'র স্তব্ধ গোট পায় হতেই খেরিয়ে এলেন। মি: শ' তাঁকে দেখে আঁর্ষ হয়ে গেলেন।

উনি নিজের রুটিন মতো চলেন। যেদিন বয়স্ক্রেণের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে সেদিন বাংলাতে ফেরেন না। অল্প প্রেমোদ বিহারের জায়গা আছে। সপ্তাহে দু-দিন। বাকী দিনগুলো ছেলেমেয়েদের জন্ত।

মিঃ শ'য়ের জন্ত কোনো সময় গুঁর রুটিনে নেই। তথাপি আজ এই রাত্রি জেগে বসে আছেন দেখে আশ্চর্য হবেন না তো কি ?

মিঃ শ' বললেন—শুভ মর্নিং ডার্লিং।

—শুভ মর্নিং। তোমাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

—ইয়েস। ইটস এ ফেলিয়োর টু মী। ড্যাম ফেলিয়োর। সি. এম. ই.-র কাছে কি করে মুখ দেখাব ?

মিসেস শ' গুঁকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। এক পেগ ছইস্কি দিয়ে বললেন—তুমি যদি প্রথম রাত্রে মদ খেয়ে তোমার উত্তম্যানের সঙ্গে শুয়ে পড়তে তবে কষ্ট পেতে হতো না। কেন তা করলে না ?

—মিঃ শ' বললেন—আজ রাত্রে ওয়াইন, উত্তম্যান বিখাদ হয়ে গেছে। ভীষণ অ্যাংজাইটি নিয়ে রাত্রি বারোটোর অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু যারা হাজারবার কসম খেয়ে বলেছিল—রাত বারো বাজে জরুর আদমী নিয়ে আসব—খাদ চালু করবো। তারা কেউ এল না। অল ফাকিন বদমাস! কোম্পানীর হাজার হাজার টাকা ওদেরকে দিয়েছি। তার কি হিসেব দেব? সব শালা চোর—বেইমান। ওদেরকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব।

মিসেস একটু হেসে বললেন—বাইজোভ! তোমার এত একসাইটমেন্ট কেন? বি কুল—বি স্টেডি—ভ্যানিস—নাও।

ছইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিলেন।

—তুমি আমাকে মাতাল করে দিতে চাও? জানো সন্ধ্যা থেকে মদ খাইনি।

—খেলেই ভালো করতে। মদের নেশায় যারা অভ্যস্ত তাদের মদ না খেলে উত্তেজনা হয়—আবার অবসাদও হয়।

উনি ঢক ঢক করে খেয়ে গ্লাসটা ঠক করে টেবিলে নামিয়ে দিলেন। মিসেস বললেন—ডোন্ট বি সিলি ডিয়ার। এরকম বিহেত করলে আমি চলে যাবো। মাইগু ইট আমি তোমার কেপ্ট নই।

সেই মুহূর্তে মিঃ শ'-এর গুঁকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাগে অস্থির মিঃ শ' বললেন—প্রিজ গো।

অসন্ত দৃষ্টিতে গুঁর দিকে তাকিয়ে মিসেস শ' বললেন—ওকে। ব্যাক ইউ!

খটখট শব্দে পাশের ঘরে চলে গেলেন। অথচ উনি আজ রাত্রে গুঁর স্বামীর উবেগ, অশান্তি ও উত্তেজনার কথা জানতেন। সেজন্য জেগেছিলেন। কিন্তু কতদিনের জন্যই কি অতিশয়? একটা সংলাপেই সারারাত্রিব্যাপী প্রতীকার ব্যর্থ পরিশ্রম সর্ববে ধোঁকিত হলো।

মেঘমুক্ত শরতের আকাশ নতুন দিনের বার্তা নিয়ে স্বর্ষ উঠছে। লাল থালার মতো স্বর্ষের বর্ণময় দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছে। চারিদিকে আলোর বণ্ডা। অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে পিটটপের রেলিং ধরে স্বর্ষের দিকে মুখ করে। জ্যোতির্ময় স্বর্ষদেবকে প্রণাম করে প্রার্থনা করল—হে সবিতৃ মণ্ডল তুমি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে সৎমার্গে পরিচালিত কর।

সকাল থেকেই খবর আসতে শুরু করেছে ঘটনা ও দুর্ঘটনার। ব্যর্থতা ও সাফল্যের। ধর্মঘট স্বতঃস্ফূর্ত। তামাম কলিয়ারী অঞ্চলের পুলিশাাকা বন্ধ হয়ে গেছে ঠিক রাত বারোটোর সময়। অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেছে তা নয় তবে সাফল্যের তুলনায় নগণ্য। সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বর্তমান।

সারারাত ধরে দাঁড়িয়ে থেকে স্বর্ষোদয়ের পর যেসব রিপোর্ট এল তা দেখে শুনে বাসায় ফিরল। গৈরী তখন বসে থাকতে থাকতে অর্ধৈর্ষ হয়ে গেছে। বেচারী জগদীশের এক ধমকীতে ঘরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। না হলে ওর যা স্বভাব তাতে রাত্রেই বেরিয়ে পড়ত।

তাই তো জগদীশ গুকে ধমক দিয়েছে খবরদার—বাইরে যাস না। আমি তোকে দেখব না তোর মরদকে ?

গৈরী অবশ্য সে কথার অর্থ বুঝেছিল। তাই বেরোয়নি! কিন্তু ওর বুকটা লাফাচ্ছিল পুলিশাাকা বন্ধ হওয়ার দৃশ্যটি দেখতে। ঘরে থেকেই দেখল নীরব, নিস্তব্ধ, কলিয়ারীর আরেক চেহারা। এতদিনের এত পরিশ্রম সার্থক হলো।

অনন্ত বলল—স্ট্রাইক সাফসেসফুল। স্বতঃস্ফূর্ত। সব কলিয়ারী বন্ধ।

আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে সকালটা ভালোই কাটল। অনন্ত স্নান করে খেতে বসেছে। গৈরী কাছেই আছে। একটি শ্রমিক এসে খবর দিলো তিলক সিং আর গোরখপুর কম্যাণ্ডার প্রায় চারশো লোক জড়ো করেছে। ওরা দিনপালিতে কাজ করবে। স্পেশাল পুলিশ আসবে।

শুনেই ওর মাথা ঘুরে গেল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে খবরটা পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে কলিয়ারী গেল। তখন অগ্নান্ত নেতারাও এসে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুচারটে কথা! চোখে চোখে ইশারা।

চিৎকার করে উঠল—রাস্তা ব্যারিকেড করো।

ওদিকে তখন তিলক সিংয়ের প্লোগান উঠছে।

অনন্ত ছুটে গেল বয়লার হাউসে। যে খালাসীরা ইমার্জেন্সী ভিউটিতে ছিল তাদেরকে বলল—জলদি স্টিম ডাউন কর। বয়লারের স্টিম ফুঁকে দাও। ব্লো-অফ কক খুলে দাও। ঝাঁঝরি থেকে আগুন ঝেড়ে দাও। তারপরে পালাও।

ইঞ্জিন খালাসীকে বলল—তুমিও পালাও। এক মিনিট থেকে না।

স্ট্রাইকের সময়-কলিয়ারীর শ্রমিকরা ম্যানেজার এজেন্টের চেয়েও তাদের লীডারের কথাকে গুরুত্ব দেয় বেশী। ওরা যথাযথভাবে নির্দেশ পালন করল।

রাস্তায় ব্যারিকেড। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ইচ্ছুক শ্রমিক নামে অভিহিত দালালদের লোকজনকে পথ করে দিলো। কিন্তু কটা ব্যারিকেড ভাঙবে? পর পর ব্যারিকেড হতে লাগল। শ্রমিকরা লাঠি খেলো। রক্তাক্ত হলো। তবু মাটি আকড়ে দাঁত খিঁচে প্রতিরোধ গড়তে লাগল।

দু'দিক থেকে দুটি দল আসছিল। ধাওড়ার দিক থেকে ফাটকবাজার পার হয়ে তিলক সিংয়ের দল। ওদের সরদার যমুনা যাদব। আর সদর রাস্তা দিয়ে গোরখপুরী শ্রমিক। সব মিলিয়ে সংখ্যায় শ-চারেক। ওরা যখন বাতিঘরে এল তখন সেখানে বাতি দেবার জন্ত কেউ নেই।

সাহেবরা নিজের হাতে বাতি দিলেন, হাজারি লিখলেন। কিন্তু বয়লারে স্টিম নেই। ইঞ্জিনের খালাসী নেই।

সে খবর যখন মিঃ শ'-এর কাছে গেল তখন উনি থেপে আশুন।

বললেন—দিস্ ইজ ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের জেন্টেল-ম্যানশ এগ্রিমেন্ট ছিল অল ইমারজেন্সী চালু রাখার। সেফটি, সিকিউরিটি, লাইট, গুয়াটার, ইলেকট্রিসিটি, মেডিকেল ইমারজেন্সী ইউনিয়ন বন্ধ করতে পারে না। এটা আইনের খিলাপ।

কিন্তু ওঁর তড়পানিতে ওঁর দালালরাই ভয় পাবে। ইউনিয়ন কেন ভয় পাবে? তারা তাদের হাতের পাঁচ নিয়ে নিয়েছে। ইঞ্জিন বন্ধ থাকলে খাদে লোক নামবে কি করে?

অনন্ত বলল—মিঃ শ'। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন যে ব্রিটিশরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ রাজত্বের যদি অবসান ঘটাতে পারেন তবে আমরা ব্রিটিশের বাস্টার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ার চোখ রাঙানি বরদাস্ত করে নেব এটা কেন ভাবছেন? আপনারা হাজার হাজার আইনের খিলাপ করেছেন। আমরা করেছি একটা।

চীফ পারসোন্সাল ম্যানেজার ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং করার আহ্বান জানালে অনন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে বলে পাঠাল—আমরা কোম্পানীর সঙ্গে মিটিং-এ বসতে পারি যদি খাদ চালু করার জন্ত যেসব শ্রমিক আনা হয়েছে তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

মিঃ শ' সেজন্ত তৈরি নন। উনি বললেন—সরকার নেই ইউনিয়নের সহযোগিতার। আমাদের অফিসাররাই ইমারজেন্সী চালু রাখবে!

কলিয়ারীর ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন মিঃ সরকার। বিলেতে লেখাপড়া। হাতে কলমে কাজ করেছেন। স্টিম এনার্জীর মাস্টার। নিজের হাতে ইঞ্জিন চালাতে জানেন। তিনিই ইঞ্জিন চালাবেন। ম্যানেজার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজাররা বয়লার হাউসে হাতে বেলচা ধরে ফায়ারিং করে স্টিম করতে লাগলেন।

তাস্তিক জানের ভাণ্ডার সবারই যগজে গিজ গিজ করছে। কিন্তু আনাড়ি

হাতে এক চাড়া আগুন জ্বালাতে পাঁচ মিটার কেরোসিন খরচ করে ঘণ্টা পার করে দিলো। বয়লারে যখন স্টিম উঠল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অত ইচ্ছত করে যে শ্রমিকদের আনা হয়েছিল তারা বেলা ডুবতে দেখেই ফুটফাট সরে পড়েছে।

মিঃ শ' তরুণ দিলেন—সব তৈয়ার রাখো। বাই এনি মীনস কাল সকালে খাদ চালু রাখতে হবে। এখুনি সমস্ত ধাণ্ডা ও কোয়ার্টারের জল ও বিজলী বন্ধ করে দাও। কাল থেকে ভাতারখানাও বন্ধ থাকবে। ইঞ্জিন বন্ধ তো সব বন্ধ।

ব্যস! সারারাত অন্ধকার।

রাত্রি দশটা। অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে চার নম্বর পিটটপে। কংক্রীট করা মেঝের উপর টপ গাড়ির লাইন। বিলকুল ফাঁকা। বয়লার চিমনি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক যুগে উদ্ভিদের সরল গুঁড়ির মতো। হেডগিয়ারগুলো যেন লোহার খাঁচা। ধাণ্ডাগুলো গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে আছে। দু-একটা গাছপালার রূপসি অন্ধকার তাকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। বাবু কোয়ার্টারেও বাতি নেই। কোথাও কোনো ধাণ্ডায় মিটি মিটি জোনাকীর মতো দু-একটা হারিকেনবাতি জ্বলছে।

কিন্তু আলোর বন্ধ্যায় ভেসে যাচ্ছে সাহেব বাংলোগুলি। ওদের লাইন কাটা হয়নি।

ব্রিটিশ আমলের বৈষম্য যেন তার চোখের সামনে ছবি হয়ে উঠেছে। দেশের স্বাধীনতা কোথায় এসেছে তা বোঝার জো নেই আজকার কলিয়ারীতে। এখানে এখনো সন্ন্যাসে ভারতবাসীর বৃকের উপর বৃত্ত চালনা করে ব্যারাকলউ সাহেবের আরজ সন্তান মিঃ শ'। এখনো তাদের শোষণের কারখানায় উৎপন্ন হচ্ছে কারেন্সী নোট। রাজস্ব গেলে কি হবে? রাজস্বের চেয়েও বেশী আমদানি করেছে ভারতবাসীর ঘাম, রক্ত ও ইচ্ছত বিক্রি করে। এই যুগের অবসান চাই।'

উনঘাট

গোরখপুর ক্যাম্পের আইন কানুন বেশ কড়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন শ্রমিকের চাহিদা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল তখন গোরখপুর থেকে শ্রমিক সংগ্রহের কেন্দ্র চালু হয়েছিল। সে এক বিরাট সংস্থা। 'রিটার্ডড ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার তার চীফ অফ এডমিনিস্ট্রেশন। এগারো মাস থেকে তেরো মাসের চুক্তিতে শ্রমিকদের সহি করত হতো। তারপর তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো কোলকিন্ডে। যে কলিয়ারীর যেমন চাহিদা সেই স্রোতাবেক ক্যাম্প অফিসার

তাদেরকে নিয়ে আসতেন। এজেন্ট, ম্যানেজাররা ফীজ সহ রিক্যুইজিশন দিতেন। ছুটি সিক পাওনা বাবদ শ্রমিকরা একমাস ছাড়া পেত। তার আগেই নতুন দল এসে হাজির হতো। প্রত্যেক ক্যাম্পই একজন কম্যাণ্ডার। তাঁর অধীনে সুপারভাইজার, মুনশী, কেরানি ইত্যাদি মোতায়েন থাকত।

ক্যাম্প মানে কোনো ত্রিপল ছাওয়া টেম্পোরারি ঘর নয়। পাকাপোক্ত দালান-ঘর। বাউণ্ডারির উঁচু দেওয়ালে কাঁটা তার। যাতে কেউ পালাতে না পারে সেজন্য নানাপ্রকার সুরক্ষার ব্যবস্থা। শ্রমিকদের বন্দীজীবন। আহার, নিদ্রা, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম ও ডিউটির বাইরে কিছু করার জো ছিল না। দৈনিক তিনবার খাবার—ভাত কিংবা রুটি। সপ্তাহে একটি সাবান, মাখবার তেল। নগদ পাঁচসিকে পয়সা।

তাদের রোজগারের পাই পয়সা পর্যন্ত জমা হতো গোরখপুর সেক্ভর্নেটে। চুক্তি মারফিক কাজ শেষ করে গিয়ে পুরো টাকা এক লপ্ঠে দেওয়া হতো। অবশ্য ওর যাবতীয় খরচ-খরচা কেটে নিয়ে। এক থেকে মোটা টাকা পেত। সেই লোভে রিক্রুটিং সেন্টারে নাম লেখাবার হিড়িক পড়ে যেত।

সব লাহাঙ্কা জোয়ান। কাজ করত জন্ত জানোয়ারেব মতো। কত রকমের লোক থাকত তাদের মধ্যে চোর, ডাকাত, খুনী, সাধু, মুর্থ, গায়ক, যোঁনরোগী, সমকামী, অগম্যাগামী এমন চরিত্র।

এইসব মাল নিয়ে সুরমপ্রসাদ সিং কম্যাণ্ডার। স্ট্রাইকের প্রথম দিনটা ব্যর্থ যাবার জন্ত শ্রমিকদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করতে খাবার জন্ত লুচি মাংসের বরাদ্দ করেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাল খাদ চালু হলে ঢালাও মদ ও লৌণা নাচের ব্যবস্থা করবেন।

সমকামী পুরুষদের কাছে লৌণা নাচ দারুণ প্রমোদ। টিন এজের ছেলেদের মেয়ে সাজিয়ে উদ্দাম নাচ ও ঢোলকের বাজনা ওদের রক্তে নেশা ধরিয়ে দেয়। নাচওয়া ছেলেদের কচলে কাঁদা করে দেয়। দীর্ঘ একবছর স্ত্রী বর্জিত জীবন কাম-কামনার যন্ত্রনায় উন্মাদ হয়ে থাকে। শরীরের প্রয়োজন তো যাবার নয়। সবাই স্থূল বৃদ্ধির। আত্মরতি এবং সমকামীতা ছাড়া উপায় কি?

দলের মধ্যে যেসব শ্রমিক চলতা পূরজা নেতা গোছের তাদেরকে একটা করে লৌণা উপহার দেওয়া হবে এতদূর পর্যন্ত টোপ দেওয়া হয়েছে।

অন্তঃপর শ্রমিকদের মধ্যে পরদিন কাজ করার বেশ একটা জোরদার ইচ্ছা জেগেছে। ওরা যেবেন সেন, কল্যাণ রায়কে চেনে না। কখনো ট্রেড ইউনিয়ন করেনি। ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জো নেই। তাহলেই চাবুকের ঘায়ে পিঠের চামড়া তুলে দেবে।

কম্যাণ্ডার সাহেবের হুকুম অমান্য করার মতো হুকুম পাটা তাদের নেই।

তারা ভেড়ার পালের মতো যেদিকে নিয়ে যাবে সেইদিকেই যাবে। শ-দুয়েক আনকোরা নতুন লোক এনেছে ওরাই।

তিলক সিংয়ের তো প্রায় সবাই নতুন। যমুনা যাদব দেশ থেকে নিয়ে এসেছে—গোয়াল, তেলি, ধোবী ও ক্যাণ্ট ছোকরাদের। রঘুবীর মুন্সের জেলা থেকে এনেছে ভুঁইয়া, মশহর, দুশাদ, মুচি। নিজের দেশে ওরা বণ্ডেড লেবার। চার হাজার বছর থেকে ভূমিহীন দাস। বংশ পরম্পরায় বেগার খেটে আসছে জোতদার, জমিদার ও মহাজনদের। ঘর-গুপ্তি বন্দক পড়ে আছে। তারই মধ্যে বিবাহ, প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি। মালিকরা নিজের গরজেই জোয়ান ছোকরা ছুকরীদের বিয়ের নাম করে এক ঘরে ঢুকিয়ে দেয় বাচ্চা প্যায়দা করতে। ছুকরীটা যদি চোখলাগু হয় তবে মালিক নিজেই প্রাথমিক পর্বটা সেরে দেয়।

তাদের কাছে কলিয়ারী স্বর্গরাজ্য। যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে খানাপিনা ভালোই চলছে। ভাঙের সরবৎ, মুগের ডাল, আটার রুটি। তারা কি বুঝবে ট্রেড ইউনিয়নের মর্ম? খাদে কাজ করবে—নোট কামাবে, এটাই জানে। তিলক সিং মহাপুরুষ।

এইসব মাল পরের দিন সকালে ডাল-রুটি-সবজি স্টেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু শ-কদম যেতে না যেতেই পড়ে গেল মহিলা শ্রমিকদের ব্যারিকেডের সামনে। গতকাল পুরুষ শ্রমিক দিয়ে ব্যারিকেড হয়েছিল আজ স্ট্রাটেজি বদল করে মহিলা শ্রমিক দেওয়া হয়েছে। যে শ্রমিকরা কাজ করতে যাচ্ছিল তাদের চোখ ছানাবড়া। মেয়েরা যে পুরুষদের রাস্তা আটকে দাঁড়াতে পারে এই ধারণাটা তাদের স্বপ্নের মধ্যেও নেই। ওদের মেয়েরা পুরুষমানুষ দেখলেই ঘোমটায় মুখ ঢাকে। আর এরা ঝাণ্ডা হাতে, শ্লোগান দিয়ে, হাতের চুড়ি ঝনঝন করে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। ওঃ! বহুত বে আবর, বে-শরম জানানা, এইজগুই লোকে বাঙাল দেশের জানানাদের এত রেয়াৎ করে।

পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে দিলো। স্বরমপ্রসাদ ঠেলেঠেলে রাস্তা করে লোকগুলি নিয়ে এগোল কিন্তু ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর সামনে সারি সারি মহিলা শ্রমিক। তাদের হাতে ঝাণ্ডা। মুখে শ্লোগান।

ঝাণ্ডা হাতে জীবন্ত ভাস্কর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। পুলিশ অফিসারের সন্ধে বহুত জোর তকরার হলো। তাতেও যখন ব্যারিকেড ভাঙল না তখন লাঠিচার্জ শুরু হলো। মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল। গৈরীকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করে ভ্যানে চড়াবার চেষ্টা চলছে। ভীষণ চিংকার। মারমুখী জনতার গোলমাল। ছুটে এল হরিহর গান্ধী, রাজকিশোর সিং। তারাও লাঠি খেল।

হঠাৎ বিউট ছুটে এসে গৈরীকে ধরে ফেলল। বিভিন্ন সময়ে ওর সন্ধে পুলিশ অফিসারের দেখা সাক্ষাৎ হতো। তাই বলল—ওকে ছেড়ে দিন।

পুলিশ বলল—কেন ছাড়বো? এই মেয়েটা বারবার বাগড়া দিচ্ছে।

—আর দেবে না। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

গৈরীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল—কেন স্ক্যাপার মতো করছিস। অতগুলো মরদের সঙ্গে গায়ের জোরে পারিস ?

তখন ব্যারিকেডও ভেঙে গেল। গৈরী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—পারলাম না দিদি। শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।

বিউটি বলল—আয়—আমার ঘরে আয়। ওরা যা খুশী করুক। কিন্তু খাদ চালু করতে পারবে না। এই কথা বলে রাখলাম।

ওকে বাংলাতে নিয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল—এবার নিজের দিকে তাকিয়ে ছাখ।

গৈরীর সে সময় নারীমূলত ‘লজ্জা’ বস্তুটা যদি থাকতো তাহলে অমন লক্ষ্যরূপ করে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করত না। ওরা ওর হাত ধরেই স্ফাস্ত হয়নি। শালীনতার মাত্রাও ছাড়িয়ে গেছিল। সায়, শাড়ি, ব্লাউজ ছিঁড়ে ফালা ফালা। চুল খুলে সারা গায়ে ছড়িয়ে। অনাবৃত স্তনে নখের দাগ। পিঠটা চিড়ে রক্ত মুখ হয়েছে। যেখানে সেখানে লাঠি পড়েছে। ঘামে ও রক্তে মাথামাথি। মুখটা রাগে লাল। গালে শিটা শিটা চড়ের দাগ। কাঁচের চুড়ি, শাঁখা ভেঙে চুরমার। আক্রোশে ফুলছে। গলগল করে ঘাম ঝড়ছে! লজ্জায় মরে গেল। বিউটির সামনে দাঁড়াতে পারছে না। দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হেঁড়া শাড়িতে গিঁট দিয়ে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করল।

বিউটি বলল—থাক তোকে আর শাড়িতে গিঁট দিতে হবে না। নে চা খা। অত তাড়াহড়োর কিছু নেই। এ বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই। দিদির কাছে লজ্জা কি রে ?

ফ্যানের বাতাসে গৈরী প্রকৃতিস্থ হলো। বিউটি ডেটল ভেজা তুলো দিয়ে ওর ক্ষতস্থানগুলি মুছিয়ে দিলো। জিজ্ঞাসা করল—ওরা কতদূরে গেল দিদি ?

—তা কি করে জানব ?

একসেট শায়, শাড়ি, ব্লাউজ, ব্রেসিয়্যার এনে দিয়ে বলল—পরে নে।

—আপনার এত দামী শাড়ি আমি কি করে পরবো ?

—চঙ করিস নে।

হেঁড়াখোঁড়া কাপড় বদল করে চুল আঁচড়ে মুখ মুছে দিলো।

আবেগে অভিভূত গৈরী বলল—দিদি !

—এই কাপড়-চোপড়গুলো ফেলে দিস না। সঙ্গে নিয়ে যা। অনন্তকে দেখা গিয়ে।

—আচ্ছা দিদি। আমি চলি তবে !

—হ্যাঁ। একটা গোপন কথা—তোদের জীবনের উপর আঘাত হবে।

গৈরী ভেজের সঙ্গে বলল—সে ষড়যন্ত্রের ষৌকাবিলা আমরা করে নেব।

—বেশি বড়াই করিস নে। ডি. সি. সাহেবের প্ল্যান। কাজ হাঁসিল করতে তোর প্রথম স্বামী রবিলালকে নিয়ে এসেছে। খুব সাবধান।

—আপনার ঋণ কি করে শোধ করব দিদি ?

—দিদির কাছে আবার ঋণ কি রে ? তবে য়েহ ভালোবাসার দাম কি রইল ?

অফিসের সামনে ভয়ঙ্কড় অবস্থা। গোরখপুরী শ্রমিকদের ঘিরে তিন হাজার নারী পুরুষ। চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পূর্বে অফিস, পশ্চিমে রেলওয়ে সাইডিং, উত্তরে বাবু কোয়ার্টার ও সাহেব বাংলো, দক্ষিণে তিন-চার নম্বর চানক মাহুবে মাহুবে ছেয়ে গেছে। শুধু কালো কালো মাথা। সবাই কয়লা কুঠির কুলিকামিন।

মাইকে যত প্লোগান হচ্ছে তার বিশগুণ অ-মাইকে গালমন্দ হচ্ছে। সব গাল মালিক, ম্যানেজার, এজেন্ট, ডি. ডি., ডি. সি., সভিপ্রসাদ, তিলক সিং, সুরমপ্রসাদ প্রমুখের নাম ধরে। কাঁচা খিস্তির বাণ ভাকছে।

সুদূর গোরখপুর থেকে যে শ্রমিকের দল কয়লা কুঠিতে কাজ করার জন্ত এসেছিল তারা ভয়ে পেছাব করছে। ঘেমে নেয়ে, পেছাবে পায়থানায় তাদের দশা সড়িন। পুলিশরাও ওদের কাছ থেকে সরে অফিস বারান্দায় রাইফেল উচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গৈরীর খবর শুনেই অনন্তর মাথায় দপ করে আগুন জলে উঠল। তখন একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এসে নেতাদের সঙ্গে মিটিং করার প্রস্তাব দিলেন।

অনন্ত বলল—স্মার। পুলিশ ইন্সপেক্টর আমার স্ত্রীর স্ত্রীতাহানি করেছেন। আপনি যদি তার বিচার করেন তবেই মিটিং-এ বসব।

উনি বললেন—বিচার ব্যবস্থার অনেক আইনগত ব্যাপার আছে। সেসব খতিয়ে দেখার জন্তও মিটিংয়ের প্রয়োজন। আপনার স্ত্রীকে নিয়ে আহ্নন।

মিটিং বসল। ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পুলিশ অফিসারও আছেন। এদিকে এজেন্ট, ম্যানেজার ও পারসোন্সাল ম্যানেজার। ইউনিয়নের তরফে স্মিত চ্যাটার্জী, সুনীল সেন ও রণেন গুপ্তের সঙ্গে স্থানীয় নেতারা।

অনন্ত অভিযোগ করল—স্মার। ইনিই সেই অফিসার যিনি মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছেন। মারধোর করেছেন এবং আমার স্ত্রীর শালীনতা নষ্ট করেছেন।

ইন্সপেক্টর বললেন—মিথ্যা কথা। আমি কারো শালীনতা নষ্ট করিনি।

—মিথ্যাবাদী আপনি। মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে কাপড় ছিঁড়ে যা তা করেছেন।

—না। এ অভিযোগ মিথ্যা।—

—জলজ্যান্ত সত্যি। -এই জঙ্গমহিলা আমার স্ত্রী গৈরী শর্মা। আপনি তাকে টেনে হিঁচড়ে মাটিতে ফেলে চুড়ি শাখা ভেঙেও কাঁস হননি। তার

সর্বাঙ্গে নখ বসিয়ে দিয়েছেন। তাকে রেপ করার জন্তু ভ্যানে চড়াতে টানাটানি করেছেন। তাকে টুইস্ট করেছেন।

পুলিশ অফিসারটি ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে বললেন, দেখছেন স্মার! এত ডিজাইনবালা শাড়ি পরা ডেকোরেটিভ উস্তম্যানকে ম্যান হ্যাণ্ডেল করেছে বলে মনে হয়।

অনন্ত বলল—আপনি জানেন ঐ শাড়িটার দাম কত?

—তা প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

—যার ঘরগুপ্তী আত্মীয় পরিজন একবছর যাবৎ চাকরীবিহীন, যে একটা বরখাস্ত খুঁটা কুলির স্ত্রী সে কখনো পঞ্চাশ টাকার শাড়ি পরতে পারে? আমাদের কাছে সাড়ে চার টাকা দামের শাড়ি জুটলেই ঢের। এই দেখুন স্মার যে কাপড়-চোপড় পরে আমার স্ত্রী নির্ধাতন ভোগ করেছিল তার দশা দেখুন।

গৈরীর হাত থেকে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে মেলে ধরল। একটি একটি করে দেখিয়ে বলল—আমার স্ত্রীর লজ্জা ঢাকবার কাপড় ছিল না স্মার। ওকে অলমোস্ট নেকেড করে ভ্যানে চড়াচ্ছিল। কিন্তু এক সদাশয়া মহিলা সময় মতো তাকে উদ্ধার করে ফাস্ট এড দিয়েছেন। নিজের শায়া, শাড়ি, ব্লাউজ দিয়ে গুর লজ্জা ঢেকেছেন। এই তো স্বাধীন ভারতের পুলিশ। জনগণের রক্ষক।

পুলিশ অফিসারটি বললেন—টানা হাঁচড়ায় কাপড় ছিঁড়তে পারে কিন্তু গুর শালীনতায় কেউ হাত দেয়নি।

গৈরী ফুঁসে উঠল—মিথ্যাবাদী? গায়ে হাত দেননি? কাপড় খুলে দেখাবো?

এজেন্ট সাহেব স্নেহ দিয়ে বললেন—তাতে তোমার লজ্জা করবে না?

—লজ্জা! আপনারা কি মাহুষ যে লজ্জা করবো? সব তো শিয়াল, কুকুর, বাঘ, ভালুক। জন্তু জানোয়ারের কাছে মাহুষের আবার লজ্জা কি?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—ইটস এনাক্স! আমি বুঝে নিয়েছি। অনন্তবাবু, আপনার স্ত্রীর দুর্গতির জন্তু আমি দুঃখিত। তুমি বস সিঁটার। শান্ত হও।

গৈরী বলল—কেন শান্ত হব?

—সংগ্রাম করতে নেমেছো তার খেসারৎ দেবে না? তোমার ফাঁড়া কন্মের মধ্যেই কেটে গেছে। আরো যে সর্বনাশ হয়নি সেজন্তু ভগবানকে ধন্তবাদ দাও। ইন্সপেক্টর, আপনাকে এই মেয়েটির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে!

ইন্সপেক্টর অনায়াসে বললেন—ইয়োর অনার স্মার। আই বেগ এম্মকিউজ।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—অনন্তবাবু! আমার মনে হয় এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না। আহ্নন অজ্ঞান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কণ্ঠধরে যে আন্তরিকতা ছিল তাতেই অনন্ত ও গৈরীর রাগ কমলো। দুজনেই বসে পড়ল।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—মিঃ শ' অভিযোগ করেছে যে আপনারা কলিমারীর

নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্ম যেসব জরুরী কাজকর্ম চালু রাখা প্রয়োজন তা বন্ধ করে দিয়েছেন।

স্মিতবাবু বললেন—মি: শ' ইউনিয়নের সহযোগিতা ছাড়াই জরুরী কাজকর্ম চালু রাখতে পারবেন বলেছেন।

—না আমি সে কথা বলিনি।

—তাহলে গতকাল যখন দেখলেন স্ট্রাইক পিসফুল অ্যাণ্ড সাকসেসফুল তখন আজ এত লোক এনেছেন কেন? অফিসাররা বয়লার ফ্যারিং করে স্টিম করেছেন, মি: সরকার ইঞ্জিন ট্রায়াল দিয়েছেন, প্রোডাকশন করতে লেবার এনেছেন তবে আর ইমার্জেন্সীর প্রশ্ন কেন?

হরিহর বললেন—কোয়ার্টারে জল ও বিজলি বন্ধ করেছেন। কাল সারা দিন রাত কেটেছে বেগর পানি, বেগর লাইট। আজ থেকে ডাক্তারখানা বন্ধ।

রণেনবাবু বললেন—আপনি তো ল অফ নেচারকেও নশাং করে দিয়েছেন।

মি: শ' বললেন—আপনারা ওয়াইণ্ডিং ইঞ্জিন বন্ধ করেছেন।

অনন্ত বলল—আপনারা প্রোডাকশন করবেন না প্রতিশ্রুতি দিলেই ইঞ্জিন চালু করার দায়িত্ব আমরা নেব।

—কিন্তু যারা ইচ্ছুক কর্মী তাদেরকে তো বাধা দিতে পারেন না।

—কে কর্মী? আপনি যে লোকগুলিকে এনেছেন এরা কেউ বোনাফায়েড এমপ্লয়ি নয়। সব বুটা আদমী।

—আপনাদের লিফ্ট অফ ওয়ার্কারের খাতা বের করুন। এই লোকগুলিকে আইডেনটিফাই করে দেখিয়ে দিন।

—আমরা নতুন লোক রিক্রুট করতে পারি।

—তা কি স্ট্রাইকের দিনেই? তাছাড়া আপনারা যখন চার থেকে পাঁচশো লেবারকে ছাটাই করে রেখেছেন তখন নতুন লোক রিক্রুট করবেন কেন? মঞ্জুমদার'স ট্রাইবুনাল শ্রমিকদের চাকরির স্থায়িত্ব স্বীকার করেছেন। আপনারা সেই আদেশ লঙ্ঘন করেছেন।

নরম গরম-স্বরে এই বাথেড়া চলতে লাগল ইউনিয়ন লিডার ও কোম্পানীর প্রতিনিধিদের মধ্যে।

• ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—আপনারা অন্তহীন কলহ শুরু করেছেন। এইভাবে কি দিঙ্কান্তে আসা যাবে?

পারসোন্সাল অফিসার বললেন—কলিয়ারীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি আছে। তা ভঙ্গ করে বিশাল জুম্মায়েত হয়েছে অফিসের সামনে। সব রাস্তায় ব্যারিকেড। তাহলে ল অ্যাণ্ড অর্ডার কোথায় রইল?

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—সে দায়িত্ব আপনাদের। অনেক কলিয়ারী দেখলাম—

যেখানে ম্যানেজার, এজেন্ট কলিয়ারী চালাবার চেষ্টা করেননি। সেখানে ধর্মঘট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। ইমারজেন্সীর কাজও চলছে।

—কিন্তু এই জনতা? এদেরকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব পুলিশের। কারণ একশো চুয়াল্লিশ ধারার প্রয়োগ তারাই করেছেন।

—একশো চুয়াল্লিশ ধারা সবারই জন্ম প্রযোজ্য। আপনাদের লেবাররাও তার মধ্যে পড়ে। তাদেরকে আপনারা সরিয়ে নিন।

অনন্ত বলল—ইয়োর অনার স্মার। আপনার অর্ডার মেনে নিচ্ছি। আমরা লেবারদের সরে যাবার জন্ম মাইকে ঘোষণা করছি। কিন্তু তারপর?

—আমিও পুলিশ তুলে নিচ্ছি? আমাদের পুলিশ স্ট্রাইক ভাঙবার জন্ম বা মহিলাদের লালিত করার জন্ম থাকবে না।

উনি উঠে পড়লেন।

—তাহলে স্মার ইমারজেন্সী কাজ চালু করার কি হবে?

—আপনারা বুঝুন। আপনাদের কলহ মেটাবার ম্যাজিক আমি জানি না। আপনারা একটা করে হাঙ্গামা করবেন আর আমরা শান্তিরক্ষার জন্ম ছুটে বেড়াবো? এবার কিছু হলে ইউনিয়ন এবং ম্যানেজমেন্ট উভয় পক্ষকেই অ্যারেস্ট করবো।

উনি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

তা হলেও ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দৃঢ়তার কারণে পুলিশকে সামনে রেখে মিঃ শ' যে লেবার দিয়ে খাদে প্রোডাকসন করবেন সে চেষ্টাতেও দারুণ আঘাত পড়ল। ইউনিয়ন নেতারা তাতেই খুশী।

ষাট

বিভিটির মনটা খুব খুশী। স্ট্রাইকের তৃতীয় দিনেও খাদ চালু করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রথম দুটো দিন ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। তৃতীয় দিন খাদ চালু করার কোনো চেষ্টা হয়নি। পুলিশ একশো চুয়াল্লিশ ধারা তুলে নিয়েছে। এখন সেই দমফাটা উত্তেজনা অনেকটা স্তিমিত।

কলিয়ারী যেমন ছিল তেমনি আছে। বিশেষ খবর বলতে ইঞ্জিনীয়ার মিঃ মরকার সকালে ইঞ্জিন চালিয়েছেন। ম্যানেজার ও ডি. ডি. সাহেব সেই ডুলিতে খাদে নেমেছিলেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলি তদারক করেছেন। এখনো কিছু ক্ষতি হয়নি। তবে জল বেড়েছে। দু-একদিনের মধ্যে পাম্প চালু না করলে কোল কাটিং মেশিন, ড্রিল প্যানেল, ফেস পাম্প ডুবে যাবে।

বড় ফ্যানটা চালু আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার পালি করে সেটা চালাচ্ছেন। খাদে গ্যাস হয়নি।

ইন্সপেকশন টিম রিপোর্ট তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ডি. ডি. সাহেব দুপুরে লাঞ্চ করতে এসে বিউটির কাছে সেসব গল্প করেছেন। তারপর আবার গেছেন পাঁচ নম্বর খাদে সেকেণ্ড শিফটের ইন্সপেকশন করতে।

আশ্বিনের বিকেলে তেজি রোদ। মোরাম রাস্তার উপর লম্বা লম্বা গাছের ছায়া। বিউটি হালকা নীল রঙের শাড়ি পরে শিমুল গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে অনন্তকে একটা অভিনন্দন পাঠায়। কি কৃতিত্বটাই না দেখাল। তেমনি বউ পেয়েছে। একজন যদি আশ্রয় হয় তবে অশ্রয়ন বারুদ।

বিউটি জানে মি: শ' ওদের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করেছেন। ডি. সি. সাহেব প্ল্যান করেছেন। কার্যকরী হবে বাঁকেলাল, রবিলাল ও তাদের দলবল নিয়ে।

কিন্তু কবে, কোথায়, কিভাবে সেই প্রেতকর্মটি অত্মর্চিত্ত হবে সেইটুকুই ও জানতে পারেনি।

শিমুল গাছটি যখন নিতান্তই শিশু ছিল তখন ও এই বাংলাতে এসেছে। মন ভালো থাকলেই গাছটির ডালপালায় হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করে। এবড়ো খেবড়ো গাছের গুঁড়িতে ওর চিকন কোমল হাতের স্পর্শ পড়ে প্রায়ই। যে হাতের একটুখানি স্পর্শের জন্তু কত নামী দামী পুরুষ কাঙাল সেই হাত কত অবলীলায় রেহ ও সোহাগসিক্ত হয়ে গাছটার গায়ে পড়ে। উদ্ভিদ জগতের প্রাণে যদি নারীর প্রতি আকর্ষণবোধ থাকে তবে তার ধন্ত হবার কথা।

হাত বাড়িয়ে একটি ডাল ধরে দাঁড়াতেই তার ভঙ্গীটি হলো বনচারিনী নায়িকার মতো। যেন মহাকাব্যিক সুসমা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নয়! মডেলের শকুন্তলা। ডি. সি. সাহেব অফিস থেকে ফিরছিলেন। তাতে ওর ভঙ্গীর কোনো পরিবর্তন হলো না। বরং উনি কাছে এসে বললেন—হ্যালো বিউ। এমন মনোহারিণী ভঙ্গীতে কার প্রতীক্ষায়?

—মনে করুন যিনি সামনে এসে স্তুতি করছেন।

—ওহু! মাই গড! এত সৌভাগ্য কি আমার হবে?

—আপনি আমাকে এত মূল্যবান মনে করেন?

—নিশ্চয়ই!

—ধন্ত হলাম।

—ব্যস। ধন্ত হলাম বললেই সব শেষ হয়ে গেল। আর কিছু কথা নেই? নেই কিছু দেওয়া নেওয়া?

—ডি. সি.! আপনার দেওয়া নেওয়ার অর্থ আমি জানি। কিন্তু কজনকে দিতে পারি? আমার অলরেডি দুটো ক্যাভিডেট।

ডি. সি. ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—শুধু একদিনের জন্ত এসো বিউ। একটা দিন—তুমি হবে রানী। আমি বান্দার মতো সেবা করব।

বিউটির মুখে খেলে গেল বিচিত্র রহস্যময় হাসি। যত সুন্দর, তত তীক্ষ্ণ, তত অস্তর্ভেদী। সমুদ্র মস্তিষ্ক ধনি তরঙ্গের মতো একটি একটি শব্দ তার বাকযন্ত্র থেকে বেরিয়ে এল—সুরেলা কণ্ঠস্বরে ভীষণ অর্থবহ সংলাপ—

—যাবো ডি. সি.। যেদিন ঘোর ঘনঘটায় ছেয়ে যাবে আকাশ। অশনি সংঘাতে ফালা ফালা হয়ে ঝলসে যাবে কালো প্রেক্ষাপট। ধরিত্রীর নীল নীচোল ভেসে যাবে গৈরিক বন্যায়। অনার্থ দামোদর ক্রুদ্ধ আক্রোশে ভেঙে দেবে পাহাড়! সেই দিন সেই ভীষণ নৈসর্গিক বিপর্যয়ের দিন তুমি হবে আমার বান্দা। আর আমি তোমার গুলবেগম।

স্তব্ধ বিস্ময়ে ডি. সি. ওর দিকে তাকিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন—আজ তুমি আমার সঙ্গে একটা নতুন স্টাইলে রসিকতা করলে। কিন্তু মনে রাখবে তোমার বিষদাঁত ভাঙার সাঁড়াশি আমি পেয়ে গেছি।

হাসি হাসি মুখ করে বিউটি বলল—তাই বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—বড্ড রেগে গেছ ডি. সি.। আমি একটু কাব্য করে একটা কথা বললাম তাতে এত রাগ কেন ?

—তুমি নিজেই বেশি বুদ্ধিমতী মনে কর। তাই এত দেমাক। কি করে দেমাক ভাঙতে হয় জানি। সেদিন তোমার ভেড়ুয়া স্বামী তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

উনি চলে গেলেন। বিউটি সত্যিই চিন্তায় পড়ে গেল। স্বর্ধটা তখন পঞ্চকোট পাহাড়ের চূড়ার পাটে বসেছে।

ভূতবাংলোতে তখন ভূত নাচছে। জনপ্রাণীশূন্য। চরাচরব্যাপী অন্ধকার। সেখানকার আন্না, খানসামা, বাবুর্চিরাও স্ট্রাইকে যোগ দিয়েছে। চাপরাশিটা প্রাণের ভয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। বিজলির তার কেটে দিয়েছে। শুধু কানে বাজছে দামোদরের গর্জন। দরজা জানালা বন্ধ। মেন গেটে তালা দেওয়া।

মিঃ শ' গেটের মুখে গাড়ি থামিয়ে ডি. সি.-কে বললেন চাবি খুলুন।

একগোছা চাবি নিয়ে উনি গাড়ি থেকে নামলেন। একটা একটা করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। নির্জন বাংলোয় কেমন গা ছমছমে আবহাওয়া।

বিউটি বলল—লোকজন, আলো বাতাস না থাকলে কোনো স্নেহার নেই।

মিঃ শ' বললেন—চাপরাশিটাও কেমন বেইমান দেখ। ওর তো স্ট্রাইক করার কথা নয়। তবু জিউটিতে আসেনি।

ডি. সি. বললেন—ও ব্যাটা পালিয়েছে। এখানে ডিউটি করতে ভয় লাগছে ওয়।

—ননসেন্স।

ডি. সি. জানতেন যে ভূতবাংলোতে বাতি নেই। তাই কয়েকপ্যাকেট মোম-বাতি নিয়ে এসেছিলেন। বড় ঘরটায় চার পাঁচটা জ্বলে দিলেন। বিউটি একটা ডিসে কাছু বাদাম ও চানাচুর এনে দিলো। হুইস্কীর বোতল খুলে তিনটি গ্লাসে ঢেলে ট্রে-তে শাজিয়ে নিয়ে এসে বলল—নি। সেবা করুন।

—ধ্যাক্ ইউ ডার্লিং। আজ তোমাকে কষ্ট করতে হলো।

—নো ডিয়ার। আমি খুব খুশীতে একাজই করছি।

মদ খাওয়া শুরু হলো। দু পেগ খাওয়ার পরই মিঃ শ'য়ের মাথাটা চনমন করে উঠল। বললেন—ইটস এ মিজারেবল ফেলিয়োর ডি. সি.। আমি আপনাদের উপর খুবই ভরসা করেছিলাম।

ডি. সি. বললেন—আমরা চেষ্টার ক্রটি করিনি স্মার। কিন্তু আমাদের সিক্রেট প্রোগ্রাম বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্মই সব বানচাল হয়ে গেল।

—তা জানি ডি. সি.। কিন্তু কি করে গেল ?

—আমি একটা সূত্র পেয়েছি।

—বলুন।

—খুবই প্রাইভেট স্মার।

—এখানে বলতে কি অস্ববিধে ?

তেমন কিছু নয়। তবে কথাটা দুজনের মধ্যে থাকলেই ভালো হয়।

বিউটি বলল—আপনারা প্রাইভেট কথা সারুন না। আমি পাশের ঘরে আছি। ও চলে গেল। দুজনেই চূপচাপ। আরো এক পেগ করে হুইস্কী নিলেন।

ডি. সি. বললেন—যা বলতে চাইছি তা আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু দয়া করে শুনুন এবং বিশ্লেষণ করুন। যেটুকু সংবাদ পেয়েছি তার সঙ্গে আমার আনুমানিক হিসেব যোগ করে বলছি।

মিঃ শ' খুবই মনোযোগী হয়ে বললেন—হ্যাঁ। বলুন।

ডি. সি. মিজের মধ্যে কথাগুলো শুছিয়ে নিয়ে বললেন—স্মার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে মিটিংয়ের দিন গৈরী যে শাড়িটা পরেছিল তা কি চেনেন ?

উনি একটু ভেবে বললেন—চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু কার ? ঠিক খেয়াল হচ্ছে না। অথচ—

—ইয়েস স্মার ! আপনার খুব নিকট উণ্ডম্যানের ?

—ইউ মিন—বিউ।

উনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ডি. সি. শাস্তকণ্ঠে বললেন—ইয়েস স্মার ! অনন্ত বলেছিল কোনো সদাশয়া মহিলা—ইনিই তিনি !

—মাইগড ! কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয় ? ওর মন উচু । সংবেদনশীল । হয়তো গৈরীর ডিসট্রেসড কণ্ডিশন দেখে দিয়েছে ।

—ডিসট্রেসড উত্তম্যান আরো ছিল । ওর চেয়েও নাজেহাল অবস্থা আরো দু-তিনটি মেয়ের ছিল । তাদের দিকে তো নজর যায়নি । আসলে অনন্তর সঙ্গে ওর একটা আন্তরিক সম্পর্ক আছে । আগে খুবই ঘাতায়াত ছিল । ইদানীং দেখা যায় না । কিন্তু গোপন আঁতাত থাকতে পারে । ব্যাপারটা আরো অল্পসঙ্কানের । আরো বিশ্লেষণের । আমি প্রমাণ যোগাড় করছি ।

—ও কে প্রসিড

এ যেন কোষ বিভাজন । মনের পর্দা খুলছে । এর আগে বিউটি কখনোই তার মনের গূঢ় অভিজ্ঞ প্রায় ব্যক্ত করেনি । সে যেন একা । তার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের যাবতীয় ভার তার নিজেরই । এতে কাউকে অংশীদার করতে চায়নি । কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছে জীবনে একজন এমন অংশীদার প্রয়োজন যে তার দরদি ও মরমি হতে পারবে । আপন পৌরুষ দিয়ে নিজের নারীর সম্মান রাখতে না পারুক—তার প্রতি সং থাকবে ।

সন্ধ্যাকালে ভূত বাংলোতে তাকে সরিয়ে মিঃ শ' ও ডি. সি. সাহেবের গোপন আলোচনা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে । ডি. সি. যে তার নামে চুকলি করবে এটা জানা কথা । কিন্তু তার কার্যকলাপের হৃদিশ পাবে কি করে ?

সেই নিয়ে ডি. ডি. সাহেবের সঙ্গে বিস্তার আলোচনা হলো ।

এতদসঙ্গেও ডি. ডি. সাহেব খুশী হলেন । এতদিনে বিউটিকে নিজের কাছে পেয়েছেন । কত দূরে ছিল ও । মনে হতো আসমানের হরী পরী । আজ তার মনের পর্দা খুলে গেল ।

বিউটিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিহিংসার জালায় জ্বলতে । ভালোবাসার আকাজক্ষায় নিজেকে মেলে ধরতে ।

আহা ! বিউটি আজ বিউটিফুল ফুলের মতোই ফুটে উঠেছে ।

এতদিনে নিজেকে নিয়ে গর্ব করার মতো কিছু পেলেন । এবার দেখিয়ে দেবেন তিনি কাপুরুষ নন ।

মিঃ শ' তখন থেকেই ভাবছেন বিউটি তাঁকে বিদ্রো করবে ? নাকি এটা ডি. সি. সাহেবের রটনা ? এটা কি ব্যর্থকাম পুরুষের প্রতিহিংসার প্রচেষ্টা ? মিঃ শ'য়ের বুক পিন ফুটিয়ে বিউটির প্রতি তাঁকে বিরূপ করে তোলা ?

সে ঘাইহোক, বিউটিকে উনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন ।

পরের দিন বেলা দশটার সময় ডি. ডি. সাহেবকে খাদ্যে পাঠিয়ে দিয়ে উনি গুঁর বাংলোতে এলেন । দরজা খুলে বিউটি বলল—কি সাহেব ? এই অসময়ে ?

বিউটির ধরোয়া চেহারাটা মাদকতাময়ী তবে নয় রূপে লাবণ্যবতী তো বটেই । সাহেব তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বড় দুশ্চিন্তায় আছি বিউ ।

উনি সোফাতে বসলেন। বিউটি দাঁড়িয়ে রইল। বলল কেন সাহেব ?

—যা প্রোগ্রাম করছি তাই ভেঙ্গে যাচ্ছে। ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা।

বিউটি একটু চুপ করে থেকে বলল, এটা তোমাদের সাফল্যের সময় নয় সাহেব। ক্বাই চেষ্টা করছো।

—কেন ?

বিউটি একটা চেয়ারে বসে বলল, কয়লা কুঠির ইতিহাসে ঘট সাফল্য তো তোমাদের নামে জমা হয়ে আছে। একবার ওদেরকে সফল হতে দাও।

—তার মানে ? তুমি চাও না যে আমরা সফল হই।

—নিশ্চয়ই চাই সাহেব। তবে তা যেন কল্যাণের পথে হয়।

—তাই বুঝি তুমি আমাদের গোপন খবর ফাঁস করে দিচ্ছে ?

বিউটি চমকে উঠল। কথায় কথায় এতদূর চলে আসবে তা ও ভাবেনি। অথবা ইচ্ছা করেই সাবধান হয়নি।

বলল—কে বলেছে তোমাকে ?

—আমার তো চোখ কান আছে।

—বুঝেছি ডি. সি. সাহেবের রটনা !

—যদি তাই হয়।

—ওর মনোবাসনা জানো ? আমাকে ভোগ করতে চায়।

হুজনেই নীরব। অনেকক্ষণ। মিঃ শ' বললেন—আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—যদি না দিই ?

—তাহলে জানবো ডি. সি.-র অভিযোগ সত্য।

—তখন তুমি কি করবে ?

—তোমাকে ডি. সি.-র হাতেই তুলে দেব।

—আমাকে ডি. সি.-র হাতে তুলে দেবার তুমি কে সাহেব ? কি মনে কর কি ? আমি তোমার কোবালা সম্পত্তি ? নাকি গুদামের মাল ?

মিঃ শ' গুম হয়ে বসে রইলেন ? বিউটি ওর দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আঁছে। অপরিসীম ঘৃণা উপছে পড়ছে তার মুখে।

মিঃ শ' বললেন, আই অ্যাঁম সরি। কথায় কথায় রূঢ়তা বেড়ে গেল। কিছু মনে কোর না বিউ। আমার ভুলটা ভেঙে দাও।

—আমার কিসের দায় ? না কারো গোয়েন্দাগিরি করি। সবাই জানে আমি নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষ। শরীর বিকিয়ে ইনাম পাই। আমার কাছে ডি. ডি., ডি. সি, শ'-র কোনো তফাৎ নেই। তুমি আমাকে ডি. সি.-র হাতে তুলে দেবে কি ? আমি একটা ইশারা করলে ঐ ডি. সি. তোমার কৃক ছুরি বসিয়ে দেবে। জানো সেটা ?

মিঃ শ' ওর হাত ধরে বললেন—রাগ করো না বিউ। শিউ !

—ওর কথায় নেচে বেড়াচ্ছ সাহেব? কতটুকু জানো ওকে? ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। কত সাহেবকে ওর জ্ঞান কাঁদতে কাঁদতে যেতে হয়েছে।

আমি অত খারাপ মেয়েমানুষ নই।

মিঃ শ' ওর রাগ ভাড়াবার জ্ঞান সাধন ভজন শুরু করলেন। ইহাই ছলনাময়ী নারীর কৌশল।

অনেক কলিয়ারীতে স্ট্রাইকের দিনগুলিতে খাদ চালাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু কোথাও সফল হয়নি। সেজন্য বহু গুণ্ডগোল হয়েছে। যে সব কলিয়ারীতে নিরাপত্তা, সুরক্ষা, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি চালু রাখার দায়িত্ব ইউনিয়ন গ্রহণ করেছে, সেখানে কোনো গুণ্ডগোল হয়নি।

তখন একটা কিছু করা যায় কি না তা নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছেন মিঃ চৌধুরী। তিনি ম্যানেজার। কিন্তু মিঃ শ' এমন জবরদস্ত দাবানি দিয়ে রেখেছেন যে প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁর কোনো ইমেজই গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু তাঁর তো একটা দায়িত্ব আছে। এত বড় কলিয়ারীর এত এত লোকজনের দুর্ভোগ, খাদের ভিতর নিরাপত্তার দেখাশোনা করা তো কজন অফিসার দিয়ে চলবার নয়।

মিঃ সরকার ইঞ্জিন চালাবেন। ডি. ডি. সাহেব পাখা চালাবেন, দস্ত মাধব বয়লার চালাবেন, এভাবে দু' একদিন লোক দেখানো কাজ হতে পারে। বেশী দিন চলতে পারে না।

সেজন্য তিনি ইঞ্জিনীয়ার ও অ্যান্ডিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে মিঃ ভার্মার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি মিঃ চৌধুরীর বক্তব্য সমর্থন করে বলেছিলেন—ইউ প্রসিড।

তাই সেদিন মিঃ চৌধুরী ও মিঃ সরকার অফিসারদের একটা গোষ্ঠীকে নিয়ে মিঃ শ'য়ের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

মিঃ সরকার বললেন—আফটার অল কলিয়ারীর সামগ্রিক স্বার্থে ইউনিয়নের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া খুব দরকার।

মিঃ শ' উষ্ণভাবে বললেন, সে কথা আমিও বুঝি। কিন্তু ইউনিয়ন মানেই স্মিত চ্যাটার্জীর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা, কালকার ছেলে অনন্তের ধমকি এবং তার ভালগার বউটার হাতনাড়া আর চিলচিংকার। উঃ অসহ।

আই ক্যানট স্ট্যাণ্ড।

মিঃ চৌধুরী বললেন, আপনার সেক্টিমেন্ট আমরা ফিল করি স্যার। কিন্তু এই জ্ঞান কি কলিয়ারী বরবাদ হবে?

উনি ফ্রুঙ্ক ভব্বীয়েত বললেন, ছাট ইন্স মাই বিজনেস।

—আবারও দায়িত্ব আছে সারা কৌশলীরাতে কোনো একসিডেন্ট হলে,

মাইনস ডিপার্টমেন্ট আমাকেও ছাড়বে না। আইনত আমিও সেজ্ঞা দায়ি অথচ স্বাভাবিক কাজ চালাবার ক্ষমতা আপনি আমাকে দিচ্ছেন না।

—কারণ আপনি আমার কাছে নিজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দায় দায়িত্ব প্রমাণ করতে পারেননি। শুরু থেকেই বড় কেলাস অ্যাণ্ড হোপলেস।

মিঃ শ'য়ের এত উম্মার পরেও নার্ভাস হননি বা মেজাজ হারাননি। শাস্ত কঠে বললেন, আপনার কথা বড়ই আপত্তিকর। আমি তার প্রতিবাদ করে বলছি আপনার হামবাগ গৌয়াতু'মির কারণেই আমি চুপ চাপ থাকতে বাধ্য হয়েছি। না হলে আমি শো রান করতে পারি।

মিঃ শ' ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আই সি! আপনি ইউনিয়নের ছোকরাদিকে তেল দিয়ে কাজ চালাতে চান নাকি?

—তেল দেবার কি আছ? তাদের সঙ্গে কড়িয়ালি মিটিং করতে পারি।

—আপনার কি ধারণা ঐ অবাধ্য লোকগুলিকে আপনি বোঝাতে পারবেন?

—আশা করি।

—ও কে। ওদেরকে ডেকে পাঠান।

কিন্তু অনন্ত তখনো হাসপাতাল থেকে ফেরেনি। ওকে ছাড়া অগ্র নেতারা আসতে চাইলেন না। হরিহর গান্ধী আরো পরিষ্কার করে বলে পাঠালেন—এজেন্ট সাহেবের সঙ্গে আমরা কোনো মিটিংয়ে বসব না। ম্যানেজার যাদ নিজের দায়িত্বে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তবে যেতে পারি।

মিঃ শ' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে বললেন, দেখলেন কেমন তামাশা।

মিঃ সরকার বললেন, একবার। আপনি আমাদের একবার ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলতে দিন স্মার। আমরা এমন কিছু করবো না যাতে আপনার সম্মান ক্ষণ হয়।

ও কে।

উনি উঠে চলে গেলেন ভূতবাংলোয়। তাঁর পিছনে পিছনে চললেন অমুগত চাটুকার ডি. সি. সাহেব। ডি. ডি. সাহেব রয়ে গেলেন। কারণ খাদের নিরাপত্তার জঙ্ক সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম ইনিই করছেন।

সেই প্রথম ইউনিয়নের সঙ্গে মিটিং হলো মিঃ শ'কে বাদ দিয়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে জরুরী কাজ অবিলম্বে চালু করা হবে। বয়লার, ইঞ্জিন, ফ্যান, বাতিঘর, খাদের মাইনিং, ওভারম্যান, বিজলি মিস্ত্রী, ফিটার মিস্ত্রি, এম্বুলেন্স, ডাক্তারখানা, জল, বাতি সব চালু। শুধু প্রোডাকশন ও ডেসপ্যাচ বাদ দিয়ে ম্যানেজার যে কাজের জঙ্কলোক চাইবেন তাই দেওয়া হবে।

এতদিন পর একটা মিটিং সফল হলো।

অনন্ত বলল, স্মার। আমরাও তো চাই না যে জরুরী কাজ বন্ধ হয়ে থাক।

সারা কলিয়ারীতে অঙ্ককার ঢেকে আছে। আমরা রাত্রে ডিউটি করি। দেখি নিশ্চাপ যন্ত্র-জগৎ। নিজেদেরই খারাপ লাগে।

এই একটি সিদ্ধান্তে সারা কলিয়ারীতে স্বস্তির হাওয়া বয়ে গেল। একটা দমফাটা গুমোট অবস্থার অবসান হলো। প্রত্যেকটি মানুষের প্রাণান্তকর দুর্দশা। ধর্মঘটের দরুন সৃষ্ট এই দিকটার কথা কেউ আগে ভাবেনি।

ফ্যানের একটানা গৌঁ গৌঁ শব্দ, পাশ্পের ডেলিভারি পাইপ থেকে জল পড়ছে গর গর করে, সন্ধ্যাকালে বাতি জলে উঠল! চির পরিচিত দৃশ্য ও শব্দ হারিয়ে যাওয়াতে প্রাণ আনচান করছিল।

মিঃ শ' মোমের আলোতেই মত্তপান শুরু করেছিলেন। মাথা ঝিম ঝিম করার অবস্থায় পৌঁছে গেছেন। হঠাৎ ভূতবাংলোর বাতিগুলো জলে উঠল।

ডি. সি. সাহেব বললেন—বাঃ, আজ বাতি জলছে।

মিঃ শ' বললেন—এতে আপনার খুশী হবার কোনো কারণ নেই ডি. সি.।

—স্মার!

—বুঝতে পারছেন না এইভাবে আমার মুখে খাপ্পর মারা হলো।

ডি. সি. সাহেব ওর কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। আর একটু পরে পিণ্ডন মারফৎ মিঃ চৌধুরীর মেসেজ এল—ম্যাটার সেটেলেড। ইমারজেন্সী অপারেশন রেসটোরড।

চিঠিটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডি. সি. সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ননসেন্স! ব্লাডি চৌধুরী এই সেদিন ফাস্ট ক্লাশ পাশ করে আজ ডিপ্লোম্যাট বনে গেল। আমাকে আউট করতে চায়। আমাকে ছাড়াই মিটিং সাকসেসফুল! এ্যাজ ইফ আই য়াম এ ফুল!

স্তোক বাক্যের মতো ডি. সি. সাহেব বললেন—ওকে টাইট করতে কতকম স্মার। কাল অফিসে গিয়ে একটা ছক্কার দেবেন তো, সবাই থরহরি কম্পমান হয়ে যাবে।

—কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঋণ নেই। আপনি এখুনি যান। আজ রাত্রেই অ্যাকশন চাই।

—আমার সব রেডী স্মার। অর্ডার পেলেই হলো।

—ও কে। উইশ ইউ গুড লাক।

মদের গ্লাস তুলে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

ডি. সি. সাহেব চলে গেলেন। মিঃ শ' একা। একবার ভাবলেন বিউটিকে ডেকে আনবেন। তারপরই মনের পরিবর্তন হলো—না। আজকের দিনটা একাই থাকি ভূতবাংলোতে ভূতের মতো।

সত্যি কি আমি ভূত হয়ে গেলাম? মিঃ চৌধুরী এত সাহস কোথায়

পেলেন যে আমার মুখের উপরে কথা বলেন। কোন উপরগুলার মদত আছে ওর পিছনে? অথবা কলিয়ারীর সব অফিসারই এর পিছনে আছে? এ বড়যন্ত্রের নায়ক কে? বিউটি কি সত্যিই বেইমানি করতে পারে? কিন্তু তা কিসের স্বার্থে? ওকে আমি কি না দিয়েছি? টাকা, শাড়ি, গয়নায় মুড়ে দিয়েছি। এত পাওনা আর কার কাছে পাবে?

তবে কি এটা ডি. সি.-র চাল? আমার মন ভাঙাতে চায়? বিউটিকে ও অনেক দিন থেকে চাইছে? তাছাড়া ওর অল্পমানের পিছনে প্রমাণ কই?

হঠাৎ একটা গাড়ি ছুটে এল। তা থেকে নামলেন মিসেস শ'। পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই উনি চমকে উঠলেন। ঢুলু ঢুলু চোখ তুলে বললেন—হ্যালো! তুমি?

—তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম তো।

—ওঃ ইয়েস!

মিসেস শ' বসতে বসতে বললেন—তুমি একা কেন? তোমার সাক্ষোপাঙ্গরা কোথায়? তোমার সেই উত্তম্যান কোথায়?

কি রকম ক্লান্ত ও হতাশ ভঙ্গীতে উনি বললেন—ওদেরকে আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারছি না। সব বেইমান। হাজার হাজার টাকা খরচ করে ওদের মদ খাওয়ালাম, ফ্রি সেক্স, ফ্রি লাইফের চার্জ দিলাম। কিন্তু কাজের সময় এভরিবডি কাট এ সরি ফিগার। অল ওয়ার্থলেস!!

মিসেস শ' ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—আমি তোমার টেনশন ফিল করি ডিয়ার। সেজন্য বাইরে মন রাখতে পারছি না। একবার শপে গিয়ে ফিরে এলাম।

মিঃ শ'য়ের হৃদয় বলে কিছু থাকলে তখন তা মূচড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু ওরা তো দো আঁসলা ফরেন মাল! মুখের ভাবে কিছুই বোকা যায় না।

মিসেস বললেন—বাংলোয় চলো ডিয়ার। একটা সন্ধ্যা তোমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কাটাতে। তাদের সঙ্গে ডিনার খাবে। ওরা খুব খুশী হবে।

—ও কে।

ভূতবাংলোতে চাবি দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন।

সে রাতটা ছিল স্বস্তির রাত। সাতটা দিন রাত্রি অবিরত উৎসব, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটিয়ে লোকজন টান টান হয়েছিল। একটি সিদ্ধান্ত তার মধ্যে স্বস্তির হাওয়া ও বাতি আলার কারণে কেমন একটা প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। সেই সঙ্গে শরীর-জুড়ে এসেছিল ক্লান্তি। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।

অনন্ত বাসায় এল রাত সাড়ে নটায়। এসেই গৈরীকে তাড়া দিলো জলদি ভাত দে। আমাকে আবার একবার কলিয়ারী যেতে হবে।

—কেন ?

—কোয়ার্টারে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের পাম্পটা খারাপ আছে। মেরামত চলছে।

—তবে আবার যাবে কেন ? তুমি ছাড়া লোক নেই ?

—থাকবে না কেন ? চৌধুরী সাহেব নিজেই দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এতদিন পরে কোয়ার্টারে জল সাপ্লাই হবে তার শেষ দেখবো না ? এও তো একটা খুশী রে ! ভাবিস না আজ নিশ্চয় ঘরে থাকবো।

স্ট্রাইকের প্রথম দিনটি থেকে ও রাত্রে ঘরবাস করেনি। চব্বিশ ঘণ্টা কলিয়ারীতে ডিউটি দিয়েছে। বাতিঘরে ইউনিয়ন অফিস খুলেছে। সেখান থেকেই সব কাজকর্ম কনট্রোল করছে। স্বেচ্ছাসেবীরা পালি করে ডিউটি দেয়। ও নিজে লাগাতার পড়ে আছে।

দিনে রান্না হয়েছিল বেলা তিনটের সময়। গৈরীর মা এক হাঁড়ি ভাত সিদ্ধ করে রেখেছিল। সেই কড়কড়ে ভাত, একটু ডাল ও কচুর ঘ্যাঁট দিয়ে সপাসপ একখালা ভাত গিলে উঠোনে হাত ধুয়ে চলে গেল।

ভাইবোনদের খাওয়া হয়েছিল। তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। হেনী ঘরে বিছানা পাতছে। গুলু চরিতরের সঙ্গে চবুতরায় বসে গাঁজা টানছে। গৈরী একাই অনন্তর খালাতেই ভাত তরকারির যা অবশিষ্ট আছে সব ঢেলে নিয়ে বারান্দায় খেতে বসেছে। বিপ্লবকে পাশে শুইয়ে রেখেছে। হাতের নাগালের মধ্যে। যাতে কাঁদলেই গায়ে হাত দিতে পারে। ছেলের মায়ের কত হাপা।

ওরও চোখ জুড়ে ঘুম আসছিল। কিন্তু আজ অনন্ত আসবে। তাই ভিতরে একটা উত্তেজনা গুর গুর করছে। অগ্ৰমনস্কভাবে খাচ্ছিল ! হঠাৎ পায়ের শব্দ পেয়ে তাকাল। দুজন শ্রমিক।

জিজ্ঞাসা করল অনন্তবাবু কাঁহা ?

—কলিয়ারীমে।

—আন্ডি দেখা ঘরমে আয়া।

—আন্ডি চলা গিয়া।

—শালী। ঝুট কহতী হো।

অন্ধকার ফুঁড়ে তৃতীয় একজন গর্জন করে ওর দিকে এগিয়ে গেল। গুকে দেখেই গৈরীর মুখের গ্রাস হাত থেকে পড়ে গেল। এঁটো হাতেই বিপ্লবকে জাপটে ধরে চিংকার করে উঠল—বাপু।

লোকটি ওর উপরে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে নীচে নামাল।

গৈরী আরো জোরে চিংকার করল বাপু—বাপু—

একজন ঝটু করে মুখ চেপে ধরল। আরেকজন হাঁচকা মেরে বিপ্লবকে কেড়ে নিল। গৈরী প্রাণপনে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। হেনী ঘরের ভিতরে চিংকার করছে।

একজন বলল, শালী। রাণ্ডিকো লে চলো।

গৈরীর বুকের রক্ত জল হয়ে গেল—এ যে রবিলাল।

কোথা থেকে একমুহূর্তের জ্ঞান শরীরে এসে গেল আত্মরিক শক্তি। এক ঝটকায় লোক দুটোর হাত ছাড়িয়ে লাফ মেরে বারান্দায় উঠল। তৎক্ষণাৎ বোম চার্জ হলো লক্ষ্য করে। ঝলস ঝটা আগুন আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠল—আ। বা—পু—

তবু সে ঘষটে ঘষটে দরজার কাছে পৌঁছাল। হেনী দু'হাত বাড়িয়ে ওকে ঘরের মেঝেতে টেনে নিল। বোম পড়ল এদিক ওদিকে। বারুদের গন্ধে রক্ত বমি হলো।

তখন চারিদিকে বোমা ফুটছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধকার। হারিকেনটি উল্টে গড়িয়ে গেছে উঠানে। সেখানে কেরোসিন তেলে আগুন জ্বলছে। ভীষণ হৈ হুল্লা। ছুটে আসছে লোকজন। পর পর বন্দুকের গুলি। ব্যস। তারপরই বোম বারুদের খেল খতম।

সব মিলিয়ে দেড় বা দুমিনিট। একটা সংসার ছারকার করে দিয়ে গেল। সবার আগে ছুটে এসেছিল গুলু ও চরিতর। তারপর বৈশাখী। তখনো ধোঁয়া কাটেনি। আবছা অন্ধকারে দেখল গৈরী উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার শরীরের অর্ধেকটা ঘরের মেঝেতে। অর্ধেকটা বারান্দায়। কোমরটা চোঁকাটের উপর। ভীষণ গৌঁ গৌঁ করছে।

হেনী ঘরেই কাত হয়ে পড়েছে। সে গৈরীকে টেনে ঢোকাবার সময় বোমের ছিটকনা পেয়েছে। স্বরেশ, মহেশ ও চম্পাও বোমের ছিটকনা পেয়েছে। গৈরীর সর্বাঙ্গ জলে গেছে। পিটের দিকেই বেশী। মুখ খুবড়ে বুকের উপর পড়েছিল বলে সামনে দিকের আঘাত বোঝাচ্ছে না। সবাই গোঙাচ্ছে বিপ্লবের কোনো চিহ্ন নেই।

গুলু হায় হায় করে উঠল। চরিতর মাথা চাপড়াতে লাগল। চারিদিক থেকে পিল্ পিল্ করে ছুটে আসছে। সব ধাণ্ডার লোক মুনীয়া ধাণ্ডার দিকে। অনন্ত দুটো এন হাঁস ফাঁস করতে করতে। গৈরীকে দেখে আর্তনাদ করে উঠল।

গৈরীর মুখে ফ্যানা ভাঙছে। বমি, রক্ত ও লালায় লেবড়ে গেছে মুখটা। হাত দিয়ে মুখটা মুছে দিয়ে বার বার ডাকতে লাগল—গৈরী! গৈরী!

যে অনন্তর একটা ডাকে গৈরীর তাবৎ ভুবন আলোয় আলোকিত হয়ে উঠত সে গুর ডাক শুনে সারা দিলো না। অনন্তর গলা ভেঙে গেল। কেমন অদ্ভুত

ভঙ্গী করে চিৎকার করল ডাক্তার। ডাক্তার ডেকে আনো। ওর কাছে বসে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বৈশাখী একটা কাপড় ঢাকা দিলো গৈরীর উপর।

কিন্তু বিপ্লব কোথায়? চিৎকার করে উঠল অনন্ত—বিপ্লব!

হেনীর জ্ঞান ফিরছিল। সে বলল—উ-লোগ ছিন্লিয়া। ববিনাল বাকেলাল আউর আদমী।

হা-হা শব্দে হাহাকার করে উঠল—হে ভগবান। স্বী-পু-তুটোকেই শেষ করে দিলে?

হরিহরকে দেখে পাগলের মতো ওকে ধরে বলল—হরিহর। জলদি কর। ডাক্তার ডাক। এম্বুলেন্স ডাক। গৈরীকে হাসপাতালে নিয়ে চল।

হরিহর বলল—আপনি শান্ত হোন অনন্তবাবু। রাজকিশোরবাবু গাড়ি আর ডাক্তার ডাকতে গেছে।

—কিন্তু আমার বিপ্লব। তাকে যে খুঁজে পাচ্ছি না।

—সে কি?

—হাঁ রে ভাই! আজ আমার সব ফুরিয়ে গেলো।

বিকৃত কণ্ঠে কঁদে উঠল ও। হরিহরবাবু ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—হিন্মৎ রাখুন অনন্তবাবু। এটা কাঁদবার সময় নয়।

—হা-হা আমি কিছু ভাবতে পারছি না রে ভাই!

বলতে বলতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ভীষণ অস্থিরতায় ছট ফট করছে। মাঝে মাঝে উঠে বসে চিৎকার করছে—গৈরী! বিপ্লব!

ওর সেই বুকফাটা ডাক শুনে পাথরও ফেটে চোঁচির হয়ে যাবে।

হরিহরবাবুর হাত ধরে বলল—দাদা! কত দুঃখের সংসার আমাদের। গৈরীকে পেট ভরে খেতে দিতে পারতাম না, পরনের কাপড় জোঁটাতে পারতাম না। তবু তো সব কিছুকে তুচ্ছ করে ঐ একটি শিশুর মুখ চেয়ে আমরা বেঁচে ছিলাম। এক লহমায় ভেঙে গেল। এবার কি নিয়ে বাঁচব।

মুখ গুঁজে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।

এত লোক জমেছিল যে রাস্তা পর্যন্ত জ্যাম। সেই ভিড় ঠেলে রামজী এল কোলে মৃত বিপ্লবকে নিয়ে। সর্বাঙ্গ খেঁৎলে গেছে। মাথাটা ছাতু। পাথরে আছড়ে মেরেছে। এমন মালুষ ছিল না যে সেই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠেনি। সবাই হায় হায় করে উঠল। বিভিন্ন কণ্ঠে বিভিন্ন রকম শব্দ। কারো ক্রোধ, কারো হুঁকার, কারো অহুতাপ, কারো শোক। সব মিলিয়ে শোক, দুঃখ ও ক্রোধের ভয়াবহ গর্জন।

মৃত শিশুকোলে দাঁড়িয়ে আছে রামজী। তার মুখে রা নেই। ঠোঁটগুলো নড়ছে। সারা গা ঠক ঠক করে কাঁপছে।

একদিকে গুলু অল্পদিকে অনন্তর জ্ঞান বৃদ্ধি লুপ্ত। ওরা বোধের সীমা অতিক্রম করে গেছে। অসহনীয় যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত ওরা।

গাড়ি ও ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার আনবার ব্যবস্থা করে রাজকিশোরবাবু এলেন।

উনিই বললেন—রামজী। ওকে এক-পাশে শুইয়ে ঢাকা দাও। অনন্তকে দেখিয়ে না।

রামজী ওকে নিচে নামাতেই বৈশাখী ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সঙ্গে সঙ্গে কুস্তী ফাস্তনী ও আরো কয়েকটি ছুনিয়া মহিলা। তাদের যত কান্না তত বিলাপ। বুক চাপড়াচ্ছে। টেনে টেনে চুল ছিঁড়েছে; ঘন ঘন মাথা ঠুকছে।

রামজী বলল—গৈরীকা লেড়কা। হম লোগকো জান। শালা দুঘমন ছিনলিয়া।

ইউনিয়নের নেতারা সবাই এসেছিল। তারাই চেষ্টা করে ওখান থেকে লোকজন সরিয়ে ভিড়টা পাতলা করল। ছুনিয়া পাড়া শোকের তীব্র আঘাতে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

রবিলাল! বাঁকেলাল!

ছুটি নাম ওদের বৃকে ফার্নেসের মতো জ্বলছে। ওদের কলিজা ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। ওদের ক্রোধ এবং বিলাপের ধ্বনি শুনে অনন্ত বেরিয়ে এল। একজায়গায় অনেকগুলি মেয়ে জড়ো হয়ে কাঁদছে। রামজী বুক চাপড়াচ্ছে।

অনন্ত ওকে ধরে বলল—বোল-বোলরে রামজী—কাঁহা মেরে জান?

রামজী পাগলের মতো কঠম্বরে বলল—খতম হোগয়া হো-হো—

জাস্তব আক্রোশ ও স্মৃতির বেদনার মিলিত আক্ষেপে প্রায় ভেঙে পড়ল। বলতে লাগল—জ্ঞানসে পেয়ারা মেরে বহিন খাঁহা গয়ী হম সাথমে থা। কিসীকো হিন্মৎ নেহী ছয়া উস পর হামলা করনেকা। কোন জানতা শালা লোক ঘরমে আ-কর খতম করে গা। হমলোক বুড়বক ছায়—বেয়াকুব ছায়। ঘর সামহালনেকা তাকং নহী ছায়।

ওর দিকে একটুকু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে মেয়েগুলির কাছে ছুটে গেল। হমড়ি খেয়ে পড়ল বিপ্লবের উপর। একদিকে বৈশাখী অল্পদিকে কুস্তী ওকে টেনে তুলল। রক্তমাখা, মাথাভাঙা শিশুটিকে দেখে বিকটভাবে চিৎকার করে উঠল ও।

বৈশাখী বলল—এমন কোর না জামাই। তুমিই যদি পাগল হয়ে যাও তবে আমরা কি করব?

রাজকিশোর ও হরিহর দুজনে ধরে ওকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল—অনন্তবাবু। আপনি ছোটোছোটো কুরবেন না। আমরা কি অস্ত্র আছি? সব দেখছি—ওরা ওকে বসিয়ে দিয়ে অস্ত্রাস্ত্র নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করছে। তখন

ছুটো জলন্ত উষ্কার মতো এল জগদীশ ও হরেরাম । ওরা খাণ্ডার ছিল না ।
হুনিয়া মোড়ে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে ।

ওদেরকে দেখেই শ্রমিকরা ক্ষেপে উঠল । উচ্চকণ্ঠে বলল—ইয়ে কাম হ্যার
শালা এজেন্ট সাহাবকো । উসীনে বীকেলাল-রবিলালকো ফিট কিয়া । চল—
শালেকো বাংলা উড়া দেঙ্গে ।

প্রবল কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো, এজেন্ট সাহেবকে খতম করো ।

খতম করো, হালাল করো, খুন পিয়েগা, ভবড়ী নিকাল দেগা ইত্যাদি শব্দ
সহযোগে রীতিমতো শ্লোগান উঠে গেল ।

তেরা মাকো, বহিনকো, জরুকো বেটীকো অশ্লীলতার চরমতম শব্দগুলির
প্রয়োগ চলতে লাগল উন্নতভাবে ।

নেতাদের কাছে এও এক সমস্যা । একদিকে নিহত, আহত ও শোকার্ত
পরিবার, অগ্নিদিকে ক্ষিপ্ত জনতা । অনেক নেতাও তাদের সঙ্গে চিৎকার
করছে ।

জগদীশ ও হরেরামের নেতৃত্বে একটা দল অস্ত্র শস্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ।

একি হলো ?

নেতাদের মধ্যে হরিহর, রাজকিশোর, নগেন তখনো খৈর্খচাত হুনি । তারাই
ছুটে গিয়ে জোড়হাত করে দাঁড়াল ।

—ভাইসব । তোমরা কি ক্ষেপে গেছো ? নারীঘাতী, শিশুঘাতী
এজেন্ট সাহেবের বিচার একদিন হবেই । তোমরা কেন নিজের হাতে আইন
নেবে ?

জগদীশ গর্জন করে উঠল শালালোক নেতা হুয়া । শাস্তি মাংতা ? হার্টো
হমলোগ বদলা লেগা, খুনকা বদলা খুন ।

—ভাই রুখ যাও ।

—নেহী । ইয়ে মেরা খানদানকো বেইজুং । যবতক খুন নেহী পিয়েগা
তব তক বরদাস্ত নেহী হোগা ।

ধাক্কা দিয়ে ওদেরকে সরিয়ে দিলো ।

রাজকিশোর ছুটে গেল অনস্তর কাছেই ।

ও তখন মাথা ঠুকছে—এখনো গাড়ি এল না কেন ? ডাক্তার এল না কেন ?

উনি থাকলে তো আসবেন । মিঃ শ' যেদিন হাসপাতাল বন্ধ করে দিলেন
সেদিনই তাঁর অভিমানে ফ্যামিলি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন । আজ তাঁর কাছে
খবর গেছে কাল হয়তো এসে পড়বেন ।

রতন চক্রবর্তী ও মানিক দাস কম্পাউণ্ডার এলেন গুড্বেক তুলো ব্যাণ্ডেজ
ও গুধুপত্র নিয়ে । ফার্স্ট এড দেবার জন্ত গায়ের ঢাকা খুলেই শিউরে
উঠলেন ।

ওর শায়া শাড়ি পুড়ে গেছে। পোড়া গা, পোড়া কাপড়, দগদগে রক্তমাংস চোখ মেলে দেখা যায় না। তবে দেহে প্রাণ আছে। দারুণ প্রাণশক্তি মেয়েটার। বোম খাওয়ার পর ঘষটে ঘষটে বারান্দা পেরিয়েছে। না হলে প্রাণের স্পন্দন থাকতো না। বোমের মুখে উড়ে যেত। এমনতেই খাবলা খাবলা মাংস উড়ে গেছে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে।

—তোমাকে এখনি যেতে হবে। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

—কি বাকী আছে ?

বহুত বাকী আছে। লেবাররা ক্ষেপে গেছে। ওরা ডি. সি. ; ডি. ডি. আর এজেন্ট সাহেবকে খতম করতে যাচ্ছে। আমরা ঠেকাতে পারিনি। তুমি চল।

—আমার বিপ্লব ? আমার গৈরী ?

—ঈশ্বরের ভরসায় ছেড়ে দাও অনস্ত। হালত এত খারাপ যে ওদেরকে না আটকাতে পারলে কলিয়ারী খুনে লাল হয়ে যাবে।

অনস্তর মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। আমার স্ত্রী পুত্রের খুন নিয়েও শাস্তি হলো না রাক্ষসী কলিয়ারীর। চল আমি যাবো। আমি যে নেতা।

যে অনস্ত একটু আগে শোকে ভেঙে পড়েছিল সে আবার ছুটে গেল উন্নত জনতার সামনে। জোড় হাত করে দাঁড়াল। হুঁচোখে দর দর অশ্রুধারা। চুল-গুলো ফর ফর করে উড়ছে। মুখে রক্ত লেগে আছে। বিপ্লবের রক্ত। গায়ে পোড়া কাপড় লেগে আছে। গৈরীর কাপড়। হাত পা কাঁপছে।

ক্ষিপ্ত শ্রমিকের দল শুরু। জগদীশ ও হরেরামের হাতের উত্তত হাতিয়ার আস্তে আস্তে নেমে গেল। ওরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

জগদীশ বলল, ক্যা তুম আদমী হো ইয়া পাথর ? আপনা বিবি বাচ্চাকো খুন তোমহারা দিলমে চোট নেহী দিয়া।

অনস্ত বলল, তাই কি না হয় দাদা। যে তোমাদের বোন সে আমার স্ত্রী। যে তোমাদের ভাগনে সে আমার পুত্র। এখনো একটা গাড়ি পেলাম না হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ডাক্তার বাবু নেই। কম্পাউণ্ডাররা চিকিৎসা করছেন। তবু আমি বলতে এসেছি আমাদের শাস্তিপূর্ণ আন্দোলনে আমার স্ত্রী পুত্রের রক্তপাতটাই যেন শেষ রক্তপাত হয়। আর রক্ত ঝরিয়ে না। আমার শ্রমিক ভাইদের সংসার আছে। স্ত্রী পুত্র আছে। ওঁদের হাতেও বন্দুক রাইফেল আছে। ক্ষিপ্ত জনতার মোকাবিলা করতে ওরা গুলি করবে। পুলিশ এসে সর্বনাশ করবে। তখন কি হবে ?

ভাইসব ! আমার মৃত পুত্রের দিব্যি রইলো তোমরা আর এগিয়ে না। আমি বলছি শাস্তির পথেই আন্দোলন সার্থক হবে।

এরপর শ্রমিকদের কারো পা চলল না। বৃকের ভিতর প্রচণ্ড আক্রোশ গর্জন

করতে লাগল। চোখ থেকে আগুন ঝরল। রক্ত মাংসের শরীর ভূমিকম্পে
তাড়নায় কম্পিত হলো। তবু কেউ অনন্তর মৃত পুত্রের দিব্যি পায়ে ঠেলতে
পারলো না।

বাষট্টি

গৈরীর শরীরে অজস্র পাথরকুচি মাংস ভেদ করে ঢুকেছে। জাহ্নু ও পিঠের মাংস
উড়ে গেছে। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। প্রাণফাটা আর্তনাদ করছে। ছুঁজন
কম্পাউণ্ডার বহু চেষ্টায় পাথরকুচি বের করে বার্নল দিয়ে ড্রেস করলেন। যেসব
জায়গার মাংস উড়ে গেছে তাও ড্রেস করলেন। এ টি. এস. এবং পেনিশিলিন
ইন্জেকশন দিলেন।

ও ছাড়াও সুরেশ, মহেশ, হেনী ও চম্পার গায়েও বোমার ছিটে লেগেছিল।
তাদেরকেও ফার্স্ট এড দিলেন।

জল তেষ্টায় গৈরীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। ছ'বার রক্ত বমি করেছে। কি
জানি পেটের ভিতর কিছু হয়েছে কি না? আছাড় খেয়ে পড়ার দরুন মুখটা
ফেটে গেছে। দাঁত নড়ে গেছে। সারা মুখে রক্ত।

কম্পাউণ্ডার বললেন—এখনো যদি হাসপাতালে দেওয়া যেত তবে হয়ত গৈরী
বঁচে যেত।

কিন্তু গরীব লোক গাড়ি পাবে কোথায়? সাহেবদের অত গাড়ি। ওদের
জন্ত একটাও নেই। সাইকেল নিয়ে লোক গেছে শেরগড়ে।

অনন্ত তখন শুদ্ধ। যাবতীয় হৃদয় বেদনা বৃকের ভিতর বরফের মতো জমে
যাচ্ছে। সে এক নিদারুণ মানসিক অবস্থা। মাটিতে বসে পড়ল।

আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমেছে। কাল বয়ে যাচ্ছে অনিবার্ঘ গতিতে। তিন
চার ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। গৈরী গৌঁ গৌঁ করছে। আর বুঝি বাঁচার কোনো
উপায় নেই।

যে ছোকরা ছুটি গাড়ি আনতে গিয়েছিল তারা একটা জীপ গাড়ি নিয়ে এল।
মিলিটারী আমলের জোকা জীপ। পিছনের সিটে গৈরীকে উপুড় করে শোয়ালো।
অনন্ত ধরে রইল। সামনের সিটে বসলেন হরিহর ও রাজকিশোর। জীপ
চলতে লাগল ষড় ষড় শব্দে।

শেরগড় হাসপাতালে যখন পৌঁছাল তখন রাত দুটো। হাসপাতালের
অ্যাটেনডেন্ট পেসেন্টের নাম লিখতে যখন শুনল ওয়াইক অফ অনন্ত শর্মা তখন
তার কলম বন্ধ হয়ে গেল।

হুঃখ প্রকাশ করে বলল—এ পেসেন্ট তো জড়ি হবে না। কড়া নিষেধ।

অনন্ত নিজেই মাথা ঝুঁকল—ওহো! এই কথাটা তো মনে ছিল না। কান্না হাসপাতালে চল। কিন্তু ওখানেও তো ম্যানেজারের সহি করা চিঠি চাই।

রাজকিশোর বললেন—তাহলে? কি উপায়?

—আমরা তো বরখাস্ত কর্ণী। কয়লা কুঠির হাসপাতালে চিকিৎসা পাব কেন? আসানসোল গভর্নমেন্ট হাসপাতালে চল।

আবার জীপ চলল। গভর্নমেন্ট হাসপাতালে পৌঁছাল ভোর রাতে। কি আক্ষশাস! যে মাহুঘটা কয়লা কুঠির শ্রমিকদের জন্ত প্রাণ বিপন্ন করল পুত্র বলি দিলো সে তার পোড়া, ছেঁড়া, বোমা বিধ্বস্তা মুমূর্ষু স্ত্রীকে কয়লা কুঠির হাসপাতালে ভর্তি করার স্থান পেল না!

সেখানে ওকে ভর্তি করা হলো। গৈরীকে নিয়ে গেল ইমারজেন্সীতে।

রাজকিশোর বললেন—এবার কি করব অনন্ত?

—কলিয়ারীতেই ফিরে যেতে হবে।

—ভূমি থাক। আমরা ফিরে যাই।

—না রে তাই। কলিয়ারীতে হৈ হৈ পড়ে গেছে। কখন কি হবে কে বলতে পারে? পুলিশ, দারোগা, লীডার কত কি সামাল দিতে হবে। জগদীশ ভাইয়ের মাথার পোকা নড়ে গেলে আরো বিপদ। চল। ভাগ্যে থাকলে গৈরী বাচবে। ওকে ঈশ্বরের হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাই। তাছাড়া বিপ্লবের সংকার করতে হবে তো।

ওরা আবার জীপে চড়ল।

কেউ চুপ করে বসে নেই। সেই রাতেই খবর চলে গেছে পুলিশ, দারোগা, এম. ডি. ও., এ. ডি. এম., কোম্পানির চীফ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, চীফ পারসোন্সাল ম্যানেজার ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কন্ট্রোল রুমে, নেতাদের কাছে। ওরা ট্রাঙ্ককলে চীফ মিনিষ্টারকে আবেদন করেছেন। টেলিগ্রাম হয়েছে প্রাইম মিনিষ্টার, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, শ্রম দপ্তর ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে।

অভিযোগ করা হয়েছে—ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানির দালাল এজেন্ট সাহেব ভাড়াটিয়া গুণ্ডা রবিলাল ও বাঁকেলালকে দিয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারী অনন্ত শর্মার বাসায় আক্রমণ করিয়েছে। তার শিশুপুত্রকে পাথরে আছড়ে হত্যা করেছে। তার বোমা বিধ্বস্তা স্ত্রীকে শেরগড় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি।

অনন্তরও ইন্তেকাল হয়ে যেত যদি সে আবার বাসা ছেড়ে বাইরে না যেত। প্যান প্রোগ্রাম সেইরকমই ছিল। কিন্তু রাখে হরি মারে কে?

পুলিশ এসেছিল ভোররাতে। ওরা তো জানে কলিয়ারী এখন অগ্নিগর্ভ। জীপে চড়ে হুঁপাচলন পুলিশ কোর্স নিয়ে রাজিকালে ঘাওয়ার বিপদ আছে। তাই কোর্স শক্ত না করে আসতে চান না।

কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ছিল না। গুলু, চরিতর, কিষণ ও

সুনিয়া মেয়েগুলি যেখানে সেখানে পড়ে কাঁদছিল। বিপ্লবের লাশ ঢাকা দেওয়া ছিলো। লোকজন চারিদিকে ভিড় করে আছে। সবারই মুখ শুকিয়ে গেছে। গুলু তখন পাগল। ওর ছেলেরাও আক্রান্ত। হেনী খাবি খাচ্ছে। ছোট মেয়েটি কঁদে কঁদে নেতিয়ে গেছে। বাকী সবাই হাসপাতালে, জবানবন্দী কে দেবে ?

চরিতর ও কিষণ দারোগাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখিয়ে ঘটনার বিবরণ দিলো। দামোদরের দিক থেকে এসে কুটুম কাঁটার বেড়া ভিড়িয়ে উঠানে ঢুকেছে। চারিদিকে বোম মেরেছে। প্রথম বোমাটা গৈরীকে লক্ষ্য করে মেরেছিল। তখন সে আছাড় খেয়ে পড়েছিল বোমাটা প্রত্যক্ষভাবে ওর উপরে পড়েনি। তাহলে তো উড়েই যেত। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে হতো না। কিন্তু খুব কাছেই যে বাস্ট হয়েছিল তার লক্ষণ স্পষ্ট। হারিকেন উর্টে অঙ্ককার হয়েছিল এবং প্রচুর ধোঁয়া হয়েছিল বলে বাকী বোমগুলি আন্দাজেই হোঁড়া হয়েছিল।

হেনী এবং গৈরী স্বচক্ষে বাঁকেলালকে ও রবিলালকে দেখেছে ও চিনেছে। বাঁকেলাল গৈরীর ছেলেটাকেও কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ও রবিলাল গৈরীকে ধরে নিয়ে ঘাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয় ব্যক্তি বোম চার্জ করেছে।

গুলু ও চরিতর গৈরীর ডাক শুনে ছুটে আসছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ বোম চার্জ হওয়ার কারণে কাছে যেতে পারেনি। বৈশাখীও ছুটে আসছিল সে বাঁকেলাল ও রবিলালকে দেখেছে।

ঘটনার কার্যকারণের বিবরণ পরিষ্কারভাবেই দিলো ওরা। পুলিশের গতানুগতিক প্রশ্ন কাউকে দেখেছেন কি না, চিনেছেন কি না, কাকে সন্দেহ হয় এদের কোনো প্রয়োজন রইল না। সোজা সাপ্টা জবাব পেয়ে গেল।

সকাল থেকেই জনসমাবেশ শুরু হলো। নেতারাও একে একে এসে পড়লেন। সুমিতবাবুও এলেন। ওঁকে দেখে শ্রমিকদের মূখের রাশ খুলে গেল। যে যে ভাষায় যত রকম খিঁচি খোঁচ করা যায় তা দিয়ে এজেন্ট সাহেব ও তার সাক্ষোপাঙ্গদের নামে হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব চড়াল।

ফাটকবাজারে গাড়ি থেকে নেমে গুলুর বাসা পর্যন্ত যেতে যেতে ওদের চার পাঁচজনের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এই লোকগুলো কি করে এখনো একটা ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়নি সেইটাই বৃষ্ণে ওঠা দায়।

পরে শুনলেন অনন্ত সবারই সামনে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে তার মৃত ছেলের নামে দিব্যি দিয়ে গেছে।

সুমিতবাবু বললেন, যেমন নেতা তেমনি শ্রমিক। এত ধৈর্য এমন উদারতা কার আছে ?

শোকস্তরু গুলুর ঘরের নারী ও পুরুষগুলি ওদেরকে দেখে কেঁদে ফেলল। গুলু ওঁর পায়ে পড়ল বাবুজী! আমার কি হলো?

কি সাধনা দেবেন তার চেয়েও করুণ দৃষ্ট বারান্দার উপর। কাপড়ের ঢাকা খুলে দেখাল মাথা ভাঙা রক্তমাংসের পিও অনন্তের শিশু সন্তান বিপ্লব। হায় বিপ্লবের আজ এই দশা। সোনার বরণ ছেলে। খলবলে দামাল শিশু। গোটা হুনিয়া পাড়ার চোখের মণি। কোলে কোলে ফিরত। এ হাত ও হাত করতে করতে হারিয়ে যেত। বৈশাখী হস্তে হয়ে খুঁজে বেড়াত। প্রকৃতির রূপে রসে। আদরে সোহাগে লালিত হচ্ছিল একটি স্বপ্নের কোরক। আজ তার এই দশা।

চোখ মেলে দেখা যায় না। স্মৃতিতবাবু বললেন—ঢাকা দাও।

চরিভর বলল, বাবুজী! এ তো আর দেখা যায় না। বলুন দামোদরে সংস্কার করে দিয়ে আসি।

উনি বললেন, এখনো অনেক লোকের আসতে বাকি। তারা এসে দেখুক। তাছাড়া অনন্ত আসুক।

—হ্যাঁ বাবু!

মিঃ শ'-কে সেদিন বহু প্রার্থনার মুখে পড়তে হলো। এস. ডি. ও. সাহেব নিজে এসেছিলেন এবং একজন দুর্দে পুলিশ অফিসারকে দিয়ে গেলেন তদন্ত করতে। তিনি মিঃ শ', ডি. সি., ডি. ডি., সভিপ্রসাদ, তিলক সিং প্রমুখ ব্যক্তিকে জেরায় জেরবার করে দিলেন।

স্মৃতিতবাবু তদবির করলেন মিঃ শ'-কে এই হত্যাকাণ্ডের জন্ত দায়ি করতে।

মিঃ শ' বললেন, আসামীদের নাম তো পেয়েছেন তাদেরকে ধরুন। এটা তাদের বিবাহ ও প্রতিহিংসার ঘটনা। গৈরী ছিলো রবিলালের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু সে স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অনন্তকে শ্রদ্ধা করে। তারই বদলা নিয়েছে ওরা।

শ্রমিক ইউনিয়ন নিজের স্বার্থ হাঁসিল, বিপুল প্রচার এবং কোম্পানীর প্রতি বিদ্বেষপ্রসূতভাবেই এর উপর রঙ চড়িয়ে ধর্মঘট ইত্যাদির সঙ্গে গুলিয়ে দিয়েছে। আপনারা আসামীদিকে ধরুন, তাদের জবানবন্দি নিন তবেই আসল কার্যকারণ বুঝতে পারবেন। কলিয়ারীর পাঁচ হাজার শ্রমিক, পনেরো বিশ হাজার বাসিন্দার ঘরে বাইরে কার কি ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্ত আমরা দায়ী নই।

ডি. সি. ও ডি. ডি. সাহেব হিজ মার্টারস ভয়েস। তাঁরাও ঐ একই কথা ইকো করলেন।

বিউটির সাক্ষাৎকার নিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তদন্তকারী অফিসার।

মিঃ শ' বললেন, যীশাস ক্রাইস্ট! উনি একজন হাউস ওয়াইফ। তার সঙ্গে এসবের কি সম্পর্ক?

—হু' একটা কথা জিজ্ঞাসা করব আবার কি?

না করার উপায় নেই। মিঃ শ' সঙ্গে করেই নিয়ে গেলেন। কিন্তু ডি. ডি. সাহেবের বাংলোতে এসে অফিসারটি বললেন, আমি ঠুর সঙ্গে প্রাইভেট কথা বলবো।

—আচ্ছা! আমরা বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছি।

—না। আপনারা অফিসেই যান।

তাই হলো। সামান্য সৌজন্য বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো।

—বিউটি দেবী। আপনি কিছু মনে করবেন না। প্রশ্নটা ব্যক্তিগত।

—বলুন।

—আপনার সম্পর্কে অনেক বাজে কথা শোনা যায়—তা কি সত্যি?

—বাজে কথা বলতে অনেক কিছু বোঝায়। আপনি ঠিক কি বলতে

চাইছেন?

—মানে মিঃ শ'য়ের সঙ্গে আপনার অর্থে সম্পর্ক নিয়ে কানাকানি হয়।

তা কি সত্যি?

—সত্যি!

এত পরিষ্কার জবাব যে পাবেন তা আশা করেননি। পরের প্রশ্নটি যেভাবে করতেন অর্থাৎ বিউটি যে চরিত্রহীনা তা তার মুখ থেকেই টেনে বের করার জন্য যে প্রশ্নাবলী মনে মনে রচনা করেছিলেন তা ভেঙে গেল।

উনি ভাবছেন। বিউটি জিজ্ঞাসা করল, চা খাবেন স্তার।

—না। ধন্যবাদ।

একটু খেমে উনি বললেন, অনন্তবাবুর লাইফে যে দুর্ঘটনা ঘটে গেল তা জানেন নিশ্চয়। আপনার কি মনে হয় এর পিছনে এজেন্ট সাহেবের হাত আছে?

—তা কি করে বলবো?

—সে কি? ভূতবাংলোতে বসে ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা তৈরি হয়। আপনি সেখানকার মক্ষিরাণী। মিঃ শ'য়ের অতি নিকটে থাকেন। তবু জানেন না?

—না। কোম্পানী বা ইউনিয়ন ছ'পক্ষের মধ্যে কেউই আমাকে বিশ্বাস করে না। নষ্ট মেয়েমানুষকে কে বিশ্বাস করবে?

—আই সি!

উনি ধতমত খেঙ্গে গেলেন? আর প্রশ্ন চলে না। বিউটি কথার গুড় মেয়ে দ্বিয়েছে। উনি ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লেন।

বিউটি বলল—আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না তাই তো?

—সেটাই স্বাভাবিক। আপনি কাজে সহযোগিতা করলে বাধিত হব।

চলি পরে আবার আসকো।

উনি চলে যাবার পর ডি. সি. সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে ছড় মুড় করে ঘরে ঢুকলেন

মিঃ শ'। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা শুরু করে দিলেন কি হলো বিউ ? অফিসার কি জিজ্ঞাসা করলেন ? তুমি কি বললে ?

বিউটি হাসতে হাসতে বলল, অত ব্যস্ত হয়ে না সাহেব। বসো। চাখাও। বিউটির পেট থেকে কথা বের করা অত সহজ নয়।

—বেফাস কিছু বলে ফেলোনি তো ?

—পাগল। এমন জবাব দিয়েছি যে উনি লজ্জায় পালিয়ে গেছেন।

—তার মানে ?

—বললাম আপনি আমার কাছে বেশীক্ষণ থাকলে চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

—হাঃ হাঃ হাঃ।

ওদের ধড়ে প্রাণ এল।

মিঃ শ' বললেন, ওয়েল ডান। আমি তোমার কাছে ওবলাইজড্।

ডি. সি. সাহেব কাজের অজুহাত দিয়ে চলে গেলেন। বিউটি নিজেই ট্রেডে করে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে বলল, কি সাহেব ? এতেই হবে। নাকি হট ড্রিংকসের ব্যবস্থা করবো।

—আজ এই থাক। কাল সন্ধ্যায় ভূতবাংলোয় পার্টি দেবো। তুমি আমি ডি. ডি., ডি. সি. আর কাউকে ডাকবো না। আসবে তো ?

—ওঃ সিওর।

—তোমাকে আজ বাজে প্রদ্ব করেছি কিছু মনে করোনি তো ?

—না সাহেব—তোমার কত টেনশন চলছে বুঝি না।

—ওঃ মাই ডার্লিং।

ওর হাতটা ধরে চুম্বন করলেন। বিউটি হাসতে হাসতে বলল, শুধু পার্টি দিলেই হবে না সাহেব। আমাকে হীরের হুল দিতে হবে। এতবড় কিস্তি মাং করলে তার প্রাইজ দেবে না ?

—অফকোর্স !

—তুমি যাই বলে ডায়ার তোমার লোকগুলো অপদার্থ। একটা কাজও প্ল্যান মাসিক করতে পারে না। একসঙ্গে জোড়া পাখী শিকার করতে পারলে কত ভালো হতো। তা নয় একটা অবোধ শিশুকে।

—আঃ। ভোট সে। মেজাজ আমিও খুব খুশী হইনি। ঝামেলা তো কম পোয়াতে হচ্ছে না। অথচ আশাহুরূপ রেজার্ণ্ট এল না।

—ভোট ওরি। যা হয়েছে তাতেই অনন্তর মাজা ভেঙে যাবে। ওকে আর ইউনিয়নের ঝাণ্ডা ধরতে হবে না।

—তুমি বলছো ?

—ওঃ সিওর।

—খ্যাং ইউ ডার্লিং।

মিঃ শ' চলে গেলেন ।

বিউটি মনে মনে বলল, শালা বেইমান ! নারীঘাতী, শিশুঘাতী জাহান্নমের মুষ্টিফির পুলিশ তোমাকে কিছু করবে না—তা জানি । কিন্তু রেহাই তুমি পাবে না ।

ভেষাট্টি

সারা কলিমারী জুড়ে তুমুল হট্টগোল চলছে । কত রকমের মানুষ । কত তাদের ক্রোধ, হিংসা ও আবেগ । দলে দলে লোক যাচ্ছে অনন্তর ছেলেকে দেখতে । রাস্তার উপর গালমন্দ চলছে । ডি. ডি. ও ডি. সি. সাঁচেবের বাংলোর কাছে এসে চিৎকার করে বলছে—তোমাদের ঘরগুপ্টিকে কবর দিয়ে দেবো ।

ওরা কি বুঝবে বিউটি ওরফে শোভা পালের হৃদয় বেদনা । ক্ষণকাল পূর্বে তার অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে আসল চরিত্রের কি দুস্তর ব্যবধান ।

কপালে হাত দিয়ে বসে আছে । মনে মনে বলছে—তোমাদিকে আমি সাবধান করেছিলাম অনন্ত । তবু নিজেকে বাঁচাতে পারলে না । আফশোস !

গৈরীকে একবার দেখার বড় ইচ্ছে । এখনো কি জ্ঞান ফেরেনি ওর ?

হায় অনন্ত ! তোমার জন্ম আমার দুঃখের সীমা নেই । জানি না কেন তোমাদিকে ভালোবেসেছি ? বড় ভুল হয়েছে । আমার মতো হৃদয়হীন নষ্ট চরিত্রের মেয়েমানুষকে ভালোবাসতে নেই । ভালোবাসার বড় কষ্ট । এমনি আমার দুর্ভাগ্য যে থাকে ভালোবাসছি তাকে নিয়েই যত্নগা ভোগ করছি ।

তোমরা দুটি ছিলে আমার ভাইবোন । জানি না আবার কোনো দিন আমরা সেই দুর্গাপুজোর দিনটির মতো সারা দিনরাত আগড়ম বাগড়ম করতে পাবো কি না ?

তুই ভালো হয়ে যা গৈরী । আগামী বছর পুজোতে আমি তোকে নিমন্ত্রণ করবো । তোকে পায়ের রান্না করে খাওয়াবো । নতুন ছাঁচে চুল বেঁধে দেবো । নতুন সাজে সাজিয়ে দেবো ।

কেমন করে যে পুঞ্জিভূত অশ্রুরাশি হু হু করে বইতে শুরু করল তা ও বুঝতে পারল না । ভিতরটা যেন প্যাচকল দিয়ে কেউ নিংড়ে দিচ্ছে । কি বেদনা ।

গৈরী । তোর ছেলেরা খলবল করে হাসতো রে । দেখে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যেত । মনে হতো আমারও যদি একটা ছেলে থাকতো । শেষ হয়ে গেল । আর তাকে দেখতে পাবো না ।

তোরা বুঝতে পারছিল তোদের বিউটিদি কাঁদছে । তার চোখে জল পড়ে না । কটাক করে । মদালসা ভদ্রীর কটাক গুরুত্ব প্রাপ্তে আশুনাধরায় । কচিং

ঝলসে ওঠে গুপ্ত আয়েয়গিরির অগ্নিশিখা। তার ভাষা কেউ পড়তে পারে না। মনে করে বিভঙ্গ বিলাস। আমার ভুরু দুটি নাকি ধহুকের মতো।

রাগ হয় মা বাপের উপর। এই জন্মই কি তারা আমাকে স্বপ্নের নির্ধ্যাস দিয়ে ভিল ভিল করে তিলোত্তমা তৈরি করেছিল? শালা কুমোর কুমোরী। বারোয়ারী প্রতিমা গড়তে গড়তে নিজের মেয়েটিকেও বারোয়ারী বানিয়েছে?

ওহো! মা বাবা গুরুজন। তাদেরকে আমি গালি দিলাম? ছিঃ ছিঃ। মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে মা।

মা! প্রাণ আনচান করা শব্দ। যত মিষ্ট তত ব্যঞ্জনাময়।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি যে কাল্পে কল্যা এই বোধটা হারিয়ে গেছিল। মনে হতো আমি উর্বশী, মেনকা। আমার জন্ম বিশ্বামিত্র মুনিরা তপোভঙ্গ করে আসঙ্গ পিপাসায় লিপ্ত হয়। আমার পরিচয় আমি অপরাধী! স্থির যৌবনা। আমার ঠিকানা নেই।

ডি. ডি. সাহেব ভালোবাসার শিকড় চেয়েছেন। একটি জড়। একটি প্রাণ।

কিন্তু কি হবে। ঐ তো এক নিখাদ ভালোবাসার শিকড় গজিয়েছিল অনন্ত গৈরীর দেহমন আপ্নত করে। কি হলো? তাদের জীবনের এত সংগ্রাম এত ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট সহিষ্ণুতা এক লহমায় শেষ হয়ে গেল। এক ফুঁয়ে নিভে গেল হাজার বাতির ঝাড় লণ্ঠন।

কি করবে এখন ঐ শিশুর জনক জননী? রক্তাপ্নত মাংস পিণ্ড তাইথে তাইথে করে নাচবে তাদের চোখের তারায়।

তবু সন্তান চাই।

কিন্তু তার আগে সরিয়ে দিয়ে যাবো নোংরা জঞ্জাল।

চোখের জল তখন শেষ হয়নি। ক্ষণে ক্ষণেই উপছে পড়ছিল। আয়ত চোখের সেই অশ্রুশাশি অপূর্ব মাধুর্যময় সৌন্দর্যের মুক্ত বিকাশ।

ডি. ডি. সাহেব ঘরে ঢুকে শুরু বিশ্বয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখন বেলা চারটে।

সেই শিশুর শব্দেহু শোয়ানো আছে বারান্দায়। স্তম্ভীকৃত ফুল এবং মালা পড়েছে তার উপরে ফুলের গন্ধকে ছাপিয়ে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে পচনশীল রক্ত মাংসের।

তাকে ঘিরে আছে একদল রমণী। তখনো মাহুঘ আসছে তাকে দেখতে ফুল দিতে। একটি শিশু তার পিতামাতার একনিষ্ঠ সংগ্রামের বিনিময়ে পেল মূর্তী মূর্তী ফুল। মরনোস্তর পুরস্কার — তবে সরকারী নয় জনগণের।

অনন্ত এসে দাঁড়াল তার সামনে। রক্ষ, গুরু, বিনিমিত্ত, অনাহারী জনক। ঈশ্বর দিয়েছিলেন এক কোঁটা আলো। ছুঁছোড়া চোখের তারায় সেই আলো

নাচত। তাকে ঘিরে পিতামাতার স্বপ্ন বাসর মন্দির হয়ে উঠত। খলবল করে হামা টানতো। দস্যি দামাল ছিল পেয়ারা শিশু। বলি হয়ে গেল প্রতীহিংসার যুপকাঠে।

অনন্তর চোখে অশ্রু নেই। কর্ণস্বরে আবেগ বা জড়তাও নেই।

বলল—আর নয়। এবার বিপ্লবের সংকার করতে হবে।

রণেনবাবু সঙ্গে ছিলেন। বললেন, হ্যাঁ! চতুর্দোলায় চড়িয়ে ফুলে ফুলে চেয়ে দাঁও। ওকে নিয়ে শোক মিছিল বের করবো।

অনন্ত বলল, দাদা! আমার শোক আমার বুকেই থাক। অগ্নকে পীড়া দিতে চাই না।

—আহা! এতে পীড়ার কি আছে?

—দাদা! আমার ছেলে শোক প্রদর্শনীর মডেল নয়। আপনারা যান। আমি আমার জীব আত্মীয়-স্বজন নিয়ে তার সংকার করব। কিছু মনে করবেন না।

রণেনবাবু আঘাত পেলেও অনন্তর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—হয়তো তোমার কথাই ঠিক। যাও। আমরা তার আত্মার শান্তির জন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।

চরিতর, কিষণ, গুলু, জগদীশ, হরেরাম, রামজীর একটি দল দামোদরের দিকে এগিয়ে চলল। অনন্ত নিজেই ওকে কোলে নিয়েছে। পিছনে যাচ্ছে রাজকিশোর, হরিহর, কালো বাউরী, নগেন, ইয়ানিন, হানিফ, জানমহম্মদ, রাধেশ্যাম পাণ্ডে প্রমুখ ইউনিয়নের কর্মী।

দামোদরের পাড়ে শিমূল গাছের তলায় একটি গর্ত খুঁড়ল। সেই গর্তের মধ্যে বিপ্লবকে গুইয়ে দিয়ে অনন্ত স্বগতোক্তি করল—যাও পুত্র। কুরুক্ষেত্রে অভিমত্ব্যর মতো নিজের ঘরে চলে যাও।

সবাই নীরবে তার আত্মার সদগতি কামনা করল। তারপর আবেগ মণ্ডিত-কণ্ঠে রাজকিশোর ক্লোগান দিলো—বিপ্লব জিন্দাবাদ!

রাত হয়েছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, বুদ্ধিস্কিত অনন্ত সীমাহীন শোকের পাথারে ভুমিশ্যায় গুয়ে আছে সেই জীব-পুত্রের কলরব মুখরিত ঘরটিতে। মিট মিট করে হারিকেন জ্বলছে। অনন্ত স্তিমিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

বৈশাখী এক গ্লাস চুধ এনে বলল—খেয়ে নাও জামাই। উপোস দিয়ে থেকে না।

অনন্তর বুক ভেঙে গেল। যে কান্নাটাকে সে প্রাণপনে দমিয়ে রেখেছিল তাই বেরিয়ে এল স্বর্ণাধারার মতো। বলল—ভোজী! আমার যে সব শেব হয়ে গেল।

—কি করবে জামাই ? সবই জগবানের হাত ।

—মা আমাকে ভাগ করেছেন, সমাজ আমাকে বহিকার করেছে, সম্মান মারা গেল । স্ত্রী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে । এই হতভাগার দুঃখ তোমাদের ঘাড়েও চড়ে বসেছে । আমার জন্ম আর কত দুঃখ সহ্য করবে ভোজী ?

বৈশাখীর চোখের জল ফুরোয়নি । আবার তা বইতে শুরু করল । উঠে চলে গেল । একটু পর জগদীশকে নিয়ে ফিরে এল ।

বলল—দেখ—জামাইকে বোঝাও—ও যে পাগল হয়ে যাবে ।

জগদীশ ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল—অনন্ত !

অনন্ত বলল—আহা ! তোমরা কি মনে করছ ? আমি পাগল হয়ে গেছি ?

—খেয়ে নাও ভাই ।

—আচ্ছা দাঁও ।

একটু একটু করে দুখটা খেল । বলল—একটা বিড়ি সিগারেট কিছু দিতে পার ভোজী । বৈশাখী কয়েকটা বিড়ি এনে দিলো । হারিকেন বাতিতে বিড়ি ধরিয়ে দুজনে টানতে লাগল । একটু দূরে থেকে বৈশাখী তাকিয়ে আছে দুটি ঝড়ে ভাঙা মহীঝরের দিকে । সে জানে এই মুহূর্তে তার স্বামী কি ভাবছে ? কিন্তু সে কথা অনন্তকে বলা যাবে না । কারণ সে বলেছে—আমার ছেলের রক্ত-পাতেই যেন রক্তের খেলা শেষ হয় ।

তাই কি হয় ? হুনিয়া গোষ্ঠীর ঘরে এসে তাদের শিশুকে হত্যা করে গেছে এই বিষাক্ত আঘাত ওরা সুইবে কি করে ?

সেই ভয়ে বৈশাখীর বুক দুকদুক কাঁপে ।

অনন্ত বলল—খবর পেয়েছিলাম জগদীশ ভাই । গৈরীও জানত বাঁকেলাল রবিলাল কিছু একটা খংরা জরুর করবে । তবু সাবধান হইনি । তোমাকেও কিছু বলিনি ।

জগদীশ বলল—কে তোমাকে খবর দিত অনন্ত ?

—তার নামটা বলা যে বারণ

—না বললে কি করে জানব যে তার জান যেন খংরা না হয় ।

অনন্ত চমকে উঠল । বলল—তুমি কি ভাবছ জগদীশ ভাই ?

—আমার ঐ নামটা খুব দরকার ।

—বলতেই হবে ?

—হ্যাঁ । তার ভালোর জন্মই ।

—গোপন রাখবে জগদীশ ভাই ।

—জরুর ।

—ডি: ডি: সাহেব ও বিউটিদি ।

—হে রাম !

জগদীশ চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল—আমরা উল্টা বুঝেছি। নামটা বলে ভালো করলে। না হলে সত্যিই ওদের খতরা হয়ে যেত।

অনন্ত বলল—হেই ভাই খুনখারাবি কোর না।

—অনন্ত! তোমার বউ বেটার জ্ঞান শাস্তিদেবীকে ফুল জল দাও। আমাদের জ্ঞান ভেবো না। আমরা যা করব তা আমার বহিনের জ্ঞান। আমার জ্ঞাত-গোষ্ঠীর ইচ্ছতের জ্ঞানে।

জগদীশ উঠে চলে গেল।

অনন্ত বলল—ভোজী। জগদীশ ভাইয়ের কি মতলব আছে?

—তুমি কি জানবে জামাই? তুমি তো আর আমাদের জ্ঞাত নও। কি বুঝবে তার মর্ম? ভালোবাসার জোরে বৃকের ভিতরে ঢুকে গেলে। তাই জানো না—এরা তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু নিজের জ্ঞাতের ইচ্ছতের থেকে বেশী নয়। যারা একাজ করেছে তারাও ইচ্ছত খিলাপের জ্বালাতেই করেছে। কাজেই এ নিয়ে তুমি ওদের সঙ্গে কথা বোল না।

এঁটো গ্লাসটা ভোজী নিয়ে চলে গেল।

অনন্ত একা। অনন্ত শোকের পারাবার। সেই সঙ্গে জ্বালা। কিসের শাস্তি? কাকে শাস্তি বলে? আজ বুকজোড়া হাহাকার। পুত্র শোকের জ্বালা। স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়। কি দোষ করেছি আমি? মানুষের অধিকার আদায় করবার জ্ঞান সংগ্রাম করছি। তার জ্ঞান এই শাস্তি। এর পরেও শাস্তির গ্রহন।

তার চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ এই অনার্ধ গোষ্ঠীর জীবনচর্চা। যারা বোঝে খুনের বদলা খুন। ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা।

গৈরীকে ভালোবেসেই এক অনার্ধ গোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে আগে চিনতে পারেনি। আজ বোধহয় নতুন করে চিনছে।

নীরব, নিস্তরক রাত্রি ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে। কানের পাতায় একটা গুড় গুড় শব্দ আছাড় খেয়ে পড়তে শুরু করল। বোধহয় দামোদরে নতুন করে বাপ ডাকছে। বড় বড় চেনুয়ের আঘাতে ভেঙে যাচ্ছে পাড়।

বারান্দায় গুলু বসে আছে গালে হাত দিয়ে। কাল তার সব ছিল। আজ কিছু নেই। নিস্তরক শোকপুরীতে সে বেচারীর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নিপাট ভালোমানুষ সে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মেহনতী মানুষের প্রতীক। তার সংসারে এই বিপর্যয়। অথচ সে কখনো কারো ক্ষতি করেনি। কারো সঙ্গে চড়া গলায় কথা বলেনি। অতি বশব্দ দায়িত্বসচেতন ষষ্ঠীওলা। তার জীবনে কখনো কোনো ডুলিতে একসিঙ্গেট হয়নি। কখনো কাজ কামাই হয়নি। কখনো দেরি হয়নি। তবু তার চাকরিতে জবাব হয়ে গেছে। তবু তার জীবনে চাপ চাপ অধিকার।

অনন্ত কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। এইখানে গৈরী স্তম্ভ। এইখানে বিপ্লব। ঘুমের ঘোরে হিসি করত। কখনো বা গুর গায়েরই। গৈরী বকত, মারত। ছেলেটা কাঁদত। তখন অনন্ত ওকে বৃকে নিয়ে বাইরের খোলা বাতাসে বেড়াতে নিয়ে যেত।

ফুরিয়ে গেল। এখন শুধু স্মৃতিটুকুই আছে। স্মৃতিপটে গৈরী ও বিপ্লবের কত রকমের মূর্তি ছাপা আছে। গৈরী গুর উপরে রাগ করত, অভিমান করত আবার যদি দুদিন না আসত তবে হস্তে হয়ে খুঁজে বেড়াত। মধ্যবিত্ত লজ্জা, ভয় ধিধা দ্বন্দ্ব গুর ছিল না। সে কি আবার ফিরে আসবে?

কার হাতের স্পর্শ লাগল মাথায়। রক্ষ ও কর্কশ হাতের পাঞ্জা। কিন্তু কি অপার মমতাময়? চোখ মেলে তাকাল। একটি দাড়িভরা মুখ। মোটা মোটা ঠোঁট। জটার মতো চুল।

ওদের জীবনে এই বৃষ্টি প্রথম গুলু তার জামাইয়ের গায়ে হাত দিলো। সে তার ভদ্রলোক জামাইয়ের সঙ্গে একটা ব্যবধান রেখেই চলত। একজন খনি শ্রমিক যেমন ছোট সাহেবকে দেখতে অভ্যস্ত অনেকটা তেমন।

আজম লালিত দাস মনোবৃষ্টির এই আচরণ অনন্ত ভেঙে ফেলতে পারেনি। তার শব্দ শান্তির শান্তির সঙ্গ করেছিল ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্মণের অহংকার ত্যাগ করে প্রশ্রাম করতে পারেনি। স্বজাতি, কুটুম্বের ছেলে ঘরের জামাই হলে যতটা আপন ও নিকট হতে পারে তাও হয়নি।

সেই গুলু যখন গুর মাথায় হাত দিলো তখন গুর বুকটা তোলপাড় করে উঠল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—কি হয়ে গেল বাপুজী?

গুলু এমনিতেই চুপচাপ থাকে। কেমন করে কথার পিঠে কথা যোগ করতে হয় তা জানে না। তারপরে বুকজোড়া তীব্র হাহাকার। গলাটা রুদ্ধ হয়ে আছে। তাই সে ড্যাপ ড্যাপ করে গুর দিকে তাকিয়ে রইল।

অনন্ত বলল—বাপুজী! আপ স্বরেশ, মহেশ গুর মাতাজীকে দেখিয়ে। আমি ঠিক আছি।

গুলু বলল—ব্রাহ্মণের লেড়কা তুমি। আজ আমার ঘরে মাটিতে গুয়ে কাঁদছ। এই দুঃখ আমি সহিতে পারছি না।

—এসব ভাববে না তো। যাও—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। কাল সকালে হাসপাতালে যাব।

গুলু উঠে এসে বারান্দায় গুয়ে পড়ল। দু'চোখ ভরা জল। সে নিজের জন্ম যত না ব্যথিত তার বেশী অনন্তের জন্ম। নিজের ছেলেরা যন্ত্রণায় কাঁতর। স্ত্রী ব্যথায় হু-হু করছে। সব ও বুক পেতে সঙ্ক করছে। পিতৃ হৃদয়ের মমতা গুর মতো মূর্খ মাল্লসকেও অনেক বিদ্বান ব্যক্তির চেয়ে বেশী অহুভূতিশীল করে তুলেছে। সে নিজের মধ্যে ডুবে গেছে। হেনী, গৈরী, স্বরেশ, মহেশ, চম্পা—

সবারই সত্তা শুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সবারই যন্ত্রণা নিজের বুকে নিয়ে বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ মনে হলো গৈরী ডাকছে ভীষণ আতঙ্কিত—বাণু—

চৌষষ্ঠি

গৈরীর জ্ঞান ফিরছে। অতল অন্ধকার থেকে উঠে আসছে ক্ষীণ চন্দ্রলেখা। অল্পভূতির একটা আলাদা জগৎ। ব্যাথা বেদনাকে অতিক্রম করে চৈতন্তের নতুন অভ্যুদয়। ভ্রষ্ট স্থিতির আঁতি পাঁতি খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা। সব এলোমেলো হয়ে গেছে।

কে সে? কোথা থেকে আসছে? কোথা যাবে? কেন যাবে? কি হয়েছে? ইত্যাদি আপাতসরল গূঢ় প্রশ্নাবলী তার মগ্ন চৈতন্তের গভীরে কিলবিল করছে। কোথায় যেন ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে বিরাট জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে আদিগন্ত শত্রুক্ষেত্রে। কি একটা হয়েছে? গৈরী ঠিক বুঝতে পারছে না।

অনেকক্ষণ পর নাকে ওষুধের গন্ধ লাগল। গোটা শরীর জুড়ে চাপবঁধা ব্যাথা। একটু নড়তে গেলেই জ্বালাময় দাহ। যেন সারা শরীর আগুনে পুড়ছে। পোড়া মাংসের গন্ধ উঠছে।

হঠাৎ ঝলসে উঠল হালুদ আগুনের লকলকে শিখা। নীল হালুদ সাদা আলোর ফুলঝুরি। তার সামনে, পশ্চাতে, ডাইনে, বাঁয়ে। আগুনের কোয়ারা এবং ঘন ঘন বারুদ বিস্ফোরণের মধ্যে সে একা। এবং তার বিপ্লব।

গোড়ানির শব্দ উঠছিল। কিন্তু কে দেখবে? কার এত গরজ? ধীরে ধীরে জেগে উঠল যন্ত্রণার বিরাট বিরাট তরঙ্গ। কোনো অঙ্গ মুচড়ে যাচ্ছে। কোনো অঙ্গ জলে যাচ্ছে।

গোড়ানির শব্দ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পাশের বেডের রোগিনীর ঘুম ভেঙে গেল। উনিই ডাক্তার ডাক্তারি শুরু করলেন। তখন একজন অ্যাটেনডেন্ট এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি কষ্ট হচ্ছে?

গৈরী গুর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। মুখটা ব্যাথায় কুঁচকে গেল অ্যাটেনডেন্ট একজন নার্স ডেকে এলেন। তিনি তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিলেন।

এক—হুই—তিন—চার—যন্ত্রণার অল্পভূতির জগৎ থেকে আবার ফিরে গেল অতল অন্ধকারের জগতে।

দিনগুলোও খুব দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের নবম দিন ২৫শে সেপ্টেম্বর ৯ বিপ্লবের সূত্যাও তৃতীয় দিনে পড়ল। অনন্ত ও গুলু হাসপাতালের পথে ৯

দুজনই বুক ছুক ছুক করছে। গৈরীকে ওরা ঈশ্বরের ভয়সায় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাকে কেমন রেখেছেন তা তিনিই জানেন।

ওরা কায়মনে প্রার্থনা করছে—হে ঈশ্বর আজ যেন গৈরীর লাশ বয়ে আনতে না হয়।

ঈশ্বর বোধ হয় তাদের প্রার্থনা শুনলেন। তাই ওরা হাসপাতালে পৌঁছেই খবর পেল রাত্রে গৈরীর একবার জ্ঞান ফিরেছিল। অস্বাভাবিক ঘটনা হচ্ছিল বলে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

দিনে বড় ডাক্তার এসেছিলেন। দুজন সার্জন ছিলেন। তাঁরা গুঁর ক্ষত-স্থানগুলি যথাসম্ভব অপারেশন ও ড্রেসিং করে দিয়েছেন। আঘাত খুবই মারাত্মক। পা, জাঁহু ও কোমরের উপর থেকে মাংস উড়ে গেছে। সারা শরীরে ছোট বড় মিলিয়ে বাইশটি ক্ষত। বাম অঙ্গের উপর ভর দিয়ে এদিক ওদিক যোগান করে গুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। মুখটি বড়ই মলিন। গায়ের রঙটা ক্যাকালে হয়ে গেছে। চোখের পাতা বোজা। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

অনন্ত ও গুলু গুকে দেখল। অনন্ত বলল, ঘুমোক। আমরা বাইরে বসিগে। করিডরে সিমেন্টের বেঞ্চে ওরা বসল। অনেকক্ষণ পর অনন্ত বলল, বাপু। আপনি বাড়ি যান। ওখানেও তো সবাই পেলেন্ট। আমি এখানে আছি।

গুলু ঘাড় নেড়ে সায় দিলো। উঠে দাঁড়িয়ে গামছাটি মাথায় জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনন্ত একাই বসে আছে। আকাশ পাতাল ভাবছে। কি হবে এবার? স্ট্রাইকেরই বা কি পরিণতি হবে? সেই থেকে কোনো খবরই রাখতে পারেনি। আবার কি হুতন বড়ঘন্ত্র হচ্ছে, কে জানে?

হঠাৎ ওর সামনে প্রায় দেবদূতের মতো হাজির হলো সুবীর ও কমলেন্দু। অনন্ত গুদের দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কেমন অভিযোগের স্বরে বলল—তোরা এত দেরি করে এলি? সব যে শেষ হয়ে গেল।

সুবীর ওর গায়ে হাত দিয়ে বলল—বি স্টেডি অনন্ত। ডোন্ট লুজ ইয়োর-সেলফ।

কমলেন্দু বলল—কাল সন্ধ্যায় খবর পেলাম রে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। রাত্রেই সুবীরের কাছে গেলাম। তারপর আসবার বাস্-পেলাম না।

যাক্ গে গুলব কথা। চল গৈরীকে দেখে আসি।

ওরা তিনজনে গৈরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার সেই জ্ঞান ফিরে আসার অল্পভুক্তিভুক্তি চকল অস্থিরতা। তবে এবার

বিশ্বতির অভঙ্গ থেকে উঠে আসা নয়। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা। স্ববীর গুর
কপালে হাত রাখল। মুহু স্বরে ডাকল গৈরী! মাই সিস্টার।

স্তিমিত দৃষ্টিতে গুর দিকে তাকাল গৈরী।

তিনজনেই গুর দিকে খুঁকে পড়েছে।

গোড়ানি শুরু হলো। অসহ যজ্ঞার গোড়ানি। কথা বলতে পারল না।
চোখ দিয়ে জল পড়ল দু'গাল ভাসিয়ে। ঠোট নড়ল ধর ধর করে। অনন্তর
মনে হলো তার হাড় পাঁজরগুলো আখ মাড়াই পেনিয়নে পিষে দিচ্ছে।

এটা ভিজিটিং আওয়ার্স নয়। একজন নার্স অনন্তকে বললেন; আপনি
খাকলেই পেসেণ্টের ইমোশান বেড়ে যাবে। তাতে ক্ষতি হবে।

ওরা বাইরে এল। স্ববীর বলল, চল ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

অনন্ত বলল—তোদের কি ধারণা গৈরী বাঁচতে পারে?

—অফকোর্স! লেট আস হোপ ফর ছ বেস্ট। তুই ভেঙে পড়িস না
অনন্ত।

ডাক্তারবাবু এলেন বেলা দশটার সময়। তখন গুরা গুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

উনি বললেন—আঘাত খুবই মারাত্মক। কোনো কোনো ভাইট্যাল অরগ্যান
নষ্ট হয়েছে, শিরা, নার্ভ টেনডাম ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। আমি যতদূর সম্ভব করেছি।
শরীরে রক্ত চলাচল হচ্ছে। তবে বার্ণ ইনজুরী শেরে উঠতে বড় সময় লাগে।
টিটেনোসেরও ভয় আছে।

অনন্ত বলল, বাঁচবে তো স্তার।

আশা করি। পেসেণ্ট কতটা স্ট্যাণ্ড করতে পারে সেটাই কথা। বার্ণ
ইনজুরিতে এক মাস পরেও মারা গেছে এমন ঘটনাও আছে। তবে পেসেণ্টের
প্রাণশক্তি আছে। না হলে বাইশক ম্পট ডেথ হতে পারত। শক্ত আছে।

—ধন্যবাদ স্তার। ওরা বাইরে এল। তখন পর পর দুটো জীপ এসে
দাঁড়াল। একটাতে বোঝাই হয়ে আছে তার সহকর্মী ও কেন্দ্রীয় কমিটির অস্থায়ী
সভাপতি। অল্পটাতে পুলিশ ও তদন্তকারী অফিসার।

অনন্তর কাছে খবরাখবর নিয়ে গুরা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।
উনি বললেন—দক্ষ দক্ষ দু'তিনজন গিয়ে দেখে আসতে পারেন কিন্তু দয়া করে
পেসেণ্টের সঙ্গে কথা বলবেন না।

স্বাস্থ্যকারী অফিসার বললেন—গুর একটা স্টেটমেন্ট নিতে হবে যে।

—তা সম্ভব হবে না। আপনি কাল আসুন।

আবার লোক। এবার কলিয়ারীর কিছু কর্মী। অনন্তর বন্ধুবান্ধব। সাহেব
স্বশো। ক্রমাগত লোক আসছে গুঁড় দু'দিন ঘাবৎ। ডাক্তারবাবু খুব বিরক্ত
হচ্ছেন। অনন্তকে বললেন—কি ব্যাপার? এত লোক কেন?

—সব দেখতে আসছে স্তার।

—আপনি বুঝি কলিয়ারী ইউনিয়নের নেতা ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনার জীও ?

—হ্যাঁ।

—তাই বুঝি বারোটি ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকল। এখন ওরা কিছন্ন আসছে ? আদিখ্যেতা। এই সব সফিসটিকেটেড জেন্টলম্যানরা শব্দেহে মাল্যদান করার জন্তু হাজির হন কিন্তু মরার আগে একফোটা জল দিয়েও সাহায্য করেন না। আফশোস !

—সবাই তো তা নয় স্ত্রার। ওদের মধ্যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীও আছেন।

—এবার আপনি ভিড়টা কম করতে বলুন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর ! ওরা তিনজনে বাইরের সিঁড়িতে বসে আছে। তিনজনেই চুপচাপ। অনেকক্ষণ পর স্ত্রবীর বলল—অনস্ত ! তোকে কি বলে সাধনা দেবো ? তুই আমাদের চেয়ে অনেক শক্ত ধাতের মানুষ। ঈশ্বর তোকে সছ করার শক্তি দিন।

অনস্ত বলল, আমার জন্তে ভাবিস নে। সবাই একসঙ্গে কষ্ট করে পড়ে থাকারও যুক্তি নেই। কমলেন্দু সেকেণ্ড শিফট ডিউটি আছে।

কমলেন্দু বলল, আমি ক্যাজুয়েল ছুটি নেবো।

—কি দরকার ? একদিনেই তো শেষ হবে না। আরো আসতে হবে। আজ আমি সারাদিন রাত আছি। কাল পরণ্ড তোরা আসিস।

স্ত্রবীর বলল—এটা যুক্তির কথা।

কমলেন্দু বলল—ওকে।

তাপরপর পকেট থেকে একগোছা দশ টাকার নোট বের করে অনস্তকে দিয়ে বলল—এটা রাখ।

—এ কি রে ! টাকা কেন ?

—কত রকমের খরচ হবে। তা সামলাবি কি করে ?

—তাই বলে তোর কাছে টাকা নেবো ?

—হ্যাঁ। নিবি শালা। এখনো তোর ভ্যানিটি গেল না।

—কিন্তু—

—অনস্ত ! গৈরী আমার বোন। তার চিকিৎসার জন্তু দিলাম। দরকার হলে আরো দেবো। চিকিৎসার অভাবে গৈরীর ক্ষতি হয়েছে এটা যেন গুনতে না পাই।

স্ত্রবীর বলল, কমল ঠিক বলেছে অনস্ত। টাকাটা তুই রাখ।

—আচ্ছা ! কি করে যে তোমের ঋণ শোধ করব ?

—গৈরী ভালো হয়ে গেলেই জানবো ঋণ শোধ হয়ে গেছে।

—আর আমার ছেলে ? বিপ্রব ?

—বিপ্রব মরে নারে। সে আবার নতুন শক্তি নিয়ে তোদের মধ্যে আসবে। চলি। পরশু আসবো।

ওরা চলে গেল।

বেলা চারটের সময় বিউটি এল। গেটের বাইরে রিক্শা থেকে নেমে আস্তে আস্তে হেঁটে এল ? ওর রূপের দেখাকে, ঘোবনের ঝলকে, গায়ের স্বগন্ধে, চলার ছন্দে হাসপাতালে ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় চঞ্চল হয়ে উঠল।

অনন্ত ছুটে গেল ওর কাছে। বলল—দিদি তুমি ?

—দিদির কথাটা কানে গেল না তখন ?

—ভুল হয়ে গেছে দিদি। তারই খেসারত এত মর্মান্তিক।

—চল গৈরীর জ্ঞান ফিরেছে ?

—জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে আছে।

—কথা বলছে ?

—খুব কম।

—কি করলে অনন্ত ? নিজেই নিজেকে পুড়িয়ে দিলে। এত অসাবধান।

—আর বোল না দিদি। মাথা ঠুঁকে মরছি।

ওরা দুজন গৈরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বিউটি ওর মাথায় হাত দিয়ে ভাকল—গৈরী !

ওকে দেখে গৈরীর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর জলে ভরে গেল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তবু সেই গোঙানির মধ্যেই বার বার বিকৃত উচ্চারণে বিপ্রবের নাম ধরে ভাকল।

বিউটির বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। অনন্তর দিকে তাকাল। সে ওকে চোখের ঈশারায় বারণ করল।

বিউটি বলল—বাচ্চা ছেলে এখনি এনে কি হবে ? তুই ভালো হয়ে ওঠ—তারপর গৈরীর চোখ দুটো আবার জলে ভরে গেল। বিউটি ওকে অনেক সাধনা দিলো। ভালো হলে ওকে নিয়ে তোপচার্চার ঝিলে পিকনিক করতে যাবে, পূজোর সময় ভালো শাড়ি কিনে দেবে, স্ট্রাইকের পর সবাই চাকরি হবে, বেতন বাড়বে। ওদের নাম যশ হবে। ইত্যাদি মন ভুলানো কথা বলে একঘণ্টা কাটাল। যাবার সময় ওর পাংগু মুখে আলতো চুমু খেল।

যেতে যেতে অনন্ত জিজ্ঞাসা করল—দিদি তুমি যে এলে ওরা কিছু মনে করবে না ?

—জানবে কি করে ? সেজন্য তো বাসে এসেছি। আর জানলেই বা কি ? স্ট্রাইকের পর আমরা অল্প কলিয়ারীতে চলে যাবো। ডি. ডি. একটা কোম্পানীতে অ/২০

কথা ফাইন্সাল করেছে। তুমিও যদি যেতে চাও তো বলবে। গৈরী ভালো হলে ওকে নিয়ে আলাদা ঘর বাঁধো। শ্রমিক ইউনিয়ন করে অনেক পাওনা পেয়েছো। এবার অন্তভাবে বাঁচবার কথা ভাবো।

অনন্ত চুপ করে রইল। একটু পর বলল তাহলে বাসেই ফিরবে ?

—হ্যাঁ। তুমি ?

—আমি এখানেই থাকবো। গৈরী মাঝে মাঝে ভয়ে চমকে উঠছে। বিপ্লবকে বারবার চাইছে। ওকে কি বলবো দিদি ?

বলতে বলতে অনন্তর গলা ধরে গেল।

বিউটি বলল—তুমিও ছিঁচ কাঁড়নে হয়ে উঠলে দেখছি। নিজেকে শক্ত রাখো। তুমি যে কাঁদছো এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে।

সারাদিন ধরে কত অজস্র মানুষ এসেছিল সাক্ষাৎ করতে। তাদের কেউ শ্রমিক, কেউ নেতা, কেউ সাহেব। তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দিনটা কেটে গেল।

রাস্তার ধারে একটা দোকানে গরম গরম রুটি তরকারি বিক্রি হচ্ছিল। তাই দেখে ওর পেটে ক্ষিদে চন্ চন্ করে উঠেছিল। কাল রাত্রে তাকে বৈশাখী ভোজী কত না সাধাসাধি করেছিল এক গ্লাস দুধ খেতে। তারপর তা ছাড়া পেটে কিছু পড়েনি। সুবীর ও কমলেন্দু হোটলে খাবার জন্ম বলেছিল। খায়নি। এখন ক্ষিদে লেগেছে। প্রকৃতির তাগিদেই সে চারটি রুটি তরকারি কিনে খেল। এক গ্লাস জল খেয়ে হাসপাতালের সিমেন্ট বাঁধানো বেঞ্চে বসল।

তখন রাত হয়ে গেছে। অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। সারাদিন ধরে নানা রকমের লোকজন যাতায়াত করেছে ঐ একটি পেশেন্টকে দেখার জন্ম তাই অনন্ত যে নগণ্য কেউ নয় তা ওরা বুঝতে পেরেছে।

যে পেশেন্টের যত বেশী দর্শনার্থী তার তত ইম্পরট্যান্স। লোকে তাই মনে করে। উনি ওকে রোগীদের খাট বিছানার উপর একটি কাচা চাদর পেতে শোবার জায়গা করে দিলেন। তারই উপর শুয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লীলা কোঁতুক দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ উধরু বাজছে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। শাঁ শাঁ বাতাস বইছে। দামোদরে বান ডাকছে গুড় গুড় শব্দে।

দুপুরে লাঞ্চ সেরে সোফায় বসে আড়মোড়া ভাঙছে বিউটি। ভকীটি অলস। ডি. ডি. সাহেব বাইরে যাবার জঞ্জল তৈরি হয়ে বললেন—বিউ! আমি কলিয়ারী যাচ্ছি।

—কলিয়ারী গিয়ে কি হবে ?

—যা বৃষ্টি হচ্ছে। দেখে আসি কোনো খাদে জল ঢুকছে কি না ?

—জল ঢুকলে তোমার কি ?

—বাঃ রে ! খাদে জল বেড়ে যাবে।

—তার জন্তু ম্যানেজার, এজেন্ট, গণ্ডা গণ্ডা ছোট সাহেব আছে। তুমি কি একাই কলিয়ারীর ঠিকা নিয়েছো নাকি ? আজ বেরিয়ে না। কাজ আছে।

—বাঃ রে ! তুমি বেশ বলছো। খাদ যদি জলে ডুবে যায়।

—তাতে তোমার কী ? একবার বললে কথা বুঝতে পারো না ?

বলতে বলতে বিউটি উঠে পড়ল। ড্রেস মেক-আপ সারতে একঘণ্টা লাগল। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে গায়ে রেন কোট দিয়ে বলল চলো।

—এই বৃষ্টিতে ?

—হ্যাঁ। বৃষ্টি আজ থামবে না। দেখছো না সাইক্লোন হচ্ছে।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার উপর জল বইছে। ছপ্ ছপ্ শব্দে চলছে ওরা। একে স্ট্রাইক তাই সাইক্লোন। পথে জনপ্রাণী নেই। ওরা স্ট্রাইক কাটে গিয়ে রেল লাইন ধরল। স্কিনিং প্ল্যান্টের পাশ দিয়ে, বালি তোলার হলেজ লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে মোড় ফিরতেই ভূতবাংলোর মোরাম দেওয়া পথ। তার উপরেও জল চলছে। দামোদর ফুলছে। আদিগন্ত জল চক্ চক্ করছে। পাহাড় ভাঙার গর্জন উঠছে।

রেন কোট বাইরে খুলে রেখে ভূতবাংলোর ঠেসানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা। তখন সেখানে দুই মহাপ্রাণী টপ ভূজঙ্গ হয়ে বসে আছেন।

মিঃ শ' বললেন—হাল্লো বিউ ! তুমি এসেছো ?

—ওঃ শিওর। তুমি আসতে বলেছো।

—ভুল হয়ে গেছে। আমার উচিত ছিল গাড়ি নিয়ে তোমাকে তুলে আনা। কিন্তু তুমি তো খবর দিতে পারতে।

—আমি জানি যে এখন তোমার ড্রাইভার নেই। তাই কষ্ট দিলাম না।

—ভিজ্ঞে তো গেলে।

—ও কিছু না। বরং ডি. ডি.-র শরীরটা খারাপ চলছে !

—কেন ? কি হয়েছে।

—কাল রাত্রে একটু জ্বর হয়েছিল। এই সর্দি কাশি আর কি ?

বলতে বলতে ডি. ডি. সাহেব বসলেন। বোকার মতো হাসলেন। ওর প্যান্ট শার্ট সবই ভিজ্ঞে গিয়েছিল। বিউটির অত সাধের মেকআপ জলে ধুয়ে গেছে। পাতলা ফিন ফিনে শাড়ি ভিজ্ঞে গিয়ে ওর শরীরের স্বক মাংস জেলা দিচ্ছে।

মিঃ শ' ওর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—ওঃ ডারলিং। বড্ড ভিজ়ে গেছো।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ওর ঘাড় গলায় বুলিয়ে দিলেন। বিউটি হাসতে হাসতে ওর হাত থেকে ওটা নিয়ে বলল, ওঃ সাহেব। তোমাকে এত ব্যস্ত হতে হবে না।

ডি. সি. সাহেবের চোখে টর্চ জ্বলছে। বিউটির ভিজ়ে শরীরটা গিলে খাচ্ছেন। টেবিলের উপর মদের গ্লাস নামানোই ছিল। মিঃ শ' ওর মুখের কাছে তুলে ধরে বললেন, জাস্ট এ সিপ্ ডারলিং।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

এক চুচুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে ডি. ডি. সাহেবকে বললো—তুমি ভিজ়ে কাপড়ে বসে থেকো না। বেডরুমে এসো কাপড় চোপড় ছেড়ে একটু রেস্ট নাও।

ওকে টেনে তুলল এবং মিঃ শ'কে বলল, জাস্ট এ মিনিট! ডি. ডি.-র ব্যবস্থা করে দিই।

ওকে বেড রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, রেডি হয়ে থাকবে। ডাকলেই হাজির হবে।

—আচ্ছা!

ডি. সি. বললেন—স্মার! এই চিড়িয়ার কি দেমাক ভাঙবে না?

—বি স্টেডি ডি. সি.। আজ তোমার দিন। এনজয় কর।

—যদি রাজী না হয়।

একটা ভালগার উওয়ানকে কি করে রাজী করাতে হয় তাও কি বলে দিতে হবে?

—ও. কে. স্মার! আপনার পারমিশন পেলেই হলো।

বিউটি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বলল—তোমরা ফুস্ ফুস্ করে কি বলছো?

—ও নাথিং। ডি. সি. বলছিল—সে তোমাকে খুব ভালোবাসে। তুমি পাস্তা দাও না।

বিউটি ঠোঁট উন্টে বলল, ভালোবাসা পেতে হলে কিছু মূল্য দিতে হয়। ও ফোকর্টেই সব কিছু পেতে চায়।

ডি. সি. ব্যগ্রভাবে বললেন—কি মূল্য চাও বল।

—অন্তত হীরের লকেট বসানো একটা নেকলেস। বেশী বললাম কি? মিঃ শ' অমন কত দিয়েছেন। তাড়া তাড়া নোট—সোনার গয়না কত কি? ডি. ডি.-র মতো হ্যাগার্ডও হামেশা এটা সেটা কিনে দেয়।

ডি. সি. যেন মরমে মরে গেল। তেমনিভাবে বলল—ওহো! এদিকটা আমি একবারও ভাবিনি। অলরাইট! কালকেই তোমাকে নেকলেস কিনে দেব।

—থ্যাঙ্ক ইউ!

ডি. সি.-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। যেন স্বর্গের অক্ষর এসে ওর বাহুতে

ধরা দিয়েছে তেমনি ব্যগ্রতায় দু'হাত দিয়ে ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন। ঘন ঘন চুম্বন দিলেন।

—আঃ। ডোপ্ট বি একশাইটেড।

চতুরিকা বিউটি নিপুণ কৌশলে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বড় টেবিলটার কাছে গেল। গ্লাসে মদ ঢালল! দু'হাতে দুটি গ্লাস নিয়ে ওঁদের সামনে দাঁড়াল মনোমোহিনী ভঙ্গীতে ওঁরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। গ্লাস হাতে নিয়ে ওঁরা তারিয়ে তারিয়ে খেলেন। বিউটি বড় আয়নার সামনে বসে আলতো-ভাবে প্রশাধন করে নিল। আবার দুটো গ্লাস ভর্তি করে এনে দিলো।

মিঃ শ' বললেন—কাল তুমি যাতে নেকলেস পাও তার গ্যারান্টির আমি।

বিউটি বলল—তুমি, আমাকে খুব লোভী মনে করছো না তো ডি. সি. ?

—না—না। আমি এদিকটা ভাবিনি বলে নিজেরই মাথা ঠুকতে হচ্ছে করছে।

বিউটি নিজের এক গ্লাস মদ নিয়ে চুম্বক দিতে দিতে বলল—আমি তোমাদিকে নিজের কথা ঠিকমতো বলতে পারিনি। আমার একটা প্ল্যান আছে। তোমরা যদি সাহায্য কর তবে বলবো।

ওরা তখন বিউটির জ্ঞান সর্বস্ব দিতে পারেন। বললেন—সিওর।

—যোবন তো চিরকাল থাকবে না। তোমরা আছো বলেই ডি. ডি. আমাকে নিয়ে সংসার করে না হলে তাড়িয়ে দিত। তোমরা বোঝ তো ?

মিঃ শ' বললেন—ও তোমাকে ভালোবাসে না ?

—উচ্ছিন্ন নারীকে কোনো পুরুষেই ভালোবাসে না সাহেব। সেজ্ঞান আমি ভাবি না। আমি চাইছি একটা বাড়ি করে জন কয়েক মেয়ে এনে রাখবো। তোমাদের মতো বাছাই কার্টমার নিয়ে ব্যবসা করবো। আমার কিছু সোর্স আছে। তোমরা কিছু দেবে। কি বলছো—প্ল্যানটা খারাপ হবে ?

মিঃ শ' বললেন—গ্র্যাণ্ড। তোমার মতো মন্দিরানীর উপযুক্ত কাজ।

—সেজ্ঞানই টাকা কড়ি গয়নাগাঁটির যোগাড় করছি। দেখবে দু'তিন বছরের মধ্যে তোমাদের জ্ঞান ফ্রেশ উওয়ান এনে দেবো।

নেশার ঘোরে ডি. সি.-র মাথাটা ঝুঁকে আসছিল। হঠাৎ সোফা থেকে নীচে বিউটির পায়ের কাছে বসে ওর কোমর ধরে বললেন—বিউ তোমাকে আমি বরাবর ভুল বুঝেছি। মনে করতাম দেমাক দেখাচ্ছে।

মুখটা ওর কোলে গুঁজে দিলেন।

বিউটি ওর মুখটা তুলে ধরে বলল—অমন ছাংলামি করো না ডি. সি. ! সোজা হয়ে বোসো। আমি তো আছি। সারাটা রাত পড়ে আছে।

ডি. সি. আবার সোফায় বসলেন : নেশা খুব জম্পেশ হয়েছে। ওদের চোখে আশ্রয় জ্বলেছে। দুজনেই বিউটিকে চাইছে।

বিউটি উঠে পড়ল। শাড়ির আঁচলটা খসে পড়ল। ও ভ্রক্ষেপ করল না। আরো দু'গ্রাস মদ নিয়ে ওদের কাছে দাঁড়াল মূর্তিমতী কামনার মতো। ওদের হাতে গ্রাস ধরিয়ে দিয়ে নিজেও নিল।

বলল—এখনকার মতো এবং এই শেষ। মনে কর আমি ক্যাবারে ড্যান্সার। একটি একটি করে কাপড় খুলে ফেলছি। এই পেগ শেষ হলেই শেষ আবরণটিও খুলে দেব। ও. কে.! দিস ইজ গেম!

—ফাইন!

বিউটি সত্যি সত্যিই ওর শাড়িটা খুলে দিলো। ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে বলল, দেখতে পাচ্ছে ডি. সি.। আজ প্রকৃতি কত উদ্দাম। কথা দিয়ে-ছিলাম এমনি দিনে তোমার কাছে আসবো। তাই এসেছি।

ডি. সি.-র চোখ জুড়ে আসছে। মিঃ শ'য়ের মাথাটা বার বার ঝুঁকে পড়ছে।

বিউটি বলল—এবার চোখ ধাঁধানো সীন। গ্রাসটা শেষ কর। না হলে এ দৃশ্য সহ্যে পারবে না।

সত্যিই অসহ্য দৃশ্য। শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি চোখের মণিতে কেন্দ্রীভূত করে তাকিয়ে আছেন। বিউটি দাঁড়িয়ে আছে মিটি মিটি হাসছে। অনাবৃত স্বক মাংস ঝলক দিচ্ছে। শেষ দৃশ্যের জন্তু তৈরি। গ্রাস নিঃশেষ করে বললেন, আঃ! হোয়াট এ বিউটি!

ভারপরই চোখের জ্যোতি ফিউজ হয়ে গেল ওদের। দুজন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে ওকে ধরতে গেলেন। বিউটি টুক করে সরে গেল। ওঁরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

বিউটি কাপড় চোপড় গুটিয়ে পাশের ঘরে গেল। সেখানে ডি. ডি. সাহেব ছিলেন। ওর সাহায্যে দ্রুত কাপড় পরে ফিরে এল।

সাহেবরা তখন টলমল করে উঠছেন।

মিঃ শ' গর্জন করে বললেন—নো ডি. সি.! ডোপ্ট টাচ।

—ইউ হাভ প্রমিসড স্মার।

—সি ইজ মাই উওয়ান।

—নো। মাই উওয়ান।

—শাট আপ।

মিঃ শ' শপাটে একটি ঘুঘি চালালেন ওঁর মুখে। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন। ডি. সি. সাহেব একটা লাথি মারলেন কিন্তু তিনিও ভারসাম্য হারিয়ে পড়লেন।

মিঃ শ' ডাকলেন—বিউ!

—এই যে সাহেব। আমি তোমার কাছেই আছি।

ডি. সি. গর্জন করে বললেন—শালা বেজন্মা—বেইমান। বলেছিলে অনন্তর সংসার ছারখার করে দিতে পারলে বিউটিকে দেবো।

খল্ খল্ করে হেসে উঠল বিউটি। বলল—গুরে শয়তান! বিউটি কারো বাপের নয়। তোমরা দুজন দুনিয়ার পাপ। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন মাহুঘের সুখ শাস্তি নষ্ট করবে। শিশু হত্যা, নারী হত্যা, শ্রমিক হত্যা করবে। মেয়ে মাহুঘের রক্ত খাবে, শ্রমিকদের হাড় মাংস চিবিয়ে খাবে। পৃথিবীতে তোমাদের বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

ওরা সবই গুনতে পেলেন কিন্তু চোখের পাতা এত ভারী যে তাকাতে পারলেন না। হাত পা অবশ তাই পিস্তল বের করতে পারলেন না। এক ছলনাময়ীর ছলনায় শোচনীয়ভাবে হেরে গেলেন। একটু একটু করে গভীর স্থপ্তির অতলে গেলেন।

ডি. ডি. সাহেব থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বললেন—মারা গেল নাকি ?

—না। ঘুমিয়ে পড়েছে। মদের সঙ্গে স্লিপিং ড্রাগ মিশিয়ে দিয়েছি। আমার মাংস খাবার লোভে খেয়েও নিল আকালের মতো। এখন চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিত। নাও। সব গুটিয়ে ফেলো।

মদের গ্লাস, বোতল, এঁটো থালাবাসন, অর্ধভুক্ত খাবার-দবার সব ব্যাগে পুরে, ভালো করে টেবিল, নোকা, মেঝে মুছে দিলো।

ডি. ডি. সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—এদের কি হবে ?

—দামোদরে বিসর্জন। দেখছো না দামোদর ক্ষেপে গেছে। অনার্ধ দেবতা অর্ধ মাহুঘের লাশ পেলে খুশী হবেন। নাও নিকাশের কাজ শুরু কর।

তখনো ওদের নাড়ি চলছিল। হুংপিণ্ডে স্পন্দন ছিল। ধরে তুলবার সময় মিঃ শ' নড়ে উঠলেন। দুটোই বিরাট লাশ। দুজনে ধরে গাড়িতে তুলতে হিম সিম খেয়ে গেলো। আপন আপন রেন কোর্ট গায়ে নিল।

সামনের সিটে ওদেরকে বসে থাকার ভঙ্গীতে রাখল যদিও নেতিয়ে যাচ্ছিল। ঘরদুয়ার সাফ স্তরো করে, ঘষটে নিয়ে যাবার দাগ, পায়ের ছাপ সব মুছে তালা চাবি লাগিয়ে চাবিটা মিঃ শ'য়ের পকেটেই রেখে দিলো।

মিঃ শ'য়ের গাড়ি। বিউটি তা চালাতে জানে! হেডলাইট না জ্বলে ডি. ডি. সাহেবের হাতে যে টর্চ ছিল তারই সামান্য আলোতে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

দামোদরের জল তখন ভূতবাংলোর গেট পার হয়ে গেছে। লনটার উপর একফুট জল। বিউটির রাস্তাঘাট মুখস্থ। বহুবার এসেছে বহু রকমভাবে দেখেছে। প্ল্যানটা তো হঠাৎ নয়। দীর্ঘদিনের। সেই রকম প্রস্তুতি ছিল শরীরে ও মনে।

যেখানে রাস্তাটা দু'ভাগ হয়েছে সেখানে বাঁয়ে মোড় নিয়ে ও থামল। এখান থেকেই রাস্তার ঢাল শুরু হয়েছে। পিছন থেকে রাস্তার জল এসে গাড়িকে ধাক্কা দিচ্ছে। বিউটি নামল। ইঞ্জিন চলছে। মিঃ শ'য়ের শরীরটা টেনে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসিয়ে দিল। ওর পা-টা একসিলারেটরে চড়িয়ে দিয়ে দ্রুত হাতে দরজা লাগিয়ে দিলো। গাড়ি একটা ঝটকা খেয়ে এগিয়ে গেল। পেছন থেকে ওরাও ঠেলে দিলো। গাড়ি গড়িয়ে গেল। পাহাড়ের মতো উথাল পাথাল ঢেউ এসে ধাক্কা মারল। গাড়িতে গতি সঞ্চার হলো। এবং মুহূর্তে এক বিশালাকার ঢেউ এসে লাউয়ের খোলার মতো গাড়িটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

জাহ্নতক জলে দাঁড়িয়ে ওরা দেখল অনার্ঘ দামোদরের আক্রোশ। ব্যাগের ভিতর যেসব সামগ্রী ছিল তাও ডি. ডি. সাহেব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

জলে ভিজে, ঘামে নেয়ে ওরা জল থেকে উপরে উঠল। একে অপরকে জড়িয়ে ধরল প্রচণ্ড আবেগে।

ড্রপসিন পড়ল সেক্স অ্যাণ্ড ক্রাইম ড্রামার রুদ্ধশ্বাস দৃশ্যে। দুটি জীবন্ত পাপ পৃথিবী থেকে বিদায় নিল।

ছেষটি

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬। প্রচণ্ড সাইক্লোনে রাত বঙ্গ ভেসে যাচ্ছে। একটানা ঝুপ্তির সঙ্গে শা শা বাতাস। সেই নৈসর্গিক বিপর্যয়ের ক্ষণে বিউটি যখন পাপ নিকাস করতে ব্যস্ত অনন্ত তখন হাসপাতালে পড়ে আছে অকূল পাথার ভাবনা নিয়ে।

তার ছাব্বিশ বছরের জীবন পরিক্রমায় এত ঝুপ্তি কখনো দেখিনি। না জানি এই ঝুপ্তিতে কত বন্না হবে। হয়তো ওদের মাটির বাড়ি অজয়ের বানে ডুবে যাবে। মা তাহলে বড় আতান্তরে পড়বেন। নীতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। একবার পেছিয়ে গেছে মায়ের অন্ত্রের জন্ম। আবার অজ্ঞান মাসে হবার কথা আছে। ঘর ভেঙে গেলে কি হবে?

মায়ের জন্ম বড়ই ভাবনা হলো। গতবছর এমনি দিনে মা তাকে তীব্র ভৎসনা করে বাড়ি গিয়েছিলেন। তারপর দেখা হলো হাসপাতালে। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে ভালো করে রোগ সারিয়ে যে ফিরবেন তাও হলো না। মিঃ শ' তাঁকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়েই দিলেন।

মা এখন কেমন আছেন? একটা চিঠি লিখবে মাকে? তাকে কি গৈরীর খবরটা দেবে? কি প্রয়োজন? গৈরী যখন হাসপাতালে আয়ার ভূমিকা অভিনয় করতো তার দাম ছিল। যে মুহূর্তে অনন্তর স্ত্রীর ভূমিকায় এসে গেল সেই মুহূর্তে সে অচ্ছুৎ। তার খবরে দরকার কি?

অথচ বাবা যদি বেঁচে থাকতেন তবে সমাজ সংসারের ভয়ে ঘরে হয়তো নিতে পারতেন না। কিন্তু আশীর্বাদ করতেন। তিনি ছ্যাংমার্গকে ঘৃণা করতেন। সেই মানুষের শুচিবায়ুগ্রস্তা স্ত্রী।

বাবা! আপনি মানুষকে সমান ভাবার মন্ত্র কেন দিয়েছিলেন? কেন বলতেন সবাই ঈশ্বরের সৃষ্টি। আপন পর ভেদাভেদ নেই। মানুষকে ঘৃণা কোর না। অস্পৃশ্য কেউ নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হাড়ি, ডোম, চণ্ডালকেও হরিনাম দিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী মূর্খি, মেথর, চণ্ডালকে হরিজন বলতেন।

আপনার বাক্য আমি কায়মনে বিশ্বাস করেছি। মেনে নিয়েছি। হাড়ে হাড়ে তার ফল ভোগ করছি। আমার অপমানিতা স্ত্রীকে কোনো দিনই সম্মানিতা করতে পারতাম না। তাই বৃষ্টি শে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে বলছে— তোমার মুরোদ দেখে নিলাম। যাকে সম্মান দিতে পারো না তাকে বিয়ে করবার তুমি কে?

হাসপাতালের পরিত্যক্ত খাটিয়ায় গুয়ে উদাগীন ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে। ক্ষিধেয় পেট কল্ কল্ করছে। মন পুড়ে যাচ্ছে অপমান ও আত্মগ্লানিতে।

আগের দিন রাত্রে চারটি রুটি খেয়েছিল। আজ সকালে এককাপ চা খেয়েছে। ব্যস। কোনো দোকান খোলেনি খাবে কি?

সকালের দিকে আউটডোরে কিছু পেশেন্ট এসেছিল। তারপর থেকে ফাঁকা। অদ্ভুত নীরবতার মধ্যে সময় কাটছে গুর। আর এই তো সময় যখন মানুষকে আত্মগ্লানিতে পেয়ে বসে।

হাসপাতালে সেকেণ্ড শিফটের ছোকরাটির নাম শিবরতি দাস। এই ষ্ট্রুটিতেও সে ডিউটি এসেছে তিনমাইল হেঁটে। সে বলে ডিউটি বড় পবিত্র কর্ম। এতে কখনো অবহেলা করতে নেই।

রোগীদের খাবার দেবার সময় সে বলল, বাবুজী! আপনার তো কিছু খাওয়া হয়নি?

অনন্ত হাসল। ও বলল, কিচেনে জল ঢুকে গেছে। তাই রাত্রে রান্না হয়নি। রোগীদের জন্ম দুধ পাউরুটির ব্যবস্থা হয়েছে। আপনি খাবেন?

—সেকি! রোগীদের ভাগ কেটে আমি কেন?

—আপনিও তো রোগী।

অনন্ত আবার হাসল। মলিন অনুকম্পা জাগানো হাসি। দেখলেই মানুষের বুক টন্ টন্ করে। বলল, তা বটে। আমাকেও ভর্তি করে নিও।

ও চলে গেল। একটু পরে হাক পাউণ্ড রুটি ও এক গ্রাস দুধ এনে দিয়ে বলল—থান দরকার হলে আরো একটা পাউরুটি দেবো!

—না। তার দরকার হবে না।

অনন্ত খাচ্ছে। শিবরতি গুর কাচ্ছেই বলে আছে।

বলল—আশা করি কাল বৃষ্টি থামবে। তখন বাড়ি যেতে পারবেন।

অনন্ত কি রকম উদাস ভঙ্গীতে বলল—বাড়ি কোথায় শিবরতি? আজ আমার বলতে ঐ আধপোড়া বউটা। পুরোটা পুড়ে গেলেই নান্দা ফকির হয়ে যেতাম।

—অমন বলবেন না বাবুজী। আপনার জানানো জরুর ভালো হয়ে যাবে।

—ঈশ্বরের রূপা!

—বাবুজী! কয়লা কুলির জন্য আপনি এত করলেন তবু কেন এত দুঃখ?

সাধু সম্ভরা বলেন মানুষের মঙ্গল করলে নিজের মঙ্গল হয়। এই কি তার নমুনা?

অনন্ত চূপ করে রইলো ঈশ্বর এবং মানুষ; অশরীরীর সঙ্গে শরীরীর দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক করার মতো মন মেজাজ গুর নেই। শুধু কপালে হাত দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিলো। এও এক প্রকার হতাশার মূদ্রা

শিবরতি আরো পাঁউরুটি এনে দিলো।

অনন্ত বলল—আবার কেন?

—খান ববুজী।

—আসলে কি জানো—মানুষের সহনশীলতার একটা সীমা আছে। যা পার হলেই অল্পভব শক্তি হারিয়ে যায়। আমারও বুঝি তাই হয়েছে। সারা দিন তো ক্ষিদেতে পড়ে আছি। কই খাবার ইচ্ছে তো জাগেনি।

—অনেক সহ্য করেছেন বাবুজী। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্ষিদে পেটে খাবার পড়তেই অনন্ত শরীরে বল পেল। তখন ভাবল—খাওয়াই প্রাণ। একবার গৈরীকে দেখার প্রবল ইচ্ছা জাগল। কিন্তু ওকে কি এই রাজিকালে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে দেবে?

শিবরতিকে সে কথা বলতেই বলল—আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সেই ওয়ার্ডের নার্সকে অনুরোধ করল। উনিই গুর কাছে নিয়ে গেলেন।

গৈরী ঘুমোচ্ছে। ডাক্তাররা ওকে ঘুমের গুঁড়ু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। জেগে উঠলেই যন্ত্রণায় ছটফট করে। মুখটি খোলা। চোখ দুটি বোজা, মুখের রঙ ফ্যাকাশে, অমন স্বন্দর লাভণ্য ভরা টস টসে মুখ চূপসে গেছে। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক। নাকের দু'দিকেই ছেঁদা ছিল দু'নাকে নাকছাবি পরত বলে। বিউটি একটা নাকছাবি খুলে দিয়েছে। বলেছে এসব দেহাতি আদং।

বিউটি গুর গা থেকে অনেক কিছুই খুলে দিয়েছে। রূপোর বিছে। কাঁচের চুড়ি। পায়ের মল, লাল ফল গাঁথা বাজু বন্ধ, গায়ের কতুয়া। সে নিজে ছাড়িয়েছে বিড়ি, মদ, যেখানে সেখানে থুতু ফেলা, ঝন্ ঝন্ করে কথা বলা।

পুল্লানো খোলস ছেড়ে এতদিনে মেয়েটি সত্য ভব্য হয়েছিল। শাড়ি ব্লাউজ পরতে, খোঁপা বাঁধতে, সাজ সজ্জা করতে ও কথা বলতে শিখেছিল। চলাফেরায়

স্বচ্ছন্দ সাবলীল একটা ভঙ্গী এসেছিল। অনন্তর পাশে তাকে বেশ মানাতো। আগেকার মতো বে-খাপ্লা, বে-মানান মনে হতো না শিথিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে ফেলেছিল। সেই সময়েই এই বিপর্যয়।

স্ট্রাইকের প্রচণ্ড টেনশানে নিজস্ব স্বথ দুঃথকে বেবাক ভুলে ছিল। এখন তাই শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কি মলিন, শুষ্ক, রক্তহীন, পাণ্ডু বর্ণ গৈরীর মুখ।

অনন্তর বুকটা টন টন করে উঠলো। ওর মুখে আলতোভাবে হাত বুলিয়ে দিলো। ফিরে এল সেই শয্যাটিতে যেখানে পুঞ্জীভূত শোক, গ্লানি, দুর্ভাবনা ও একটি ক্ষীণ আশা নিয়ে গতরাত্রি থেকে বসে আছে।

বিপ্লব নেই।

শব্দ দুটি এক ব্যাপক অর্থ নিয়ে ওর বৃকে ধাক্কা মারল। এই যে তামাম কোলফিল্ডের ধর্মঘট, গণআন্দোলন, বিপ্লবের স্বপ্ন সবই তার কাছে অর্থহীন মনে হলো। বিপ্লব ওর ছেলে না। এ এক ভাবনা। যা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী মাহুষের বৃকে থাকে। তা নেই। কি মর্মান্তিক এই বোধ!

পরদিন সকালে রোদ্দ উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল নানা দুর্ঘটনার সংবাদ। ইস্টার্ন রেলের মেন লাইন ভেঙে গেছে, জি. টি. রোডে সিডারগ ব্রিজ ভেঙেছে, আরামবাগ ডুবে আছে, বর্ধমান রাজবাড়িতে বান ঢুকেছে, সারা শহর জলমগ্ন। অজয়ের বাঁধ ভেঙে ইলামবাজার থেকে গুসকরা ভেসে গেছে। বহু কয়লা খনিতেও জলপ্রাবন হয়েছে। তার মধ্যে বড় ধোমা অগ্ন্যতম। সেখানে খাদের ভিতর বহু শ্রমিক জলবন্দী হয়ে আছে। কারণ এই কলিয়ারীতে ধর্মঘট হয়নি।

অনন্ত দিনের বেলাটা হাসপাতালে থেকে, সন্ধ্যার মুখে হুসনিয়া মোড়ে বাস থেকে নেমে ধীরে ধীরে কলিয়ারী ফিরল। মেসেই ঢুকল। ওর সিটটা তখনো খালি ছিল। তাই অসুবিধা হলো না।

সান্ত্বতি

কত যে কাজ অনন্তর জগ্ন অপেক্ষা করে ছিল তার ইয়ত্তা নেই। সেই সঙ্গে মাহুষজন। সকালে ইউনিয়ন অফিসের টালির ঘরটিতে বসামাত্র পিল্ পিল্ করে লোক আসতে শুরু হলো। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর অর্থাৎ অভিযোগ—জল নেই, কয়লা নেই, ভাত নেই, কাপড় নেই, অসুখ, বিষুখ এমন কত।

অনন্তর কান ঝালাপালা। সে যেন সবারই মুন্ডিল আসানের ঠিকা নিয়েছে। সবারই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া এবং প্রতিকার করার উপায়—আবার ভাবতে-ভাবতেই বেলা গড়িয়ে গেল।

রাজকিশোর, হরিহর, নগেন, কালো বাউড়ী প্রভৃতি সক্রিয় কর্মীরা সেখানে হাজির ছিল কিন্তু ভাতের অভাব কে পূরণ করবে ?

সেদিন স্মৃতিবাবু এসেছিলেন। শ্রমিকদের দারিদ্র্য দেখে ঘাবড়ে গেলেন। বললেন—এই লোকগুলো কি ? আজ তিনমাস ধরে বলা হচ্ছে ধর্মঘট হলে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, মারদাঙ্গা, রক্তপাত, দমন, পীড়ন সবকিছুরই মোকাবিলা করতে হবে। তা এত বলার পর দশটা দিন ঘরে ভাত নেই। এ বড মুন্সিলের কথা। দান খয়রাৎ চাঁদা, সাহায্য যা পাচ্ছি তাই ভাগ করে দিচ্ছি আর কোথায় পাব ?

সমস্যাটা যে এইভাবে একদিন প্রকট হয়ে উঠবে। তা হিসেবের মধ্যে ছিল। শ্রমিকদিকে পুন পুন হুঁশিয়ারীও দেওয়া হয়েছিল। যাদের পরিবার বাড়িতে পাঠাবার স্বেচ্ছা আছে তারা তাদেরকে সরিয়ে দিখেছে।

কিন্তু ধর্মঘটের আগের সপ্তাহে পেমেন্ট হয়নি। এটা কোম্পানীর একটা চাল। তার ফলও শ্রমিকদের কাছে মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দোকানে জিনিসপত্র নেই। থাকলেও ধার দিতে নারাজ।

অনন্ত বলল—দাদা! লেবারদিকে বুঝিয়ে স্বেচ্ছায় রাখছি। আপনি দেখুন—যদি কিছু চাল-গম যোগাড় করতে পারেন।

—তুইও চল। ভিক্ষা মাগতে হবে তো।

ধুপুরেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। কয়েক বস্তা চাল গমের আশ্বাস নিয়ে গভীর রাতে ফিরল। আবার ভোরেই বেকুল সেসব সংগ্রহ করতে। সেদিনও ফিরতে সক্ষম হলো। তবে শুধু হাতে না।

পর পর দু'দিন হাসপাতাল যাওয়া হলো না। পরের দিন সকালে উঠেই দেখে গুলু দাঁড়িয়ে আছে। কি জানি কি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে সেই আশঙ্কায় বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল।

গুলু জানাল—গতকাল সে হাসপাতাল গিয়েছিল। গৈরী কথা বলছে এবং বাচ্চাটাকে দেখতে চাইছে।

অনন্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—ওকে কিছু বলনি তো ?

—না।

—ওকে বলো না বাপুজী।

ও ঘাড় নেড়ে চলে যাচ্ছিল। অনন্ত ওকে ডেকে পাঁচটি টাকা দিলো। ব্যস। ওরও হাত খালি। ভাগ্যিস সেদিন কমলেন্দু ওর হাতে এক গোছা নোট ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই খরচ চলল। এদিকে পার্টি কাণ্ডের টাকাও শেষ। যাদের চাঁদা নিয়ে পার্টি কাণ্ড সেই লেবাররাই খেতে পুচ্ছে না। চাঁদা দেবে কি ? তিলক সিং ক্যাশিয়ার ছিল। সে যদি অত-টাকা হড়প না করত তবে এতটা অভাব হতো না।

হাফ পে। এ ভাবনাটা পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত রেশনটা

সুষ্ঠুভাবে বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। দু'তিন দিনের খোরাকি তো বটে।

সেদিন দেখল এমন কিছু ছেলেমেয়ে রেশনের লাইনে দাঁড়িয়েছে যারা ভদ্রলোক বলে পরিচিত। অনন্তর চোখ কর কর করছিল। এই মেয়েরা আজ দু'সের চালের জন্ম লাইন দিয়েছে। দারিদ্র্য এমন সর্বনাশা, ক্ষুধা এমন সর্বগ্রাসী। ওদের সামনে দাঁড়াতে পাবল না।

যেদিন থেকে ফিরেছে তাবপর একদিনও নুনিয়া ধাওড়ায় যায়নি। বড় অজ্ঞায় হয়ে গেছে। ওদের ভালোবাসায় তো ঘাটতি নেই। তাহলে কেন দেখা করল না? সময় নেই? মেকথা বলতে পাবে। কিন্তু গৈরী থাকলে তো ওরই মধ্যে সময় হতো।

ভর দুপুরে মেসে না ফিরে নুনিয়া ধাওড়াতে গেল। সেখানে তখন বৈশাখীকে ঘিরে ওদের আট দশটি ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ে। উলুনে ভাত ফুটছে। বৈশাখী ওদেরকে ভুলোচ্ছে—আব একটু বোস। ভাত নামলেই ফ্যান ভাত দেব।

অনন্তর বুকটা মুচড়ে উঠল। এইজন্মই ধর্মঘট ডেকেছিল? এই ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েদের মুখে ফ্যান ভাত যুগিয়ে দেবার মুরোদ ফুরিয়ে দেবার জন্ম। না জানি সারা কয়লা অঞ্চলে কত সহস্র জননী ক্ষুধার জ্বালায় ছটকট করা ছেলেমেয়েদের সামনে এক থালা ফ্যান ভাতও দিতে পারছে না।

বৈশাখী ওকে দেখেই মাথাব ঘোমটা টেনে ফিক করে হাসল। মলিন মুখের হাসিটি অমলিন আনন্দরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু লাজ ঢাকা বড় দাঘ। ছেঁড়া ফাটা শাড়ি নিয়ে সে বড়ই বিব্রত।

বলল—দেখেছ। এরা আমাকে পাগল করে দেবে।

অনন্ত বলল—ভোজী! দোষ আমাদের। এখন মনে হচ্ছে টর্মঘট করাটা হঠকারিতা। ক'দিন থেকে ধাওড়ায় ধাওড়ায় দারিদ্র্য ও অনাহারের চিত্র দেখে মনটা বড় দমে গেছে। আবার ভাবি—কিছু মূল্য তো দিতেই হবে। সংগ্রাম তার মূল্য উত্তল করে নেবেই।

বৈশাখী বলল ওসব কথা থাক। প্রতিদিন তোমার জন্ম ভাত রেঁধে গ্রহর রাত পর্বন্ত বসে থাকতাম। এই আসছে—করে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ক্ষিদে তেষ্ঠা নিয়ে আসবে তাই ছেলেদের মুখের আহার কেটে তোমার জন্ম রাখতাম! তবু একবার মনে পড়ল না। আমরা এত পর?

ঝর ঝর করে কঁদে ফেলল বৈশাখী।

অনন্ত মরমে মরে গেল। হাত জোড় করে বলল—দোষ শুয়ে গেছে ভোজী। মাক কর।

—হ্যাঁ। মাক কর বলেই খালাস। আমাদের কষ্ট বুঝবে কেন? তুমি বামহনের ছেলে। আমাদের আপন হবে কেন? আমার হাতে খাবার রুচি হবে কেন।

—আঃ ভোজী! এমন আঘাত দিয়ে কথা বলবে তো আমি চলে যাবো। অনন্ত উঠে পড়ল। ফাস্তনী এসে ওর হাতে ধরে বলল, ওঃ খুব রাগ হয়েছে জামাইয়ের। ভোজী যে কেঁদে মরছে সেটি দেখতে পাও না।

বৈশাখী কেঁদে ভাসিয়ে দিলো—আমি মুখ্য মেয়েমাছ। কি বলতে কি বলেছি তাতে তুমি রাগ করছো?

অনন্ত আবার বসে পড়ল। ষাট হয়েছে ভোজী। কান্না থামাও।

বৈশাখী ফিক্ করে হেসে ফেলল। অশ্রুমুখী রমণীর হাসি এক বিশেষ মাত্রা নিয়ে অনন্তর অন্তরে গঁথে গেল।

বলল—দু দিন ধরে কি রেঁধে রেখেছো দাও—খেয়ে-যাবো।

—স্বাধার রাজ্যে কি ভাত যোগানো থাকে? বাচ্চাদিকে দিয়ে দিয়েছি তুমি বস। গরম ভাত খেয়ে যাবে।

কথায় কথায় অনেক বেলা হলো—অনন্ত সেইখানে থাওয়া দাঁওয়া করে বলল চলি—ভোজী। মেসেই থাকবো। কিছু মনে কোর না।

—আরো কিছু কিছু রেশন পাঠিয়ে দেবো। আমি যতদিন আছি ততদিন তোমাদিকে উপোষ দিতে দেবো না।

—আহা রে কত দরদ।

বৈশাখী হাসল। এই আসল বৈশাখী যে শত দুঃখেও হাসতে পারে। প্রথম থেকেই যাকে সদা হাসুমুখী দেখছে সে। চলে যাচ্ছিল।

বৈশাখী পিছু ডাকল—জামাই।

—কি ভোজী?

—কিছু মনে করবে না তো? একটি কথা বলবো।

বল।

—আমাকে তিনটি টাকা দেবে?

অনন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। বৈশাখী কখনো ওর কাছে টাকা চায়নি।

আজ হঠাৎ চাইল কেন? নিশ্চয় খুবই জরুরী।

—সন্ধ্যা নাগাদ পাঠিয়ে দিলে হবে তো ভোজী?

—তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না।

—কোথায়?

—গৈরীকে দেখতে। বুকটা টন্ টন্ করছে। এইটুকু থেকে মাছ করছি।

যে হাসপাতালে গেল আর চোখের দেখা দেখিনি। তাই আমি, কুস্তী, ফাস্তনী তিনজনে যাবো ভেবেছিলম। একটাকা করে বাস ভাড়া লাগবে।

—কাল যেয়ো ভোজী। আমি তোমাদিকে নিয়ে যাবো।

—বেশ।

নারী স্বপ্নের মমতা মেছুর মেহ ভালোবাসার অশ্রু স্বপ্নি বুক নিয়ে হাঁটতে

হাঁটতে ইউনিয়ন অফিসে হাজির হলো। তার অনেক কাজ বাকী পড়ে আছে। ধর্মঘট চলছে। এ সময়ে কি নেতাদের ফুরসৎ থাকে ?

দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা হলো। তারপর রাত। একাই হাঁটতে হাঁটতে মেলে ফিরছিল। গৈরী, ধর্মঘট, স্কুধা, দারিত্র্য ইত্যাদি ভাবনার সঙ্গে নূতন ভাবনা জুটেছে হরিহরের মেয়েকে নিয়ে। ওর জামাই বড় ধেমো কলিয়ারীতে কাজ করত। বস্তার দিন খাদে জলপ্লাবন হয়েছে। অনেকের মধ্যে সেও খাদে আটক পড়ে গেছে। সহজ বুদ্ধিতে অনুমান করলে খাদের ভিতর সলিল সমাধির কথাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

অনন্তর মতো অতিরিক্ত আশাবাদীরা মনে করে বেঁচেও তো থাকতে পারে। হয়তো কোনো বন্ধ স্নডঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। জল অতদূর পৌঁছায়নি। সেখানে কিছু বাতাস এবং অক্সিজেন আছে।

বিভিন্ন সময়ে মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা করার জগুই তার এমন ধারণা হয়েছিল। ও মনে করে মাহুঘের জীবন যত ক্ষণস্থায়ী তত অলৌকিক জীবনী শক্তির আধারও বটে। না হলে গৈরী বেঁচে থাকতো না।

কিন্তু হরিহরের মেয়েটি যে পাগল হয়ে গেছে। তিন বছর আগে বিয়ে হয়েছে কোলে একটি বাচ্চা। সে বেচারী কি করে সহ্য করে ? হরিহর সেখানে গেছে। ওকেও একবার যেতে হবে। ওরা তো কয়লা খনির শ্রমিক।

ডি. ডি. সাহেবের বাংলোর সামনে বিউটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রয়োজন বোধ করল। তাই সে গেট খুলে ঢুকে পড়ল। বিউটি ওকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করল এবং অভিযোগও করল, কেন সে আগে আসেনি ?

অনন্ত ভাবল—এই এক মেয়েলি স্বভাব। সে দেহাতিনীই হোক বা আধুনিকাই হোক কৈফিয়ৎ না দিয়ে ছাড়ান নেই।

বিউটি ওকে বসিয়ে দিয়ে কিচেনে গেল। মিষ্টি ও সিঙাড়া নিয়ে এসে বলল—খাও।

অনন্ত খাচ্ছে। বিউটি জিজ্ঞাসা করল—তোমার তো চাকরি বাকরি আয় উপার্জন নেই তাহলে খরচ পত্র চলছে কি করে ?

—কমলেন্দু পাঁচশো টাকা দিয়েছিল। তাই চলল।

—তার পর ?

—আমার বন্ধু ভাগ্যটা ভালো। সূবীর ও কমলেন্দু বলেছে গৈরীর যাবতীয় চিকিৎসার খরচ ওরা দেবে।

—আর আমি যদি দিই তাহলে নেবে না ?

অনন্ত হাসল। বলল—নেবো না কখন বলেছি ? আমাকে তো এবার চেয়ে চিন্তাই চালাতে হবে। কিন্তু এ যে কি কষ্টের তা তোমাকে কি বলব দিদি ? কারো কাছে কখনো হাত পেতে কিছু চাইনি, আজ তাই আমার

বিধিলিপি হয়ে দাঁড়াল। গৈরী হতচ্ছাড়ি একেবারে যদি মরে যেত তবে আমার হাড় জুড়োত।

বিউটি ধমকের স্বরে বলল, আঃ অনন্ত ! ওকে কেন দুঃখা ?

অনন্ত আত্মসংবরণ করে বলল—কেন যে এমন কাল বাক্য মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কে জানে ? কিন্তু সত্যিই তো আমি ওর মৃত্যু কামনা করি না। আমি চাই ও বেঁচে থাক। প্রবলভাবে আমার কাছে ফিরে আসুক।

বিউটি ওর কাছ থেকে উঠে গেল এবং পাচশো টাকা এনে দিলো।

—ধন্যবাদ দিদি !

—অনন্ত ! আমি তোমার দিদি। এ সম্পর্ক আজকার না। তোমার বাবা এ সম্পর্ক বেঁধে দিয়ে গেছেন। তোমার যা প্রয়োজন আমাকে বলবে। লজ্জা দিধা কোর না।

—আচ্ছা দিদি !

পরদিন হাসপাতালে বৈশাখী, কুস্তী ও ফান্টনীর সঙ্গে অনন্তকে দেখে গৈরীর স্তিমিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপরই বিষণ্ণ উদাস গলায় বলল—আমার বিপ্লবকে নিয়ে এলে না কেন ?

সবাই এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। গৈরী অনন্তকে বলল—তুমি যে ওকে নিয়ে আসবে বলেছিলে—আজ তো ভোজী এসেছে—আনলে না কেন ?

বৈশাখী শব্দ করে কেঁদে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামের স্বর ঝঙ্কারের মতো কুস্তী ও ফান্টনীও স্বর মিলিয়ে দিলো। অনন্ত বড়ই বিপন্ন বোধ করল। মনে মনে বলল—ধন্য মেয়ের জাত ! একটা কথা পেটে রাখতে পারে না। যে সিন্ করল তাতে কি গৈরীর বুঝতে বাকী থাকবে ?

—তোমরা কাঁদছ কেন ? তবে কি বিপ্লব—

—আঃ গৈরী ! তুই এত ছটপট করছিস কেন ?

একজন সিটার ছুটে এসে ওদেরকে ধমক দিতে শুরু করল—যাও। বাইরে যাও ! একি হচ্ছে অনন্তবাবু ? এটা কি কান্নার হাট ?

অনন্ত খ' হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মেয়েগুলির কান্না সটকে গেল। চোখ মুছে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আর মুখে কথা নেই।

গৈরীর ভিতরটা থর থর করে কাঁপছে। ক্ষতস্থানগুলিতে অজস্র বিষ কাঁকড়া হল কোটাচ্ছে। চোখে যেটুকু জ্যোতি ছিল তাও ম্লান হয়ে এল। ভীষণ ঘঙ্গণায় মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল।

এত যে ওষুধ, ইনজেকশন তবুওর গা থেকে পচা মাংসের দুর্গন্ধ উঠছে। পোড়া ঘায়ের ব্যাপারই এই। এক ঠাই থাকে না। চারিয়ে চারিয়ে বাড়তে থাকে। মাংস পচে দুর্গন্ধ ওঠে।

নার্সটি ঘাবার সময় শাসিয়ে গেল—পেশেন্টের কাছে কান্নাকাটি করবে না। আর কেউ কাঁদবে না। চোখে কাপড় বেঁধে রাখবে। বুকটা ড়হল বিকল করুক। পাথর চাপা দিয়ে রাখবে। বড়ই স্ক্ল মনে চলে গেল ওরা।

অনন্ত গৈরীর মাথায় হাত দিয়ে বলল—কান্নাকাটি করিস নে গৈরী। যা গেছে তা ফিরবে না কিন্তু যা আছে তা যেন হারিয়ে না যায়।

গৈরী ফ্যামফেসে গলায় বলল—কথাটা স্পষ্ট করে বল না গো। এমন তিলে তিলে দণ্ডাচ্ছে কেন ?

—বিপ্লব নেই রে গৈরী।

বলতে বলতে অনন্তেরও গলা কেঁপে গেল। গৈরীকে ধরে বলল—না। একদম নড়িস নে। সিটার আসছে। যা তা অপমান করবে।

—হঁ। ছেলে মরার খবর এনেছো। আবার মান-অপমান। তুমি একটি পাথর। মায়্যা দয়া বলে কিছু নেই।

—আঃ। চুপ কর গৈরী।

গৈরী চুপ করল। কারণ তার কথা বলার ক্ষমতা নেই। খবরটা শুনেই সে যুগী রোগীর মতো তড়পে উঠেছিল। অনন্তর কথার জবাব দিয়েছিল ঘোরের বশে। তারপরই জ্ঞানহীন হওয়ার অবস্থা হয়ে গেল। ক্ষতস্থানগুলিতে রক্ত-পাতের জ্বালার সঙ্গে যুক্ত হলো পুত্রশোকের জ্বালা। মুখটা বেঁকে চুরে বীভৎস হয়ে গেল।

সে দৃশ্য সহ্য হলো না অনন্তর। দীর্ঘ-বিদীর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে ওর কাছ থেকে সরে এল। কড়িডর পেরিয়ে বৈশাখীর সঙ্গে দেখা হলো।

বৈশাখী বলল—গৈরী খুব কাঁদছে জামাই ?

—কাঁদলে তো বেঁচে যেত ভোজী। তোমরা কলিয়ারী ফিরে যাও। আমি রাত্রে হাসপাতালেই থাকব। যদি এ যাত্রা টিকে যায় তবে কাল সকালে যাব।

—সে কি জামাই ? অবস্থা এত খারাপ ?

—জানি না ভোজী। তোমরা যাও।

অবসন্ন ভঙ্গীতে হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে গেল। অনন্ত তাকিয়ে রইল উদাস-দৃষ্টিতে।

গৈরী কি আজকের খাঙ্কা সহ্য করতে পারবে ?

আটঘণ্টা

গভীর উৎকর্ষার মধ্যে সেই রাতটা অনন্ত বেগেই কাটাল। শিবরত্নির সাহায্যে ওর থাকা খাওয়ার অস্ববিধা হয়নি। কিন্তু যার স্ত্রী ঐ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে তার কি ঘুম হয় ?

সকালে কলিয়ারী কিরবার আগে গৈরীর সঙ্গে দেখা করল। না করলেই জাগো করত। কারণ সে গুকে দেখেই কাঁদতে লাগল। অনন্ত গুকে অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শাস্ত করল। তখন আবার গৈরীর অল্প কথা। আমার অল্প রাত জেগে কতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকবে গো ?

—আমার অল্প ভাবিল না গৈরী। তোকে ভালো করে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাবো তবেই আমার শাস্তি।

তখন হৈ হৈ পড়ে গেছে চিনাকুড়ির ঘাটে।

কমলা কুঠির আদি পর্বে ফেরিঘাটে নৌকোতে কমলা বোঝাই হতো। দামোদরের শ্রোতের টানে নৌকা ভেসে যেত হাওড়া জেলার মহীসভা ঘাটে। সেখান থেকে উলুবেড়িয়া ক্যানেল দিয়ে কলকাতায়।

সেই সব ফেরিঘাটে এখন ব্যাপক স্মাগু স্টোরিং ব্যবস্থা। নদীতে ফানটুন বসিয়ে তাতে পাম্প বসানো জল ও বালি পাম্প করে তুলবার জন্ত। নদীর বানে ফানটুন যাতে ভেসে না যায় সেজন্ত রীতিমতো এনকারিং করা থাকতো।

কিন্তু জল শ্রোতের ক্ষমতার তুলনায় মাহুঘের হিসেবী ক্ষমতা যে কত তুচ্ছ, উনিশ শো ছাপ্পান সালের বন্যায় তা প্রমাণ হয়ে গেল। চিনাকুড়ির ঘাটে তারই প্রদর্শনী ছ'খানা ফানটুন এনকারিংয়ের দড়িদড়া ছিঁড়ে একটা ঘূর্ণিতে মুখ খুবড়ে পড়েছে। তার উপরে শিকড় বাকড় শুদ্ধ আরও একটি গাছ, বহু ডালপালা এবং কুঁড়ে ঘর আটকে আছে। তারই মধ্যে মিঃ শ'য়ের ডজ গাড়িখানা।

বানের জল সরে যাবার পর স্থানীয় কলিয়ারী কর্তৃপক্ষ ফানটুন উদ্ধার করতে গিয়ে এতগুলি যন্ত্রদানব ও উদ্ভিদের সমাবেশ দেখে ক্রেন দিয়ে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করেন।

মিঃ শ'য়ের কাঁচ, ভাড়া, তাল ত্যাপড়া গাড়িটির সামনের সিটে দুটি পচা মাংস লাগা দুর্গন্ধযুক্ত লাশও উদ্ধার করা হয়। লাশ দুটি প্রায় কঙ্কাল হয়ে গেছে। মাছ ও জলজ প্রাণীর রক্ত মাংস খুবলে খেয়ে ফেলেছে। চিনবার জো নেই। তবে গ্লাডি ও তাদের শরীরে জামা, কাপড়ের ছিন্ন খণ্ডংশ, বাড়ি, আংটি, বেল্ট, রিভলভার ইত্যাদি অভিজ্ঞান তাঁদেরকে চিনিয়ে দেবার জন্ত যথেষ্ট।

পুলিশ, দারোগা, সাহেব সুবো, কুলি মজুর, নেতা, চাপারশি, গ্রাম্য চাষী, ব্যবসায়ী, জেলে, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি হরেক লোকের মেলা বসেছে। সারা নদীঘাট লোকে গিজ গিজ করছে। এত বড় খবর সমসাময়িক যুগের মাহুঘদের হৃদয় করা শক্ত।

শুধু সহজ হলো তদন্তকারী অফিসারের কাজ। তিনি অনায়াসে রিপোর্ট দ্বিগলেন বন্যায় গাড়ি ড্রাইভ করার সময় তারসাম্য হারিয়ে বানের তোড়ে গাড়ি সর্ব্বশেষ ভেসে গেছেন।

জনতার মুখেও সেই কথা। শালারা মাতাল ছিল। দামোদরে ডুবে গেল।

অনন্ত বাস স্ট্যাণ্ডে নেমেই সে খবর পেল। তারপর তাকে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হলো ডি. সি. সাহেবের পরিবার ও কল্যাণীর জন্ত। মৃতদেহ তুলে দাহ করা পর্বস্ব সব কাজই সে করল।

ওদের কান্নাকাটি, ফিট হয়ে পড়া ইত্যাদি ব্যাপারেও সামাল দিতে হলো। কল্যাণী ভেঙে পড়েছিল। সেই তাকে হাতে ধরে খাড়া রেখেছিল।

কলিয়ারী ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হিসেবে মিঃ শ'য়ের শেখবৃত্তে হাজির থাকতে হলো। শোকসভাতে অংশগ্রহণ করল।

সেই সভাতে মিসেস শ' একটা কথা বলেছিলেন—আমার স্বামী মায়ের পেটে থাকতে মদ খেতে শুরু করেছে। যতই মদ থাক সে মাতাল হয়ে দামোদরের বস্ত্রায় গাড়ি ভাসিয়ে দেবার মতো মাতাল নয়।

অনন্তর সহনশীলতার সীমা ইলাসটিকের মতো বেড়েই যাচ্ছে। এক রাত্রি শ্মশানভূমিতে রাত জেগে পরের দিন দুটো ইউনিয়নের মিটিং ও একটি শোকসভা সেরে রাত্রিকালে মেসে এল শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে টাল খেতে খেতে। একটু ঘুমুতে পারলে যুত হতো। তার জ্ঞো কি? যত রাজ্যের স্বপ্ন মিছিল করে আসতে লাগল, আর বার বার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

ছুটি বীভৎস মৃতদেহ ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে চোখের তারায় নাচছে। কোনো এক প্রেতিনী তা থৈ তা থৈ নৃত্যে ছুটি নরকঙ্কালকে নৃত্যের জগতে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেতিনী কখনো মনোরমা নারী হয়ে তাদেরকে চুষন করেছে। কিন্তু নারী বা সাপ যে মূর্তিই ধরুক তার রূপে অঙ্ককারে আলো ফুটেছে। অজস্র হীরা মুক্তা ও মাণিক্য তার সর্বাঙ্গে ঝলক দিচ্ছে।

অনার্ঘ দামোদর ভীষণ ক্রুদ্ধ। এগিয়ে আসছে লক্ষ ফণা ধরে।

উনসত্তর

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬। অবসান হলো একমাস ঘাবৎ খনি ধর্মঘটের। অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনে মামলা চলার জন্ত বে-আইনী ঘোষিত হলো।

ধর্মঘট ভেঙে গেলে কি হবে? তা ছিল শিল্প বিরোধের ঝড়। আর ঝড় যখন বয়ে যায় তখন অনেক কিছুই ভেঙে চূরে দিয়ে যায়। কমলা শিল্প তার ব্যতিক্রম নয়। সে ঝড়ে অনেক রথী মহারথী ধরাশায়ী হয়েছে। পট পরিবর্তন হয়েছে ঞ্চমিক-মালিক সম্পর্কের। আধুনিক যন্ত্র সত্যতার জীবনীশক্তি কমলা। তাপ থেকে যদি বাশ উৎপন্ন না হয় তাহলে প্রাইম মুক্তার ঘোরে না।

কয়লা কুঠিতে ধর্মঘট মানে যে কয়লা শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশা বা মালিকদের মুনাফা কামানো বন্ধ তাই শেষ কথা নয়, এর সঙ্গে দেশের অর্থনীতির সম্পর্কও অত্যন্ত নিবিড়। রেল, তাপ বিদ্যুৎ, সিমেন্ট, ফার্টিলাইজার, শিল্প উৎপাদন—সবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাই নতুন পটভূমিকায় শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক নির্ণয়ের সময় এসে গেছে। ব্রিটিশ জমানা শেষ হয়েছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই মালিক পক্ষের মঙ্গল।

নতুন এজেন্ট এসেছেন রঘু বংশ শুকুল। মৈথিলী ব্রাহ্মণ। মোটাসোটা মাহুঘ। তাঁর স্ত্রী কলকাতায় লেখাপড়া শিখে বাঙালি হয়ে গেছেন।

লেবার সাহেব এসেছেন রামনারায়ণ সিন্হা। উত্তর প্রদেশের লালা কায়ত। সফিসটিকেটেড জেন্টিলম্যান। টাই না বেঁধে বাংলা থেকে বের হন না।

উপর তলায় ম্যানেজমেন্টেরও খোল নলচে বদলে গেছে। সি. এম. ই. সাহেবকে অবসর নিতে বলা হয়েছে। চীফ পারসোন্সাল অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। মিঃ ভার্মা প্রমোশন পেয়ে চীফ হয়েছেন। ধর্মঘটের সময় বহু ঘটনা ও দুর্ঘটনা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন, বড় বড় নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে কূটনৈতিক তৎপরতা দেখিয়েছেন, ধর্মঘটকে বে-আইনী ঘোষণা করার জগ্নু ফিচেল উকিলের মতো আর্গুমেন্ট করেছেন তাই কোম্পানী তার যোগ্যতার পুরস্কার দিয়েছেন।

অনন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিভিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতি, ইউনিয়নের বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে গুর সম্পর্কটা সহজ হয়েছিল। হাসপাতালের পথে হস্তনিয়া মোড়ে বৈশাখীর অশ্রুভরা কণ্ঠস্বরে যে গভীর উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল তাতেই সে সমস্তার গুরুত্ব নতুনভাবে উপলব্ধি করল। সেই থেকেই সে ভাবছে। আইনের হাত অনেক দৃষ্টি, সময়ও বহু দীর্ঘ। কোম্পানী যদি ট্রাইবুন্সালে লড়াই করার মতলব করে তাহলে আরো যে কত সময় লাগবে—তা কে জানে? ততদিনে হয়ত গুরা মরে হেজে যাবে। সার্থক অর্থেই সত্যীকৃত বিক্রি হয়ে যাবে। বৈশাখীর না হলেও আরো তো অনেক যুবতী রয়েছে। তাদের মনের জোর নাও থাকতে পারে। সে কি অবস্থা না বুঝেই এমন কথা বলেছে?

কিন্তু কার কাছে যাবে? আঁধার ঘরে কোথায় বা সাপ ধরে বেড়াবে? এই সময়েই মিঃ ভার্মার প্রমোশনের খবর এল। অনন্ত মনস্থির করে নিল—নিজে ছোট হয়েও যদি গুদের সমস্তার সমাধান করতে পারে তবে তাই করবে।

পিণ্ডন মারফত স্নির্প পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে গুর ডাক পড়ল।

—গুড আফটারনুন স্মার ।

—গুড আফটারনুন অনস্ত । কাম ইন । সিট ডাউন ।

অনস্ত ধন্ববাদ দিয়ে বসল । উনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন ।

অনস্ত বলল—আমাকে সাক্ষাৎ করার স্বযোগ দেওয়াতে খুব বাধিত হয়েছি স্মার । এখন আমার বক্তব্য বলার জগ্ন একটু সময় দিলে কৃতজ্ঞ হব ।

উনি মুচকি হেসে বললেন—এত এটিকেট দুঃস্থ কখন থেকে হলে অনস্ত ? তোমাকে তো উদ্ধত এবং অমার্জিত নেতাক্রমেই দেখেছি । অবশ্য তোমার যুক্তির ধার আছে । আর সেই নাটকটা—অগ্নি সংস্কার আমার খুব ভালো লেগেছে । এমন কয়েকটা একসেলেন্ট মোমেন্ট ছিল যা দীর্ঘদিন মনে রাখার মতো ।

—সত্যি ?

—ওঃ ইয়েস ! বল—তোমার কি সমস্যা ? তোমার স্ত্রী কেমন আছে ?

—টিকে আছে । মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ।

—আমি খুবই দুঃখিত অনস্ত যে তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা শেরগড় হাসপাতালে হলো না । এখন যদি তুমি চাও তবে ব্যবস্থা করতে পারি ।

—থ্যাঙ্ক ইউ স্মার । ওখানে ডাক্তারবাবুরা যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন ।

হু'চারটে কথাবার্তার পরই অনস্ত মূল প্রসঙ্গে এসে পড়ল । একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল—আপনি তো জানেন স্মার ওয়্যাগন লোডাররা এক বছরের উপর বসে আছে । একটা বিরাট শ্রমশক্তি নষ্ট হচ্ছে ।

দিনের পর দিন যত দুঃখ দুর্দশা বাড়ছে তত ওরা হতাশ হচ্ছে । গায় অগ্নায় বৃষ্ণবার সাধ্য নেই । স্বভাবে হিংস্র । কবে কি করে দেবে সেই আমার ভয় । নেহাত আত্মীয়তা আছে বলেই দাবিয়ে রাখতে পেরেছি । না হলে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে কতক্ষণ ।

—কিন্তু অনস্ত ওদের কেস যে ট্রাইবুন্সালে আছে ।

—মিউচুয়্যাল স্টেটলমেন্ট হলে আমরা কেস তুলে নেবো ।

—তুমি ওদের জগ্ন কি চাও ?

—চাকরী ।

—কিন্তু কেসে জিতলে ওরা এতদিনের বেতন পাবে ।

—সে ক্ষতি আমরা স্বীকার করবো । তবে আপনাদের তরফ থেকে স্ববিচার আশা করি ।

—কিন্তু যে কলিয়ারীতে ম্যাচুয়ালী ওয়্যাগন লোজি হয় না সেখানে কি করে চারশো জন শ্রমিককে কাজ দেবো ।

—শ্রমিকের প্রয়োজন আপনাদের ফুরাবে না । ওদেরকে যে ওয়্যাগন লোজির কাজই দিতে হবে তাতে বলছি না ।

উনি অনেকক্ষণ ভেবে বললেন—আই বিলিফর ইউ । আমাদের কোম্পানীর

ইচ্ছা ছিল টাইবুল্লালে এমনভাবে কেস লড়বো যাতে কৃতিপূরণ দিয়ে চারশো জনকে ছাটাই করতে পারি। এখন তোমার কথা রাখতে হলে গোটা ব্যাপারটা পুনরায় রিভিউ করতে হবে। তুমি এক কাজ কর। নতুন এজেন্ট তোমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে দু'চারদিনের মধ্যেই মিটিয়ে বসবেন। শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে পারো। এই ইস্যুটার উপর জোর দিও। আমি সিনসিয়ারলি ভেবে দেখবো।

খুব তাড়াতাড়িই কাজ শেষ হয়ে গেল অনন্তর। এতটা আশা করেনি। মিঃ ভার্মার সঙ্গে কথা বলে ও তৃপ্তি পেল। কাজ হোক বা না হোক ওর বক্তব্য উনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন।

মেসে ফিরে দেখল প্রশান্ত বসে আছে। অনন্ত ঘাবড়ে গেল। মায়ের কোনো দুঃসংবাদ আছে নাকি? সেই কথাটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল। প্রশান্ত বলল—না। মা ভালো হয়ে গেছে।

অনন্তর বুক থেকে একটা স্বস্তির শ্বাস বইল। খাটে বসে জুতো খুলল।

প্রশান্ত বলল—পিসিমার চিঠিতে জানতে পারলাম বৌদিকে বোমা মেরেছে। মা বলল কেমন আছে দেখে আয়। হুনিয়া ধাওড়াতে গিয়ে সব খবর পেলাম। বিপ্লবকে পাথরে আছড়ে মেরেছে। বৌদি যমের মুখে পড়ে আছে। তবু একটা চিঠিতেও জানালে না দাদা?

উদাসীন কণ্ঠে অনন্ত বলল—কি হবে জানিয়ে?

প্রশান্ত হকচকিয়ে গেল। তবে তুমি আমাদের কিছুই জানাবে না?

—জেনে কি করবি? মাকে বলে দিস—আমাকে যেন খরচের খাতায় তুলে দেয়।

প্রশান্ত জলে উঠল—এমন কথা বলতে পারলে দাদা? তুমি কি হয়েছে বলা তো? মায়ের দিকটা দেখবার চেষ্টা কর।

—আমাকে আর কাটা ঘায়ে হুনের ছিটা দিস না প্রশান্ত।

প্রশান্ত চুপ করে গেল। খানিকপর বলল—দিদির বিয়ে ঠিক হয়েছে। ওরা অগ্রহায়ণ হবে। কিছু জমি বিক্রি না করলে টাকা যোগাড় হচ্ছে না তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছে।

—এটা তো আমারই দায়িত্ব। জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—পরিবারের দায়-দায়িত্ব বহন আমারই কর্তব্য। কিন্তু তা পারলাম না, কত অপস্বার্থ আমি। ওঃ। এসব কথা যখন মনে হয় তখন ভিতরটা পুড়ে থাকে হয়ে যায়।

বলতে বলতে অনন্ত এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে দু'হাতে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। প্রশান্ত ভাবাচাচা খেয়ে গিয়েছিল। ওকে ধরে বলল, দাদা!

অনন্ত বলল—প্রশান্ত! তোর বৌদিকে নিয়ে গ্রামের সমাজে আমার ঠাই

হবে না তাহলে পৈতৃক বিষয় আশয়ের মোহ কিসের জন্ম ? বোনের বিয়ে আমার অংশ বিক্রি করেই করতে বলবি। কোর্টে গিয়ে আমি সহি দিয়ে আসবো। দলিল রেডি করতে বলিস।

—কিন্তু দাদা—

—কোনো কিন্তু নেই। পরের বোনটার বিয়েও আমার অংশ বিক্রি করে হবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা তোর নামে কোবালা দলিল করে দেবো। তুই পড়াশোনা করে মানুষ হ।

প্রশান্ত অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বলল—তুমি এমনি করে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে চাও তো ? কিন্তু পারবে না। আমরা তোমার মুখের উপর কথা বলি না বলে মনে করেছো যা খুশী বলবে ? তোমার কোনো কথাতে আমার সায় নেই।

হু'ভাই হু'দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ পর প্রশান্ত জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে বলল—যাবার পথে হাসপাতালে বোর্দিকে দেখে যাবো।

—না। গুর মাথার ঠিক নেই। তোকে দেখলে কেঁদে ককিয়ে কি আবোল তাবোল বকবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে না যাওয়াই ভালো।

—তোমার কথাতেই ? কি মনে করেছো তোমার বাধা মেনে আমি ফিরে যাবো।

—তবে যা। সহ করতে পারবি না।

সহসা প্রশান্ত কেঁদে ফেলল। অশ্রুধরু কণ্ঠে বলল, তুমি কেন এমন হয়েছো দাদা ? আমরা চার ভাইবোন কি আলাদা ? আমরা কি তোমার পর ? তোমার দুঃখ কষ্ট আমাদের কিছু নয় ? তোমার স্ত্রী আমাদের বোর্দি নয় ? আমরা কি তাকে কম ভালোবাসি ?

প্রশান্তর আবেগ ও অশ্রুজলে অনন্তেরও হৃদয় প্রাবিত হয়ে গেল। সেও কাঁদতে লাগল। তারপর চোখ মুছে বলল—আচ্ছা আচ্ছা—আর কাঁদিস নে।

প্রশান্ত ওকে প্রণাম করে চলে গেল। অনন্তও বেরিয়ে পড়ল উদ্বেগহীনভাবে। মনের ভিতরটা তছনছ হয়ে গেছে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। এ সময়ে প্রশান্তকে যেতে না দিলেই হতো। কলিপাহাড়িতে পিসিমার কাছে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

কিন্তু গুর কেন এমন হলো ? প্রশান্তকে আঘাত দেবার কি প্রয়োজন ছিল ? সে বেচারী গৈরীর জন্ম সত্যিই ভাবে। গুরের মধ্যে একটা স্নেহ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বিপ্লবকেও দারুণ ভালোবাসে। কাজেই ও তো মনে কষ্ট পেয়েছে। তার উপরে সে বোঝা বাড়িয়ে দিলো। নিজেকেই ধিকার দিলো অনন্ত।

একটু পর আশ্রয় হয়ে ইউনিয়ন অফিসে ঢুকল। সেখানেই কিষণ ও

চরিতরকে ডেকে পাঠাল। আরো কিছু কর্মী ছিল। তাদেরকে নিয়ে মিটিংয়ে বসল—নতুন এজেন্টের সঙ্গে মিটিংয়ের সময় কি কি দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা আলোচনা করবে ?

কিষণ ও চরিতরকে জিজ্ঞাসা করল—ট্রাইবুন্সালে মামলার রায় বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না কি আপোস মীমাংসা করবে ? ভালো করে ভেবে জবাব দাও। ওরা দুদিন সময় চাইল।

অনন্ত বলল—বেশ। তারপরেই মিটিংয়ের দিন ধার্য হবে।

রাত নটা পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করে উঠে পড়ল। তখন কিষণ বলল ধাওড়াতে যে যাও না জামাই।

—আচ্ছা কাল যাবো।

অনন্তর এখন কাগজ কলমটাই বেঁচে থাকার অবলম্বন। ঘুম আসে না। কাজ কর্মের একটু বিরতি দিলেই হাজার ভাবনা কাঁকড়া বিছের মতো কামড় বসাতে থাকে। গৈরী এসে দাঁড়ায় মনের দরজায়।

কাগজ কলম নিয়ে বসলে কিছুটা রেহাই পায়। শৈলেন খার্ড ইয়ারের ছাত্র। আগামী বছর সেকেণ্ড ক্লাস পরীক্ষা দেবার জন্ত পড়াশোনা করে। অনন্ত ডায়েরি লেখে।

সে লিখেই চলেছে কি পরিণতি হলো এত বড় একটা সর্বাঙ্গিক ধর্মঘটের ? আমার মতো দুর্ভাগাদের কথা বাদই দিলাম, সাধারণ শ্রমিকদের কি হলো ? ক্ষয় ক্ষতির চূড়ান্ত। নিজস্ব আর্থিক সম্বল যার যা ছিল সব শেষ। রোগ, শোক, দারিদ্র, অনাহার নিত্যসঙ্গী। যে জীবনে কোনোদিন আদালত দেখেনি তার নামে পাঁচটা ফৌজদারি মামলা। যে রক্ত দেখলে মুর্ছাঁ যায় সে হলো দাঙ্গাবাজ, খুনের আসামী। যে পরের জিনিস লোষ্ট্রবৎ মনে করে তাকে তৈরি করা হলো ডাকাত। জেল ভরে গেল খনিশ্রমিকে। হাসপাতাল ভরে গেল আহত শ্রমিকে। বাস্তবচ্যুত ও চাকরিচ্যুত মানুষের সংখ্যা হাজার হাজার।

আর্থিক ক্ষতির এখনো পুরো হিসেব হয়নি। তবে স্ট্রাইকের একমাস কেউ বেতন পাবে না। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর দুটি কোয়ার্টারের বোনাস গেল। প্রতি তিনমাসে ছেষটি দিন হাজিরা হবে না। সময়টাও দুটি কোয়ার্টারের মধ্যবর্তী হওয়ায় হুকোয়ার্টারই গেল। বার্ষিক সবতন ছুটি বরবাদ হলো কারণ এখানেও সেই বাৎসরিক হাজিরার ব্যাপার আছে।

দেশে যাবার গাড়ি ভাড়াও মার পড়ল।

যাদের চাকরি গেছে তারা তো আগাম দরিয়ায় পড়ে আছে। ট্রাইবুন্সালে এত কেস জমেছে যে তার ফয়সালা হতে হুঁচার বছর লাগবে। ওয়াগন লোকটারদের কেসটাই এক বছর যাবৎ গুনানী করতে পারেনি। হচ্ছে, হবে, আগামী মাসের দশ তারিখে গুনানি, আর তা হলেই জজ সাহেব শ্রমিকদের

ডিক্রি লিখবার জন্ত কলম বাগিয়ে বসে আছেন, এমনি সব স্তোকবাক্য আর কত শোনা যায়। আন্দোলন কর, সংগ্রাম কর, ধর্মঘট শ্রমিকের হাতিয়ার এই একই কথা কানে বাজছে। সে হাতিয়ার প্রয়োগ করাও হলো। তাতে অমৃতের চেয়ে গরল উঠল বেশী। শুরু হয়েছে ভাঙনের পালা। যেমন মালিকদের মধ্যে, উর্দ্ধতন অফিসার ও কর্মচারীদের তেমনি ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে। সর্বদলীয় ফ্রেড ইউনিয়নের কো-অর্ডিনেশন কমিটি কার্যত অচল। কল্যাণ রায় কমিউনিস্ট, দেবেন সেন প্রজা সোস্যালিস্ট, কেশব নারায়ণ কংগ্রেস—আর এক প্র্যাটফর্মে নেই। আপন পার্টি পতাকা নিয়ে আলাদা সংগঠন তৈরি করেছেন, কমিউনিস্টরা এগিয়ে আসছে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ভাঙছে। ওরা ক্রমশই শ্রমিকদের আস্থা হারিয়ে ফেলছে।

ভিলক সিং কোরার। বেচারী শ্রমিকদের রোষে পড়ে ছেলেমেয়েদের ছেড়েই পালিয়েছে। ওর স্ত্রী কান্নাকাটি করছিলেন তাই রাজকিশোর সিংকে দিয়ে ওদেরকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভেঙে গেছে সন্তিপ্রসাদের সাধের গোলদারী। মিঃ শ'য়ের ইন্তেকাল হয়ে যাবার পর উনি তল্লিতল্লা গুটিয়ে নিয়েছেন। শ্রমিক শোষণের রস নেই তো মহাজন কি জন্ত বসে থাকবেন।

বাকেলাল ও রবিলালের পাক্তা নেই। আমার চোখের আলো কেড়ে নিয়ে নিজেরাও অন্ধকারে ডুবে গেছে হয়তো বা দামোদরের গর্ভেই। ছুনিয়ারা যে আমার এত কাছের মানুষ তবু কিছুতেই কবুল করছে না। কিন্তু ওদের ভিতরে যে ক্রোধ হরদম টগবগ করে ফুটত তা এখন নেই।

আগামীকাল জগদীশ, হরেরাম ও অত্মাত্ম ছুনিয়া ছোকরাদিগকে নিয়ে কোর্টে যাবো। কিছু টাকার সংস্থান হয়েছে এবং উকিল বাবুদের সঙ্গে কথাও হয়েছে। আসামী হাজির হলেই জামিন পাবে। তাহলে ওরা ঘরবাস করতে পারে।

কিন্তু সব ভাবনা ছাপিয়ে উঠছে বৈশাখী ভোজীদের চাকরি। বরফ অনেকটা গলেছে। দেখা যাক কি হয়? আমি ওদেরকে বলে দিয়েছি চাকরি না হলে সবাই মিলে অনশন ধর্মঘট করে মর। তাতে ওরা রাজী। এখনো যে ওদের লড়াই হিম্মৎটা আছে এটাও দেখার মতো।

এ নিয়ে কল্যাণদার সঙ্গেও কথা হয়েছে। উনি পুরো মদৎ করবেন।

ইহ বাহ! আমার ভবিষ্যৎ কি? আমি কি নেতাগিরি করবো? শ্রমিকদের কাছে ঠান্ডা আদায় করে রোজগারের পথ দেখবো? নাকি পরীক্ষায় পাশ করে ম্যানেজার হব?

সবই ভবিষ্যতের গর্ভে। এ লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না।

আজ নীতির বিয়ে। এতক্ষণ আমাদের বাড়িতে বিয়ের ভোজ চলছে। নীতি বসেছে বিয়ের পিঁড়িতে। আমার আদরের ছোট বোন। আমিই উপস্থিত হতে পারলাম না। প্রশান্ত ছেলে মানুষ। কি করে এত সব সামলাচ্ছে ?

বংশের কুলাঙ্গার আমি। কত বড় দায়িত্বের দিকে পিছন ফিরিয়ে বসে আছি। আমার যাওয়া খুবই জরুরী ছিল। কিন্তু যদি কুটুমজনদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তাতে বিয়ে বাড়ির আনন্দ কোলাহল বিঘ্নিত হবে। নতুন কুটুম কিভাবে নেবে কে জানে ?

এ আমি কি করলাম ? মায়ের কাছে ক্ষমা চাইবারও মূখ রইলো না।

আজ কি মা তার হতভাগ্য দ্ব্যেষ্ঠ সন্তানের অভাব বোধ করছেন ? তার জগ্ন অশ্রুজল ফেলছেন ? কি জানি ? কিন্তু আমার চোখদুটি যে জলে ভরে যাচ্ছে। খাতার পাতায় কলম সরছে না। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বুকটা কর কর করছে। আঃ কি যন্ত্রণা !

মাগো তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দু'চোখ-ভরা জল নিয়ে অনন্ত খাতা বন্ধ করল। চোখ মুছে বাথরুম থেকে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

শৈলেন বলল দাদা, আপনার চোখে জল দেখলে বড় কষ্ট হয়।

—তোকে যে বলেছি আমার কথা ভাবিস নে। শুয়ে পড়। বাতি নিভিয়ে দে।

চোখ থেকে জল পড়লে ভিতরটা বুঝি হান্ধা হয়। অনন্ত ঘুমিয়ে পড়ল। বিড়ম্বিত নায়ক এখন বড়ই ক্লান্ত।

ডি. ডি. সাহেব চলে যাচ্ছেন। অনন্ত তাদেরকে বিদায় জানাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—শ্রার। আপনি ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজারের মতো স্ট্যাটাস এনজয় করতেন। তা ছাড়লেন কেন ?

উনি বললেন—তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা কর।

রিউট বলল—তোমার কি জানতে বাকী আছে ?

—তা আছে বৈকী !

—আমি এবার শোভা হব। সেই ছোট বেলাকার নাম। যে তোমার বাবার পাঠশালায় বই স্নেট বগলে নিয়ে পড়তে যেতো। সেই নামটাই নিজের মধ্যে জাগিয়ে তুলবো। বাক্যে এবং কর্মে।

একথার অর্থ অনন্ত বোঝে। তবু বলল—এখানে কি তা হতো না।

—না। হতো না। এখানে আমার পরিচয়ের একটা লেবেল আঁটা হয়ে গেছে। লোকে আছিল দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবে—নর্ধসহচরী। এখানে আমি জীবনে কখনো লম্বান পাবো না। মাঝায় ঘোমটা নিয়ে বন্ধু হতে পারবো না।

জননী হবার সাধও মিটবে না। তাই অনেক দূরে চলে যাচ্ছি যেখানে আমাদেরকে কেউ চেনে না। সেখানে নতুন করে জীবন গড়বো, নতুন করে বাঁচবো। আমি বধু হব। মা হব।

বেশ আবেগ দিয়েই কথাগুলো বলল ও, অনন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। গত একমাস যাবৎ যে গুজবটা ছড়িয়ে ছিল তাই আজ সত্যি হলো। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনন্ত আশা করেছিল ওঁরা থাকবেন। কারণ মিঃ ভার্মাও একবার ডি. ডি. সাহেবকে ডেকে অল্পরোধ করেছেন। বিউটি তাঁর কাছেও পৌঁছে ছিল এবং বলেছিল আপনাদের টাকা ও বাংলোর চেয়ে আমার সম্মানের দাম বেশী। সাহেবদের মনোরঞ্জন করার জন্য আমার জীবন নয়। কিন্তু ওরা সেইভাবেই আমাকে এক্সপ্লয়েট করেছে। প্লিজ। ডি. ডি.-কে ছেড়ে দিন।

ওদের গাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত অনন্ত রইলো। তারপর ক্ষুধা মনে মেসে ফিরল। তখন সেখানে দুটি মানিকজোড় তার জন্য অপেক্ষা করে বারান্দায় বসে আছে। জগদীশ ও বৈশাখী; হরেরাম ও কুস্তী। ফুস ফুস করে বিড়ি টানছে। ওকে দেখে বৈশাখী ও কুস্তী তাড়াতাড়ি পা দিয়ে বিড়ি নিভিয়ে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল।

ব্যাপার কি? আবার কিছু দুঃসংবাদ নাকি? কালই তো ওদেরকে জামিন করিয়ে নিয়ে এসেছে। তার পরে কিছু ঘটল নাকি? এদের যে কখন কি হয়, কি যে করে বসে তার হিসেব পাওয়া দায়।

বলল—কি খবর?

বৈশাখী ও কুস্তী উঠে দাঁড়াল। পরনে ছেঁড়া ফাটা শাড়ি। মলিন মুখ।
বৈশাখী বলল—তুমি খুব নিষ্ঠুর জামাই।

—বলবেই তো! মরদগুলিকে জামিনে ছাড়িয়ে এনে পাশে শুইয়ে দিলাম কিনা তাই সারারাত আমোদ ফুটি করে আমাকে নিষ্ঠুর বলছে।

জগদীশ থিক্ থিক্ করে হাসল। হরেরাম ও কুস্তী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল। বৈশাখী প্রথমে ধতমত খেয়ে তার পরেই প্রবল বিক্রমে ওর বাছ ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। অনন্তর জ্রাহি জ্রাহি অবস্থা।

বৈশাখী আবার বলল—তুমি নিষ্ঠুর।

অনন্ত হেসে ফেলল। বলল—ব্যাপারটা বলবে তো?

গৈরী যদি মরে তো তোমার জন্তই মরবে।

—বাঃ। আমি ওকে বোমা মেরেছি? নাকি ওর বিয়লা পুঁক্বে মেরেছে?

—সেকথা নয়। তুমি আজ কতদিন যাওনি? বেচারী কেঁদে হাপসে গেছে।

আমরা কাল গিয়েছিলাম। কি কারা। আসবার সময় হাত ধরে বলল, ওকে একবার পাঠিয়ে দিও।

অনন্ত গুম্ হয়ে থেকে বলল, সে না হয় যাবো। তবে কি এই যে জুড়ি বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন স্থখের দিন নাও থাকতে পারে।

—সে কি জামাই ?

—হ্যাঁ। আমি দু'একদিনের মধ্যেই অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিচ্ছি। তোমরা তৈরি হও গে। বাল বাচ্চা বুড়ো বুড়ি নিয়ে খোলা আসমানের নীচে অনশন গুরু হবে। ঘরে বসে মরে হারিয়ে কেঁদে কেটে চোখের জল ফেলে কিছু হবে না। সবাই একসঙ্গে আত্মাহুতি দাও। কয়লা কুঠির ইতিহাসে এক নতুন নজীর তৈরি কর। পারবে ?

—পারবো জামাই।

কণ্ঠস্বর নীচু কিন্তু দৃঢ়। জগদীশ ও হরেরামের মুখ দুটি কঠোর। কুস্তীরও চোখ জ্বলছে। ওরা সংগ্রামকে ভয় পায় না।

অনন্ত পকেট থেকে কুড়িটি টাকা বের করে জগদীশকে দিয়ে বলল—ভোজীদের জন্ত দুটি শাড়ি আর চম্পাকে একটা ফ্রক কিনে দিও। দেখো মদ খেয়ো না।

—ছিঃ। কি যে বলো। চল গে বহ !

ওরা চলে গেল।

কঠিন প্রতিজ্ঞায় অনন্তর মুখটাও কঠিনতর হয়ে গেল। ঘরে ঢুকেই অনশন ধর্মঘটের নোটিশ ড্রাকট করতে লেগে গেল। আর পথ নেই।

কিছু টাকার দরকার। পরদিন সকালেই গুলুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল বাপু! গৈরীর গয়নাগুলো আছে ?

সে বলল—রূপোর গয়না সবই বিক্রি হয়েছে। সোনাগুলো আছে। তুমি নিয়ে যাও।

—বিউটি গুকে আদর করে পরিয়ে দিয়েছিল। আজ বড় দুঃসময়ে তা কাজে লাগল।

আংটিটা রেখে বাকী সব বিক্রি করল। কিছু টাকা গুলুকে দিলো চাল গম কিনতে। বাদবাকী রইলো অনশন ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্ত।

সপ্তম

দু'দিনের মধ্যে সবকিছু তৈরি করে ফেলল। তারপর হাজার খানেক কুলি-কামিনের একটা মিছিল নিয়ে এক্সেস্ট সাহেবের অফিসে এসে নোটিশ দিলো। তার কপি রেজিষ্ট্রি পোস্টে পাঠিয়ে দিলো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রকে, লেবার কমিশনার অফিসে, দেবেন, কল্যাণ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও কোম্পানীর সি. এম. ই. থেকে বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে। আসানসোল পোস্ট অফিস থেকেই এসব কাজকর্ম চুকিয়ে হাসপাতালে গেল।

মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। ভিতরে ঝড় বইছে। কি বিরাট ঝুঁকি সে নিয়েছে তা সে ভালোই জানে। গৈরী গুর মুখ দেখেই ভয় পেয়ে গেল। বলল—
কি হয়েছে গো ?

অনন্ত বলল—তোর কি বাঁচার সাধ আছে ?

গৈরী থমকে গেল। অনন্ত কয়েকদিন না আসার জন্তু যে অভিমান ও অভিজোগ পুষে রেখেছিল তা চূপসে গেল।

বলল—আমার সাধ আফ্লাদ, বাঁচা মরা সবই তোমাকে নিয়ে। নিজের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

—বেশ। তবে মরার জন্তু তৈরি হ।

—তাই হবে। কিন্তু কেন ?

—কোম্পানীর সঙ্গে অনেক মিটিং হলো। শুধু ধানাই পানাই টাল বাহানা করে সময় নষ্ট করছে। ওয়াগন লোডারদিকে ওরা চাকরি দেবে না। তাই আমি আজ অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে এলাম। তোকেও তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে শুইয়ে দেব। মবতে হয়ত একটা মহৎ কারণের জন্তুই মর।

শুক্ক বিষ্ময়ে গুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গৈরীর চোখ ছুটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল—সেই ভালো। তিল তিল করে দন্ধে মরার চেয়ে ঐভাবে মরাই ভালো।

—তা বলে যে আসবে তার কাছেই কান্নার হাট বসিয়ে দিস না। সবাইকে এক কথা—ও আসছে না—ও আসছে না। আমি কি ওখানে বসে আছি ? নাকি কল্যাণীর সঙ্গে প্রেম করছি ?

—আর খোঁটা দিও না তো। তুমি এত জান—এত বোঝ—আমি যে কখন কি বলেছি তাই ধরে বসে আছ।

—আচ্ছা। ধৈর্ষ ধরে থাক। আমার এখন অনেক কাজ। প্রশান্ত তো প্রায়ই আসে। স্ববীর কমলেন্দুও আসে। কোনো খবর থাকলে ওদেরকে বলে পাঠাস।

—মন যে মানে না গো। তোমাকে দেখলেই বুকে বল পাই। না হলেই জগৎ অন্ধকার। কান্না কি এমনি আসে ?

অনন্ত ওকে আরো কিছু সাঙ্ঘনা দিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে চলে এল। ফিরেই ওকে হুনিয়া ধাওড়া যেতে হবে।

পরদিন সকাল দশটা। মেস ফাঁকা। সবাই ডিউটিতে গেছে। ঠাকুর রান্না করছে। ঝি তরকারি কুটছে। ধরে একা অনন্ত। কাঠের বাকলো দিয়ে তৈরি টেবিলে কাগজপত্র মেলে নিমগ্ন হয়ে আছে মিটিংয়ের প্রস্তুতির জন্তু।

হঠাৎ একটি ঝকঝকে ডকুণী এসে গুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অনন্ত

বিহ্বল হয়ে তাকাল ওর দিকে। সারা গায়ে নতুন গয়না ঝলমল করছে। সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। পরনে সিন্ধের শাড়ি। মিট মিট করে হাসছে।

বিস্মিত কণ্ঠে অনন্ত বলল—নীতু—তুই ?

—হ্যাঁ দাদা।

—বোস বোস। আর কে এসেছে ?

—এই যে।

ও বলতে না বলতেই নীতির স্বামী সুনীল ওকে প্রণাম করল।

অনন্ত ওকে জড়িয়ে ধরে বলল—আরে ! আমাকে প্রণাম করছ কেন ?

—বাঃ। আপান দাদা।

—হলেই বা। আমি তো ব্রাহ্মণত্ব হারিয়ে ফেলেছি।

—ধ্বজত্ব পেয়েছেন দাদা। কয়লা কুটির বৈপ্রবিক চরিত্র।

ওর কথা শেষ হতে না হতেই অনন্ত চোঁচিয়ে উঠল—মা। তুমিও ! ব্যস্ত হয়ে প্রণাম করল। উনি ওর মাথায় হাত রাখলেন।

অনন্ত ওর কাগজপত্র গুটিয়ে টেবিলটা সরিয়ে দিলো। ছুটি খাটে ওরা মুখোমুখি বসল। ঠাকুরকে পাঠাল মিষ্টি আনতে।

অনন্ত বলল, তোমরা এসেছো দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে। তুমি ভালো আছ তো মা ?

—সে খবরে তোর কি দরকার ?

—মা !

—নীতুর বিয়েতে যে গেলি না ?

অনন্তর মুখেও দুষ্ট কথার বেরিয়ে এল—তুমিই তো বারণ করেছিলে মা।

—ওঃ। সেই কথার এতদিনে শোধ নলি।

অনন্ত চূপ করে রইল। নীতি বলল—এই সব কথা বলতে এসেছো মা ?

তবে যে কৈদে ভাসাচ্ছিলে।

—আমি এখনো কাঁদছি। আমার কান্নার কি শেষ আছে ? না মায়ের কান্নার দাম আছে ? আমি বিক্রির দলিলে সহি করেই বড় ভাইয়ের কর্তব্য শেষ
—এই ছেলে !

অনন্ত সে কথারও জবাব দিলো না। আত্মমগ্নভাবে আবার সেই কাগজ-গুলিই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

সুনীল একজন সার্ভেয়ার। গত বছর পাশ করে রাণীগঞ্জ কিন্ডে একটা কলিয়ারীতে কাজ করে। কোয়ার্টারে থাকে। অনন্তর নাম সারা কোলকিন্ডে। কিন্তু কখনো চোখে দেখেনি। সেক্ষেত্রে অদম্য কোতূহল ছিল ওকে দেখার। নীতিকৈ সেকথা বলতেই ও বিগলিত হয়ে উঠল। দাঁটার চেয়ে বউদিকে দেখার

কোঁতুহল আরো বেশী। মায়ের অস্থখের সময় যদি ওর একটা স্বামী থাকত তবে অনন্ত ঠেকাতে পারত না। আজ ওর কত আফশোস। সেই দুঃস্থ চরিত্রের বউদি মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে। ছেলেটিও মারা গেছে।

সুনীল অষ্টমঙ্গলা করতে এসে প্রোগ্রাম করেছিল দুজনে বেরুবে, দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করবে, কোয়ার্টারে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে তারপর নীতিকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

নীতি খুব খুশী। স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাবে স্থখ যেন ধরে না। কিন্তু সে তার মাকে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে দেখতো তাই বলেছিল, দাদা বউদির সঙ্গে দেখা করতে যাব তুমি যাবে নাকি মা ?

যে মাকে সাধ্য সাধনা করে টলানো যায় না তিনি এক কথায় রাজী হলেন। অথচ এখানে এসে কথার পিঠে কথা বাড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জাহ্নবীদেবী বললেন, তুই এতো দুই কি করে হলি অনন্ত ? নিজের বোনের বিয়ে। একবার ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলি নে।

অনন্ত মরমে মরে যাচ্ছিল। বলল—সেজ্ঞা আমার যে কি অনুশোচনা ভোগ হয়েছে তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু না যাওয়ার পিছনেও কারণ ছিল মা।

উনি গলায় জোর দিয়ে বললেন—কি কারণ তাই বলতে হবে।

অনন্ত একটু থেমে বলল—আমার লজ্জা সংকোচ নিয়ে কুটুম্বজনের সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়েছিল। পাছে কেউ হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। পাছে কেউ জ্ঞাত তুলে খাবো না বলে।

—কাপুরুষ ! যে কাজ করে লজ্জায় মাথা তুলতে পারিস না তা করেছিল কেন ?

কাপুরুষ শব্দটা অনন্তর বুক বুলেটের মতো লাগল। ঘাড় নীচু করে অনেকটা দুর্বিনীত ভঙ্গীতে বসে রইল।

মেসের ঠাকুর মিষ্টি, সিঁড়া ও কেটলিতে চা নিয়ে এল। নীতি উঠে সেসব ডিশে সাজিয়ে দিলো। ওর মাকে ছোটো মিষ্টি দিয়ে বলল—নাও মা।

উনি ইতঃস্তত করছিলেন। নীতি বলল—তুমি গতবারে কিছু খাওনি মা। এবার না খেলে দাদাকে অপমান করা হবে।

অনন্ত বলল—কি বলছিস নীতু ? ওতে কি অপমান যায় ?

জাহ্নবীদেবী না করলেন না। খাওয়া দাওয়ার পর নীতি এঁটো গুটিয়ে বাইরে রেখে এল।

ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন—গৈরী কেনল আছে ?

—ভালো নয়। মরলেই খালাস পায়।

নীতি চমকে উঠল। সুনীলও।

ওর মা বললেন—ছেলেটাকেও মেরে দিয়ে গেল। লোকের সঙ্গে এতো হুশমনি করে রেখেছিলি। সেই যদি অপারেশনের সময় ওদের মা-বেটাকে নিয়ে আসতিস তবে তোর কি মান যেত? নাতির মুখটা পর্যন্ত দেখতে দিলি না—এত ছুঁছুঁ তুই।

যে অনন্তর জ্বিতের ডগায় বারুদের মতো কথার ফোয়ারা সে তার মায়ের তিরস্কার নীরবে নত মস্তকে হজম করে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ চাপ থাকার পর আবার উনি বললেন, তোর চাকরি চলে গিয়েছিল। আবার পেয়েছিল।

—না।

—চাকরি নেই। রোজগার নেই। তবে এখানে পড়ে আছিস কেন?

—কোথায় যাবো মা?

—কেন? বাড়ি যাবি।

অনেকক্ষণ পর দূরাগত সমুদ্র কল্লোলের মতো বুকভাঙা কণ্ঠস্বরে অনন্ত বলল—যাবো মা। ছেলেটা তো গেছে। বউটাও মরুক তবেই ওর শ্রাদ্ধ শাস্তি চুকিয়ে, গঙ্গাস্নান করে তোমার কাছে যাবো।

উঠে বাইরে চলে এল। তীব্র সঞ্চারী আবেগের তাড়নায় আত্ম-সংবরণ করতে না পেরে বারান্দার সিঁড়িতে বসে হু হু শব্দে কঁদে ফেলল।

সুনীল ওর কাছে এসে বলল—দাদা! আমি একটা বৈপ্রবিক চরিত্র দেখতে এসেছিলাম। তার চোখে অশ্রু জল দেখতে নয়।

—পারছি না রে ভাই। হুঃখের পর হুঃখ, আঘাতের পর আঘাত আমাকে স্তেঙে চুরে তছনছ করে দিচ্ছে।

—উঠুন। বারান্দায় বসে কাঁদলে লোকে হাসবে।

ওকে টেনে ঘরে নিয়ে এল।

নীতি বলল—মা। যখনই আসো তখনই দাদাকে কাঁদিয়ে দাও। কি যে তোমার মতিগতি তাও বুঝি না। বৌদিকে তুমি গ্রহণ করতে পারবে না তা আমরা জানি। সেকথা তোমাকে বলতেও যাবো না। সেও কোনো সাধারণ মেয়ে নয় যে কঁদে ককিয়ে করুণা ভিক্ষা করবে। তারও নিজের জগতে প্রচুর মান সম্মান আছে। সে একটা সংগ্রামী মেয়ে। জাত-পাত যদি না দেখতে যাও তাহলে কিন্তু সে দাদার যোগ্য স্ত্রী।

নীতির এ বক্তৃতাটা কার মনে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল কে জানে সবাই চুপ করে রইল।

আর কিছুক্ষণ পর খাওয়ার ভাক পড়ল। তখন অন্তান্ত টেনিরাও এসে

পড়েছে। অনন্ত বলল—মা। তোমার জন্ত ফল মিষ্টি দুখের ব্যবস্থা করেছে। এই ঘরেই দিতে বলছি।

—তাই বল।

ওঁকে ভিতরে দিয়ে আর সকলের সঙ্গে অনন্ত, হুনীল ও নীতি পাশাপাশি বসে খেল। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকতে প্রায় দেড়টা বাজল। ওরা যাবার জন্য তৈরি।

জাহ্নবীদেবী বললেন—আমরা গৈরীকে দেখে যাব।

—ওকে আর কি দেখবে মা ?

—বাঃ রে ! ও আমার অহুখের সময় এত সেবা করল আর আমি তাকে দেখতে যাব না ?

অনন্ত ফট করে জবাব দিলো—একটা সেবাদাসীকে অহুকাপ্পা দেখাতে যাবে তো মা।

জাহ্নবীদেবী ওর মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—মাকে এত নীচ মনে করিস ? তোর মনটা এত ছোট হয়ে গেছে।

নীতি বলল—আবার গুরু করলে। মা-বেটাতে অডি-বষ্টি। একটা কিছু লাগলেই হলো।

—তোমার দাদাকে বল।

অনন্ত বলল—ঘাট হয়েছে মা।

—তুই আমাদের সঙ্গে যাবি তো ?

—না—মা। আমার মিটিং আছে।

নীতি বলল—তাহলে আমরা কি করে চিনব ?

—সাতষষ্টি নম্বর বেড। মা চেনে ওকে।

—বেশ।

তখন ভিজিটিং আওয়ার্স। রোগিগীদের আত্মীয় স্বজনরা আসা যাওয়া করছে। গৈরী একদিকে কাৎ হয়ে আচ্ছন্নের মতো শুয়ে আছে। এমনি করেছে থাকতে হয়। চিং হতে পারে না। তাহলে দগদগে ঘায়ে চাপ পড়বে।

কারো আসবার কথা ছিল না তাই তার প্রতীক্ষাও ছিল না। সীমাহীন দুঃখ যন্ত্রণা বৃকে চেপে রেখেছে। শরীরের কয়েকটা জায়গায় মাংস পচে গেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন—আবার অপারেশন করতে হবে। অর্থাৎ পচা মাংস ছুরি দিয়ে টেঁচে তুলে দেবেন। ভাবতেও গা শির শির করে। এমনিতেই অজস্র জালা যন্ত্রণা তারপরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

কি জন্ত যে বেঁচে আছে তাই ভাবে। এখন তো ছুনিয়ার একটা আবর্জনা। অনন্তর জীবনের বোঝা। অমন একটা সরল, স্থল্লর, সৎ মানুষ জেঙে চুরে

একাকার হয়ে গেল। সে যদি মরে যেত অনন্ত কষ্ট পেত ঠিকই কিন্তু কালের পলি পড়ে সে ক্ষত একদিন সেরে যেত। আবার সে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত। সেই গুকে ছুঁবিবহ যজ্ঞপার মধ্যে টেনে নামিয়েছে।

এইভাবে ক্রমে ক্রমে গুর মৃত্যু ভাবনার স্বপ্নে অনেক যুক্তি খাড়া করেছিল। সেই কারণেই সে জ্ঞানাগত ক্ষয়ে যাচ্ছিল। তারপর যেদিন অনন্ত গুকে মরার জ্ঞান প্রস্তুত হতে বলে গেল সেদিন থেকে ও মৃত্যুরই স্বপ্ন দেখছে।

হঠাৎ একটা স্নেহ কোমল হাতের স্পর্শ পড়ল গুর কপালে। খুব স্বস্তি বোধ করল। আশ্চর্যগত ভাবেই বলল—আঃ।

—বউ মা!

এমন মিষ্টি, এমন আন্তরিক ডাক সে জীবনে কখনো শোনেনি। বউমা বলে কোনো শব্দ বাংলা অজিয়ারে আছে তাই বুঝি ও জানে না। শব্দটি তার কানে ঢুকল। স্বপ্নে কাণ্ড বেয়ে নিচে নামল। ইঁড়া পিকলাকে স্পর্শ করল। মূলাধার আলোড়িত হলো। যেন ধীরে ধীরে আগ্রস্ত হলো কুলকুণ্ডলিনী।

এক অল্পত অল্পভূতিতে সারা মন ছেয়ে গেল। চোখ খুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। শব্দ ও স্পর্শের স্বাদ বহুকক্ষ যাবৎ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অম্লভব করল। তারপর চোখ মেলল। সামনেই একজোড়া ঝকঝকে, তকতকে যুবক যুবতী। কি স্নন্দর দেখতে!

জাহ্নবীদেবী মাথা শিতানে ছিলেন। তাই প্রথমটা দেখতে পায়নি। উনি এখন দ্বিতীয়বার ডাকলেন—বউমা! তখন গুর আচ্ছন্ন চেতনায় নিবিড় অম্লভূতির জগৎ অপসৃত হলো।

অক্ষুট কণ্ঠে বলল—মা! আপনি?

—হ্যাঁ মা! কেমন আছ?

—কি করে যে বেঁচে আছি তাই জানি না মা। বিপ্লবের শোকে মারা যাচ্ছি।

করুণ বেদনার্ত কণ্ঠস্বর। কারো মুখে উত্তর জোগাল না। ক্ষণকালের নীরব অন্ধ বিসর্জন।

নীতি বলল—আমাদিকে চিনতে পারলে না বোঁদি? আমি তোমার নন্দা নীতি। এই তোমার নন্দাই।

গৈরী একটা শীর্ষ হাত গুর দিকে বাড়িয়ে বলল—আপনার দাদার কাছে শুনেছি আপনার বিয়ের কথা। আপনারা ভালো আছেন?

গুর হাতটা ধরে নীতি বলল—তুমি এমন আপনি—আপনি করছ কেন বোঁদি? গুতে যে পর পর মনে হয়। তুমি বল।

—তাই বুঝি। গৈরী-হাসল। মলিন মুখে অমলিন হাসি।

বলল—মা। আপনি সেরে উঠেছেন তো?

—হ্যাঁ মা। তুমি তখন জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলে বলে বের্বেচেছি।

—মা। পরমাষু আপনার। আমরা কি করতে পারি ?

—তোমার সেবা এবং দায়িত্ব পালনের কথা ভুলব না মা।

গৈরী একটুকুশ চূপ করে থেকে বলল—এটুকু স্বকৃতির জন্ত আজ আমাকে আশীর্বাদ করুন মা—যেন তাড়াতাড়ি মরে খালাস পাই।

—বউমা !

—আপনার ছেলে মুক্তি পাবে। আমাকে নিয়ে ওর যে কত যত্নশা তা আমিই জানি। আর কেউ না। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। অত বড় একটা ফলয়বান মানুষকে আমিই টেনে নামিয়ে দিয়েছি। আজ সে আমার জন্ত সমাজ সংসারে মুখ দেখাতে পারে না। যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই দুঃখ আমাকে ভোগ করতে হবে। আমাকে আশীর্বাদ করুন মা।

জাহ্নবীদেবীর নাড়ীতে নাড়ীতে পাক দেবার বেদনা। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্বস্ত কোনো জীবন্ত সরীসৃপের দ্রুত সঞ্চারণের স্তূতির আলোড়ন।

এই তার পুত্রবধু। যাকে ছোটলোকের মেয়ে বলে বোঝা করেছেন। তার এক একটি কাজ ও কথা অলৌকিক মাত্রা নিয়ে হাজির হচ্ছে।

বললেন—না বউমা। সে আশীর্বাদ আমি তোমাকে করব না। গৈরীর মুখটা মলিন হয়ে গেল। আবার সে চোখ বুজল। একরাশ জলবিন্দু গাল বেয়ে পড়ল। আঁচল দিয়ে যত্ন করে ওর মুখ মুছে দিয়ে বললেন—তুমি ভালো হয়ে ওঠো মা। অনন্তর জীবনকে আলোকিত কর। আমি হিয়া খোলসা করে আশীর্বাদ করছি—তুমি ভালো হবে—আবার তোমার কোলে সন্তান আসবে।

—আবার আমার কোলে সন্তান আসবে ?

—হ্যাঁ মা ! নিশ্চয় আসবে ?

—আমার যে বাঁচতে ইচ্ছে করছে মা।

—বাঁচো মা। তুমি বাঁচো—অনন্তকে বাঁচাও—নতুন করে সমাজ গড়। তোমরা আমার স্বামীর আদর্শ পেয়েছো। তোমাদের তো জিৎ হবেই।

তীব্র আবেগে গৈরীর সারা গা কাঁপছিল। দেখতে দেখতে কান্নার বাধ ভেঙে গেল। সেই ধাক্কাটা সামলে নেবার পর গৈরী একটু স্বাভাবিক হলো।

নীতিকে বলল—মা আমাকে বাঁচবার আশীর্বাদ দিলেন আর ওমিকে তোমার দাদা আমাকে মরবার জন্ত প্ররোচিত হতে বলে গেছে।

নীতি অর্থাৎ হয়ে বলল—সে কি ? না—না। দাদা তোমাকে মরতে বলবে না। এটা তুমি ভুল বুঝেছো বোদি।

গৈরী হাসল। বলল—না—না। তুমি যা ভাবছো তা নয়। তোমার দাদা

১৫ই ডিসেম্বর থেকে অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে। তাই বলেছে—এখানে মরবি কেন? মরতে হয় তো অনশন ধর্মঘট করে আশ্রয়বলি দে।

—তুমি রাজী হয়েছ?

—হ্যাঁ।

গৈরীর কণ্ঠস্বরে গভীর আত্মপ্রত্যয়। ওরা মুখ চাওয়াচাঘি করল। নীতি বলল—শুনেছো মা? বৌদি এই শরীরে অনশন ধর্মঘট করবে। দাদাকে তুমি বারণ কর গে মা।

—ও কি বারণ শুনবার ছেলে? আমার হাড় মাংস জালিয়ে দিলো।

একান্তর

তখন অনস্তর সামনে দুজন জবরদস্ত অফিসার। খুব কায়দা মাফিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মগজ খোলাই চলছে।

—তুমি বুঝে ছাখ অনস্ত, তোমার স্ত্রী অসুস্থ। তার জন্ম ভালো চিকিৎসার প্রয়োজন। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর দীর্ঘদিন শুক্রবার প্রয়োজন। রান্নাবান্না, ঘর গৃহস্থালীর কাজ করতে অনেক সময় লাগবে। এ সময় তোমার একটা আশ্রয়, নিশ্চিত উপার্জন এবং শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন। আমরা তোমার দিকটা খুব ভালো করে ভেবেই প্রস্তাবটা দিয়েছি।

মি: ভার্মার বলা শেষ হলে মি: শুকুল শুরু করলেন—তুমি ডি. ডি. সাহেব নও। তা কোনোদিন হতেও পারবে না। আনকোয়ালিফায়ডে অ্যাসিস্ট্যান্ট হবার জন্ম তোমার জীবন নয়। তুমি ফার্স্ট ক্লাস পাস করে আমাদের পোস্টে আসবে। কাজেই ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট সাময়িক।

অনস্ত বলল, স্তার। আমার জন্ম যে এতটা ভেবেছেন এ জন্ম কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কিন্তু মূলে তো ম্যানেজমেন্টের একটাই উদ্দেশ্য তা হচ্ছে আমাকে শ্রমিক সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

মি: ভার্মা কলমটা নিজের নাকে ঠেকিয়ে বললেন—তুমি সত্যই বুদ্ধিমান অনস্ত। কিন্তু আমরা যা ভাবছি তার পুরোটাই প্রিটেনশান নয়। তোমার দিকটা তুমি এখন বুঝতে পারছো না—পরে পারবে।

—আমি এখন বুঝতে পারছি স্তার। যে অসুবিধার মধ্যে আছি তাতে ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট এবং বাংলা আমার কাছে স্বর্গস্থলের সমান। কিন্তু যাদের জন্ম আমি এসেছি তাদের অসুখ বড়ই মারাত্মক। ওদের জন্ম কি করবেন তাই বলুন স্তার।

মি: ভার্মা একটা ফাইল দেখতে দেখতে বললেন, তোমার চটজলদি অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া ঠিক হয়নি। আমরা তো একজন কিম তৈরি করছি।

তাতে তোমারও সহযোগিতা চাই, বোর্ড অফ ডাইরেক্টার্সেরও অনুমতি চাই। তাই সময় দিতেই হবে।

১৫ই ডিসেম্বরের আগে কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

—জানুয়ারি মাস পর্যন্ত লেগে যাবে।

—স্কিমটা কি ?

—ট্রান্সফার নিতে হবে চার পাঁচটা কলিয়ারীতে। ভাগ করে কাজ দেবো। কিছু লোককে রিটায়ার করাতে হবে। যারা মারা গেছে তাদের বদলি কাজ দিতে পারি আগার গ্রাউণ্ডে।

—আমাকে এই স্কিমটার কথা পুনরায় ভাবতে হবে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। দয়া করে স্কিমের একটা কপি দিন এবং আমাকে লিখিতভাবে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময় সীমা ধার্ষ করার চিঠি দিন। তাহলে আমিও তারিখ বদল করবো।

—ও. কে। কিন্তু তারপরে আমরা তোমাকে অফিসার হিসেবে দেখতে চাই। ড্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসেবে নয়।

—কেন স্মার ? এই ইস্যুটার উপর এত জোর দিচ্ছেন কেন ?

—আমরা শ্রমিক ইউনিয়ন খতম করে দিতে চাই না। ওটা থাকবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অলঙ্কৃত আসন হিসেবে। মাঝে মাঝে মিছিল ও তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লোগান হবে। নরম গরম আলোচনা হবে। শ্রমিকদের দাবি সরব, সদৃশ, উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি হয়ে উঠবে। এভরিথিং লাইক স্পোরটস। সেখানে তোমার মতো নেতা যে নাকি তার মরণাপন্ন স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে তুলে এনে অনশন ধর্মঘটে শামিল করে দিতে চায় ! তাকে সহ্য করব কি করে।

অনন্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, বুঝেছি স্মার। আমি নিজেই নিজেকে সহ্য করতে পারি না আপনারা কি করে করবেন ? আমাকে তিন দিন সময় দিন। তার মধ্যে আপনারদের স্কিম আমাদের পক্ষে কতটা গ্রহণযোগ্য তা এবং আমার নিজেরও সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবো।

—ও. কে।

পরদিন সকালে স্মৃতিতবাবু এলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলো অনন্ত ?

—ওরা আমাকে ডি. ডি. সাহেবের পোস্ট অফার দিয়েছিল দাদা। আমি তা রিজেক্ট করেছি।

স্মৃতিতবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত বড় লোভনীর প্রস্তাব কেউ ছাড়তে পারে ? বললেন, তোর মতোই কাজ করেছিল। কিন্তু আমরা যে মনে গেলাম অনন্ত। শ্রমিকরা নেতাদের কাছে অত্যন্ত অজিযোগের কথা বলে। নেতারার কার কাছে বলবে ? কি কষ্টে যে আমার দিন কাটছে তা তোকে কি বলবো ?

বস্ত্রত পুনর্বহালের জন্য সুমিত চ্যাটার্জী ও স্বপ্না চ্যাটার্জীর নাম ফাইন্সাল অর্ডারের মুখে এসে গিয়েছিল। অনন্তর স্বস্তুর শাওড়ি সহ তেমন কর্মীর সংখ্যা ছিল ছাপায় জন। অনশন ধর্মঘটের নোটিশ দেবার পর সেসব অর্ডারগুলিও বন্ধ করে রেখেছে। নোটিশটা যদি আর দু'দিন পরে দিত তাহলেই ওরা ডিউটি জয়েন করে যেত। অনন্ত তা জানে। তবু দু'দিন সবুজ করেনি। কারণ ওরা চাকরি পেলেই তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন আন্দোলনের ধার কমে যাবে।

অনন্ত বলল, দাদা আর দু'দিন অপেক্ষা করুন। সব কিছু নির্ভর করছে আমার একটা সিদ্ধান্তের উপরে। আমিও সে সিদ্ধান্তের জন্য তৈরি হয়েছি।

—বীচালি ভাই। তুই আমার গর্ব অহঙ্কার। যাই, তোর বৌদি এই খবরটার জন্য ছটকট করছে।

—পরশু বিকেলে এই মিটিংটাতে আসুন দাদা। আপনিই এই ইউনিয়নের হোতা। আপনাকে বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে না। একটা কাজ আপনাকে জিজ্ঞাসা না করে করেছি বলে অপরাধ নেবেন না।

—নারে না। তুই আমার ভাই।

শ্রীতের অপরাধে চরিতরের চবুতরায় বসে সেই বুকভাঙা সিদ্ধান্তটিই তাদেরকে- নিতে হলো। সব ওয়োগন লোডার জমা হয়েছিল। তাদের কাছে কোম্পানীর তৈরি স্কিমটি পড়ে শোনাল অনন্ত। কোথাও টু শব্দ নেই। সবাই শুরু হয়ে গুনছে। রামকানালীতে কোম্পানীর নতুন কোয়ার্টারী খাদান হচ্ছে। সেখানে পাথর কাটার জন্য দু'শোজন কুলিকামীন যাবে। আলু ডি কলিয়ারীতে নতুন সাইডিং লাইন হচ্ছে সেখানে আপাতত অন্ত্যস্ত কাজের জন্তে ও পরে ওয়োগন বোঝাই করার জন্য বাহান্তর জন, বনবহাল কলিয়ারীতে তিপায় জন এবং এই কলিয়ারীতে দিন হাজারীর কাজে আটচল্লিশ জন ও খাদে লোডারের কাজে যাবে বাইশ জন। সাকুল্যে তিনশো পঁচানব্বই জন। আটজন মারা গেছে। তাদের ছেলেদিকে লোডারের কাজে এই কলিয়ারীতেই রাখা হবে।

তোমরা সব রাজী তো ?

কে জবাব দেবে ? কেউ দু'পুরুষ, কেউ তিন পুরুষ, যাবৎ এই কলিয়ারীতে কাজ করছে ও খাওড়াতে আছে। তাদের শিকড় গজিয়ে গেছে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে থা হয়ে ভালপালা ছড়িয়ে পড়েছে। কারো বা প্রেম প্রীতির সম্পর্ক আছে। দোকানদারি, রিকশা টানা, জনমজুরি কাজকর্মে আত্মীয় স্বজনরা করে থাকে।

সে সব ছিঁড়ে খুঁড়ে ডেরা ডাঙা নিয়ে অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়া কি সহজ কথা ? সব চূপ করে আছে।

অনন্ত বলল—চূপ করে থাকলে তো চলবে না। আমি আমার শেষ রক্ত-বিন্দু দিয়ে চেঁচা করেছি। কিন্তু যে কলিয়ারীতে বেসিঙে ওয়োগন বোঝাই হচ্ছে

সেখানে আমি চারশোজন শ্রমিকের বোঝা—কোম্পানীকে রাজী করাবো কি করে? এই যে হয়েছে তার জন্তও আমাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছে। তোমরা বল। চূপ করে থেকে না।

তখন নেপথ্যে কয়েকটা চুড়ির শব্দ হলো। কিষণ ও চরিত্তর উঠে গেল। একটু পর ফিরে এসে বলল—রাজী না হয়ে উপায় কি বল? অনেক দগদন হয়েছে। কষ্ট পেয়েছি। রোজগার থাকলে বনেও বাস করা যায়। আমরা রাজী আছি।

ক্লাস্তির শেষ পর্ধ্যায়ে পৌঁছে গেছে ওরা। দরিদ্র শ্রমজীবী গোষ্ঠীর পক্ষে বৎসরাধিক কাল ভুখ পিয়াসে লড়াই করা সহজসাধ্য ছিল না। এরই মধ্যে কত দুর্ঘটনা, জন্ম মৃত্যু ঘটে গেছে। আরো কি পারে?

সেদিন মিটিংয়ে অনন্তর সঙ্গে স্মিতবাবু, রাজকিশোর সিং, কিষণ, চরিত্তর ও কেন্দ্রীয় কমিটির দুজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ভার্মা, মিঃ শুকুল, মিঃ দীক্ষিত ও ডেপুটি সি. এম. ই. হাজির ছিলেন কোম্পানীর তরফে। তিন ঘণ্টা আলোচনার পর এক-আধটু ওলট পালট করে ঐ স্কিমটা কার্যকরী করার জন্ত বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের কাছে পাঠানো স্থির হলো। সি. এম. ই. সাহেব তখন কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাই গুর সহিটা পরে হবে বললেন।

জনপ্রতি পাঁচশো টাকা অহুদান মঞ্জুর করারও সুপারিশ হলো। তবে সব কিছুই বোর্ড অফ ডাইরেকটর্সের অহুমোদন সাপেক্ষ।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনন্ত অনশন ধর্মঘটের তারিখ এক মাস পিছিয়ে ১৫ই জ্যাম্বারি ১৯৫৭ সালে রাখল। যে ছাপায়জন বরখাস্ত কর্মীর পুনর্বহালের কথা হয়েছিল তা অবিলম্বে কার্যকরী করার জন্ত তৎক্ষণাৎ চিঠিপত্র সহি সাবুদ করে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। বাকী রইল একজন। সে অনন্ত। কোম্পানী তাকে তাদের কোনো কলিয়ারীতে অফিসারের কাজ দিতে রাজী, কিন্তু সাধারণ কর্মী হিসেবে তাকে নেবেন না। এটা ওরা জলের মতো পরিষ্কার করে দিলেন। অনন্ত তা নিয়ে চাপ দিলো না। বরং বলল—আমাদের এই জেটেলম্যানস এগ্রিমেন্ট কার্যকরী হলেই আমি পদত্যাগ করব। আপনারা দয়া করে বরখাস্তের নোটিশটা তুলে নেবেন।

—ও. কে.।

—কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই রয়ে গেল অহুমোদন সাপেক্ষ। যদি বোর্ড অফ ডাইরেকটর্স অহুমোদন না দেন তাহলে?

মিঃ ভার্মা বললেন—একটা মুঁ কি তো নিতেই হবে।

মিঃ দীক্ষিত বললেন—আপনাদের ট্রাইবুন্সালের মাঝলা তো আর তুলে নেননি। কাছেই কোনো কিছুই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বললেন—হ্যাঁ। আন্দোলক হাঁটতর সব ভাস এখনো

ফেলে দিইনি। তাছাড়া অনশন ধর্মঘটের নোটিশ তো রইল। তারিখটা শুধু পেছিয়ে গেল।

অনন্ত বলল—সেটাও কম ক্ষতি নয়। একবার মানসিক প্রস্তুতি ভেঙে গেলে পরে তাকে তৈরি করা শক্ত।

মিঃ ভার্মা বললেন—ম্যানেজমেন্টকে এতটা সন্দেহ করলে চলে না অনন্ত। লেট আস টেক ইট স্পোরটিলি ?

—ও. কে. স্মার।

দিনের পর দিন কাটছে। দীর্ঘ শীত রজনী দীর্ঘতর হচ্ছে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ঘুম হচ্ছে না। অল্পমোদন আসতে যত দেরি হচ্ছে তত তার উৎকণ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে।

অথচ বাইরে সব ঠিক ঠাক আছে। তেমনি কলিয়ারী চলছে। দিন দিন রেজিং বাড়ছে। সাহেবরা ক্রমশই শক্তভূমির উপর দাঁড়াবার জায়গা করে নিচ্ছে।

ওদিকে শ্রমিক সংগঠনে চলছে ভাঙনের ঢেউ। বহু কলিয়ারিতে ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কোম্পানীগুলি নেতা ক্রয়ের বাণিজ্য করছে। আজকাল নেতাদের খাদে ডিউটি করতে হয় না। তবু তাদের প্রমোশন ও ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে। ক্রমশই ভোল পার্টে যাচ্ছে এদের।

এসব দেখে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। যে পঞ্চাঙ্গজন বরখাস্ত কর্মী ডিউটি জয়েন করেছে তারা সবাই বশংবদ হয়ে উঠেছে। হয়তো এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন যাবৎ অসীম ক্লেশ ভোগ করার পর একটু সুখের মুখ দেখেছে তাই।

তার খবর বেচারী গুলু ঘটাওলা রোজ একবার মেসে এসে তার খবর নিয়ে যাবেই। কোনো কথাবার্তা নেই। আসে, ওকে দেখে আর চলে যায়। যেদিন গৈরীকে দেখতে যায় সেদিন এসে খবরটা দিয়ে যায়। ঈশ্বরের রূপায় সে এখন সেয়ে উঠছে। গতবার গিয়ে চলাফেরা করতে দেখে এসেছে।

দু'চারদিন পরে পরেই ছুনিয়া ধাওড়াতে যায়। রোজই একই কথা—আজও কোনো খবর নেই ভোজী।

তা শুনে ওদের মলিন মুখ আরো মলিন হয়। বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বয়। ওদের দিকে তাকাতে পারে না অনন্ত।

এই করতে করতে ১৫৫৬ সাল শেষ হয়ে গেল। কয়লা কুটির ইতিহাসে একটি লাল অক্ষরে লিখে রাখার মতো বৎসর। সারাটা বছর কাটল টান টান উত্তেজনার মধ্যে। ১৯৫৭ সালের গর্ভে কি আছে কে জানে ?

তখন একটা গুজব উঠল ওদের কিমটা মজুর হয়ে গেছে। দু-একদিনের মধ্যে চিঠি এল বলে। কিন্তু কোথাকার কি ? দিন কয়েক অপেক্ষা করে হেড

অফিসে গেল। মিঃ দীক্ষিত বললেন—আমি তো শুনেছি কথাবার্তা হয়ে গেছে। চিঠি কেন আসছে না তাতে বুঝতে পারছি না।

১৩ই জাহুয়ারি অনন্ত মোজা মিঃ ভার্মার চেয়ারেই ঢুকে পড়ল। গুঁর মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে। বললেন—বোসো অনন্ত।

একটা চেয়ারে বসে অনন্ত বলল—স্মার। আমাদের ধৈর্ষের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ আমাকে নিশ্চিত করে বলুন কি হয়েছে বা কি হবে ?

উনি একটু চূপ করে থেকে বললেন—অনন্ত। কথাটা বলতে আমার হুঃখ হচ্ছে। আমাদের সি. এম. ই. সাহেব পুরো প্রপোজালটাই নাকচ করে দিয়েছেন।

ধর ধর করে কেঁপে উঠল অনন্ত—রাগে ক্ষোভে প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। গুর চোখ মুখ সর্বাক্লে ফুটে উঠেছিল তার লক্ষণ।

মিঃ ভার্মা বললেন—উত্তেজিত হয়ো না অনন্ত। আমি যে কত আঘাত পেয়েছি তা তোমাকে কি বলব ?

আমাকে আগে বলেননি কেন স্মার ?

—এই তো গতকাল গুর অফিস থেকে ম্যাটার ফিরে এল। আমি ভেবেছিলাম বোর্ডে চলে গেছে কিন্তু গুটা গুর অফিসেই আটকে ছিল।

—মাই গড। আমাকে আপনি সুইসাইড করবার পথ দেখিয়ে দিলেন স্মার।

—আমি খুবই লজ্জিত। তোমার কাছে মুখ দেখাতে পারছি না। কিন্তু কি করব ? ইউরোপীয়ান সি. এম. ই. ভারতীর শ্রমিকদের হুঃখ দুর্দশা বোঝে না।

অনন্ত জলে উঠল। গলায় জোর দিয়ে বলল—উনি কি মনে করেছেন এখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আছে ? জানেন না—আমি একটা ডাক দিলে আপনার কলিয়ারীর পুলিশাকা বন্ধ হয়ে যাবে।

—আহা ! ট্রাইব্যুন্সাল তো চালু আছে। আমি না হয় সেখানে তোমাকে সহযোগিতা করব।

—আর আপনার সহযোগিতার দরকার নেই। শ্রমিকদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে তারা নিজের ক্ষমতাতেই দাবি আদায় করে নেবে। আপনারা দয়া করে কাউকে কিছু দেননি, দেবেন না। দিন কয়েকের জন্ত আমাকে বোকা বানালেন। কিন্তু এখানে শেষ নয় !

গট গট করে বেরিয়ে এল।

অফিসের ঘড়িতে দেখল বিকেল চারটে। এখনো সময় আছে। ও তাড়াতাড়ি বাস স্টাণ্ডে গিয়ে আসানসোলের বাস ধরল।

অনন্ত এস হাসপাতালে। শিবারতিকে দ্বিধে গৈরীকে ডেকে পাঠাল। ও এল ব্যস্ত হয়ে।

—কি গো—এত রাজে ? কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো ?

—বোস। সব বলছি।

শিরারতি নিজের অফিসে ওদেরকে বসতে দিয়ে বাইরে চলে গেল। গৈরী একটা চেয়ারে বসল। ওর বাম অঙ্গটিই সার। ডান অঙ্গে ভর দিয়ে শুতেও পারে না বসতেও পারে না। লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে।

অনন্ত সমস্ত ঘটনা আল্পূর্বিক বর্ণনা করার পর বলল—এবার আমি মুখ দেখাবো কি করে ? চাকরি হবে বলে যারা দেশে গিয়েছিল তারা ফিরে এসেছে। বদলি হয়ে অনত্র চলে যেতে হবে তাই সাত আটটা ছেলেমেয়ের গাওনা করিয়ে দেব বলেছি। তারা নতুন জীবনের জন্ত দিন গুনছে। কাকে কি বলব ?

টেবিলে ভর দিয়ে গৈরী উঠে দাঁড়াল। অনন্তর কাছে এল। ওর মাথার এলোমেলো চুলগুলো গুছিয়ে দিতে দিতে বলল—তুমি আমাকে মরবার জন্তে প্রস্তুত হতে বলেছিলে। দেখ আমি এখনো প্রস্তুত আছি।

অনন্ত উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল—গৈরী !

—ভেঙে পড়ো না। অনশন ধর্মঘট শুরু কর। আমি যাব তোমার সঙ্গে শেষ লড়াইয়ে জীবন দিতে।

—গৈরী ! এত ভোর মনের জোর ?

—জীবন ভর তো নিন্দা বদনামই কুড়োলাম। অন্তত একবার মরার মতো মরি।

অনন্ত ওকে জড়িয়ে ধরল। বুক ভাঙা কণ্ঠস্বরে বলল—তুই আমার আধার মানিক রে।

বাহাস্তর

১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭ সাল।

স্বর্ষোদয়ের প্রাক মুহূর্তে একটা বিরাট মিছিল নিয়ে প্লোগান দিতে দিতে অনন্ত এগিয়ে গেল অফিসের দিকে। ভোরের আকাশ মুহমূহু প্লোগানে কম্পিত হয়ে উঠল। অফিস প্রাঙ্গণে শিশির ভেজা ঘাসের উপর শতরঞ্চি পেতে বসে পড়ল অনশন ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী বাইশজন শ্রমিক। তার মধ্যে সতেরোজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলা। গৈরীর জন্ত একটা বিছানা পেতে দিলো। বাঁদিকে ভর দিয়ে সে শুয়ে রইল। অনন্ত রইল তার পাশে। তাছাড়া কিষণ ও চরিতর ছিল সঙ্গীক এবং শকুন্তলা ও ফুলমণি। বাকী সব ওয়ানগন লোডারদের বিভিন্ন দল থেকে।

বেলা ঋত বাড়তে লাগল শ্রমিকের সংখ্যাও তত বাড়তে লাগল। জনকয়েক খুঁটি পুঁতে উপরে খাদের ব্রাটশরুখ দিয়ে ছাউনি করে দিলো। চারিদিক ধীরে

দিলো। আপন আপন ঘর থেকে তক্তা নিয়ে এসে তাতে বিছানা পেতে অনশনকারীদের শোবার বসবার জায়গা করে দিলো। মাইক ও লাইট হলো।'

অনন্ত ভাবতে পারেনি ওরা এমন স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পাবে। মাইকে জোগান ও বক্তৃতা চলছে। বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু কোম্পানী কেমনভাবে বেইমানি করেছে তার সবিস্তার বর্ণনা। মাঝে মাঝে সি. এম. ই.-কে মূর্দাবাদ ধনি।

বেলা বারোটো পৰ্বস্তু খুব জোর চলল। তারপর কিছুক্ষণের জন্ত বিরতি। হাল্লাবাজদেরও তো স্নানাহার আছে।

অনন্ত গৈরীর মুখের দিকে তাকাল। দুজনের চোখাচোখি হতে দুজনেই হাসল। গতকাল রাতে ঘুম হয়নি। উদ্বেগ ও উৎকর্ষা তো ছিলই। তাছাড়া দীর্ঘদিন পর দুজনে মেসের ঐ ঘরটিতে একসঙ্গে ভূমিশয়ায় শুয়ে রাত কাটিয়েছিল। কত কথা জমেছিল দুজনের বুকে। কত ব্যথা কত কান্না। কখন ভোর হয়ে গেল ওরা বুঝতেই পারেনি। দুজনেই স্নান করল।

তখন গৈরীর মুখটি ছিল ফোটা ফুলের মতো। এরই মধ্যে মলিন হয়ে গেছে। ওর পোড়া ঘাগুলো এখনো সারেনি। সেজন্ত ডাক্তারবাবু বকাঝকা করেছেন। তা ওরা স্নেহের শাসন বলে মেনে নিয়েছে।

বলেছেন—ওষুধ খেতে হবে।

গৈরী বলেছে—না দাদা অনশনে আবার খাওয়া কি ?

—তাহলে ইনজেকশন দেবো।

—তাই দেবেন।

দুপুরে ফাঁকা সময়ে এজেন্ট ও ম্যানেজার এলেন। ওঁদের ইচ্ছা অনন্তকে আলোচনায় বসার জন্ত রাজী করাবেন।

কিন্তু অনন্ত বলল—না স্মার। আপনাদের সঙ্গে আর আলোচনা নয়। সি. এম. ই. যদি কালকেও বলতেন তবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। কিন্তু এখন আলোচনা করতে হলে ওঁকে এখানে আসতে হবে।

মিঃ গুকুল বললেন—তা কি করে হয় অনন্ত ? উনি একজন সি. এম. ই.। তিনি কি আসতে পারেন ?

...কেন ? মানে লাগবে ? অত কিসের অহঙ্কার ? উনিও তো সাত সপ্ত প্যার হয়ে দাসত্ব করতে এসেছেন ! আমরাই বরং দাঁড়িয়ে আছি আমাদের মাতৃভূমিতে।

তারপর আর কথা চলে না। ওঁরা চূপ করে আছেন।

অনন্ত বলল—আমার অনার্ব স্ত্রীটিকে তো আগে দেখেননি স্মার। এই সেই।

গৈরী নমস্কার করল। উনি বললেন—আমি তো দেখেই বুঝতে পেরেছি। একে তুমি অনার্ব বল অনন্ত ? এ যে মা স্ত্রী !

কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওঁরা চলে গেলেন।

অনন্ত বলল—এই শালা সাহেব জাতটা কঠিন ধুরন্ধর। শক্ত লোকের কাছে এমন মিষ্টি কথা বলবে—এমন প্রশংসা করবে যে মনে হবে আহা অমায়িক ভদ্রলোক। কিন্তু শালারা হাড় বজ্জাত। নরমের ঘম।

গৈরী বলল—তুমি তো সাহেব হওয়ার জন্মই এসেছিলে, আমার পাল্লায় না পড়লে আজকে ছোট সাহেব হয়েও যেতে। কি মনে হয়—আমি তোমার ভালো করিনি।

—তুই যে আমার কি করেছিল সে হিসেব বোধহয় এজীবনে করতে পারব না।

হুজনেই হাসল। পারম্পরিক হাসি ঠাট্টার মধ্যেই প্রবল উৎকর্ষা পীড়িত সময়কে পার করে দিতে লাগল।

রাত্রে এল একদল স্বেচ্ছাসেবী ওদের হাতে সবরকম অস্ত্রশস্ত্র মজুত এবং যে কোনো রকম হামলার মোকাবিলা করার জন্ম তৈরি। ওরা জগদীশের লোক। অনশনকারীরা যাতে নিশ্চিন্তে ঘুমায় সেকথা বলে দিয়ে গেল। প্যাণ্ডেলের সামনে দুটো বড় বড় আগুনের চারা জ্বালা হলো। শীতের রাত।

পরদিন সকালেই এসে হাজির হলো সূবীর ও কমলেন্দু। হুজনেই ফুক।

অনন্ত বলল—আয়! আয়।

ওদের বসবার জন্ম জায়গা করে দিলো। সূবীর বসতে বসতে গৈরীর মাথায় হাত দিয়ে বলল—কেমন আছিস?

—ভালো আছি দাদা।

—হ্যাঁ। খুব ভালো আছিস। এই শালা সবাইকে জ্বালিয়ে দিলো।

গৈরী একটু হেসে বলল—ওকে কেন গাল দিচ্ছেন দাদা?

—দেবো না? কি করল ও? সব দুর্ভোগের মূলে ও নিজে। বিউটিদি আমাকে সব বলেছে—ষড়যন্ত্রের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ওকে। তখন শালা সাবধান হতে পারেনি। আজকে আবার মরতে বসেছে।

অনন্ত ওর রাগের মুখে মিন্ মন্ করে বলল—সংগ্রামের ময়দানে নেমে পড়ার পর কি পিছনে যাওয়া চলে?

—কে তোকে পিছে হটতে বলছে? আপনা জান কবুল করে লড়ে যা। কোরবানি করে দে। তোর নামে শহীদ মিনার বানাবো। কিন্তু গৈরীকে তুই হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলি কেন?

কমলেন্দু বলল—অনশন ধর্মঘট ছু-চারদিনে মিটবে না। যদি দশ বিশদিন লেগে যায় তো সে লড়াই তুই করতে পারবি। গৈরী কি করে পারবে? ছু-পাঁচদিনেই শেষ হয়ে যাবে। তখন কি নিয়ে লড়াই করবি?

অনন্ত বলল—তোদের রাগের কারণ আছে। স্নেহ দিয়ে, সামর্থ দিয়ে ডিল

ভিল করে ওর জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করেছিল। তাই আজ তোদের বুকে ব্যথা লাগছে। কিন্তু গৈরী না হলে যে আমি আমারও অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্তই নিতে পারতাম না।

সুবীর বলল—বেশ তো। সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এবার গৈরীকে ছেড়ে দে। আমরা আবার ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই গে।

অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ।

গৈরী বলল—তা হয় না দাদা।

সুবীর ফেটে পড়ল—তোদের সঙ্গে কে পারবে? আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু দেখিস যেন তোর মড়া পোড়াতে আমাদের না আসতে হয়।

হুজনেই চলে যাচ্ছিল।

অনন্ত বলল—রাগ করে যাস না।

—যাব কোথায়? তোদের শেষ না দেখে কি যেতে পারি? এখন মেসে যাচ্ছি। মাথাটা গরম হয়ে গেছে।

কলিমারীর উৎসর্গী উৎপাদন ঝপ করে নেমে গেল। সেদিন হলো অর্ধেক, তারপরদিন হলো আরও অর্ধেক। ছুটি, সিক, বিনা নোটিশে কামাই ইত্যাদির কারণে হাজিরার সংখ্যা অর্ধেক। আবার যারা আছে তাদেরও কাজে মন নেই। পিট টপ, পিট বটম, খাদের গোলাই থেকে শুরু করে চাঙনি আয়তন পর্যন্ত শুধু কোম্পানীর বেইমানির কথাই আলোচনা হচ্ছে। অনশন ধর্মঘটকে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করে।

মি: শুকুল, মি: শ' নন যে হুঁতুধি করে বেড়াবেন। সুরমপ্রসাদ গোরখপুর কম্যাণ্ডারেরও সে জোস নেই যাতে করে ক্যাম্পের লঙ্গরখানায় লুচি মাংস খানা-পিনা দিয়ে ও লোঁগা নাচ দেখিয়ে তার শ্রমিকদের তাতিয়ে তুলবেন।

ম্যানেজারের লাঠি, বাতি, টুপির রেওয়াজ উঠে গেছে। গোমস্তা সজিপ্রসাদ এখন আর ইচ্ছা করলেই দু-পাঁচশো তাজা ছোকরা এনে খাদে নামিয়ে দিতে পারে না। তাহলে যে রক্তাক্ত ঘটনা ঘটবে তার সামাল দেবে কে?

অতঃপর নানাভাবে চেষ্টা চলতে লাগল অনন্তকেই বুঝিয়ে স্বিকৃতিয়ে অনশন থেকে বিরত করা। কোম্পানীর উপর মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ে গেল। কিন্তু কল্যাণ রায় পর পর দুদিন এসে বলে গেলেন তোমরা চালিয়ে যাও। আমরা পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব তুলবো। প্রাইম মিনিষ্টারকে বলব।

ওদিকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দিল্লী থেকে সেনে করে উড়ে এলেন। জরুরী মিটিং-এ বসলেন। গুয়াগন লোডারদের ইস্যু নিয়ে যে প্রোপোজাল তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে সি. এম. ই.-কে কলকাতা অফিসে ডেকে

পাঠালেন। তারে তারে খবর চলছে, গাড়ি দৌড়ছে, পেট্রল পুড়ছে। অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে।

পঞ্চম দিনে অনশনকারীদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। পুলিশ গ্রহরা বসেছে। এস. ডি. ও., এ. ডি. এম. এসেছেন। একটা মেডিকেল ইউনিট ভ্যান নিয়ে হাজির হয়েছে অনশনকারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে। আর কলিয়ারীর সমস্ত শ্রমিক অতন্ত্র প্রতীকায় অবস্থান করছে। কলিয়ারীর উৎপাদন কার্যত বন্ধ।

জাহ্নবীদেবী এলেন প্রশান্তকে সঙ্গে নিয়ে। অনন্ত নির্জীব হয়ে শুয়েছিল। মাকে দেখে চোখ পিট পিট করে তাকাল। ওর মা কাছে এলেন। ওর মাথায় হাত রাখলেন। ভীষণ স্বস্তি বোধ করল ও। আরামে চোখ বুজল। উনি গৈরীর কপালে হাত রাখলেন। মুহূর্তে ডাকলেন—বউমা!

গৈরীর চোখ দুটো করকর করছিলো। বলল—কি মা?

—তুমি যে সেদিন বলেছিলে মরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি সেই কথাটাই সত্যি করে দেবে মা?

গৈরী তার উত্তর দিলো না।

উনি অনন্তকে বললেন—অনন্ত! আমি ভোর মা! এ দৃশ্য কি করে সহ্য করব?

—কেন কষ্ট পেতে এলে মা? না এলেই পারতে।

—অনন্ত! কোনো মা ঘরে বসে থাকতে পারে রে?

—মা। আমি তোমাকে সারা জীবন ব্যাপী যত্নপাই দিলাম। এই শেষ। আমাকে জন্ম দিয়েছ। সেই কারণে শোক দুঃখ যত্নপা একবারই ভোগ করে নাও। তারপর জাতিভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট কুলাকার সন্তানের কথা একেবারে ভুলে যেও।

উনি অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন—মাগের উপরে কত অভিমান তুই পুষে রেখেছিল অনন্ত। আমি গোঁড়া হিন্দু বিধবা। ক'দিন বা বাঁচব। তাও তুই আমার মুখের কথাটা এত ভারী মনে করছিল।

অনন্ত কোনো উত্তর দিলো না। বাইরে তেমনি রোগান চলছে। কোলাহল উঠছে। কিন্তু কিছুই যেন ওদের কানে চুকছে না।

জাহ্নবীদেবী গৈরীকে বললেন—বউমা! তোমারও তো সন্তান ছিল। তাকে হারিয়ে কি ব্যথা হয়েছিল তা তো জানো। আজ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে সেই শোক দিতে চাও।

গৈরী বলল—মা! আমার স্বামীই আমার ভগবান! তিনি যে পথে যাবেন আমিও সেই পথে যাবো।

তোমরা তাহলে জলগ্রহণ করবে না?

—না মা ।

—প্রশান্ত । তুই যা । তিনজনের শ্রদ্ধের আয়োজন কর গে । আমিও আর জল গ্রহণ করবো না । অনন্ত ও গৈরী একসঙ্গে বলল—মা !

স্মিতবাবু কাছেই ছিলেন । তিনি বললেন—মাসীমা । এটা সংগ্রাম । এর মধ্যে আপনি কেন আসছেন ? আপনি ফিরে যান ।

—আমি অনন্তের মা । এত জিদ সে কোথায় পেল ? আমার কাছেই তো । সবাই চুপচাপ । কারো মুখে কথা নেই । কেমন একটা বুক চাপা নীরবতা । জাহ্নবীদেবী সবারই মুখের দিকে তাকালেন । গৈরীর গায়ে হাত দিয়ে মুখ নীচু করে বসে আছে প্রশান্ত । অনন্তর পাশে স্ববীরও কমলেন্দু । স্মিতবাবু গুঁর কাছেই ।

উনি বললেন—স্ববীর তোমরাও কি চাও ওরা মরে যাক ?

স্ববীরের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো । কেমন কাল্পা ভাঙা গলায় বলল—কি বলব মাসীমা আমাদের বুক ভেঙে যাচ্ছে । এই গৈরী । বোনের মতো ভালোবাসি । হাসপাতালের সব দেখাশোনা আমরা করেছি । অনন্ত ওকে শুধু কাঁদিয়েছে । আমরাই চোখের জল মুছে দিয়েছি । কিন্তু একদিন রাতে কি যে ফুসমন্তর গুর কানে দিলো—তারপরেই দেখি কি না হাসপাতাল থেকে চলে এসেছে । আমরা তো পর । কেন কথা শুনবে ?

অনন্ত বলল—তুই এখনো রেগে আছিস ?

—মাসীমা । আমরা ওদের কাছে হেরে গেছি ।

হঠাৎ প্রশান্ত ওর মায়ের দিকে তর্জনী তুলে বলল—তুমিই এর জন্ত দায়ী । বৌদি তোমার স্থণার আঙুনে জলে গেছে । দাদা হারিয়ে ফেলেছে জীবনের স্বাদ । যার দুখের ছেলেকে পাথরে আছড়ে মেরে দেয়, মায়ে স্থণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তার কাছে জীবন মৃত্যুর পার্থক্য কি ? তাই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে । জিতলে বিজয় মঞ্চের নায়ক নায়িকা, হারলে শহীদ । তুমি এখন ছেলে বোয়ের জন্ত কাঁদছো কেন ? গাছের গোড়া তো আগেই কেটে দিয়েছো ।

গৈরী ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল—মাকে গল্পনা দিও না প্রশান্ত ।

প্রশান্ত ওর হাতটা দু'হাতে ধরে হু-হু করে কেঁদে ফেলল । ডুকরে ডুকরে বলল—তুমি মরে যেও না বৌদি । আমি দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি, পিসিমাকে বলেছি । তুমি ভালো হয়ে ওঠো । তোমাকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাব । দাদার বন্ধুরা বলেছে—অমন একটা বৈশ্ববিক চরিত্রের আবার জাত কিরে ? বল বল বৌদি তুমি মরবে না তো !

ফুরিয়ে হিত রেহ ভালোভাষার সুকোমল তন্ত্রীগুলিতে যেন বন্ধুর উঠলো । কেমন একটা মধুর ব্যথা । পরম মেহে প্রশান্তের মুখে হাত বুলিয়ে দিলো । ওর

মনে হলো বিপ্লব যেন বড় হয়ে গেছে। জাত পাতের সংস্কার ভেঙে দেবার সংগ্রামে নেমেছে।

আলো আলো বলল—না ভাই মরবো না। আমরা জিতবো। সবাই চূপচাপ বসে আছে। যেন সব কথা বলা হয়ে গেছে।

সপ্তম দিনের সকালে গৈরীর গায়ে হাত দিয়ে জাহ্নবীদেবী ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগলেন—বউমা! বউমা!

কিন্তু গৈরীর কোনো সাড়া নেই। তার ধাত ডুবতে বসেছে। নাড়ী অতিশয় ক্ষীণ। অল্পভবই করা যায় না। হৃৎপিণ্ড চলছে ধুক ধুক করে।

উনি আর্তকণ্ঠে বললেন—অনন্ত! তোর মনোবাসনাই পূর্ণ হলো। একবার হাত দিয়ে ঝাখ—বউমার যে সাড়াশব্দ নেই।

অনন্তর আচ্ছন্ন চেতনা ভেদ করে যেন ডংকা বেজে উঠল—গৈরীর সাড়া শব্দ নেই। তার মানে—একটা প্রদীপ তেলের অভাবে নিতে যাচ্ছে।

কিরকম বিকৃত কণ্ঠস্বরে বলল—গৈরী! তুই আমার আগেই চললি? যা। অনেক দুঃখ পেয়েছিস। এবার মুক্তি পাবি। আমি তোর পিছনেই যাবো।

—অনন্ত! তুই কি বলছিস?

ওকে যেতে দাও মা। ও বড় দুঃখী। দুঃখের অবসান হোক।

মেডিকেল ইউনিট তৈরি ছিল। গৈরীর স্বাস্থ্যের অবনতির কারণে তাকে স্ট্রেচারে চড়িয়ে হাসপাতালে পাঠান।

অনন্ত নির্বাক হয়ে দেখল। অনেকক্ষণ পর ডাকল—সুবীর, কমলেন্দু। ওরা কাছে এসে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে ডাকল।

অনন্ত বলল—তোরা গৈরীর জন্ত অনেক করেছিস। শেষ কাজটাও করে দিস। সুবীর বলল—কি বলতে চাইছিস?

—আলতা সিঁদুর পরিষে দামোদরে ওর সংস্কার করিস। প্রশান্ত যেন মুখান্নি করে।

—আঃ অনন্ত। গৈরী বেঁচে আছে।

—মিথ্যা স্তোক বাক্যে কি লাভ? ওকে আমি বলি দিলাম। কয়লা কুঠির কালো যবনিকায় বলি দিলাম আমার জীবন সঙ্গিনীকে। গৈরী শহীদ হলো। সেলাম। লাল সেলাম।

সেলাম করার ভঙ্গীতে হাত তুলল। প্রশান্ত ভেঙে পড়ল ওর বৃকে।

বিষণ্ন, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনন্ত। সে যেন কাউকে চিনতে পারছে না। কার কথা শুনে পাচ্ছে না। কোনো অল্পভূতি অবশিষ্ট নেই।

বুককাটা কণ্ঠস্বরে জাহ্নবীদেবী ডাকলেন—অনন্ত! অনন্ত!

বেলা দশটার সময় পর পর কয়েকটা গাড়িঃএসে দাঁড়াল ওদের মাঝের কাছে

মিঃ ভার্মা নামলেন। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকজন বড় দরের অফিসার এবং এজেন্ট সাহেব। এসে দাঁড়ালেন ধর্মঘটীদের সামনে।

গত কয়েকদিন ধরে চলেছে চরম তৎপরতা। বিরোধীরা লোকসভা তোল-পাড় করেছেন। কল্যাণ রায় দরবার করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তিনি শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বলেছেন। তারপরে ব্রিটিশ কোম্পানীর সাহেবদের ভ্যানিটি লোল হতে বাধ্য।

অনন্তর সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ ভার্মা বললেন, তোমরা জিতেছো অনন্ত। কনগ্রাচুলেশান।

ওর হাতটা টেনে ধরলেন। অনন্ত যেন কোনো দৈববাণী শুনছে। তেমনি-ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

উনি একটা বড় খাম ওর হাতে দিয়ে বললেন—এই তোমাদের স্বিম। ম্যানেজিং ডাইরেক্টার অ্যাপ্রভ করে সহি করেছেন।

খামটা হাতে ধরারও ক্ষমতা নেই অনন্তের। হাতের মধ্যে ধরখর করে কাঁপছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—ধন্যবাদ স্মার।

—এবার অনশন ত্যাগ কর।

—করবো স্মার।

—তোমার ওয়াইফ কোথায়? ঠা ওয়াইন্ড হিরোইন।

অনন্ত আস্তে আস্তে আকাশের দিকে হাত তুলল।

উনি চমকে উঠলেন—মাইগড!

ডাক্তারবাবু বললেন—না স্মার। এটা অনন্তের মনের ভ্রম।

ওকে যখন থেকে মেডিকেল ইউনিট তুলে নিয়ে গেছে তখন থেকেই এই ভ্রমটা মনের মধ্যে ঢুকেছে—আমরা এত বলেও বোঝাতে পারছি না যে ওর স্ত্রী বেঁচে আছে।

—আই সি।

কাঁধটা আগ করে বললেন—শুনছে অনন্ত তোমার স্ত্রী বেঁচে আছে।

অনন্ত সেকথা কতটা বুঝল কে জানে। কিন্তু সে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে উপবাসী কলিজা ফাটিয়ে ধনি দিলো—ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

অনন্ত ধর ধর করে কাঁপছে। দু-চোখ বেঁপে জল আসছে। গলা বসে গেছে। শরীরের সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে বলল। বলল—মা। তোমার পা দুটো কই? প্রশ্নাম করি।

মায়ের পায়ে মাথা ঠেঁকিয়ে আর উঠতে পারল না। ঐখানেই জ্ঞান হারাল। ওর মা চিৎকার করে উঠলেন অনন্ত।

ডাক্তারবাবু বললেন, ভাববেন না মাসীমা। এটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমা। একতর্ক জয়ের সংবাদে তো শক্ কম নেই।

গভীর রাত। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরছে অনন্তের। যেন কোনো অভঙ্গ সমুদ্রে ডুবেছিল। যেখানে গহীন কালো অন্ধকার। তার বুক চিরে এক কৌটা আলো পড়ল চোখে। সেই আলোর ইশারা পেয়ে ব্যাকুল প্রচেষ্টা চালান উঠে আসবার। তারপর আন্তে আন্তে জেগে উঠল একটি সবুজ বীপের শ্রামলিমা। নীলাভ আকাশ। বলাকার সারি। রৌদ্রমাত বেলাভূমিতে বিক্মিক করছে ঝিকুৎ এবং অভ্র। লাবণ্যময়ী জলরাশি তরঙ্গ ভঙ্গ চঞ্চল।

ক্রমাগত উদ্বেগ, অশান্তি শোক ও দুঃখে জর্জরিত নায়ক জয়ের তীব্র স্বাদ সত্ত্ব করতে পারেনি। তার মগ্ন চৈতন্যের ওপার থেকে কতই না যাদুকরী শব্দ ও দৃশ্যের মিছিল ছুটে যাচ্ছে।

জ্ঞান ফিরে দেখল তার গর্ভধারিণী জননী অসীম উৎকণ্ঠায় ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। আবেগ ভরে ডাকল—মা।

—অনন্ত!

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল—যায় জন্ম এত লড়াই সেই গৈরীর কানে এতবড় খবরটা পৌঁছাল না মা।

—কেন পৌঁছাবে না বাবা? এই তো তোর গৈরী। হাতটা বাড়িয়ে গুকে ছুঁয়ে জ্বাখ—সে জীবিত আছে। তার জ্ঞান ফিরেছে।

অনন্ত হাত বাড়াতেই পাশের বেড়ে গুয়ে ধাকা গৈরীর হাতটা পেল। ওর মা গুকে আরো কাছে সরিয়ে দিলো।

অনন্ত বলল—গৈরী সত্যিই বেঁচে আছে মা?

—হ্যাঁ বাবা। গুকে যে বাঁচতেই হবে। না হলে পৃথিবীতে সততা ও সংগ্রামের মূল্য থাকবে কি করে?

আন্তে আন্তে জীবনের ছন্দ ফিরে এল। খুশী এল। কত মানুষ এল ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে। তাতে তারা আশ্রুত হলো। গৈরীর মুখে বুলি ফুটল। নীতি ও ধর্মতিকে জড়িয়ে ধরে কত আদর, কত সোহাগ, কত কথা। জ্যোৎস্না রাতে দামোদরের বালুকা বেলায় রোমাঞ্চকর প্রণয়কাহিনী থেকে বঙ্গম হাতে রোমহর্ষক দাঙ্গা লড়ার গল্প শোনাল দুই ননদিনীকে। ওরা গুকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলল।

তারপর হাসপাতাল থেকে সবাই ছাড়া পেল, গৈরী বাদ। তার বোমা বিধ্বস্ত শরীরটার আরো চিকিৎসার প্রয়োজন। সেজন্য ওর বড় মন খারাপ।

বিকেলের দিকে অনন্তকে ওরা বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। গৈরীর ভিতরটা উন্মাদ পাখাল করছে। আবার তাকে একাই হাসপাতালে পড়ে থাকতে হবে। সেই কষ্টের কথা শ্রবণ করে ওর গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। ব্যথার মোচড় দিচ্ছিল স্বয়ংস্ব স্বকোমল ভদ্রীগুলি।

জাহ্নবীদেবীকে প্রণাম করে বলল—আমি আপনার কাছে চির অপরাধিনী
মা। আমাকে ক্ষমা করুন।

উনি ওকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—আর ও কথা কেন মা? মনে কোনো
কিন্তু রেখ না। আমি মা। ক্ষমা তো করবই। কিন্তু তোমরা আমাকে
নাতির মুখ দেখতে দাওনি সে দুঃখ আমার আছে। যেদিন তোমার কোলে
সন্তান আসবে সেদিন এ দুঃখ যাবে।

—আশীর্বাদ করুন মা!

—আরেকটা কথা। ছাড়া পেয়ে অনন্তর সঙ্গে একবার বাড়ি আসবে।
আমাদের কুলদেবতাকে প্রণাম করবে। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে নতুন সংসার
পাতবে। বিপদে আপদে তিনিই রক্ষা করবেন।

ওরা চলে গেলেন। গৈরী একা। হাসি ছিল, খুশী ছিল, প্রাণের মাহুৰ
ছিল। আবার কবে সেইদিন ফিরে আসবে?

একমাস ব্যারোদিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেল গৈরী। অনন্ত ওকে ট্যান্ডি
ভাড়া করে নিয়ে এল। এখন ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল।
গাল দুটি ভরাট। স্তন ও নিতম্বের ভোল ফিরেছে। রঙটা খুব পরিষ্কার
হয়েছে।

অগ্রদূত মেসে উৎসবের হাওয়া বইছে। খাবার হচ্ছে লুচি, মাংস, পায়ের,
মিষ্টি। নাচগান কমিক নকশায় সন্ধ্যাটা জমাট হয়ে উঠল। ট্রেনি ছোকরারা
ওদের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলল—আজ দাদা বৌদির ফুলশয্যা!

দীর্ঘ অমা রজনী বিদীর্ণ করে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। দিক চক্রবালে বিন্দু
চন্দন ঝরে পড়ছে। ওরা বোধহয় এই স্থখ রজনীর জন্মই এতদিন ধরে প্রতীক্ষা
করে আছে।

গৈরী যখন হাসপাতালে তখন অনন্তর কালঘাম ছুটে গেছে চারশোজন
শ্রমিকের পুনর্বাসনের কাজে। জড় শিকড় উপড়ে এক একটি দলকে নিয়ে যাওয়া,
ঘরবাড়ি নির্মাণ, কাজে যোগদান করানো, ছেলেমেয়েদের বিয়ে, গাওনা, পরিশেষে
গ্যালন গ্যালন অঞ্জলি মাড়িয়ে ফিরে আসা। সে কি কম কাজ?

তারপর যেসব সহকর্মীদের সঙ্গে জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে,
সততা বিশ্বাস, রেহ ও ভালোবাসার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাদেরকে ওরা
ভুলবে কি করে? রামধনি ও বাসমতী, গুলনাম ও প্রেমা কাউরের মতো কত
জুড়ির সঙ্গে ওদের প্রাণের সম্পর্ক। এতোয়ারী রাম, স্বমন লাল, জান রাজকিশোর
সিং, হরিহর গাঙ্গী, নগেন মণ্ডল, ফুলমনি, শঙ্কুলা, কালো বাউরী, শঙ্কু বাউরী, জান
মহম্মদ, ফৈজু সিংয়ের মতো কত মাহুৰ জান কবুল করে দিয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্ত
স্বয়ম্ভব ছিল বাবু, জেইয়া, লেবার, কামিন্দু, স্ক্রীমী ও হুলি কামিনদের।

কে গৈরী ; কি তার জাত ? কোন কুলে কালি দিয়ে সে বিয়ালা পুরুষ ছেড়েছে, বামূনের ছেলে হুনিয়া ঘরে জাত দিয়েছে এসব প্রশ্নের কোনো গুরুত্বই ছিল না। এক কণ্ঠের বাণী সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। নতুন যুগের নতুন মানসিকতা পুরানো ধ্যান ধারণা বদলে দিচ্ছে। তাই তো ওরা ছিনিয়ে এনেছে জয়। প্রমাণ করেছে জীবন অনেক বড়।

বড় তীব্র, বড় রোমাঞ্চকর এই আশ্বাদন। সব দুঃখ নিমেষে মুছে যায়। সেই আশা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে।

পরদিন ধাওড়ায় ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাজকিশোর সিংঘের বাড়িতে থাওয়া দাওয়া করল। শান্ত, স্নন্দর বয়স্ক এই মানুষটির সংসার নানা সমস্যায় জর্জরিত কিন্তু কখনই তিনি তাঁর সমস্যা অল্পকে বুঝতে দেননি। হরিহরেরও তাই। এই ছুটি চরিত্র সদা সর্বদা তাকে বুক দিয়ে আগলে রেখেছিলেন। সব সময়ে সং পরামর্শ দিতেন। কাজের ইশারা পেলেই বাঁপিয়ে পড়তেন।

তাদের কাছে বিদায় নিতে বুক ফেটে যাচ্ছিল। কত যে অশ্রুজল মাডাতে হলো তার হিসেব নেই। আলু-ডিতে চরিত্রের কিরণের দলকে নতুন হুনিয়া ধাওড়ায় থিতু করে যেদিন ও ফিরে এসেছিল সেদিন তাদের কাম্রায় মাটি পিছল হয়ে গেছিল। ওঃ মানুষের ভালোবাসা যে এমন তীব্র সঞ্চারী বেদনার স্রোত হয়ে বইতে পারে তাও জানত না। সেই লবনাক্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে ও বুঝল জীবন দেবতা বড়ই নিষ্ঠুর। বড়ই রসিক এবং স্নেহময়ও।

অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে স্মিতবাবু ও স্বপ্না নতুন কোয়ার্টারে এসেছেন। গুরু ও গাইড, ফ্রেণ্ড ও ফিলজফার এই ব্যক্তিটির সঙ্গে অনন্তের সম্পর্ক বড়ই আন্তরিক ছিল। শুধু একবারই ওদের মধ্যে তুল বোঝাবুঝি হয়েছিল তারপর ঠিক হয়ে গেছে। ওঁর হাতে ইউনিয়নের চার্জ বুঝিয়ে দিলো।

এয়ার ওকেও যেতে হবে। কমলেন্দু ওর জন্মে মাইনিং সরদারের চাকরি ঠিক করে রেখেছে। ওঁর বাসাতে চা খেয়ে সন্ধ্যাকালে মেসে ফেরার রাত্তা ধরল। চলতে চলতে অনন্ত বলল আজ শুধু একজনের জন্ম বুকটা চড় চড় করছে।

—কার কথা বলছো গো ?

—বিউটি দি। ওদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। অথচ মানুষ তাদেরকে চিনল না। আবিল পরিচয়ের অন্তরালে রয়ে গেল মহৎ প্রাণ।

মেনে কিরে অনন্ত বল ডায়েরীর খাতা নিয়ে। গৈরী গোছগাছ করছে। অনন্তর বই, খাতা, পত্র পত্রিকা ও স্থানীয় খবরের কাগজে প্রকাশিত অনন্তর কটো, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, খবর, কবিতা প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলল, আচ্ছা, বারো খানা ডায়েরী লিখেছো কখন ?

অনন্ত বলল, লিখছি তো যেদিন প্রথম এখানে এসেছি সেদিন থেকেই। কিন্তু

সবচেয়ে বেশী লিখেছি তুই এখন হাসপাতালে ছিলি ! রাত্রে ঘুম হতো না। বুক-চাপা কষ্ট। খাতার পাতাতেই উজাড় করে দিয়েছি। তবে সবই ভূমিমাল নয়। কয়লা শিল্পে অগ্নিগর্ভ সময়ের দলিলও বটে।

বিশ্বয় বিমুক্ত কঠে গৈরী বলল সত্যি ! তুমি একটা বিরাট মাহুঘ।

বাকসো নিয়ে বসলো। অনন্তর গোলাপ ফুল আঁকা স্ট্যুটকেশটা তখনো আছে। সেটা ভর্তি হবার পর নিজের বাকসোটি খুলল। ওর বাবা দ্বিরাগমনের জন্ত কিনে দিয়েছিল। চরিতর কিষণের সঙ্গে বদলি নিয়ে ওরাও চলে গেছে। জাত কুটুম ছেড়ে থাকতে চাইল না বলে। যাবার সময় বাকসোটি অনন্তকে দিয়ে গেছে। তাতেই গৈরীর কাপড় চোপড়, গয়না গাঁটি, টুকিটাকি মেয়েলি জিনিসপত্র থাকতো। গয়না গাঁটি বিক্রি হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় পরতে পরতে ছিঁড়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে বিয়ের শাড়ি ও গাঁটছড়াটি আর অনন্তর পুরানো গায়ের চাদরটা। তাতে ওর ঘামের গন্ধ লেগে আছে। শুঁকে দেখল।

বাকসোটা উপুড় করে দিলো। হুমড়ানো মুচড়ানো একটি কাগজের প্যাকেট বের হলো। সাতপুর কাগজের ভাঁজ খুলে বেরুল একটি সোনার আংটি। মুক্ত দৃষ্টিতে বিচক্ষণ তাকিয়ে তাতে চুমু খেয়ে বলল, ওগো দেখো দেখো তোমার দেওয়া সেই আংটিটা এখনো আছে। এত অভাবেও আমার মা বাবা এটা বিক্রি করেনি।

অনন্ত তা জানে। সেই তা রেখে দিয়েছিল। গৈরীর খুশী দেখে বলল, প্রথম প্রেমের স্মৃতি তো। তাই তোর মা বাবা জাগিয়ে রেখেছে।

গৈরী বলল—হ্যাঁ গো ! একবার যাবে না ? সবাইকে দেখতে মন হচ্ছে।

—তা তো হবেই।

—কবে যাবে ?

—কাল সকালে একটা কাজ আছে। বিকেলে নতুন কলিয়ারীতে যাবো নতুন সংসার পাততে। কমলেন্দুর বাংলাতে জিনিসপত্র রেখে পরন্ত মাকে প্রণাম করতে বাড়ি যাবো। মা তোকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমার গ্রামের বন্ধুরাও তোকে দেখতে চাইছে। নীতি, স্রীতি, প্রশান্ত কত খুশী হবে সে তো বুঝতেই পারছিল। দু'একদিন থাকবো। ফিরতি পথে আলু-ভির নতুন হুনিয়া ধাওড়া। ব্যস ! মাল ফাল টেনে ভোজীদের সঙ্গে দমে নাচবি। গৈরী শুকে পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি মাদল বাজাবে তো ? হিপীড় ডিগীড় বাজনা। বৃকে হড়পা বান ডাকিয়ে দেবে।

ওরা হেঁটে যাচ্ছে দামোদরের দিকে। অনন্তর কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ। গৈরীর খালি হাত। পা টেনে টেনে চলছে। পথে কত চেনা মাহুঘের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কত কুশল বিনিময়। কত শুভ কামনা। অকস্মে কটাখানেক লাগল। স্মৃতিভাব চোটা চরিত্র করে ওর মস্ত কিষ্কি টাকি আঁধার করিয়ে দিলেন।

গরুই পাওনা। এতদিন আটকে ছিল। যাবার দিনে এজেন্ট, ম্যানেজার বিনা
ধিখায় ভাউচার সহি করে দিলেন।

ফাঁকি বাজারে এসে আধঘণ্টা দাঁড়াতে হলো। এখানেই দাঁকা হতো।
সেখানে লোকজনদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গেল।

ঐ দিকে মোড় দিয়ে পুরানো নামো ধাণ্ডার পাশ দিয়ে রাস্তা। গৈরী
সেখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনটা উদাস বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল। এই ধাণ্ডা
হরদম ছেলে পুলে, মাহুঘ জন, শুয়োর, কুকুর, ছাগল, হাঁস মুরগিতে গিজ গিজ
করতো। আঙ্গ প্রাণী শূন্য কুপড়িগুলো ভেঙে ছত্রখান। গরুতে খড় টানছে!
চবুতরার ঝকমকে জায়গাটা শু, গোবর, নোংরা আবর্জনার ভরে গেছে।
রাজমিস্ত্রী লেগেছে গোল ঘরের কোয়ার্টারগুলো ভাঙতে। যে টালির ঘরে
গৈরীর আঠেশব কেটেছে তার কাঠামো খুলে ফেলা হয়েছে। কোম্পানী এখানে
নতুন কোয়ার্টার বানাবে।

গৈরী সেদিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কি ছিল কি হলো ?

অনন্ত বলল, ওদিকে তাকাসনে গৈরী। চল, আগে চল।

চলতে চলতে দামোদরের ঘাটে নামবার রাস্তায় গুর মুখে হাসি ফুটল।

আঙুল বাড়িয়ে বলল ঐ জায়গাটা না ? তুমি বই পড়ছিলে।

—হ্যাঁ।

—কি দৃষ্টি ছিলাম তখন।

বালিতে পা দিয়ে অদ্ভুত ভাবান্তর হলো গুর। এমনভাবে বেড়াচ্ছে যেন
বৈশাখের জ্যোৎস্না প্রাবিত রাজিগুলি ফিরে পেয়েছে। আরব্য রজনীর জিন
পরীদের মতো নেমে এসেছে স্নান করতে। তেমনি ছলবল করে বেড়ালো। গা
ডুবিয়ে স্নান করল। এখানকার প্রতিটি বালুকণায় গুরের স্মৃতি স্মৃতি জড়িয়ে
আছে। তাইতো মনটা আনন্দে নেচে উঠেছে।

গুকনো কাপড় পরে একটা শিমুল গাছের দিকে লক্ষ্য রেখে চলতে লাগল।
গৈরী বলল—ঘাটের রাস্তা এদিকে।

—হ্যাঁ তো! ঐ তো সেই শ্রাণ্ডা গাছটা। বর্ষার রাতে জোনাকি
পোকায় ছেয়ে থাকতো। এখানেই তো তুমি আমার মাথায় সিঁহুর পরিয়ে
দিয়েছিলে।

—হ্যাঁ।

মাটির চালু পাড় বেয়ে উঠবার সময় অনন্ত গুর হাত ধরে টেনে তুলল।
একটা শিমুল গাছের নীচে দাঁড়াল। চারিদিকে রোদ। গাছের নীচে জাকরি
কাটা ছায়া। ধূধু করছে দামোদরের বালু বেলা। উত্তরে কলিয়ারীর
হেতুস্বরূপ, চিমনি প্রভৃতি যান্ত্রিক চালচিহ্ন।

অনন্ত বলল—গৈরী ঠিক আছিল তো ?

ও একটু একটু হাঁকাচ্ছিল। বলল, হ্যাঁ।

অনন্ত ফুলগুলো পকেট থেকে বের করল। গৈরীর একটা হাত ধরল। বড় বড় চোখে তাকাল ও।

অনন্ত বলল, আমাকে ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়া।

—কেন গো ?

মন থেকে সব দ্বিধা ভুলে ঝেড়ে ফেলে বলল—আজ বিপ্লবের জন্মদিন।

—হ্যাঁ।

—এই খানটায় ওকে পুঁতে দিয়ে গিয়েছিলাম। আজ তার জন্মদিনে জীবনে শেষবারের মতো ফুল দিয়ে যাবো। সেজন্তাই তোকে এনেছি।

অনন্ত যা ভেবেছিল তাই হলো। গৈরীর আর্তনাদ এবং তার টাল খেয়ে পড়ে যাওয়া শরীরটা ও সতর্কভাবে ধরল। আন্তে আন্তে বসিয়ে দিলো। গৈরী আকুল হয়ে কাঁদছে।

সবুজ শ্রামল ঘাসের আন্তরণ কেটে যে গর্তটা করেছিল তা আবার ভরাট করে ঘাসের চেলা বসিয়ে মাটি থেকে একটু উঁচু করে দিয়েছিল। এখন তা মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। গৈরীর ত্বক মাংসে যেমন ক্ষত চিহ্ন আছে মাটিতেও তেমনি ক্ষতচিহ্ন আছে। ঘাস শুকিয়ে গেছে। প্রকৃতি নিজেই তার উপর ফুল বিছিয়ে দিয়েছে। শিমুল ফুলের অজস্র পাপড়িতে ছেয়ে আছে।

এটা হবে, বছর বছরই হবে। ফাগুনে ওর জন্ম। মধুমাশ ফাগুন ফুলের মাস। মধুর মাস। সে ফুল না দিলেও প্রকৃতি তাকে ফুল দেবে।

ইতঃসত্ত্বা বিক্ষিপ্ত পলাশ গাছগুলোর অজস্র ফুল। কালো বোঁটার লাল ফুল যেন কালো অন্ধকার কেটে লাল সূর্য গুঁঠার প্রতীক।

অনন্ত বলল, কাঁদিস নে গৈরী। বিপ্লব মরে না রে। বিপ্লব চিরজীবী। তুই আমি তো জগতের একটা পিতামাতা নই। আমরা অনেক। অনেক পিতামাতা বিপ্লবের মাথায় ফুল চড়ায়। দে ফুল দে।

গৈরী চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে বলল, কোথায় দেবো ?

—এই যে যেমনভাবে আমি দিচ্ছি তেমনভাবে তুই দিবি। ঠিক পাশে পাশে। একটা সাদা একটা লাল।

অলীম ধৈর্ষে কাঁপা কাঁপা হাতে অনন্ত গৈরী ছেলের সমাধির উপর ফুল সাজাল। ফাল্গুনের বাতাস বইল মুহম্মদ গভিতে।

অনার্ধ দ্বামোদর প্রাসন্ন প্রবাহে ছল্ ছল্ শব্দে আবহ সঙ্গতের সুর বাজিয়ে চলল। বাতাসে ভেসে এল উদাসী ঘুঘুর ডাক। কলিয়ারীর ব্যক্তিক শব্দমালা। গাছতলাটি ফুলের স্তব্ধে ছেয়ে গেল।

দিগন্তের বৃকে নীল ট্র্যাপিজিয়মের মতো পঞ্চকোটি পাহাড় রচনা করল সৌন্দর্যময় চালচিত্র। পরশারে শ্রামল বনভূমি।

গৈরীকে টেনে তুলল অনন্ত, পাশাপাশি দাঁড়াল পরস্পরের হাতে হাত রেখে ।
অপলকে তাকিয়ে রইল সেই ফুলসজ্জার দিকে ।

মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্যালোকে লাল ও সাদাফুল দিয়ে সজ্জিত একটি যুগান্তকারী
শব্দ গতি ও মুক্তির প্রতীক হয়ে মাটির বুকে ফুটে উঠলো—বিপ্লব ।

